নিবেদিতা লোকমাতা

প্রথম খণ্ড

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলিকাতা ৯

নিবেদিতা লোকমাতা

প্রথম সংস্করণ : জন্মাষ্টমী ১৩৭৫
চতুর্থ মুদ্রণ : ১ বৈশাখ । ১৩৯৮

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

ISBN 81-7066-972-3

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।
মূল্য ৭৫·০০

উৎসর্গ

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন থেকে যিনি নিজ বয়স গণনা করতেন, যাঁর মাতৃস্নেহ-দৃষ্টি স্বামীজীর মানসকন্যাকে সর্বদা বেষ্টন করে থাকত, ভারতের ইতিহাসে নিবেদিতার ভূমিকা যাতে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে নির্ণীত হতে পারে, সেজন্য নিবেদিতার পত্রগুলি যিনি পরম যত্নে বৎসরের পর বৎসর রক্ষা করেছেন, পরে তুলে দিয়েছেন যোগ্য জীবনীকারের হাতে, সেই মহীয়সী মহিলার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।

92 r a. 21.

Jan. 23: 1900

Dearest Child.

What do you think of this enclosure? coming around in English mails. We are screaming! Also warm greetings from Sister and Yum card -

Please send on to S. S. for I do not think the religion that F. H. M. is really our changed [illegible]. The Rev. Mother comes home to rest - after [illegible] years wanderings.

[illegible] - [illegible] we [illegible] like can

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে প্রবেশ ও পরিক্রমণকে রোমা রোলাঁ আত্মার তীর্থযাত্রা বলেছিলেন। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'র জীবন ও সাধনার ইতিহাসের মধ্যে কয়েক বৎসর ধরে যে পরিক্রমণ করছি—তাও আত্মারই তীর্থযাত্রা, সন্দেহ নেই।

একথা গোপন করার প্রয়োজন নেই, ভগিনী নিবেদিতার উপর এই আকর গ্রন্থ প্রস্তুতের জন্য কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অবহেলার ধূলি সরিয়ে প্রায় লুপ্ত উপাদানসম্ভার উদ্ধার করার কালে দৈহিক ক্লান্তি বোধ করেছি অনেক সময়, কিন্তু মানসিক ক্লান্তি কদাপি নয়; এই গবেষণা যে আনন্দ দিয়েছে, দুর্লভ সে প্রাপ্তি। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, আরো আরো চাই, প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে, এবং বিস্ময়—জীবন এত বৃহৎ, এত মহৎ হয়! ভগিনী নিবেদিতার জীবনকে জানা পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

অথচ ভগিনী নিবেদিতার উপর বৃহৎ আকারে সন্ধানকাজ চালাবো, আট-দশ বছর আগেও তেমন কোনো অভিপ্রায় ছিল না। বিবেকানন্দ-জীবন সম্বন্ধে আমাদের পূর্বাবধি আকর্ষণ, ব্যাপক গবেষণায় বহুদিনের অভিলাষ। সে কাজ প্রায় এক যুগ আগে আরম্ভও করে দিয়েছিলাম। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর সময়ে তার প্রারম্ভিক কিছু ফসল 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। তারও পূর্ব থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে বিবেকানন্দ-সংবাদের জন্য বিস্তারিত সন্ধান করে আসছি শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায়। এই সন্ধানের জন্য ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণও করেছি। ফলে ইংরাজিতে "বিবেকানন্দ ইন ইন্ডিয়ান নিউজ পেপারস্" নামে যে বিশাল আকার গ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছে, তার মধ্যে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের এক প্রধান চরিত্ররূপে ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে বেশ কিছু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। ঐ সংবাদগুলি নিবেদিতা সম্বন্ধে অধিক সন্ধানের ইচ্ছা মনে ক্রমে জাগরূক করে।

বিবেকানন্দ-জীবনে আগ্রহীদের কাছে ভগিনী নিবেদিতার জীবন স্বভাবতঃই আগ্রহের বস্তু ছিল, কিন্তু খুব সীমাবদ্ধ আকারে। নিবেদিতা বিবেকানন্দের মানসকন্যা, একথা দীর্ঘদিন শুনে এসেছি। সরলাবালা সরকার রচিত ও উদ্বোধন-প্রকাশিত নিবেদিতার যে-স্মৃতিকাহিনীটি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে নিবেদিতার অসাধারণ চরিত্রমহিমা আশ্চর্য সরলতা ও মর্যাদার সঙ্গে লিখিত ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র আকারের ঐ বইটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-কাহিনী নয়। স্বামীজীর জীবনীতে নিবেদিতার কথা অবশ্য যথেষ্টই ছিল এবং স্বামীজীর উপরে নিবেদিতার লেখা দুটি গ্রন্থও প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত কিছু থেকে নিবেদিতা অসাধারণ ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের প্রতীক চরিত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন কিন্তু কেন তিনি বিবেকানন্দের মানসকন্যা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, এবং যাঁরা তাঁকে সে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও তা স্পষ্ট করে তোলেননি। বিশেষ ভক্তির সঙ্গে আত্মনিবেদন করাই

কি বিবেকানন্দের মতো প্রচণ্ড গতিশীল মানুষের মানসকন্যা হবার পক্ষে যথেষ্ট যোগ্যতা? রামকৃষ্ণের দায়ভার যিনি বহন করেছেন, সেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে কী করেছেন, তার কিছুটা আমরা জেনেছি, কিন্তু বিবেকানন্দকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নিবেদিতা কতটুকু করেছিলেন? মেয়েদের একটি স্কুল চালানো এবং কয়েকটি বই লেখার বাইরে তাঁর কর্মের রূপ কী ছিল?

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী যখন উদ্বোধন পত্রিকায় ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি থেকে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিপুলায়তন রচনাটি প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, তখন আংশিক কিছু উত্তর পেয়েছিলাম। গিরিজাশঙ্কর প্রাসংগিকভাবে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং শিল্প-আন্দোলনে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছিলেন। সে এমন তথ্য, যা মনে প্রশ্ন উদ্রিক্ত করেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তর কতখানি, তা অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল। ডঃ কালিদাস নাগের একটি-দুটি প্রবন্ধ একই ধরনের কাজ করেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, যখন শ্রীনারায়ণী দেবী মাসিক বসুমতীতে ১৯৫২ সালের প্রায় শেষ ভাগ থেকে ধারাবাহিকভাবে লিজেল রেমং-লিখিত নিবেদিতার ফরাসী জীবনীর বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করে দিলেন। লিজেল রেমং'র ফরাসী জীবনীর একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রবন্ধ ভারত পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৪৬, সংখ্যায় ডঃ বিনয়কুমার সরকার করেছিলেন, কিন্তু তা মনে রাখার প্রয়োজন হয়নি যেহেতু ফরাসী গ্রন্থ ভাষাব্যবধানে আমাদের আয়ত্তের বাইরে। নারায়ণী দেবীর অনুবাদ আমাদের চমকিত করেছিল। সেই প্রথম নিবেদিতার কর্মজীবনের ব্যাপকতার সংগে আমাদের পরিচয়, অন্তর্জীবনের গভীর-মথিত রূপের সংগেও। সেই প্রথম নিবেদিতা পূর্ণাংগ রূপের আভাস নিয়ে বাঙালী মনের কাছে অবতীর্ণ হলেন। আমরা বুঝেছিলাম, বিবেকানন্দের মানসকন্যা হওয়ার অর্থ বিবেকানন্দের অভিপ্রেত ভাবগুলিকে ভাবে-কর্মে সর্বাত্মকভাবে বিকশিত, প্রকাশিত করে তোলা। মনে রাখতে হবে, ভারত ও পৃথিবী সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মতো গভীর-ব্যাপক চিন্তা আর কোনো ভারতীয়ের মধ্যে দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

নারায়ণী দেবীর অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। তার চার বছর পরে (১৯৫৯) সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের পক্ষ থেকে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বাংলার 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে জীবনী গ্রন্থখানি লেখেন, আরও দু'বছর পরে (১৯৬১) একই তথ্যের উপরে লেখা প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার 'সিস্টার নিবেদিতা' নামক ইংরাজী জীবনী প্রকাশিত হয়। তার কিছু আগে (১৯৬০) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' প্রকাশিত হয়েছে। কাছাকাছি সময়ে আরও একটি দুটি বই।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, লিজেল রেমং'র গ্রন্থের বাংলা অনুবাদই এদেশে নিবেদিতার বিষয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করে এবং মুক্তিপ্রাণা-আত্মপ্রাণার লেখা জীবনী দুটি সেই কৌতূহলকে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্থাপন করে। মুক্তিপ্রাণা-আত্মপ্রাণা জীবনী রচনায় সত্যই শ্রমস্বীকার করেছেন, কোনো তথ্যকেই যাচাই করার আগে সত্য বলে মানতে রাজি হননি। তাঁরা লিজেল রেমং বা তাঁর উপর নির্ভরশীল গিরিজাশঙ্করের লেখায় নিবেদিতার বৈপ্লবিক জীবন সম্বন্ধে যে-সব তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার বহুলাংশের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। সে প্রতিবাদ যথেষ্ট যুক্তির সংগে করা হয়েছে কিনা, তার বিচার যথাসময়ে আমরা করব, এখানে এইটুকু বলে নিতে পারি, নিবেদিতা সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছিলেন লিজেল রেমং, তার মীমাংসায় নিষ্ঠার সংগে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তিপ্রাণা ও আত্মপ্রাণা।

এই সমস্ত গ্রন্থপাঠ করে প্রভূত আনন্দ ও শিক্ষালাভ করলেও নিবেদিতার উপর গবেষণায় হস্তক্ষেপ করিনি। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থের অভূতপূর্ব সমাদর লক্ষ্য করার পরে ক্রমে মনে হতে লাগল, নিবেদিতা শতবার্ষিকীতে নিবেদিতার উপরে ঐ ধরনের একটা কাজ করা উচিত। তদনুযায়ী পুরাতন পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে দিলাম। প্রচুর সংবাদ মিলল। নিবেদিতার বহিরঙ্গ কার্যকলাপের ঐসব বিবরণের সঙ্গে অন্তর্জীবনের রূপ জানবার আগ্রহ স্বতঃই হতে লাগল। মনে পড়ল, নারায়ণী দেবীর গ্রন্থের শেষে 'নিবেদিতার পত্রাবলী যন্ত্রস্থ', এই ধরনের একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল। সেই গ্রন্থটির সংবাদ চেয়ে নারায়ণী দেবীর নামে একটি চিঠি দিয়েছিলাম প্রকাশকের ঠিকানায়। পত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনই উচ্চাশা ছিল না।

উত্তর এসেছিল, কিছু বিলম্বে, যেহেতু ঠিকানা ফিরি হয়ে তবে গন্তব্যস্থানে চিঠি পৌঁছেছিল। সংক্ষিপ্ত চিঠিতে নারায়ণী দেবী লিখেছিলেন, নিবেদিতা-পত্রাবলী আপাততঃ বেরুচ্ছে না, চিঠিগুলি আছে শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছে, যদি প্রয়োজন মনে করি, কেয়াতলা রোডের একটি বাড়িতে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে যেন দেখা করি।

রবিবারের সেই দুপুরটি নিশ্চয় আমার জীবনের এক শুভদিন, যেদিন শান্ত পরিচ্ছন্ন কেয়াতলা রোডের একটি বাড়িতে ঠিকানা খুঁজে উপস্থিত হয়েছিলাম, সৌম্যদর্শন, স্পষ্টতঃ অবাঙালী এক ভদ্রলোক সুমিষ্ট বাংলায় বলেছিলেন, হাঁ, স্বামীজী আছেন, একটু অপেক্ষা করুন। অল্প পরে ভিতরের একটি ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ছোট ইজিচেয়ারে শীর্ণকায় এক সাধু বসেছিলেন, পরনে গেরুয়া নয়, শুভ্রবাস, মুখে কাঁচা-পাকা অল্প দাড়ি, অনেকটা রামকৃষ্ণ-পার্ষদ বলরাম বসুরমতোচেহারা, ভারী শান্ত, গভীর কালো চোখ, মৃদু-স্বরে যখন কথা বললেন—স্নিগ্ধ সুরেলা কণ্ঠ। আমি পরিচয় দিলাম, প্রয়োজন জানালাম। উত্তরে বললেন, হাঁ, নিবেদিতার চিঠি তাঁর কাছে আছে। আনন্দের উত্তেজনায় নিজের পরিচয় ও প্রয়োজনকে ঈষৎ আতিশয্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছি পুনশ্চ। তিনি চুপ করে শুনেছেন। কথা শেষ হলে বলেছেন, 'বেশ তো, চিঠিগুলি নিয়ে যান।' কী বললেন, আমি যেন সত্যই বুঝতে পারিনি। 'কতগুলি চিঠি আছে?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম। 'কম বেশী পাঁচশো।' সংখ্যা শুনে হতবাক হয়ে আমি বলেছিলাম, 'যদি অনুগ্রহ করে চিঠিগুলি ব্যবহার করতে দেন! বলেন তো, আমি এখানে এসে অল্পে অল্পে দেখে যাব।' পূর্বের মতই মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'বলেছি তো, চিঠিগুলি নিয়ে যান।' এবার সত্যই নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি! আত্মসংবরণ করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'কিন্তু শর্ত কী—এতগুলি মহামূল্য জিনিস দিচ্ছেন—'

সে হাসি কখনো ভুলবো না—সাধু ব্যক্তি হেসে বলেছিলেন, 'শর্ত আছে, একমাত্র শর্ত, আপনি নিবেদিতার উপরে কাজ করবেন।' ইতিমধ্যে আমি নিজেকে আরও সামলে নিয়েছি। স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমি যে সত্যই কাজ করব, তা বুঝলেন কি করে?' তিনি বলেছিলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনি করবেন।'

এরপরে ইতস্ততঃ আরও কিছু কথা হয়েছিল। অধিকাংশই আমি বলেছিলাম, তিনি নীরবে শুনেছিলেন। তারপরে গৌতমবাবুকে ডেকে (অবাঙালী গুজরাটি ভদ্রলোকের নাম শ্রীগৌতম ধর্মপাল) চিঠির বাক্স আনতে বলেছিলেন। সেই বাক্সভর্তি অনুভূতিময় ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আমি আবার দ্বিধা প্রকাশ করেছিলাম। তখন তিনি একটু স্পষ্ট

তীক্ষ্ম ভাষায় বলেছিলেন, 'দশ বছর ধরে এই তাড়া আগলাচ্ছি, অনেককে বলেছি, কেউ রাজি হয়নি কাজ করতে। আপনি নিজে এসেছেন, আপনার কিছু লেখার কাজের সঙ্গে আমি পরিচিত, আমার মনে হচ্ছে, আপনি একাজ করবেন, আপনাকে বিশ্বাস করছি, আশা করছি সত্যই করবেন। বাল্যকাল থেকে নিবেদিতার ভক্ত আমি। তিনি আমাদের জন্য কতখানি করেছেন, তার কিছুটা জানতাম, আর কী দুঃখ হত যখন দেখতাম, এমন চরিত্রকে বাঙালী ভুলে গেল...।' শেষের দিকে গলা ভারী হয়ে এল।

সেদিন অপরাহ্নশেষে একটি পিচবোর্ডের বাক্স হাতে নিয়ে কেয়াতলা রোডের সেই বাড়িটির গেট খুলে যখন বেরিয়েছিলাম, তখন সুগভীর আনন্দের বিষাদে মন আচ্ছন্ন, আর আতঙ্ক, প্রায় আতঙ্কই বোধ হচ্ছিল—আমার প্রতি একজন অপরিচিত সাধু ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিশ্বাসের জন্য। তাঁর মধ্যে সাধুত্বের একটা লক্ষণ অন্ততঃ সেই প্রথম পরিচয়েই দেখেছিলাম—অসাধারণ আনন্দময় নির্লিপ্ততা, যা সামান্য শর্ত না রেখে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে-কোনো বস্তু দান করতে পারে।

কয়েক বছর ধরে সেই বিশ্বাসের দায় আমাকে বইতে হচ্ছে। নিবেদিতার বিপুল পরিমাণ চিঠির ভিতর থেকে তথ্য সংকলন করে গ্রন্থমধ্যে নানাপ্রসঙ্গে পরিবেশন করেছি অন্যত্র-সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে। তারপরে আরও বহুবার শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছে গিয়েছি, লিজেল রেম'র কাছ থেকে তিনি আরও চিঠি ও উপাদান আনিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ওখানেই নারায়ণী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, জেনিভা থেকে কিছুদিনের জন্য ভারতে আগত শ্রীমতী রেম'র সঙ্গেও, যখনি প্রয়োজন অকুণ্ঠ সাহায্য তাঁরা করেছেন—কৃতজ্ঞতার কথা এখানে বাহুল্য।

গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। বর্তমান খণ্ড চার পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব স্বভাবতঃই 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।' এই পর্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছাড়া রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই পর্বের সম্পদ—নিবেদিতার পত্র থেকে প্রাপ্ত স্বামীজীর ব্যক্তিগত রূপ। বিবেকানন্দ নামক অসীম জ্বলন্ত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে নিবেদিতা পত্রমধ্যে তুলে ধরেছেন, নিখিল ধর্ম-সাহিত্যের যা গৌরব হতে পারে। এইসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া যায়, এই গ্রন্থ নিবেদিতা-গবেষণার মত বহুলাংশে বিবেকানন্দ-গবেষণাও। নিবেদিতা তাঁর প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও কখনই বিবেকানন্দ-অতিক্রমী চরিত্র নন। কর্মে ও রচনায় বিবেকানন্দের জীবন-ভাষ্য রচনা করাই তাঁর সাধনা ছিল। তাই বিভিন্ন প্রসঙ্গের গোড়ায় স্বামীজীর চিন্তা ও চরিত্রের একটা ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

মার্গারেট নোবল নিবেদিতা হয়ে কালীকে বরণ করেছিলেন, তাই দ্বিতীয় পর্ব 'মৃত্যু-রূপা কালী।' ইংরাজ মহিলার কালীপূজা ও কালী-বক্তৃতা সেকালের শিক্ষিত বাঙালীকে চমকিত করে কিভাবে তাঁদের মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল—সমসাময়িক সূত্রে তার বহু সংবাদ সংগ্রহ করে দিয়েছি। সেইসঙ্গে 'অধ্যাত্মরাজ্যের মহাদলিল' নামে আখ্যাত করে নিবেদিতার পত্রের কয়েক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দিয়েছি, যার মধ্যে কালীর সঙ্গে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাক্ষাৎ স্বীকারোক্তি মিলবে স্বামীজীরই মুখে।

একথা আবার একই সঙ্গে সত্য, মার্গারেট নোবলই ভগিনী নিবেদিতা হয়েছিলেন। নিবেদিতার প্রাণ-মনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহ বোধ করবেন তাঁদের কাছে তৃতীয় পর্ব 'পূর্ব জীবন' মূল্যবান ঠেকবে। নিবেদিতার বংশ-পরিচয় এবং পিতা, মাতা, ভাই, বোন সম্বন্ধে প্রচুর সংবাদ এখানে আছে। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজে নিবেদিতা কি প্রকার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার আভাস এখানে পাওয়া যাবে। ছদ্মনামে লেখা নিবেদিতার ১৫টি রচনা মূলে ইংরাজিতে (বাংলায় সারানুবাদসহ) উপস্থিত করেছি। এই লেখাগুলি অন্যত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ নিবেদিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এগুলি ছিল, পরে তাঁর বোন সেগুলি রক্ষা করেন। এই লেখাগুলি দেখিয়ে দেয়, তরুণ বয়সেই নিবেদিতা কি ধরনের পরিণত বুদ্ধি ও রচনাশৈলীর অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বৃথা বলেননি, তাঁর যে প্রতিভা ছিল তাতে সহজেই স্বদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারতেন।

শ্রীমতী লিজেল রেম'র অক্লান্ত পরিশ্রমে নিবেদিতা-গবেষণার সূত্রপাত; তারই একটা পটভূমিকা আমরা এই অংশে দিয়েছি।

বৃহৎ চতুর্থ পর্বের মূলে বিষয়বস্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার ব্যাপক সাহায্য। জগদীশচন্দ্র কেবল বড় বৈজ্ঞানিক নন, ভারতে বিজ্ঞান-আন্দোলনেরও কার্যতঃ প্রবর্তক। তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার সময়ে সেকথা নিবেদিতা মনে রেখেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাধনায় নিবেদিতার সাহায্যের ইতিহাস ইতিপূর্বে কোথাও ব্যাপকভাবে বিবৃত হয়নি। যাঁদের সর্বাগ্রে তা করা উচিত ছিল, সেই বসু বিজ্ঞানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখাননি। যাই হোক, আমরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার পরিমাণও বিপুল। নিবেদিতার পত্রধারা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র বা গ্রন্থাদি থেকে সংবাদ সংগ্রহ তো করেছিই, অধিকন্তু জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি মূল্যবান পত্র এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাবকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, আমরা আচার্য বসুর জীবনকাহিনী একটু বিস্তারিত বলেছি, বলার কারণ, অতি দুঃখের বিষয়, জগদীশ-চন্দ্রের বিরাট জীবন যেন আমাদের অগোচর রয়ে গেছে। নিবেদিতা কেবল জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে নয়, তাঁর জীবনের মহিমাতেও মুগ্ধ ছিলেন। সে 'জীবনের উপনিষদ' রচনার অভিপ্রায় তাঁর ছিল। জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর উপরে কোনো বৃহৎ গবেষণাগ্রন্থ বেরোয়নি। যে-স্মারক পুস্তিকা বেরিয়েছে, তার তথ্যাদি ডঃ বসুর জীবিতকালে রচিত প্যাট্রিক গেডিসের বসু-জীবনী থেকে গৃহীত। (গেডিসের গ্রন্থের উপাদান আবার নিবেদিতাই বহুলাংশে সংগ্রহ করে গিয়েছিলেন।) ডঃ বসু সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য বেদনাদায়ক। স্বামীজীর বিষয়ে সমসাময়িক ভারতীয় সংবাদ-পত্রে তথ্যসন্ধানকালে ডঃ বসুর সম্বন্ধে প্রচুর সংবাদ চোখে পড়েছিল। তার কিছু কিছু এখানে পরিবেশন করে দিয়েছি। এই পর্বে মিসেস ওলি বুলের কথাও বহুলভাবে বলা হয়েছে। জগদীশচন্দ্র এঁকে মাতৃসম্বোধন করতেন, মিসেস বুলও তাঁর 'পুত্রে'র জন্য যৎপরোনাস্তি করে গেছেন। মিসেস বুলের সূত্রে নিবেদিতার জীবনের কিছু বেদনাদায়ক সংবাদ ঐতিহাসিক সত্যের প্রয়োজনে আমাদের উপস্থিত করতে হয়েছে।

নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গ নিয়ে গ্রন্থশেষ করার কারণ, ভারতে নিবেদিতার জীবনারম্ভ স্বামীজীর আলোকে, জীবনাবসান জগদীশচন্দ্রের আবাসে।

গ্রন্থে ছবির সংখ্যা প্রচুর। তার কয়েকটিকে বর্তমান লেখকের 'আবিষ্কার' বলা চলে। ইংরাজ-পরিচালিত কলকাতার সচিত্র সাময়িক পত্রিকা 'এমপ্রেস্' থেকে নিবেদিতার অনেকগুলি ছবি পেয়েছি। নিবেদিতার ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরে বাগবাজারের গলিতে তাঁর প্রথম বাসগৃহকে কেন্দ্র করে সেগুলি তোলা। এর কয়েকটি নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের কর্তৃপক্ষ 'কমপ্লিট ওয়ার্কস্ অব নিবেদিতা'-র জন্য নিয়েছেন। অন্য দুষ্প্রাপ্য ছবির একটি (মিসেস বুলের উইলের মামলা-সংক্রান্ত সংবাদপত্রের চিত্র) রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সৌজন্যে পেয়েছি। তার জন্য শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কাছে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যে-সব দুষ্প্রাপ্য তথ্য গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে, সেগুলির প্রামাণিকতা দেখিয়ে দেবার জন্য বহুসংখ্যক পত্র বা উপাদানের প্রতিলিপি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অতীব মূল্যবান—স্বামীজীর জীবনের শেষ সপ্তাহ সম্বন্ধে ডায়েরীর আকারে লেখা নিবেদিতার চিঠির প্রতিলিপি।

আমাদের সৌভাগ্য, গ্রন্থে আমরা এমন একটি চিত্র প্রকাশ করতে পেরেছি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনীর ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব স্বীকৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। রঙিন চিত্রটির বিষয়—নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি দান করছেন। শিল্পী—প্রিয়নাথ সিংহ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্বামীজীর সহপাঠী-বন্ধু ও শিষ্য। প্রিয়নাথ সিংহ, গুরুদাস বর্মন এই ছদ্মনামে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' লেখেন, যার প্রথম খণ্ডই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশিত হয়নি।

ছবিটির সন্ধান পাই সর্বজনবন্ধু প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে। তিনি আমাকে জানান, প্রিয়নাথ সিংহের পুত্র শ্রীতারানাথ সিংহের কাছে স্বামীজী ও নিবেদিতা-সংক্রান্ত কিছু উপাদান আছে। ৬৩ বৎসরের সৌম্যমূর্তি শ্রীযুক্ত তারানাথ সিংহ অতি সৌজন্যের সঙ্গে তাঁর আপার সারকুলার রোডের বাসভবনে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বেদনার সঙ্গে বলেছিলেন, অনেক কিছুই ছিল কিন্তু বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ এবং জীবনের আবর্তে প্রায় সবকিছুই হারিয়ে দিয়েছে। 'এত বালক ছিলুম এবং অবস্থা তখন এমন যে, ওসব জিনিসের মূল্য বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, বুঝলেও রক্ষা করা শক্ত ছিল।' বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানান, তাঁর পিতার রচিত রামকৃষ্ণ চরিতের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য গণেন্দ্রনাথের কাছে দেওয়া হয়েছিল, পরে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট যা-কিছু সংগ্রহ একটি ট্রাংকের মধ্যে পড়েছিল, সেগুলি এনে দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে, বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিয়োয় তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের থামে হাত দিয়ে দাঁড়ানো ছবির পুরাতন প্রিন্ট, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির পুরানো ফটো, অনেকগুলি আঁকা ছবির খসড়া, তার একটি নব্যবঙ্গের চিত্রকলার ইতিহাসে পরিচিত 'যম ও নচিকেতা', রবীন্দ্রনাথের দুটি স্কেচ ইত্যাদি ছিল। সেগুলি দেখাবার পরে সগৌরবে শ্রীযুক্ত সিংহ বলেছিলেন, এবার এমন একটি ছবি দেখাবো চমকে উঠবেন। সেইটিই এই ছবি।

ছবিটির শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার নেই, ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধেই কিছু বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি ফটো সুপরিচিত; তার একটি উপবিষ্ট। দাঁড়ানো দুটি ফটোর একটি কেশব সেনের বাড়িতে সমাধির কালে তোলা, অন্যটি তোলা হয় বউ-

বাজারের বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিয়োতে। 'ইলাস্ট্রেটিং এ নিউ বায়োগ্রাফি অব রামকৃষ্ণ' নামে প্রবন্ধ ভারতের মার্চ, ১৯৬৫ সংখ্যায় লেখা এক অত্যন্ত কৌতূহলজনক প্রবন্ধে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ ক্রিস্টোফার ইশারউডের রামকৃষ্ণ-জীবনীতে সংযোজিত চিত্রগুলির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্থ ফটো—তাঁর দেহান্তের পরে ভক্তজনসঙ্গে গৃহীত সেই ফটোটি—এতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ বাদ দিয়ে ভক্তদের গ্রুপ ছবি হিসাবে মুদ্রিত হত, সেটি সম্পূর্ণতঃ ইশারউডের গ্রন্থের আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সংস্করণে দেওয়া হয়েছে। দেহান্তের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি ছবি তোলা হয়; মোটামুটি সে দুটি একই রকম। বিদ্যাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী নির্বাণানন্দের কাছে শুনেছেন, স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেছিলেন যে, ডাঃ রাম দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি তোলান, সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ না করায় নেগেটিভসমেত প্রিন্ট গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালের তিনটি ছবিই প্রাপ্তব্য। চতুর্থ ছবি দেহান্তের পরে তোলা। তারপরেই মূল্যদান করতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সুরেশ মিত্র কর্তৃক আঁকানো কেশবের নববিধান চিত্রের, যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে ধর্মসমন্বয়ের আদর্শরূপ দেখাচ্ছেন। চিত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যবাসকালেই অঙ্কিত এবং স্বয়ং তিনি ছবিটি দেখে প্রসন্ন পরিহাস করেছেন। এই চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের আকার মোটামুটি বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিয়োয় তোলা তাঁর ফটোর অনুরূপ। গুরুত্বের দিক দিয়ে এই চিত্রটিকে তাই পঞ্চম স্থানে স্থাপন করতে পারি।

ষষ্ঠ স্থান লাভ করবে, আমাদের ধারণা, এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রিয়নাথ সিংহের আঁকা চিত্রটি। শ্রীযুক্ত তারানাথ সিংহ বলেন, এই ছবিটি স্বামীজী নিজে দেখে অনুমোদন করেছিলেন, একথা তাঁর মা হেমন্তকুমারী সিংহ তাঁকে বলেছেন। এই সংবাদে বিশ্বাস করা হোক বা না হোক, একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই—এই ছবি যিনি এঁকেছেন তিনি বাল্যাবধি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন, এবং তিনি স্বামীজীর বাল্যবন্ধু। উপরন্তু তিনি সেকালের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ যখন হয়, তার কাছাকাছি সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে ইনি দেখেছেন—সেই দর্শন-সংস্কার তাঁর ছিল। তদুপরি ঐকালে তিনি নরেন্দ্রনাথের সাথী-বন্ধু (সে বিষয়ে চমৎকার স্মৃতিকথা প্রিয়নাথ সিংহ লিখে গেছেন), সুতরাং নরেন্দ্রনাথের ঐ কালের আচার ও বেশবাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা থাকার কথা। নরেন্দ্রনাথের এ সময়ের কোনো ছবি আমরা পাই না। তাই এই চিত্রটির অসাধারণ মূল্য আছে না বললেও চলে।

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' পর্বের সূচনায় এই চিত্রটি আমরা স্থাপন করেছি। এর থেকে উপযুক্ত শিল্প-ভূমিকা সম্ভব নয়।

এই আকর গ্রন্থটি আকারে বৃহৎ—ঋণের বোঝাও যে এক্ষেত্রে বৃহৎ হবে, সহজেই ধরে নেওয়া যায়। বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য আমি নিয়েছি। কৃতজ্ঞচিত্তে সকলের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। বিভিন্ন সময়ে আমি জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটি, পুণা তিলক ট্রাস্ট, উদ্বোধন গ্রন্থাগার, প্রবাসী কার্যালয়, সাহিত্য পরিষদ, মহাবোধি সোসাইটি, অদ্বৈত আশ্রম গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থানে কাজ করেছি। হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম গ্রন্থাগার ব্যবহৃত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্ন্যাসী এই কাজে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁদের স্নেহ ও উৎসাহবাক্যে প্রেরণা পেয়েছি। বিশেষ করে নিবেদিতা-গবেষণায় স্বামী অভয়ানন্দ যেভাবে দিনের পর দিন আশ্বাস ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন, তা ভুলবার নয়। সিস্টারের উপর গবেষণা করছি—তাঁর স্নেহ ও প্রশ্রয়লাভের পক্ষে এর থেকে বড় ছাড়পত্র বোধহয় আর কিছু নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ এবং সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দের ইচ্ছায় বেলুড় মঠ গ্রন্থাগার আমার কাছে উন্মুক্ত ছিল এবং গ্রন্থাগারিক স্বামী ত্যাগানন্দ সর্বদা তৎপর আগ্রহ দেখিয়েছেন।

নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের কর্তৃপক্ষও যখনি প্রয়োজন সাহায্য করেছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা এবং নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার আনুকূল্য প্রায়শঃ পেয়েছি।

গবেষণার ক্ষেত্রে কেবল লিখিত উপাদানই নয়, মুদ্রিত চিত্রকেও আমি মূল্যবান জ্ঞান করি। নানা গ্রন্থাগার বা সংগ্রহ থেকে ছবি তোলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ফটো-শিল্পী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণ। ফটো তোলার বহু 'অভিযানে' তিনি নেতৃত্ব করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে এমনি এক অভিযানে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন শ্রীমতী শান্তি মিত্র ও শ্রীতপন দে। ফটোগ্রাফি-জগতে সুবিখ্যাত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ নিবেদিতার চিঠিগুলির আলোকচিত্র তোলার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমার বন্ধু বা আত্মীয়রা আমাকে সাহায্য করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সুতরাং শ্রীবিশ্বনাথ বসু কিছুদিন নানা গ্রন্থাগারে একত্রে সন্ধান করেছিলেন, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বড়ালও তাই। শ্রীঅরুণ ঘোষ ও শ্রীনিত্যানন্দ ভকত সর্বদা সুপরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীবিমল ঘোষ—এই দুইজনের কাছে ঋণের কথা বলে ভার লাঘবের দুশ্চেষ্টা করতে চাই না—এত বেশী এঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ বহু সময়ই বিবেকানন্দ-গবেষণায় আমার সহযোগী; অভ্যস্ত নিপুণতায় এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট তিনি করে দিয়েছেন অল্প সময়ের মধ্যে। শ্রীবিমল ঘোষের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি প্রায় প্রতিদিনই।

আমার প্রতি স্নেহ ও প্রীতিপরায়ণ যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন বা সাহায্য করেছেন, তাঁদের কয়েকজন—ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীজানকীনাথ বসু, ডঃ শ্রীসুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, শ্রীকালীচরণ কর্মকার, শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং নিবেদিতা শতবার্ষিকী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীধীরাজ বসু।

সবশেষে, যাঁরা ধন্যবাদ দেওয়া মোটে পছন্দ করবেন না, তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি 'রীতিভঙ্গ' করে। গ্রন্থ-প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্সের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের কাছে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। এহেন বিপুলায়তন, বহু চিত্র সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব যে, কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন, তার পিছনে আছে ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বইয়ের সম্বন্ধে শ্রীঅভীককুমার সরকারের বিশেষ মনোযোগের মূলে তাঁর পারিবারিক-সূত্রে প্রাপ্ত নিবেদিতা-ভক্তি রয়েছে, তাও সহজে বোঝা যায়। শ্রীফণিভূষণ দেব নিতান্ত উৎকণ্ঠিত অনুরাগের সঙ্গে গ্রন্থসমাপনে তাগিদ দিয়েছেন এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন দে ও শ্রীবাদল

বসু আমার বহু সঙ্গত অসঙ্গত দাবিপূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শ্রীশঙ্কর বসু মল্লিকের নিত্য কৌতূহল আমার পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহজনক ছিল। আমি জানি, এ'রা এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সকলে কর্তব্যপালনই করেছেন, তবু সেইসঙ্গে এই গ্রন্থটি যে তার বিশেষ প্রকৃতির জন্য অতিরিক্ত মনোযোগ পেয়েছে, তাও মনে হয়েছে সর্বদা।

উপসংহারে জানাই, 'নিবেদিতা লোকমাতা'—বইটির এই নামের পিছনে আমার একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। গুরুর দেওয়া নাম 'নিবেদিতা'—সেই নিবেদিতাকে গুরুর আশীর্বাদ—তুমি ভারতের সেবিকা-বান্ধবী-মাতা হও। সে আশীর্বাদকে নিবেদিতা জীবনে কতখানি সত্য করে তুলতে পেরেছিলেন, তারই স্বীকৃতি রবীন্দ্র কণ্ঠে—'লোকমাতা' সম্বোধনে। একালে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আচার্য ও শ্রেষ্ঠ কবির আশা ও আদর্শকে চরিতার্থ করেছিলেন এক মহীয়সী বিদেশিনী নারী—'নিবেদিতা লোকমাতা' নামের মধ্যে লেখকের সেই নিবেদন রইল।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৩১ জুলাই, ১৯৬৮

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রায় কুড়ি বছর অমুদ্রিত থাকার পরে 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড বেরিয়ে গেছে। প্রথম খণ্ড পাওয়া যায় না বলে অনেক আগ্রহী পাঠক অনুযোগ, অভিযোগ, এমন কি তিরস্কার পর্যন্ত করেছেন। তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮০০। বহুবর্ণ চিত্রসহ মোট চিত্রসংখ্যা ৬০-এর বেশি। গত কুড়ি বছরে দ্রব্যমূল্য এমন অস্বাভাবিকরকম বেড়েছে যে, পূর্বের আকারে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করলে অনেকের ক্রয়সাধ্যের বাইরে চলে যেত। সেজন্য দুই পর্বে ভাগ করে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড মোটামুটি ৪০০ পৃষ্ঠা হওয়ায় প্রথম খণ্ডকে দুই পর্বে প্রকাশ করলে আকারসাম্য বজায় থাকবে, এমন কথাও আমাদের মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে অশুদ্ধিসংশোধন ছাড়াও কয়েকটি নতুন ছবি দেওয়া হয়েছে। অদ্বৈত আশ্রম থেকে স্বামী বিবেকানন্দের 'কালী দি মাদার' কবিতার, এবং সারদা-মঠের প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার কাছ থেকে নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' বইয়ের পাণ্ডুলিপি-চিত্র পেয়েছি। শ্রীঅরুণ ঘোষ দিয়েছেন ক্ষীরভবানী মন্দিরের পুরাতন চিত্রের প্রতিলিপি। সাহায্য পেয়েছি শ্রীমতী মায়া বসু এবং শ্রীশঙ্খ বসুর কাছ থেকে। শ্রীশোভন বসুর সতর্ক মনোযোগে উপকৃত হয়েছি। আর শ্রীবাদল বসুর বিষয়ে একথা না বলে পারছি না, তাঁর নিয়মিত তাগিদ এবং তিরস্কার না থাকলে এই সংস্করণের প্রকাশ কত বিলম্বিত হত তার ঠিক নেই। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিবেদিতা ভারতবর্ষকে বড়ো ভালবাসতেন। তেমন ভালবাসা কদাচিৎ দেখা যায়। সেই ভালবাসার কাহিনী যদি বর্তমানের ভালবাসাহীন মরুভূমিতে প্রেমের মরূদ্যান-স্বপ্নকে অন্তত ফিরিয়ে আনতে পারে, তাহলে আমরা ধন্য বোধ করব।

২৮ অক্টোবর
১৯৯০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

P. O. AND TELEGRAPH:
STONE RIDGE, ULSTER CO., N. Y.
RAILROAD STATION:
BINNEWATER, N. Y.

Shiva Guru

RIDGELY MANOR

21.10.08

Thou that art Knowledge Itself.
Pure, Free, Ever the Witness.
Beyond all thought.
And beyond all qualities.
To Thee, the Only True Guru,
My Salutation.
— Shiva Guru! Shiva Guru! Shiva Guru!

Oct. 21st 1908 – from Oct. 1899.

'শিবগুরু' সম্ভবতঃ নিবেদিতার 'ইষ্টদেবতা'। স্বামীজীর দেহত্যাগের দিন সন্ধ্যায় ধ্যানের সময়ে নিবেদিতার মন অনিবার্যভাবে শিবগুরুর দিকেই ধাবিত হয়েছিল—নিবেদিতার দিনলিপি (যার প্রতিলিপি পরে দেওয়া হয়েছে) থেকে তা দেখা যায়। 'বুদ্ধিইজম্ অ্যাণ্ড হিন্দুইজম্' নামক প্রবন্ধের শেষাংশে (পরে যা 'ফুটফলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়) নিবেদিতা এই 'শিবগুরু' কবিতাটি দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, গোড়ায় বুদ্ধ ছিলেন ভারতবর্ষের শুদ্ধ জ্ঞানের ও সন্ন্যাসের প্রতীক। পরে শিব সেই স্থান নেন—যখন বৌদ্ধধর্মের মূল সত্যগুলিকে পুনশ্চ আত্মসাৎ করে নিল হিন্দুধর্ম।

নিবেদিতার কাছে স্বামীজী ছিলেন শিব ও বুদ্ধের মিলিত প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ করে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অদ্বৈত অনুভূতি সঞ্চারিত করছেন, এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত, ডান দিকে মুদ্রিত, দুর্লভ চিত্রটির শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ। তাঁর পুত্র শ্রীতারানাথ সিংহের সৌজন্যে চিত্রটি পাওয়া গিয়েছে। এর সর্বস্বত্ব তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত।

প্রিয়নাথ সিংহ, গুরুদাস বর্মণ ছদ্মনামে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' লিখেছিলেন। তার মধ্য থেকে চিত্রটির বিষয় সম্বন্ধে পাই:

"রামকৃষ্ণদেব, যাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধিয়া কহিলেন,... ও (নরেন্দ্রনাথ) যখন প্রথম প্রথম আসতো, তখন একদিন ভাব হয়ে ওকে ছুঁয়ে দিয়েছিলুম, তাইতে ও একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হবার মত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—'ওগো, তুমি আমায় কি করে দিলে? আমার যে বাপ মা আছে।' তখন আবার ওর বুকে হাত দিয়ে বলি—'তবে এখন থাক, তবে এখন থাক।'......(প্রথম সং—পৃষ্ঠা—২২১)

"একদিন জনৈক ভক্ত নরেনের পূর্বোক্ত ঘটনা উত্থাপন করাতে নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বক্ষস্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার ভাবান্তর হইল, পা হইতে রি রি করিয়া কি একপ্রকার স্নায়বীয় স্রোত ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুসমূহ শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল তিনি বুঝি শূন্যে মিশাইয়া যাইবেন। পিতামাতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহারা সন্তপ্ত হইবেন, এই ভাবনা মনে উদয় হওয়াতেই তিনি পূর্বোক্তরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া ঐভাব প্রশমিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল—যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কীটাণু হইতে অনন্ত আকাশ পর্যন্ত সেই এক মহান লক্ষ্যের দিকে ছুটিতেছে, প্রত্যেক বস্তুই যেন তাঁহাকে সেই মহান আদি পুরুষের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে।"......(প্রথম সং—পৃষ্ঠা—২২২)



রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানের পরে তাঁর প্রধান বাণীবহের ভূমিকা নেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী মিস্ ম্যাকল্যাউডকে বলেছিলেন, নিবেদিতার নির্মাণে তিনি সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছেন। স্বামীজী নামক বিধাতার হস্তনিক্ষিপ্ত এই নারী-বজ্রটি ভারতের ইতিহাসে কোন্ আগ্নেয় ভূমিকা নিয়েছিল, তা দেখানোই বর্তমান গবেষণাগ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিবেদিতার বহিরঙ্গ প্রকাশের পিছনে যে বিশাল অধ্যাত্মরহস্যময় মহাদেশের পটভূমিকা ছিল, তা সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি এখনো পর্যন্ত। নিবেদিতার প্রকাশিত রচনাগুলি সেই গভীর আবৃত জীবনের উপর চকিত আলোকপাত মাত্র করেছে। অতি সৌভাগ্যের বিষয়, মিস্ ম্যাকলাউডের কাছে লেখা পত্রাবলীতে তাঁর অন্তর্জীবনের রহস্যরূপ উদ্ঘাটিত—সেই পত্রগুলি বহুলাংশে আমরা বর্তমানে ব্যবহার করতে সমর্থ।

বিবেকানন্দই নিবেদিতা-জীবনের সর্বকিছু—গুরু, পিতা, ঈশ্বর—সর্বকিছু! নিবেদিতা স্বামীজীর চিন্তায় ও কথায় ডুবে থাকতেন সর্বসময়। স্বামীজীর বিষয়ে তাঁর রচনার পরিমাণ অল্প নয়। এ বিষয়ে তাঁর লেখা দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থই আছে—'The Master as I saw Him' এবং 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda'। এছাড়া স্বামীজীর উপর রচিত তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, এবং অনেকগুলি বক্তৃতার অল্পবিস্তর রিপোর্ট। নিবেদিতার অন্যান্য রচনায় বিবেকানন্দ উল্লিখিত হয়েছেন, তাও না বললে চলবে। নিবেদিতার পত্রাবলীর 'বিষয়ী পুরুষ' বিবেকানন্দই।

'The Master as I Saw Him' নামক মহাগ্রন্থটি শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। খৃস্টতত্ত্বে সুপণ্ডিত অক্সফোর্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক এই গ্রন্থটিকে ধর্মীয় ক্লাসিকস্-এর স্তরে স্থান দিয়েছেন এবং শ্রীঅরবিন্দের মত মনীষী ও মহাযোগী এটিকে স্বামীজী সম্পর্কে লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলেছেন। স্বামী মাধবানন্দ-কৃত এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়। সুতরাং স্বামীজী প্রসঙ্গে এখানে বইটি থেকে অংশ সংকলন করার প্রয়োজন নেই, যদিও পরে, তথ্যরূপে অন্যান্য প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের বহু অংশ ব্যবহৃত হবে। তাছাড়া "মনস্বিনী" খণ্ডে (যে খণ্ডে পৃথিবীবিখ্যাত লেখিকা নিবেদিতার গ্রন্থাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় থাকবে) এই গ্রন্থের উৎপত্তির পটভূমিকা ও পরবর্তী প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া হবে। 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক বইটির (বঙ্গানুবাদ "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে") সম্বন্ধে একই রীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই দুটি গ্রন্থ ছাড়াও নানা সূত্রে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে প্রচুর সংবাদ পাওয়া যায়। বহু অজানিত সংবাদও আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেই সমস্ত তথ্য এই গ্রন্থের সর্বত্র পরিবেশন করা হবে প্রাসঙ্গিকভাবে। তবে

যে-সব সংবাদ বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার জীবনীর কল্যাণে বহুবিদিত সেগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে, বা তাদের উল্লেখমাত্র করে, আমরা অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত সংবাদের উপরেই জোর দেব। কিন্তু তাহলেও, নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর কয়েকটি পত্র বহুল পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা বাদ দিতে পারব না, যেহেতু প্রথমত, নিবেদিতার জীবনের ধারা নির্দেশে পত্রগুলির মূল্য অপরিসীম, দ্বিতীয়ত, কেবল নিবেদিতার জীবন গঠনে নয়, আত্মত্যাগী বাঙালী ও ভারতবাসীর সত্তায় অগ্নিদাহ ঘটাত ঐসব পত্র—এবং এখনো তা চঞ্চল করে তোলে রক্তস্রোত। যে-নিবেদিতা ভাবী ভারতের কাছে প্রেরণাদেবী হয়ে উঠবেন, তাঁকে জাগাতে বিবেকানন্দের ঐসব রচনা মহাকাব্যিক মহিমা লাভ করেছে। বিবেকানন্দের এই জাতীয় উক্তিকে স্মরণ করেই রোমা রোলাঁ বলেছিলেন—'মহাসঙ্গীতের মত তাঁর শব্দাবলী, বীঠোফেনের মত তার বাগ্‌রীতি, হেন্ডেলের একতানের মত তার উদ্দীপ্ত ছন্দ। তিরিশ বছরের দূরত্বে তারা ছড়িয়ে আছে গ্রন্থমধ্যে—কিন্তু আজও যখন তাদের স্পর্শ করছি, শরীরে যেন ইলেক্‌ট্রিক শক্‌ লাগছে—নাড়া খাচ্ছি সর্বাঙ্গে। তাহলে কী সে চমক, কী না উন্মাদনা পেয়েছিল তারা—যারা এই আগুনের মত কথাগুলি বীরের নিজের মুখ থেকে শুনেছিল!'

সর্বাধিক শুনেছিলেন—নিবেদিতা।

নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর পত্রাবলী

["বাণী ও রচনায়" নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর মোট ৩১টি চিঠি আছে। প্রথমটির রচনার তারিখ ১৮৯৫-এর ৪ঠা অক্টোবর, শেষ চিঠি ১৯০২-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী। মধ্যে প্রায় সাত বৎসরের ব্যবধান। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, প্রথম ও শেষ চিঠির বক্তব্য একই—'ওঠ! জাগো!'

আমরা কিছু কিছু পত্র বা পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি। চিঠিগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের দুটি মূর্তি উন্মোচিত; একটিতে তিনি জগৎপ্রেমিক, জাতির প্রেরণাপুরুষ, অন্যটিতে জগজ্জাল ছেদনে অস্থির চিরবৈরাগী সন্ন্যাসী। নিবেদিতার পরম সৌভাগ্য তিনি একই দেহাধারে মানুষের দুই পরম প্রকাশকে দর্শন করতে পেরেছিলেন।]

*

...পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় ব্যাপার অবশ্যই ধীরে ঘটে।

[রিডিং, ইংলণ্ড—৪ অক্টোবর, ১৮৯৫]

আমার আদর্শকে বস্তুত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে,—তা এই : মানবের

অন্তর্নিহিত দেবত্বের সত্য তার কাছে প্রচার করা, এবং কিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে বিকশিত করা যায়—তাই দেখিয়ে দেওয়া।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই পৃথিবী। যে উৎপীড়িত—পুরুষ বা নারী—আমার করুণা তার প্রতি। আরও অনেক করুণা করি তাকে, যে উৎপীড়নকারী।

দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে একটি ধারণা আমার কাছে—সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞান, অন্য কিছু নয়। জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের ধারা; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। পৃথিবীতে যারা বীরোত্তম ও সর্বোত্তম, তাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।' অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন—চরিত্র। নিঃস্বার্থ, অগ্নিজ্বলন্ত প্রেম যাঁদের মধ্যে—তাঁদের এখন জগৎ চায়। সেই প্রেম প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্র করে তুলবে।

তোমার মধ্যে আছে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি,—এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চয়। তোমার পিছনে অন্যরাও আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং তারো চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ! ওঠ, জাগো! জগৎ যে দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?

[লণ্ডন, ৭ জুন, ১৮৯৬]

নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, আমি সন্তুষ্টই আছি। দেশবাসীর অনেককে আমি জাগিয়েছি, মোটমাট আমি তাই চেয়েছিলাম। জগৎ আপন ধারায় চলুক, কর্ম চলুক নিজ গতিতে। এ জগতে আমার আর কোনো বন্ধন নেই। সংসারের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে,—এর সবটাই স্বার্থ; স্বার্থের জন্য বাঁচা, স্বার্থের জন্য ভালবাসা, স্বার্থের জন্য মানের কামনা,—সবই স্বার্থ, স্বার্থ! নিজের অতীতের দিকে তাকিয়ে কিন্তু দেখি, আমি এমন প্রায় কোনো কাজ করিনি যা স্বার্থের জন্য করা হয়েছিল,—এমনকি আমার অপকর্মও স্বার্থোদ্দেশ্যে নয়—সুতরাং আমি সন্তুষ্ট। তার মানে এই নয় যে, আমি বিশেষ কোনো ভালো বা বড় কাজ করেছি। কিন্তু জগৎ এমন সংকীর্ণ, জীবন এমন হীন, অস্তিত্ব এতই জঘন্য, অতি জঘন্য যে, আমি অবাক হয়ে যাই, হেসেও ফেলি, যখন দেখি, স্বার্থসিদ্ধি নামক নীচ, ঘৃণ্য পুরস্কারের লোভে মানুষের মত যুক্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন জীব ধাবিত হচ্ছে নিরন্তর।

খাঁটি কথা এই। আমরা জালে ধরা পড়েছি, যত শীঘ্র কেউ বেরিয়ে আসতে পারে, ততই মঙ্গল। সত্যের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি—এখন দেহটা জোয়ার-ভাটায় উঠুক নামুক—কে মাথা ঘামায়!...

লোকালয় থেকে দূরে—নিভৃতে নীরবে পুঁথিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার সংস্কার নিয়ে আমি জন্মেছি, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ—তবু পূর্ব সংস্কার আছেই—যায়নি।

[আলমোড়া, ৩ জুন, ১৮৯৭]

আমি নিজে যেভাবে শিক্ষালাভ করেছি—সেইভাবেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি, অর্থাৎ গাছের তলা আশ্রয় করে, কোনো রকমে একমুঠো খাবার জুটিয়ে নিয়ে কাজ করে যাওয়া। পরিকল্পনারও কিছু বদল হয়েছে। আমার কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি। এতে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়েছে। যে কথা আমি চিরদিন ভেবেছি তারই প্রমাণ দেখলাম : হৃদয়, শুধু হৃদয় দিয়েই জগতের মর্মে পৌঁছান যায়। তাই বর্তমান পরিকল্পনা হল, বহু যুবককে গড়ে তোলা, (উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে, নিম্নশ্রেণীর মধ্য থেকে নয়; নিম্নশ্রেণীর জন্য অল্প কিছু অপেক্ষা করতে হবে),—তারপর তাদের জনকয়েককে কোনো একটি জেলায় পাঠিয়ে দিয়ে প্রথম অভিযান শুরু করে দেওয়া। ধর্মযুদ্ধের এই অগ্রগামী কর্মী-সেনারা পথ পরিষ্কার করে ফেলার পরে তবে তত্ত্ব ও দর্শন বিস্তারের যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

জনকয়েক ছেলে ইতিমধ্যেই শিক্ষাধীনে; কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি আমরা পেয়েছিলাম (আলমবাজার মঠ), তা গত ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে। বাঁচোয়া যে এটি ভাড়া-বাড়ি ছিল। তবে ভাববার কিছু নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না, কষ্টের, অসুবিধার সীমা থাকবে না,—তারি মধ্যে তো কাজ চালিয়ে যেতে হবে।... এ পর্যন্ত, মুণ্ডিত মস্তক, ছিন্ন কন্থা এবং অনিশ্চিত আহার—এই অবস্থা।

[আলমোড়া, ২০ জুন, ১৮৯৭]

দুর্ভিক্ষের কাজে এখন দারুণ ব্যস্ত। ভাবী কাজের জন্য জনকয়েক ছেলেকে তৈরী করে তোলা ছাড়া শিক্ষাদান কার্যে বেশী শক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। "খাদ্য দান" কাজটিই আমার সব শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য টেনে নিয়েছে। কাজ যদিও এ অবধি খুবই ছোট আকারে করা গেছে, তবু ফল অপূর্ব। বুদ্ধের কালের পরে এই প্রথম দেখা গেল, অন্ত্যজ জাতির কলেরা রোগীর পাশে বসে সেবা করছে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা![১]

তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন আসল সিংহিনীর প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী নারীর জন্মদান করতে পারছে না—সেজন্য অন্য জাতির থেকে তাকে ধার করতেই হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা,

---

[১] বিবেকানন্দ নিশ্চয় একথা লেখার সময়ে অজ্ঞেয়বাদী বুদ্ধের অজ্ঞেয়বাদী ব্রাহ্মণ-শিষ্য একালের বিদ্যাসাগরের কথা ভুলে যাননি। কলেরা-রোগী বাগ্‌দী মেয়েকে বুকে তুলে এনে যেদিন বিদ্যাসাগর সেবা করেছিলেন, সেদিন থেকে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের মানবতার ইতিহাসে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি। স্বামীজী বলেছিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন কেউ নেই, যার উপরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব পড়েনি।' নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'আহা, যদি তোমার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হত!' কিন্তু নিবেদিতার ভারতে আসার সাত বছর আগেই বিদ্যাসাগরের দেহান্ত হয়। যাই হোক, বিদ্যাসাগরের জীবনের দুর্ভাগ্য, তিনি এই সেবার কোনো ধারা সৃষ্টি করতে পারেননি। সেই ধারা বিবেকানন্দের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। এবং তা হয়েছিল প্রচলিত হিন্দু-সমাজের ভিতরেই। এই সময়ের ১৪।১৫ বছর পরে কিশোর সুভাষচন্দ্র যখন কলেরা রোগীর সেবা করছেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করে, তখনো তিনি নিজেকে বিবেকানন্দের অনুগামী ভেবেছেন।

অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই নারী—যাকে ভারতের প্রয়োজন।

কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু। এদেশে যে কী দুঃখ, কী কুসংস্কার, কী দাসত্ব—সে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এদেশে এলে দেখবে, চারিদিকে অর্ধ-নগ্ন অগণিত নরনারী, জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাদের উদ্ভট ধারণা, শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে ভয়ে বা ঘৃণায়। উল্টোপক্ষে ঘৃণা পায়ও অসম্ভব। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গরা মনে করবে, তোমার মাথা খারাপ, তোমার প্রতিটি গতিবিধি তারা সন্দেহের চোখে দেখবে।

তাছাড়া দারুণ গরম। আমাদের শীতকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমাদের গ্রীষ্মকালের মত। দক্ষিণে তো সর্বসময় আগুনের হল্কা।

সহরের বাইরে ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, স্বাগত তুমি—শতবার স্বাগত! নিজের পক্ষে বলতে পারি, অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি—আমি সামান্য মানুষ, কিন্তু যেটুকু প্রভাব আমার আছে তা তোমার সাহায্যে নিয়োজিত হবে।

ঝাঁপ দেবার আগে রীতিমত ভেবে দেখবে। কিন্তু কাজ শুরু করার পরে যদি ব্যর্থ হও, কিংবা যদি বিরাগ, বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে জেনো—**আমি আমরণ তোমার পাশে আছি**—তা তুমি ভারতের জন্য কাজ কর বা না কর, বেদান্ত রাখ বা না রাখ। 'মরদ্ কী বাত হাতীকা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না। পুরুষের কথার নড়চড় হয় না। সে প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে আবার সতর্ক করে দিই। তোমাকে এখানে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস্ মুলার বা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া চলবে না।...

[আলমোড়া, ২৯ জুলাই, ১৮৯৭]

অনেকে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই যিনি 'শিশুর মত নেতৃত্ব করেন।' শিশুকে আপাতত অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে হলেও, সে-ই বাড়ির রাজা। অন্তত, আমার ধারণায়, এখানেই নেতৃত্বের রহস্য। অনুভব অনেকেই করে, প্রকাশ করতে পারে মাত্র কয়েকজন। অন্যের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি ও সমাদর জ্ঞাপনের ক্ষমতার দ্বারাই একে অন্যের তুলনায় ভাবপ্রচারে অধিক সাফল্যলাভ করে।...

বড় অসুবিধা এই : আমি দেখতে পাই অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমার উপর অর্পণ করে। কিন্তু প্রতিদানে কোনো একজনকে আমার সবটুকু তো দেওয়া চলে না, কারণ সেক্ষেত্রে একদিনেই সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ কেউ তেমনই চায়—যাদের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির ব্যাপ্তি নেই। কাজের সাফল্যের জন্য যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মানুষের উৎসাহপূর্ণ ভালবাসা পাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু অপরদিকে আমাকে ভালবাসার ক্ষেত্রে ব্যক্তিসম্পর্কের উপরে থাকতে হবে। নচেৎ ঈর্ষা ও বিপদে সব কিছু চুরমার করে দেবে। নেতাকে থাকতে হবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গণ্ডীর বাইরে। জিনিসটি তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। আমি একথা বলছি না যে, অপরের ভক্তিকে তিনি পাষণ্ডের মত নিজের কাজে লাগাবেন,

আর পিছনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই তা আমার জীবনেই ব্যক্ত; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, আবার প্রয়োজন হলে— বুদ্ধদেব যেমন বলতেন—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' আমি নিজ হস্তে নিজ হৃদয়কে উৎপাটিত করতে পারি। পাগল এই প্রেম, কিন্তু কোনো বন্ধন নেই। প্রেমের প্রভাবে জড় চেতনে রূপান্তরিত হয়। বস্তুত, এই হল বেদান্তের সার কথা। সেই একই আছেন, অজ্ঞানীরা যাকে জড়বস্তু বলে দেখে, মনীষীরা তাকেই দেখে ভগবান্ বলে। সভ্যতার ইতিহাস জড়ের মধ্যে চৈতন্যকে দর্শনের ক্রমিক ইতিহাস ভিন্ন আর কিছু নয়। অজ্ঞানীরা নিরাকারকে সাকার দেখে, জ্ঞানীরা সাকারের মধ্যে নিরাকারের দর্শন পায়। সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায় এই শিক্ষাই আমরা পেয়ে যাচ্ছি...।'

[শ্রীনগর, কাশ্মীর, ১ অক্টোবর, ১৮৯৭]

...অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—এই মূল মন্ত্র।

আমি শীঘ্রই স্টার্ডিকে লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে, বিপদে আমি তোমার পাশে থাকব। ভারতে যদি আমি এক টুকরো রুটিও পাই, নিশ্চয় জেনো, তুমি তার সবটুকু পাবে।...

[জম্মু, ৩ নভেম্বর, ১৮৯৭]

[উপরে উদ্ধৃত পত্র বা পত্রাংশগুলি নিবেদিতার ভারত আগমনের পূর্বে লিখিত।]

...কর্তব্যের শেষ নেই; আর জগৎ বড়ই স্বার্থপর। দুঃখ করো না। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—(কল্যাণকারী কেউ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না)।

[আলমোড়া, ২০ মে, ১৮৯৮]

...কাজ করে করে নিজেকে শেষ ক'রে ফেলো না যেন। ওতে কোনো লাভ নেই। সর্বদা মনে রাখবে: "কর্তব্যরূপ মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় মানবের প্রাণবস্তু।" অনুশীলনের জন্য ওর সাময়িক মূল্য আছে; কিন্তু তার বাইরে কর্তব্য একটা অসুস্থ স্বপ্ন মাত্র। জগৎ তার নিজের ভাবে চলবে —আমরা তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াই, বা না বাড়াই। মাঝ থেকে মায়াঘোরে আমরা নিজেদের ধ্বংস করি। নিঃস্বার্থতার চরম!—এই ধরনের মিথ্যা আবেগের চেহারা নিয়ে একটি জিনিস হাজির হয়, যা শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অন্যায়ের কাছে মাথা নামিয়ে অপরের ক্ষতিই করে। আমাদের স্বার্থহীনতার দ্বারা অপরকে স্বার্থপর করে তোলার কোনো অধিকার আমাদের নেই।...

[কাশ্মীর, ২৫ অগস্ট, ১৮৯৮]

মনে হচ্ছে, তোমার মনে যেন বিষাদ রয়েছে। ভয় পেয়ো না। কিছুই চিরদিন থাকে না। যাই হোক, জীবন চিরন্তন নয়। এর জন্য আমি কী না কৃতজ্ঞ! জগতের

মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, আর সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি। তবু অনন্ত ভাবীকালের মধ্যে, যে-অবধি না সবকিছু ঠিক পথে চলে সেই অবধি, এই পৃথিবীতে অন্তত যাতনার দ্বারা স্বপ্নভঙ্গের শিক্ষা হয়। স্থিতবুদ্ধির ক্ষণে আমি আমার যাতনায় উল্লাস বোধ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতে হবেই—দুঃখভোগের দায় যে আমার উপরে পড়েছে, তার জন্য আমি খুসী—আমি খুসী যে প্রকৃতির জন্য যারা বলিপ্রদত্ত, আমি তাদের একজন।

[রিজলি, আমেরিকা, ১ নভেম্বর, ১৮৯৯]

কারো কারো প্রকৃতি এমন যে তারা দুঃখ পেতে ভালবাসে। যাদের মধ্যে আমি জন্মেছি, তাদের জন্য যদি হৃদয় চূর্ণ করে নিবেদন না করতাম, তাহলে অন্যদের জন্য তা করতেই হত। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই হল কারও কারও ধাত—ক্রমে বুঝতে পারছি। সবাই আমরা সুখের পিছনে ছুটছি, সত্য, কিন্তু কেউ কেউ আছে, যারা সুখী হয় দুঃখী হলেই মাত্র! অদ্ভুত, তাই নয়? এতে ক্ষতি বিশেষ নেই, শুধু—সুখ ও দুঃখ উভয়ই সংক্রামক। ইঙ্গারসোল একবার বলেছিলেন যে, তিনি ভগবান্ হলে ব্যাধির পরিবর্তে স্বাস্থ্যকেই সংক্রামক করতেন। বলবার সময়ে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, স্বাস্থ্য ব্যাধির মতই সংক্রামক, যদি বেশী না হয়! বিপদ এখানেই। আমি সুখী হলাম, কি দুঃখী হলাম, তাতে জগতের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু অপরে যেন তার আওতায় না পড়ে। এই হল আসল কথা। কোনো মহাপুরুষ মানুষের দুঃখে ব্যথিত হওয়া মাত্র মুখভার করেন, বুক চাপড়ান, সকলকে ডেকে বলেন, তোমরা টক খাও, কাঠকয়লা চিবাও, গায়ে ছাই মেখে গোবরের গাদার উপর বসে থাকো, আর কথা বলো চোখের জলের সঙ্গে গোঙিয়ে গোঙিয়ে। আমি দেখছি এঁরা সবাই অসম্পূর্ণ—কোনো সন্দেহ নেই। যদি জগতের বোঝা বইবার জন্য সত্যই তৈরী হয়ে থাক, সর্বতোভাবে তা নাও। কিন্তু তোমার গোঙানি আর অভিসম্পাত যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার জ্বালা-যন্ত্রণার চেহারা দেখিয়ে আমাদের আতঙ্কিত করে তুলো না। আমরা যেন তা দেখার পরে মনে করে না বসি, নিজের দুঃখজ্বালা নিয়ে আমরা বেশ ছিলাম। যে মানুষ সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে তুলে নেয়, সে জগৎ-কে আশীর্বাদ করে নিজের পথে চলে যায়। তাঁর মুখে নিন্দা বা সমালোচনার একটি কথাও শোনা যায় না। তার কারণ এই নয় যে, জগতে পাপ নেই। তার কারণ এই যে, তিনি স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভার তুলে নিয়েছেন। পরিত্রাতাই আনন্দে আপন পথে চলেন—ত্রাণপ্রাপ্তরা নয়।

আজ প্রভাতে কেবল এই তত্ত্বের আলোকই আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যদি এ ভাবটি আমার জীবনে স্থায়িভাবে এসে থাকে, যদি আমার সমগ্র জীবনে তা সঞ্চারিত হয়—তাহলেই যথেষ্ট।

দুঃখভার-জর্জরিত যে যেখানে আছ, সব এস, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাকো, আর তোমরা সুখী হও এবং ভুলে যাও যে, আমি একজন কোনোকালে ছিলাম।

[লস এঞ্জেলস, ৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৯]

যে শান্তি ও বিশ্রাম খুঁজছি, তা কোনোদিন আসবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের, অন্তত আমার স্বদেশের কিছু কল্যাণ করাচ্ছেন। আর এই উৎসর্গের ভাব অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে আপস করা সহজতর হয়। আমরা সবাই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে। একটা বিরাট বলি —এছাড়া এর অন্য তাৎপর্য গোচর হয় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। যারা বাধা দেয়, তাদের ভেঙে দুমড়ে নোয়ানো হয়—তাদের দুর্ভোগ বেশী। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর।

[লস এঞ্জেলস, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০০]

কাজ করতে চাই না। বিশ্রাম চাই, শান্তি চাই। তার স্থান ও কাল আমার জানা আছে। কিন্তু আমার বিধিলিপি বা কর্মফল আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে—কাজ, কাজ! কসাইখানার দিকে তাড়িত পশুরা যেমন চাবুকের চোটে চলতে চলতে পথের ধার থেকে এক খাবলা ঘাস কামড়ে তুলে নেয়—আমাদের দশাও তাই। কিন্তু এ সকলের মূলে আমাদের কর্মফল—আমাদের ভয়—ভয়ই যত দুঃখ ব্যাধির আকর। আশঙ্কিত ও আতঙ্কিত হয়ে আমরা অপরের ক্ষতি করি। আঘাত করতে ভয় পেয়ে আমরা আরও আঘাত করি। মন্দকে এড়াতে ব্যাকুল চেষ্টার দ্বারা আমরা তাঁর কবলে গিয়ে পড়ি।

নিজেদের চারপাশে কত হেন-তেন অর্থহীন আবর্জনাই জমিয়ে তুলেছি!! এর কোনো ভাল ফল নেই—এর দ্বারা যাকে পরিহার করতে চাই, সেই দুঃখেরই মুখে ছুটে যেতে হয়।...

আ—হা! যদি একেবারে নির্ভয় হতে, সাহসী হতে, বেপরোয়া হতে পারা যেত।...

[সানফ্রানসিসকো, ৪ মার্চ, ১৯০০]

আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি, ক্রমশঃ খুবই বল পাচ্ছি। এখন কখনো কখনো মনে হয়, মুক্তি নিকটে। গত দু'বছরের জ্বালাযন্ত্রণা আমাকে নানা বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য পরিণামে আমাদের কল্যাণসাধনই করে, যদিও তখনকার মত মনে হয়, বুঝি আমরা একেবারে ডুবে গেলাম।

আমি যেন ঐ অসীম নীলাকাশ; মাঝে মাঝে সে আকাশে মেঘ জমলেও আমি সর্বদা সেই অসীম নীল আকাশই আছি।

আমি এখন সেই শান্তির আস্বাদের জন্য তৃষাতুর, যা আমার মূল প্রকৃতি; যা প্রত্যেক জীবের মূল প্রকৃতি। এই হাড়মাসের খাঁচা আর সুখদুঃখের মিথ্যা স্বপ্ন —এগুলো আবার কি?

আমার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। ওঁ তৎ সৎ।

[সানফ্রানসিসকো, ২৮ মার্চ, ১৯০০]

আমি খুব খাটছি—আর যত বেশী খাটছি ততই ভাল বোধ করছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটি বিশেষ উপকার হয়েছে, নিশ্চয়। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি, অনাসক্তি মানে কি। ভরসা করি, শীঘ্রই সম্পূর্ণ অনাসক্ত হতে পারব।

কোনো একটা বিষয়ে আসক্ত হবার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করি, কিন্তু তার বিপরীত দিকে আর একটি সমভাবে কঠিন জিনিস রয়েছে, তার বিষয়ে কোনই মনোযোগ দিই না, তা হল—মুহূর্তমধ্যে কোনো বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা।

পূর্ণ বিকশিত আসক্তি, এবং পূর্ণ বিকশিত অনাসক্তি মানুষকে সুখী ও মহান করে।...

সব জিনিসকেই ঘুরে ফিরে আসতে হবে; বৃক্ষরূপে বিকশিত হতে হলে বীজকে ভূমিগর্ভে পচে মরতে হবে। গত দু' বছর ধরে আমার এই ভূমিগর্ভের মৃত্যুজীবন চলছিল। মৃত্যুগ্রাসে পড়ে আগেও আমি ছটফট করেছি, কিন্তু তার পরেই সমগ্র জীবনের বিপুল উচ্ছ্বাস ঘটেছে। এমনই এক উচ্ছ্বাস আমাকে রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গিয়েছিল; আর একটি ছুঁড়ে দিয়েছে আমেরিকায়। শেষটিই বৃহত্তম ঢেউ। সে ঢেউ নেমে গেছে—আমি এখন এতই শান্ত যে সময়ে সময়ে গভীর আশ্চর্য বোধ হয়!! প্রতি সকাল সন্ধ্যায় কাজ করি, যখন যা পাই খাই,—রাত বারটায় শুতে যাই,—কিন্তু কী ঘুম—ঘুম! এমন ঘুম কখনো ঘুমোইনি এ জীবনে!

[সানফ্রানসিসকো, ২৮ মার্চ, ১৯০০]

আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো। কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। শ্রী ওয়া গুরু! শ্রী ওয়া গুরু! ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিকবাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা। ব্রত উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আদর্শ—সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়। শ্রী ওয়া গুরু!...

কুটিল ভাগ্যের কালো ঘন ছায়া। কিন্তু আমি তো সর্বময় প্রভু! যে-মুহূর্তে আমি উত্তোলন করি হস্ত—অন্তর্হিত হয় তমসা! এসব অর্থহীন—এই ভয়! আমি ভয়েরও ভয়, রুদ্রেরও রুদ্র। আমি অভীঃ, অদ্বিতীয়, এক। আমি অদৃষ্টের নিয়ামক, আমি কপালমোচন। শ্রী ওয়া গুরু! দৃঢ় হও, বৎসে! টাকা বা অন্য কিছুর দাস হয়ো না, তবেই সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

[সানফ্রানসিসকো, ২৬ মে, ১৯০০]

মা-ই সব জানেন—যা আমি সর্বদা বলি। মায়ের নিকট প্রার্থনা কর। নেতা হওয়া বড় কঠিন। সংঘের পায়ে যথাসর্বস্ব, এমন কি নিজের সত্তা পর্যন্ত চূর্ণ করে বিসর্জন দিতে হয় নেতাকে!...

[নিউইয়র্ক, ২ জুলাই, ১৯০০]

এই তো জীবন—খেটে খাও, শুধু খেটে মর! তাছাড়া আর কী-ই-বা করার আছে! খেটে খাও—শুধু খেটে মর! একটা কিছু ঘটবে—কোনো একটা পথ খুলে যাবে। তা যদি না হয়,—হয়তো সত্যই কখনো হবে না,—তাহলে, তাহলে, তাহলে—কী! আমাদের সব উদ্যমই হল সাময়িকভাবে চরম পরিণতিটিকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা, যার নাম—মৃত্যু! কিন্তু হে মৃত্যু! হে সর্বদুঃখহর মহামৃত্যু—তুমি ছাড়া এ জগৎ কি করত!

এই প্রতীয়মান জগৎ সত্য নয়, নিত্য নয়—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!! ভবিষ্যৎ আরও ভাল হবে কি উপায়ে? সে তো বর্তমানেরই ফল-পরিণতি। সুতরাং সে ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই মতো—যদি মন্দতর না দাঁড়ায়!

স্বপ্ন, আহা! স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল! স্বপ্ন—স্বপ্নের ইন্দ্রজালই এ জীবনের হেতু—স্বপ্নেই তার লয়। স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্ন ভাঙো!

...পৃথিবীর কাছে যে-কথা বলে চলেছি : দুনিয়ার অন্তহীন প্রহেলিকা, অদৃষ্টের সীমাহীন সুতোর পাকানো গুলির কথা—যার শেষপ্রান্ত কেউ খুঁজে পায় না কোনদিন, অথচ মনে করে পেয়েছে, নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই কিছু সময়ের জন্য যা মনে করা তার প্রয়োজন—প্রয়োজন নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য,—এই কথাই বলে চলেছি।

যাহোক, এখন বড় বড় কাজ করতে হবে—কিন্তু—বড় কাজের পরোয়া করার দরকার কি? একই সঙ্গে ছোট কাজ করে যাও না কেন? ছোট ও বড়—সমান ভাল। ছোটর মহিমা দেখতে গীতা শিখিয়েছে। ধন্য সেই প্রাচীন গ্রন্থ!!...

শরীরের কথা চিন্তা করার মতো বেশী সময় দেওয়া যায়নি। সুতরাং তা ভালই আছে ধরে নিতে হবে। আর—এ জগতে নিত্য ভাল বলে কিছু নেই। তবে মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই—ভাল হচ্ছে শুধু ভাল হওয়া ও ভাল করা।

ভালই হোক, মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এইসব নিয়ে একবার প্রাণখুলে হাসব। এই কথাটুকু আমি নিশ্চয় বুঝেছি।

[প্যারিস, ২৮ অগস্ট, ১৯০০]

মহাদেশসমূহের আর এক প্রান্ত থেকে একটি স্বর তোমাকে প্রশ্ন করছে: 'কেমন আছ?' অবাক হচ্ছ না কি? সত্যই, আমি ঋতুর পাখী।

চঞ্চল আনন্দমুখর প্যারিস, প্রাচীন গম্ভীর কনস্টান্টিনোপল, ঝক্‌ঝকে ছোট্ট এথেন্স, পিরামিডের কায়রো,—পিছনে ফেলে এসেছি; এখন এখানে আমি গঙ্গাতীরে, মঠে, আমার ঘরটিতে বসে লিখছি। চারিদিক কী নীরব! কী শান্ত! প্রশস্ত নদী প্রদীপ্ত সূর্যালোকে নৃত্যশীল। কচিৎ কখনো বোঝাই নৌকার দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে ক্ষণিক নীরবতা ভঙ্গ।

এখানে এখন শীত চলছে, কিন্তু মধ্যাহ্ন উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত, প্রতিদিন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতের মতো। সব কিছু সবুজ, সোনালি; মখমলের মত ঘাস; আর বাতাস শীতল, নির্মল ও সুখময়।

[বেলুড় মঠ, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯০০]

সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক! মহামায়া তোমার বাহুতে ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক। এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর—এই আমার প্রার্থনা।...

যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক

তেমনিভাবে, কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী স্পষ্টভাবে তিনি তোমাকে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

[বেলামস, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২]

স্বামীজীর পত্রাদিতে নিবেদিতার উল্লেখ

নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর অনেকগুলি চিঠির নির্বাচিত অংশ আমরা উপস্থিত করেছি। অন্যান্যজনকে লেখা চিঠিতেও যে নিবেদিতার নানা উল্লেখ থাকবে, তা না বললেও চলে। অবশ্য এইসব উল্লেখ খুব বিস্তারিত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে সব কয়টি উদ্ধৃত করার প্রয়োজনও নেই।

নিবেদিতা ভারতে আসার আগে তাঁর বিষয়ে জানাবার সময়ে স্বামীজী তাঁর কর্মশক্তির কথা বিশেষভাবে বলেছেন। যেমন আলাসিঙ্গাকে (২০ নভেম্বর, ১৮৯৬)—'উইম্বলডনের মিস নোবল মস্ত কর্মী।' মেরী হলবয়েস্টারকে (২৫ জুলাই, ১৮৯৭)—'উইম্বলডনের মিস মার্গারেট নোবলকে জানো নাকি? আমার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করছে। যদি পার তার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করো।' মিসেস ওলি বুলকে (১৯ অগস্ট, ১৮৯৭)—'মিস মার্গারেট নোবল নামে এক ইংরাজ তরুণী ভারতে আসতে এবং এখানকার অবস্থা জানতে খুবই আগ্রহী, যাতে সে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে ভারতের জন্য কিছু কাজ করতে পারে।'

ভারতে আসার আগে নিবেদিতা ভারতীয় অবস্থা এবং স্বামীজীর কার্যধারা সম্বন্ধে খুটিয়ে প্রশ্ন করে চিঠি লেখেন। স্বামীজী শ্রীনগর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে ঐ সব প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে লিখে পাঠিয়েছিলেন। মার্গারেট নোবলের প্রশ্নধারা থেকে তিনি কতখানি যাচিয়ে বিচার করে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন বোঝা যায়, এবং স্বামীজীর উত্তর থেকেও রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের একটি পর্যায়ের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার চিত্র পাওয়া যায়। স্বামীজী-প্রদত্ত উত্তরগুলি নিম্নোক্ত প্রকার :

১। প্রায় সকল শাখাকেন্দ্রই খোলা হয়েছে। তবে আন্দোলনের এই সবে সূত্রপাত।

২। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই শিক্ষিত। যাঁরা নন, তাঁরাও ঐহিক শিক্ষা পাচ্ছেন। কিন্তু যদি লোককল্যাণ করতে হয়, সর্বোপরি দরকার পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা। সেই উদ্দেশ্য যাতে অবশ্যই সিদ্ধ হতে পারে সেজন্য অন্য শিক্ষার তুলনায় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে।

৩। ঐহিক শিক্ষকবৃন্দ : আমরা যাদের পাচ্ছি, তাদের অধিকাংশ পূর্ব থেকেই শিক্ষিত। এখন দরকার শুধু আমাদের 'পদ্ধতি' তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের চরিত্র তৈরী করা। এখানে তাদের শিক্ষা—আনুগত্যের এবং অভীঃমন্ত্রের;

আর পদ্ধতি—দরিদ্রদের জন্য প্রথমে দেহপুষ্টির ব্যবস্থা করা, তারপরে উচ্চতর মানসিক পর্যায়ের দিকে এগিয়ে দেওয়া।

কলা ও শিল্প : পরিকল্পনার এই অংশটুকু অর্থাভাবের জন্য এখনি আরম্ভ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে সহজতম গ্রহণযোগ্য পথ হল—ভারতীয়গণকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে প্রণোদিত করা, এবং অন্য দেশে যাতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের বাজার তৈরী হয়, তার চেষ্টা করা। একাজ তারাই করবে, যারা 'দালাল'-জাতীয় নয়, শুধু তাই নয়, যারা অপরপক্ষে লাভের সবটুকু অংশ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করবে।

৪। দেশের সকল জায়গায় ঘুরে বেড়ানো দরকার হবে, যে পর্যন্ত না 'জনগণ শিক্ষার কাছে আসে।'[১] এই ভ্রাম্যমান শিক্ষকেরা যে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ধর্মের মানুষ—এই জিনিসটি সর্বাধিক ফলপ্রদ হবে।

৫। সকল বর্ণের মানুষের মধ্যেই আমাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার মুখে। এপর্যন্ত উচ্চ বর্ণগুলির মধ্যেই কাজ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-কেন্দ্রগুলির কাজ পুরোপুরি চালু হওয়ার ফলে আমরা নিম্নবর্ণের মানুষদের উত্তরোত্তর প্রভাবিত করছি।

৬। প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুই আমাদের কাজের অনুমোদন করে। তবে এই জাতীয় কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করার ব্যাপারে তারা এখনো অভ্যস্ত নয়।

৭। হাঁ, নিশ্চয়, সেবাকাজে ও অন্যান্য সৎকাজে গোড়া থেকেই আমরা পীড়িত মানুষ কোন্ ধর্মাবলম্বী—সে হিসাব নিই না।[২]

---

[১] 'জনগণ শিক্ষার কাছে যে পর্যন্ত না আসে'—কথাটির অর্থ, ভারতীয় জনসাধারণ এতই দরিদ্র যে, শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও তাদের পক্ষে সে শিক্ষা নেওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ গ্রাসাচ্ছাদনের পরিশ্রমেই তাদের সবটুকু সময় ব্যয় করতে হত। সুতরাং স্বামীজীর বক্তব্য ছিল—জনসাধারণের কাছে গিয়ে, তাদের অবসরমতো তাদের শিক্ষা দিতে হবে। ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু Chemicals ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography প্রভৃতি ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংসে উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে যায়, তাই চেষ্টা কর। সন্ধ্যের পরে, দিন দুপুরে, কত গরীব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁতি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও।"

স্বামীজীর অজস্র চিঠিতে এই জনশিক্ষার কথা আছে—এখানে অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

[২] স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-সেবার কাজ করছিলেন, এবং অনাথাশ্রম স্থাপন করেন। নিবেদিতার মতই তিনিও নিশ্চয় একই প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে স্বামীজী লেখেন (১০ অক্টোবর, ১৮৯৭)—"মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি, এবং তাহাদের ধর্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল, এবং যাহাতে তাহারা নীতি-পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম। জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকায় তুলিয়া রাখ।" দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের সময়ে ধর্ম-বিবেচনা কেন—এই কথাটি আজ যত হাস্যকর বা বিরক্তিকর মনে হোক, যে-কালের আলোচনা হচ্ছে, তখন তা ছিল না। ভারতের পক্ষে ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল—যখন ক্রীশ্চান মিশনারীরা দুর্ভিক্ষের সস্তা বাজারে ক্রীশ্চান কিনত হাজারে হাজারে। ধর্মের দয়া ও ক্ষুধার সেই বিকট চেহারায় মানবতা মলিন হয়ে গিয়েছিল সেদিন ভারতে। বিবেকানন্দের উদারতা সেই পটভূমিকায় শুভ্র জ্যোতির মত।

প্রসঙ্গটির কিছু বিস্তারিত আলোচনা আমরা নিবেদিতার সেবামূর্তির প্রসঙ্গে করব।

নিবেদিতা ভারতে আসার পরে স্বভাবতঃই নিবেদিতার বিদ্যালয় এবং সেবাকাজ সম্বন্ধে স্বামীজীর চিঠিপত্রে কিছুকিছু উল্লেখ আছে। সেগুলি আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃত করব। ঐ দুই ভূমিকা ছাড়াও নিবেদিতার বাগ্মিতায় স্বামীজী খুবই খুশী হয়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে নিবেদিতা 'ইংলণ্ডে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামীজী নিবেদিতা সম্বন্ধে বলেন—'ইংলণ্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়েছে—এই মিস্ মার্গারেট নোবল্—যাঁর কাছে আমাদের বহু প্রত্যাশা',—এই প্রত্যাশা নিবেদিতা-চরিত্রের কাছে অবশ্যই, কিন্তু নিবেদিতার বক্তৃতা শোনার পরে নিবেদিতার বাগ্মিতার কাছেও সম্ভবতঃ। কারণ এই বক্তৃতার পরেই স্বামীজী গভীর আনন্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন—'মিস নোবল্—সত্যই রত্নপ্রাপ্তি আমাদের! আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ইনি শীঘ্রই মিসেস বেশান্তকে বক্তারূপে ছাড়িয়ে যাবেন।' স্বামীজী পরেও নিবেদিতার বক্তৃতা-সাফল্যে খুশী হয়েছেন দেখতে পাই।

এখানে জানানো উচিত, নিবেদিতা বক্তারূপে মিসেস বেশান্তকে ছাড়িয়ে যাবেন, এটা খুবই উচ্চ আশা, কারণ বেশান্তকে তৎকালীন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বলা হত—স্বয়ং স্বামীজীই তাই বলেছেন। স্বামীজীর নিবেদিতা-প্রশংসায় কিন্তু নিছক শিষ্যা-স্নেহ ছিল না, পরবর্তীকালে নিবেদিতা বাগ্মী হিসাবে নাম করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশান্ত হয়ে উঠতে পারেননি, কারণ প্রথমতঃ তিনি রাজনৈতিক কাজে ও লেখার কাজে এতই জড়িয়ে পড়েন যে, বক্তৃতার অভিপ্রায় ত্যাগ করেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁর বক্তৃতা অনেক সময়ই এত উচ্চ ও ঘনীভূত চিন্তায় পূর্ণ থাকত যে জনসাধারণের পক্ষে সব সময় বোধগম্য হত না।

সম্ভব হলে আমরা পরে 'বাগ্মী নিবেদিতা'—এই বিষয়ে কিছু তথ্য দেব।

নানা চিঠিতে দেখতে পাই স্বামীজী আমেরিকায় নিবেদিতার বক্তৃতা ও অর্থ-সংগ্রহ-প্রচেষ্টার সমূহ প্রশংসা করেছেন।

ভারতের কল্যাণে নিবেদিতা যে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন, সশ্রদ্ধ চিত্তে তা রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জীবনীতে লেখা হয়েছে—

'যে সব পাশ্চাত্ত্য শিষ্য ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের শিক্ষাদান কাজটিকে চরম গুরুত্বপূর্ণ বলে এই মহান হিন্দু এবং বিরাট আচার্য মনে করেছিলেন।...পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে একজনকে বেছে নিয়েছিলেন, যাঁর উপরে তাঁর গভীর আশা ও বিশ্বাস ছিল; সেইজন্য স্বামীজীর ধ্রুবজ্যোতিপূর্ণ আলোচনার প্রবাহ উক্ত শিষ্যার দিকেই সমধিক প্রবাহিত হত। ঐকালে যদি তিনি ভগিনী নিবেদিতার গঠনের অতিরিক্ত আর কিছু না করে থাকতেন, তাহলেও বলা যেত না, তাঁর সময় বৃথা গেছে।'

নিবেদিতা সংশ্লিষ্ট স্বামীজীর কবিতা

॥ ১ ॥

স্বামীজী নিবেদিতার বিষয়ে ও উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে দুটি কবিতা রচনা করেন। একটির নাম Benediction অর্থাৎ আশীর্বাদ, দ্বিতীয়টি Peace অর্থাৎ শান্তি। 'নিবেদিতা' নামটি নিবেদিতার বিষয়ে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ততম বক্তব্য, বলা উচিত বহু বক্তব্যের হৃদয়-মধ্যস্থ কৌস্তুভমণি; আর ঐ কবিতা দুটিতে সেই মহামাণিক্যেরই উদ্‌ভাসিত দ্যুতি। প্রথম কবিতায়—ভারতের নিবেদিতা, দ্বিতীয় কবিতায়—নিত্য সত্যের নিবেদিতা। প্রথম কবিতায় স্বামীজী এক বিদেশিনী নারীকে সমগ্র ভারত-সাধনাকে আত্মসাৎ করে ভাবী ভারতের সেবিকা, গুরু ও বান্ধবী হবার জন্য আহ্বান করেছিলেন; সে রকম গুরুদায়িত্ব আর কখনো কোনো বিদেশীকে বহন করতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিবেদিতা তা করতে কতখানি পেরেছিলেন—তার চরম স্বীকারোক্তি ভারতের মহাকবির কণ্ঠে শোনা গেছে, যখন তিনি নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু নিবেদিতাকে ভারতের জন্য উৎসর্গ করার কালে বিবেকানন্দ জানতেন যে, পরিপূর্ণ প্রেম ও পরিপূর্ণ সেবা কখনই সম্ভব নয়, যদি না অন্তরে সেই পরম অধ্যাত্ম সত্যের আলোক চির দীপ্যমান হয়ে থাকে। তাই তিনি চেয়েছেন, বাইরের কর্মতরঙ্গের মধ্যে যখন নিবেদিতা থাকবেন, তখন তিনি যেন শক্তির অন্তরে যে শক্তি, আলোকের মর্মে যে আলোক,—তার সন্ধান পান। Peace কবিতায় বিবেকানন্দের সেই দ্বিতীয় অর্পণ নিবেদিতাকে।

প্রথমে Benediction কবিতাটি অনুবাদসহ উদ্ধৃত হচ্ছে। কবিতাটির রচনা-কাল অজ্ঞাত।

The mother's heart, the heroes will,
The sweetness of the southern breeze,
The Sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free:
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.

Be thou to India's future son
The mistress, servant and friend in one.

মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে-অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি আর্য-বেদীতলে :

এসব তোমারই হোক, আরও ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, গুরু—তুমি একাধারে।

(নারায়ণী দেবী অনূদিত)

কবিতাটির রচনাকাল অজ্ঞাত হলেও[১] অনুমানের চেষ্টা করা যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারীতে নিবেদিতা স্বামীজীকে এক পত্রে লিখেছেন—"আপনার জন্মদিনের কবিতা (স্বামীজীর জন্ম তারিখ ১২ জানুয়ারী, ১৮৬৩) এসে পৌঁছল গত রাত্রে।"

এই কবিতাটি কোন্ কবিতা? এই চিঠিতে অতঃপর নিবেদিতা যা লিখেছেন, তার থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী ঐ কবিতায় নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে তাঁর ভবিষ্যতের বিষয়ে অত্যুচ্চ কিছু কথা বলেছেন। হয়ত আলোচ্য Benediction কবিতাটিই স্বামীজী পাঠিয়েছিলেন। তা যদি হয়, সেক্ষেত্রে কবিতাটির রচনাকাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়। নিবেদিতার চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

"আমার প্রিয় পিতা, আপনার জন্মদিনের কবিতা এসে পৌঁছল গতরাত্রে। কী এমন বলতে পারি কবিতাটির বিষয়ে যা শেষপর্যন্ত তুচ্ছ শোনাবে না! শুধু বলি, আপনার সুন্দর ইচ্ছা যদি সফল হয়, তা আমার হৃদয়কে ভেঙে দেবে। কারণ আমি এখন রামপ্রসাদের ভাবে আছি : 'চিনি হতে চাই না মন—চিনি খেতে ভালবাসি।' একথা ভাবাও যদিচ উদ্ভট তবু বলি—আমি এমন কোনো পথে ভগবানকেও পেতে চাই না, যদি না তার দ্বারা আমার পিতা অলঙ্ঘনীয়ভাবে ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন।

অধ্যাত্মসিদ্ধির ক্ষণে গুরু হারিয়ে যাবেন, এমন কথা ভাববার দরকার হয় না জানি, তবু সেই মহা মুহূর্তেও এমন কোনো দিব্য আনন্দের কথা কল্পনা করতে পারি না, যার প্রাপ্তি গুরুর ক্ষেত্রে অধিকতর নয়।

অসম্ভব কথা বলার, কিংবা অচিন্তনীয় চিন্তা করার চেষ্টা করছে একজন, তবু, আপনি নিশ্চয় জানেন আমি কি প্রকাশ করতে চাইছি।

আগে ভাবতাম, আমি ভারতের নারীদের জন্য কাজ করতে চাই; এই ধরনের নানা সুমহান নৈর্ব্যক্তিক ভাবরাজিতে পূর্ণ থাকত মস্তিষ্ক, কিন্তু ক্রমেই নিশ্চিতভাবে সেই উচ্চ শিখর থেকে নেমে এসেছি; আজ আমি যদি কিছু করতে চাই, তার একমাত্র কারণ—আমার পিতার ইচ্ছা তাই। এমনকি আমাদের ঈশ্বরজ্ঞানের ইচ্ছাও দেওয়া-নেওয়ার ভাবমুক্ত নয়। সেবার জন্যই সেবকের চির কামনা অবশ্যই শ্রেয়, কিন্তু

[১] 'বাণী ও রচনা'র সপ্তম খণ্ডে কবিতাটির রচনার তারিখ দেওয়া আছে ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০০। এই তারিখ কিভাবে পাওয়া গেল জানি না। যদি মূল রচনা থেকে নেওয়া হয় ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে ১৯০০-র ১৩ জানুয়ারীর চিঠিতে নিবেদিতা স্বামীজীর রচিত কোন্ কবিতার কথা বলেছেন?

হে প্রিয় আচার্যদেব।—সে আমাদের এই দুঃখী ক্ষুদ্র জীবনের জন্য নয়।

আর একটি জিনিস সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত, অন্তত আমার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, সময় উপস্থিত হলে আপনি হাজার হাজার সন্তান লাভ করবেন, যারা বৃহত্তর, শ্রেষ্ঠতর, যারা আমার থেকে অনন্ত গুণ বেশী করে আপনাকে ভালবাসবে ও সেবা করবে—আর তার দেরীও নেই।

এখন স্বামীজী, আপনাকে স্বীকার করতে হবে আপনার কিছু ভুল হয়েছিল; 'আমেরিকা—ইতি!'[২] উঁহু! জ্যাকসনে একটি মানুষের কাছে আপনার নাম ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের কাছে লাল আলোর মত ছিল। সে ব্যক্তি আজ আপনার এবং আমার মিত্র, কারণ—আপনার কন্যার রসবোধ আছে!!!!"[৩]

॥ ২ ॥

Peace কবিতাটি লেখা হয় আমেরিকায়, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯। স্বামীজী ঐ সময়ে তাঁর দ্বিতীয় আমেরিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন, এবং নিবেদিতাও সেখানে ছিলেন ভারতীয় কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে। সেইকালে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কবিতাটি লিখিত হয়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা সে বিষয়ে লিখেছেন :

"২০শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা 'রিজলি ম্যানর' (মিঃ লেগেটের বাসগৃহ)

---

২ এই সময়ে স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণে এসেছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে, এবং মানসিক ঔদাসীন্যের জন্যও বটে, স্বামীজী বলেছিলেন,—তাঁর আমেরিকার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

৩ ভারতীয় কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে কাজটিকে অত্যন্ত দুরূহ দেখেন। আমেরিকা তখন বিবেকানন্দের বন্ধু ও শত্রুতে পূর্ণ। বিবেকানন্দ প্রচণ্ডভাবে মিশনারীদের ভারত-বিষয়ক কুৎসার বিরোধিতা করেছিলেন, যার উত্তর মিশনারীরা দেবার চেষ্টা করেছিল বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা করে। ভারত-কুৎসার মাত্রাও বেড়েছিল। মিশনারীদের সমবেত চেষ্টা যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। স্বামীজীর নামে প্রচার করাও স্থানবিশেষে নিবেদিতার পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। এইসব বিরোধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষে জানতেন না, বা তাঁর বক্তৃতা শোনেননি। স্বামীজীকে লেখা উদ্ধৃত পত্রে তেমনই এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা, যিনি মূলে কিন্তু ভদ্র ও রসিক মানুষ। নিবেদিতা যথার্থ সত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে, তাঁর সুরসিক হৃদয়ের কাছে আবেদন করে কোন্ ফললাভ করেছিলেন, তা ১৩. ১. ১৯০০ তারিখে মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"মিঃ ও' ডনেলের স্বামীজী-বিষয়ক মনোভাব : ও নাম আমার সামনে উচ্চারণ পর্যন্ত করবে না। এই ব্যক্তি মিশিগানের সকল 'সানডে স্কুলের' সুপারিনটেনডেন্ট, এবং কি নন? আর—সবিস্ময়ে দেখলাম, পাকাচুল নিতান্ত উষ্ণ-মিষ্ট মানুষ তিনি, চোখে ঝিলিক, সবসময়ে লোকের কৌতুকবোধে নাড়া দেন। আমাকে তিনি সৎ-স্বভাব 'চার্চ-উওম্যান' বলেই ধরলেন, এবং সেখান থেকে চলে আসার আগে আমরা সকলে মিলে রেক্টরের কাছে গিয়ে কোনো এক রবিবার স্বামীজীকে বেদী থেকে ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম!!! তুমি জানো, গির্জা-আইনে অ-সন্ন্যাসী বেদী (Pulpit) থেকে প্রচারের অধিকার পেতে পারে, যে আইন অনুসারে রোমান ও এপিক চার্চের চোখে স্বামীজী অ-সন্ন্যাসী, তত্ত্বগতভাবে!!!"

পোঁছিলেন। মিঃ লেগেট ছিলেন ধনী ব্যক্তি। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার ও মিসেস লেগেটের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। ...স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও কয়েকদিন কাটাইয়া গেলেন।...মিসেস সারা বুল আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার কন্যা ওলিয়া। মিসেস লেগেটের ভগ্নী মিস ম্যাকলাউড পূর্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন।...

নিবেদিতার আমেরিকায় অবস্থানের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ। কাজে নামিবার পূর্বে স্বামীজীর সঙ্গ ও বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে। তিনি ইতি-পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, প্রথম হইতেই আদর্শে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজন। ...লেগেটের বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ গৃহে বাস করিলেও তাঁহার জীবন যে একটি বিশেষ আদর্শবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহা স্থির রাখিবার জন্য চালচলন, বেশভূষায় পরিবর্তন প্রয়োজন।...

রিজলি ম্যানরে আগমনের পর নিবেদিতা সংকল্প স্থির করিলেন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী; যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উদ্‌যাপনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। পরদিন (২১শে সেপ্টেম্বর) তিনি তদুপযোগী পরিচ্ছদ গ্রহণের অভিপ্রায় স্বামীজীর নিকট ব্যক্ত করেন। আদর্শের প্রতি তাঁহার দৃঢ়তা ও অনুরাগ দর্শনে স্বামীজী প্রীত হন। ঐ দিন বৈকালবেলা ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র স্বামীজী তাঁহাকে একটি উপহার দেন। কবিতাটির নাম 'শান্তি' (Peace)।"[৪]

স্বামীজী এইকালে কি ধরনের আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের মধ্যে ছিলেন—তার বিস্তৃততর পরিচয় যদি পাঠকগণ বুঝতে চান, তাহলে এইসঙ্গে তাঁদের অল্প পূর্বে উদ্ধৃত নিবেদিতাকে আমেরিকা থেকে লেখা ১৮৯৯—১৯০০-এর চিঠিগুলি দেখে নিতে হবে। সেই সঙ্গে ঐ কালেই স্বামীজীর ভাবানুভূতির সম্বন্ধে নিবেদিতার পত্রও পঠিতব্য। নিবেদিতার পত্র ও পত্রাংশ অল্প পরেই উপস্থিত করব।—

Peace

Behold, it comes in might,
The power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

[৪] কবিতাটির প্রতিলিপি দেওয়া আছে "The Life of Swami Vivekananda By His Eastern and Western Disciples"-এর মধ্যে।

It is not joy nor sorrow,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

It is sweet rest in music;
And pause in sacred art;
The silence between speaking;
Between two fits of passion—
It is calm of heart.

It is beauty never seen,
And love that stands above,
It is song that lives unsung,
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear-drop goes,
To spread the smiling form
It is the goal of life,
And Peace—its only home.

শান্তি

মহাবলে ধেয়ে আসে শক্তি—
কিন্তু তা শক্তি নয়,
তা অন্ধকারে অন্তর্লীন আলোক.
তা ছায়া—তীব্র জ্যোতি মাঝে।

আনন্দ তা— অনির্বচনীয়,
গভীর বেদনা—অননুভূত,
অমর জীবন তা— অযাপিত,
নিত্য মরণ—অশোচিত।

তা দুঃখ নয়, তা সুখ নয়,
দুয়ের মর্মে যা আছে, তাই।
তা নিশা নয়, তা উষা নয়,
উভয়ের সন্ধির সেতু।

সঙ্গীতের সম, পবিত্র ছন্দের যতি,
মুখর ভাষণের অন্তরের নৈঃশব্দ্য,
বাসনার উচ্ছ্বাসের দুই তরঙ্গের মধ্যে
হৃদয়ের ক্ষান্তি, ধৃতি।

নয়নে ধরা দেয়নি, এমন সৌন্দর্য,
পাত্র নেই তবু নিঃসঙ্গ প্রেম,
অগীত অশ্রুত সুর,
আর জ্ঞান, যা জ্ঞানের অতীত।

জন্মতরঙ্গের মধ্যে স্থির মৃত্যু,
ঝঞ্ঝার শিরে নিশ্চল নিরোধ,
সৃষ্টিগর্ভ মহানেতি,
আর মহানেতি যা সৃষ্টি পরিণাম।

নয়নাশ্রু ঝরে পড়ে সেইখানে,
হাসিতে আবার ফোটে নব প্রাণে,
জীবনের পরম লক্ষ্য সেই—
'শান্তি'—তার একমাত্র ধাম।

॥ ৩ ॥

স্বামীজীর ইংরাজ শিষ্য জে. জে. গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী Requiescat in Pace নামে যে কবিতাটি লেখেন, তার প্রাথমিক রূপ কিন্তু নিবেদিতাকৃত। সে হিসাবে কবিতাটিকে স্বামীজী ও নিবেদিতার যৌথ সৃষ্টি বলা যায়, যদিও নিবেদিতারচিত প্রাথমিক রূপটি সামান্যই, এবং ত্রুটিযুক্ত বলে স্বয়ং নিবেদিতাই জানিয়েছেন।

ভারতবর্ষের জন্য, ঠিকভাবে বলতে গেলে বিবেকানন্দের জন্য, গুডউইন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। মিসেস ওলি বুল লিখেছেন, গুডউইন তাঁকে বলেছিলেন যে, "তাঁর প্রথম বয়স কেটেছিল সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্মের চেষ্টায় পৃথিবীর নানা দরজায় ধাক্কা দিয়ে গিয়ে—তার ফল,—হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অজ্ঞেয়বাদী।

নিউইয়র্কে স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফার রূপে কাজ করার অভিজ্ঞতার পরে,— স্বামীজীর সঙ্গে তিনি মাসের পর মাস দিবারাত্র কাটিয়েছিলেন,—জীবনের সর্বোচ্চ উপলব্ধির সৌন্দর্য, আত্মা ও ঈশ্বরের জ্ঞানের সম্মুখীন তিনি হলেন।"

নিউইয়র্কের নিপুণ স্টেনোগ্রাফার বিবেকানন্দকে জানার পরে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে (তাও সব সময় পর্যাপ্ত হয়নি) ভারত ও বিশ্বকে দিয়েছিলেন "বিবেকানন্দের রচনাবলী"—কেননা স্বামীজীর "রচনাবলীর" অধিকাংশই গুডউইন-অনুলিখিত বক্তৃতাবলী,—আর বিনিময়ে পেয়েছিলেন জীবনের পরম প্রাপ্তি—বিবেকানন্দ গুডইনের কাছে ছিলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট।

স্বামীজী গুডউইনকে অপরিসীম ভালবাসতেন। গুডউইন তাঁর কাছে পুত্রবৎ নন, পুত্রাধিক। গুডউইনের প্রতি স্বামীজীর অসীম ভালবাসার জন্য অন্য বিদেশী শিষ্যেরা অনেক সময় আনন্দময় ঈর্ষা বোধ করতেন। গুডউইনের মৃত্যুসংবাদে আর্তনাদ করে স্বামীজী বলেছিলেন—'বুঝলাম, পুত্রশোক কী ভয়ঙ্কর!'

গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজীর বক্তৃতা সফরের সময়ে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে থাকেন। তারপরে সম্ভবত যখন দারুণ অর্থকৃচ্ছ্র দেখা দেয়, তখন বাধ্য হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সাময়িকভাবে 'মাদ্রাজ মেল' কাগজে যোগদান করেন, এবং উতাকামণ্ডে থাকাকালে ১৮৯৮-এর ২রা জুন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃত্যু তাঁর বন্ধু ও পরিচিত মানুষদের কাছে গভীরতম বেদনার কারণ হয়েছিল, যাঁরা তাঁর আনুগত্য ও সেবার মধ্যে "খাঁটি ইংরেজের চরিত্র" দেখেছিলেন, যিনি "স্বদেশে বিদেশে যেখানেই হোক মহান ও ঈশ্বরীয় প্রকাশকে বরণ করে নেবার মত শক্তি-সম্পন্ন।" তাঁর সাহসী ও প্রেমময় জীবন, ওলি বুল লিখেছিলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা ও আনন্দের ভাণ্ডারে মহৈশ্বর্যতুল্য।"

গুডউইন যখন মারা যান, স্বামীজী আলমোড়ায় ছিলেন। নিবেদিতা প্রভৃতিও সেখানেই ছিলেন। তবে গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ আসার সময়ে স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে কিছু দূরে কোনো একটি স্থানে গিয়েছিলেন। সুতরাং সংবাদ আসা মাত্র স্বামীজী তা পাননি। কিন্তু স্বামীজী ভিন্ন অন্যান্যরাও গুডউইনকে এতই ভালবাসতেন যে মৃত্যুসংবাদের দারুণ প্রতিক্রিয়া হয় তাঁদের মনে। এ বিষয়ে মিসেস হ্যামণ্ডকে ৫ জুন, ১৮৯৮-তে লেখা নিবেদিতার অপ্রকাশিত পত্র থেকে অংশ উদ্ধৃত করছি :

"গতকাল দুপুরের দিকে একটি টেলিগ্রাম এসে আমাদের বেদনায় আচ্ছন্ন করে দিল—গুডউইনের মৃত্যু হয়েছে। মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁকে আমার চেয়ে বেশী ভালভাবে জানতেন, কিন্তু তাঁর শেষ দেখা আমার সঙ্গেই—কী ভাল ব্যবহারই সেদিন তিনি করেছিলেন মাদ্রাজে—ভালোত্ব একেবারে তাঁর স্বভাবধর্ম। যে-সব হিন্দুরা এখানে তাঁকে জানতেন, তাঁরা যথার্থ দুঃখে অধীর—দেখলেই বোঝা যায়। সারাক্ষণ আমাদের কাজ করে এমন একটি ছোকরা খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তিন-চার ঘণ্টা ধরে—কথা বলবার সামর্থ্যও যেন তার হারিয়ে গিয়েছিল। একটি সাধু সারা বিকাল বসে রইলেন, আর তাঁর বিষয়ে মধুর স্নিগ্ধ সব কাহিনী

বলতে লাগলেন। বদ্রীশা এই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি; তিনি এই সাধুর কাছে খুব সকালে এসে বলেছিলেন, তাঁর মন যেন বলছে যে তাঁর ভাই গোবিন্দলাল নিশ্চয় মারা গেছে। টেলিগ্রাম যখন এল তখন স্বামী সদানন্দ সেটি চেপে যেতে চেয়েছিলেন, যেহেতু সেটি রাজার (স্বামীজীর) নামে পাঠানো এবং রাজা অন্যত্র আছেন—কিন্তু সদানন্দ 'চোখের কয়েকফোটা জল' গড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে পারেন নি; তাতে বদ্রীশা ব্যাপারটা কি জানবার জন্য জেদ করলেন। তারপর সব শুনে বললেন, 'একই ব্যাপার, গোবিন্দলাল না হয়ে গুডউইন—তফাৎ কি!' গুডউইনকে সকলে এখানে এমনই ভালবাসে। রাজা এখনো বাইরে, আজ সকালেই ফিরবেন,—আঘাতটা দারুণ বাজবে। একমাত্র সান্ত্বনা, গুডউইন মারা গেছেন দারুণ মাদ্রাজে নয়—উতাকামণ্ডে—পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানের একটিতে। গুডউইন শহীদ হয়েছেন—স্বামীজীর কাজের জন্য, আর এখানকার আবহাওয়ার জন্য। মনে হচ্ছে, টাইফয়েডে নয়, প্লেগেই যেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।* তাঁর সেবায় কোনো ত্রুটি ছিল না, ভক্তিতে ছিল না ফাঁক। কানায় কানায় পূর্ণ, সংহত, অর্জিত সেবা ও ভক্তি। ভারতে নবযুগের ঋষিদের মধ্যে প্রথম স্থান নিলেন একজন ইংরেজ। এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনের উদ্দেশ্যে আমাদের একমাত্র উপযুক্ত অর্ঘ্য হতে পারে ধূপ-দীপ, পুষ্প ও মালা এবং সুন্দর সঙ্গীত।

ভারতে আগত পাশ্চাত্য শিষ্যের সংখ্যা একটি কমল—সাতের বদলে এখন ছয়।*

সোমবার সকাল : স্বামীজী গতকাল সন্ধ্যার শেষে এলেন, অনেকটা মূহ্যমান অবস্থায়, কেননা তিনি সেই বৃদ্ধ সাধু পওহারী বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন, যিনি কেউটের দংশনকেও বলেছিলেন—"প্রিয়তমের বার্তা।" এজন্য স্বামীজীকে গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়নি। জানানো হল আজ সকালে, যখন তিনি আমাদের কাছে এলেন। মিস ম্যাকলাউড সংবাদ দিলেন। খুব শান্তভাবে সংবাদটি নিলেন। তারপর থেকে খবরের কাগজ পড়ে এবং ক্রমাগত কথা বলে গেলেন। তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে তোমার চিঠির বিষয় শুনলেন, কবিতাটি দেখলেন।—নেল, নেল, প্রিয় আমার—ভারত সত্যই পুণ্যভূমি!"

গুডউইনের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসার পরিমাণ নিবেদিতা জানতেন বলেই গুডউইনের অভাবিত মৃত্যুকে স্বামীজী যখন শান্তভাবে নিতে পেরেছিলেন, তখন সেটি পরম বিস্ময়কর বস্তু বলে তাঁর মনে হয়েছিল, এবং সে বস্তু পুণ্যভূমি ভারতের মহাপুরুষদের পক্ষেই দেখানো সম্ভব বলে সোচ্ছ্বাসে জানিয়েছিলেন প্রিয় বন্ধু

---

* ভারতের নানা স্থানে তখন প্লেগ মহামারী চলছে। স্বামীজী প্লেগ শুশ্রূষার পরিকল্পনাও করেছেন। গুডউইন অবশ্য টাইফয়েডেই মারা যান।

* নিবেদিতা এখানে কাদের কথা বলছেন ঠিকভাবে বলা শক্ত। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যা বা ভক্তদের মধ্যে ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে এসেছেন—সেভিয়ার দম্পতি, গুডউইন, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিস মুলার, মিসেস প্যাটারসন (আমেরিকান কন্সাল পত্নী) এবং স্বয়ং নিবেদিতা। মোট সংখ্যা হয় আট। এঁদের মধ্যে হিসাবে বাদ যেতে পারেন হয় মিস মুলার, বা মিসেস প্যাটারসন। সম্ভবত মিস মুলারই বাদ যাবেন। ক্রিস্টিনের কথা এখানে ওঠে না, কারণ ক্রিস্টিন ভারতে এসেছিলেন ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের গোড়ায়।

নেলকে। নিবেদিতার প্রাপ্ত পত্রসমূহে এর বেশী পাই না, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার বিবরণ ডায়েরীতে তিনি রক্ষা করেছিলেন। বাইরে শান্ত বিবেকানন্দের বুকে কোন্ বেদনার ঝড় উঠেছিল, তা ডায়েরীর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, গুডউইনের মৃত্যুর বিষয় না জেনেও গুডউইন যখন মারা যাচ্ছেন সেইসময়ে নিবেদিতা প্রভৃতির মন কিভাবে অজ্ঞাত বিষাদ ও যাতনায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।—

"৩০শে মে থেকে ২রা জুন (১৮৯৮) : পরবর্তী সোমবার যাঁরা তাঁকে আতিথ্য দিয়েছিলেন (সেভিয়ার দম্পতি), তাঁদের সঙ্গে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন এক সপ্তাহের জন্য। আমরা আলমোড়ায় রয়ে গেলাম—ব্যাপৃত রইলাম পড়াশোনায়, অঙ্কনে এবং উদ্ভিদ চর্চায়। সেই সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় আহারাদির পরে আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম, তখন বিচিত্রভাবে আমাদের মন আকৃষ্ট হল 'In Memoriam' -এর[৭] প্রতি, এবং আমাদের মধ্যে একজন পড়ে শোনালেন :

Yet in these ears, till hearing dies,
One set slow bell will seem to toll
The passing of the sweetest soul
That ever looked with human eyes.
I hear it now, and O'er and O'er,
Eternal greetings to the dead ;
And 'Ave, Ave, Ave' said,
'Adieu, Adieu', for evermore.

আমার এই শ্রবণের শক্তি যতদিন থাকবে,
ততদিন বেজেই যাবে ধীরে, মন্থরে, ঘন্টাধ্বনি—
প্রিয়তম আত্মার বিদায়ের বার্তা নিয়ে,
এ পৃথিবীতে নয়ন মেলেছে এমন মধুতম আত্মা সে।
সেই ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনছি, শুনছি, শুনছি—
মৃতের উদ্দেশে নিত্য নমস্কার নিয়ে তা বাজছে,
বলছে— শুভ হোক! শুভ হোক! শুভ হোক!
বলছে—বিদায়! বিদায়! বিদায়—চিরতরে!

সেই বিশেষ ক্ষণেই, সুদূর দক্ষিণে, আমাদের গোষ্ঠীরই একজন প্রয়াণ করছিল এই ক্ষুদ্র, দৃশ্যমান সংসারমন্দির থেকে সূক্ষ্মতর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, দীপ্ততর

[৭] In Memoriam লর্ড টেনিসনের বিখ্যাত শোকগীতি—তাঁর প্রিয় বন্ধু আর্থার হেনরী হালামের মৃত্যুতে রচিত।

কোনো প্রকাশলোকের মধ্যে, যেখানে হয়ত পরম সান্নিধ্য স্পষ্টতর, ঘনিষ্ঠতর। কিন্তু সেকথা আমরা জানতে পারিনি তখনো। আরও একটি কালিমাচ্ছন্ন দিন গেল—কেন, বুঝিনি তখনো। তারপরে, যখন শুক্রবার সকালে বসে কাজকর্ম করছি, টেলিগ্রাম এল, একদিন দেরী করে, তাতে লেখা : 'গুডউইন গতরাত্রে উতাকামণ্ডে দেহত্যাগ করেছেন।' ঐ অঞ্চলে পরে যা টাইফয়েড মহামারী হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের হতভাগ্য বন্ধু, দেখা গেল, তারই প্রথম শিকারের অন্যতম। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি স্বামীজীর কথা বলেছিলেন;—স্বামীজী যেন পাশে এসে দাঁড়ান—চেয়েছিলেন শেষ ক্ষণেও।

রবিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী ফিরলেন।...তিনি সংবাদটি জানেন না; কিন্তু পূর্ব থেকেই গভীর বিষাদে তিনি মগ্ন; নীরবতা ভঙ্গ করে তখনি সেই মহাপুরুষের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, যিনি কেউটের দংশনকেও "প্রিয়তমের বার্তা" বলেছিলেন, যাঁকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্বাধিক ভালবাসতেন। স্বামীজী বললেন, "আমি এইমাত্র একটি চিঠি পেয়েছি; পওহারী বাবা তাঁর সকল উৎসর্গকে পূর্ণ করেছেন দেহোৎসর্গ করে; যজ্ঞাগ্নিতে দেহ বিসর্জন করে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন।" শ্রোতাদের একজন শিউরে বললেন : 'সেকি—কাজটি কি খুবই মন্দ হয়নি?'

"কী করে বলব তা?" গভীর ভাবোত্তেজনার সঙ্গে স্বামীজী বললেন,—তিনি এত বড় যে আমার বিচারের অধিকার নেই; তিনি জানতেন তিনি কি করছেন।'

এর পরে খুব অল্প কথাবার্তাই হল; সন্ন্যাসীর দল চলে গেলেন; অন্য সংবাদটি তখনও ভাঙা গেল না।

পরদিন খুব সকালে তিনি এলেন; গভীর ভাবাবেগে আচ্ছন্ন। পরে জানা গেল, রাত চারটে থেকে জেগে আছেন। একজন (মিস ম্যাকলাউড) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে মিঃ গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ জানান। বজ্রাঘাত তিনি নীরবে সইলেন। কয়েক দিন পরে, যেখানে তিনি ঐ সংবাদ শুনেছিলেন, সেখানে থাকতে চাইলেন না; সর্বাধিক বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি সর্বদা মনে জাগছে—এই দুর্বলতার জন্য নিজের উপর দোষারোপ করলেন। প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন—কারো স্মৃতির দাস হওয়া পুরুষোচিত নয়; ক্রমবিকাশের উর্ধ্বতর স্তরে উঠে মানুষ যদি মৎস্য বা কুকুরের লক্ষণগুলি বজায় রাখে তাহলে যেমন ঘটে এও তাই। এ মায়া মানুষকে জয় করতে হবে, মৃতেরা যে পূর্বের মত আমাদের সান্নিধ্যেই আছেন, একথা বুঝতে হবে। তাঁদের অনুপস্থিতি বা বিচ্ছেদের ধারণাটাই মায়া। তারপর আবার ফেটে পড়লেন; সগুণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বিশ্বসংসার চালিত হচ্ছে, এই নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'সেক্ষেত্রে গুডউইনকে মেরে ফেলার জন্য এমন একজন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁকে নিকেশ করে ফেলা কি মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না?—গুডউইন—আহা।—যদি বেঁচে থাকত কত কি করতে পারত!'...

কিন্তু শোকসংবাদ পাবার পরে স্বামীজী তাঁর বিয়োগদুঃখ সম্বন্ধে শান্তই ছিলেন। শান্তভাবে বসে তিনি কথা বলছিলেন। যে-ভক্তি ত্যাগ-বৈরাগ্যে পৌঁছায়, তারই কথায় পূর্ণ ছিলেন সেই সকালে—সেই দিব্য আকুতি যা মানুষের আত্মাকে খরপ্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ব্যক্তিত্বসীমার অনেক দূরে, অথচ আবার এমন এক

স্থানে তাকে স্থাপন করে, যেখানে সে ঐ ব্যক্তিত্বেরই মধুবন্ধন ছেদনে অস্থির ব্যাকুল হয়ে ওঠে।...

কিন্তু এই দিনগুলিতে স্বামীজী কোথাও সরে যেতে, একাকী থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যে-জায়গায় গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলেন, সে জায়গাটি তাঁর পক্ষে অসহ্য ঠেকছিল; আর সে বিষয়ে চিঠি পাওয়া বা লেখা নিত্য ক্ষতের যাতনা বাড়িয়ে তুলছিল। একদিন তিনি বললেন, 'বাইরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তিময় মনে হলেও তিনি অন্তরে জ্ঞানস্বরূপ, আর তিনি নিজে বাহ্যত যদিও জ্ঞানময় মনে হন, আসলে ভক্তিতে পূর্ণ; তাই তিনি নারীর মত দুর্বল হয়ে পড়েন।'"

এই মানসিক পটভূমিকায় গুডউইন বিষয়ে আলোচ্য কবিতাটি লিখিত হয়। কবিতাটি নিবেদিতাই শুরু করেন, ত্রিপদী ছন্দে লেখা আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু স্বামীজীর হাতে পড়ে সেটি আমূল বদলে যায়। এই পরিবর্তনে নিবেদিতা পাছে ক্ষুণ্ণ হন, স্বামীজী 'কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়া কথা গাঁথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড় জিনিস' তাই বর্ণনা করেছিলেন বিস্তারিতভাবে। কবিতাটি গুডউইনের মায়ের কাছে পাঠানো হয়। কবিতাটি এই :

Requiescat in Pace !

Speed forth, O soul! upon thy
Star-strewn path,
Speed, blissful one, where thought
is ever free,
Where time and sense no longer
mist the view,
Eternal peace and blessings be on thee!
Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home the heart of love
transcendent find,
Remembrance sweet, that kills all
space and time,
Like altar-roses, fill thy place behind.
Thy bonds are broke, thy quest in bliss is found.
And—one with that which comes as
Death and Life,—
Thou helpful one! unselfish e'er on earth,
Ahead, still aid with love this world of strife.

শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম

চল আত্মা, শীঘ্রগতি, তারকা-খচিত তব পথে,
ধাও হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাঁধে মনোরথে;
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ,
চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ!
সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান,
অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান;
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে,
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে!

টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছে সে আনন্দ-সন্ধান,
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তাঁর সাথে হলে একপ্রাণ,
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়,
আগে চল, সংসার-সংগ্রামে আনো প্রীতির সহায়!

[কিরণচন্দ্র দত্ত অনূদিত]

এই কবিতার সঙ্গে স্বামীজী গুডউইন-জননীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন পত্রে :

"তাঁর কাছে আমার যে ঋণ,—তা কখনো শোধ করা যাবে না। আমার কোনো চিন্তার দ্বারা যদি কেউ লাভবান হয়ে থাকেন তিনি জেনে রাখুন, তার প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত মিঃ গুডউইনের অক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য পরিশ্রমের ফলেই প্রকাশিত হতে পেরেছে। তাঁকে হারিয়ে আমি ইস্পাতের মত খাঁটি বন্ধু হারিয়েছি, অপরাজেয় ভক্তিতে পূর্ণ শিষ্য হারিয়েছি, এমন একজন কর্মী হারিয়েছি, ক্লান্তি কাকে বলে যিনি কখনও জানতেন না। আর পৃথিবী হারিয়েছে এমন বিরল মানুষদের একজনকে, যিনি সর্বদাই অপরের জন্য দেহধারণ করে থাকেন। পৃথিবী তাঁকে হারিয়ে সম্পদ হারিয়েছে।"

কবিতা ও চিঠি পেয়ে শোকসন্তপ্ত গুডউইন-জননী তাঁর "পরলোকগত পুত্রের উপর স্বামীজী কি জাতীয় উচ্চ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন" সে বিষয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে লিখে পাঠান।

গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজী কি দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন বোঝা যাবে, তাঁর অন্য আরও উক্তিতে। তিনি বলেছিলেন; 'আমার ডান হাত খসে গেছে; ক্ষতির সীমা রইল না।' পুনশ্চ, 'আমার বক্তৃতার পালা শেষ।'

॥ ৪ ॥

নিবেদিতার লেখার মধ্যে স্বামীজীর আরও কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার পটভূমিকা পাওয়া যায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে কোনো এক

সময়ে শ্রীনগরে অবস্থানকালে স্বামীজী পুনঃ প্রবর্তিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য To the Awakened India কবিতাটি, ঐ বৎসরের ৪ঠা জুলাই 'To the Fourth of July' এবং অগস্ট-সেপ্টেম্বরের কোনো এক সময়ে Kali the Mother কবিতা রচনা করেন। এই সমস্ত কবিতার পটভূমিকার বিষয়ে সংবাদ নিবেদিতার লেখায় পাই। এদের মধ্যে কিছু পরে Kali the Mother-এর বিষয়ে আমরা বিশেষ উল্লেখ করব। নিবেদিতার পত্র থেকে ১৮৯৯, জুনে, য়ুরোপ যাত্রাকালে জাহাজে 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' নামক বাংলা কবিতাটি রচনার বিষয়ে উল্লেখও পাই।

নিবেদিতার পত্রে স্বামীজী

নিবেদিতার যে বিপুল সংখ্যক পত্র লিজেল রেম' সংগ্রহ করেছেন, তার অধিকাংশ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা, এবং সেইসব পত্রের একটি বড়ো অংশের বিষয়বস্তু বিবেকানন্দ। স্বামীজী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পত্রগুলি স্বামীজীর উক্তি ও বিভিন্ন মুড-এর বিবরণে পূর্ণ থাকত, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে সেগুলি পূর্ণ থাকত তাঁর স্মৃতি ও চিন্তার অনুধ্যানে। বিবেকানন্দ নামক সর্বগ্রাসী চেতনা কিভাবে নিবেদিতার জীবনের প্রতিটি অংশকে অধিকার করে ছিল, এই পত্রগুলি থেকে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে নিবেদিতার অন্তর্জীবনের এক অপূর্ব ইতিহাসের সম্মুখীন হই আমরা, যার একদিকে আছে আত্মার বিপুল সংগ্রামের কাহিনী, অন্যদিকে আত্মবিলয়ের শান্তি সঙ্গীত। স্বয়ং বিবেকানন্দের অন্তরাত্মার উদ্দীপন কিংবা হাহাকারের অসাধারণ মুহূর্তও এর মধ্যে বারেবারে ফুটে উঠেছে। বিপুল প্রতিভার ঐশ্বর্যে পূর্ণ এক মানব ক্ষণে ক্ষণে কিভাবে লোকসীমাকে অতিক্রম করে দিব্যসত্তায় উন্নীত হতেন, তার গরিমাময় কাহিনীও এইসব অংশে পাওয়া যাবে। স্বামীজীর এইসব ভাববিকাশের কথা পরে অল্পবিস্তর নিবেদিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেও অনেক অংশ বাদ দিয়েছিলেন। পত্রের মধ্যে তার অধিক প্রকাশ এবং অধিকতর জীবন্ত সান্নিধ্য। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও তাঁর অশরীরী উপস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করেই নিবেদিতার বাকি জীবন কেটেছিল।

নিবেদিতার পত্রাবলীতে প্রাপ্ত স্বামীজীর সকল বর্ণনা বা উক্তি বর্তমান প্রসঙ্গে চয়িত হচ্ছে না। আমরা প্রধানত নিবেদিতার অন্তর্জীবনের সঙ্গে যুক্ত অংশগুলিই নির্বাচন করব। এইসব অংশে কোথাও কোথাও ফাঁক থেকে গেছে, কারণ সব চিঠি আমরা নিশ্চয় পাইনি, দ্বিতীয়ত, অন্তর্জীবনসংক্রান্ত পত্রগুলি মূলত মিস ম্যাকলাউডকে লেখা বলে যখন ম্যাকলাউড স্বামীজীর সান্নিধ্যে ছিলেন, তখন তাঁকে চিঠি লেখার কথা ওঠে না। সেইসব সময়ের বিবরণ নিবেদিতা ডায়েরীতে অনেক সময় রক্ষা করেছেন। ফাঁক পূরণের জন্য এইসব ডায়েরীজাতীয় রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে যোগ করে দেব।

রাজনীতি, লোকসেবা, শিক্ষা, সমাজ সমস্যা প্রভৃতি বহু বিষয়ে স্বামীজীর অনেক আলোচনা পত্রগুলিতে রক্ষিত আছে। সেগুলি প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য নানা পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হবে।

পাঠকগণ প্রথমে নিবেদিতার ভারতে আসার পূর্বে তাঁকে লেখা স্বামীজীর পত্রগুলি, যা ইতিমধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে, স্মরণ করুন। নিবেদিতা কলকাতায় মম্বাসা নামক জাহাজ থেকে অবতরণ করেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী। স্বামীজী তাঁর অভ্যর্থনায় জাহাজ-ঘাটে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা প্রথমে চৌরঙ্গীর এক হোটেলে ওঠেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড কলকাতায় পৌঁছান। কিছু-দিনের মধ্যে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জন্য জমি কেনার বন্দোবস্ত হয়, এবং ওলি বুল প্রভৃতি ঐ জমির একটি পুরনো বাড়িকে সংস্কার করে নিয়ে বাস করবার প্রস্তাব করেন। স্বামীজী সম্মত হন। নিবেদিতা সেই বাড়িতে ওলি বুল ও ম্যাকলাউডের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। এই বাড়িতে বসবাসের পূর্বে জায়গাটির প্রথম দর্শনের পরে নিবেদিতা লিখেছেন: (মিসেস হ্যামণ্ডকে, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮)—

মাননীয়া মাতা (মিসেস ওলি বুল) গত সোমবার খুব সকালে এলেন। মঙ্গলবার স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেলাম। গতকাল তাঁর অতিথি হিসাবে পিকনিক করলাম সুন্দর এক নদীর তীরে (গঙ্গাতীরে), যে-জায়গাটি মিস মুলার মঠ তৈরীর জন্য স্বামীজীকে কিনে দিচ্ছেন। জায়গাটি ঠিক উইম্বলডন কমনের কোন একটি অংশের মতই—গাছপালাগুলোকে খুব খুঁটিয়ে নজর না করলে তফাৎ ধরা পড়ে না। তেমন ভাবে দেখলে দেখা যায়, রুপোলী বার্চ, বা বাদাম বা ওক্ গাছের তলায় তুমি বসে নেই, বসে আছ পূর্ণমঞ্জরী আম্রবৃক্ষতলে কিংবা বাবলাগাছের নীচে, আশেপাশে ছড়িয়ে আছে একটি দুটি তালবৃক্ষ, মাটিতে লুটিয়ে অপরূপ পুষ্পিত লতা, জড়ানো তারের মত শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে......।

[আগেই বলা হয়েছে, আমরা ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিই বেশী পেয়েছি, আর এইসময় ম্যাকলাউড ভারতে স্বামীজীর সান্নিধ্যেই ছিলেন। সুতরাং নিবেদিতার পত্রে স্বামীজী প্রসঙ্গ অল্প পাই। তবে নিবেদিতা ডায়েরী রক্ষা করতেন, এবং সেই ডায়েরীর বিবরণ নিয়ে 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থটি রচিত। এই ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থটি সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট—খুব অল্প ক্ষেত্রেই এত ক্ষুদ্র আকারে এমন বৃহৎ ও গভীর বিষয় পরিবেশিত হয়েছে। বিবেকানন্দ যেখানে বক্তা এবং নিবেদিতা যেখানে লেখিকা, সেখানেই এ জিনিস সম্ভবপর। এই বইটি থেকে আমি ঘটনার সূত্র রক্ষা করবার জন্য সামান্য কিছু অংশ এখন উদ্ধৃত করব, বিশেষ করে সেই অংশগুলি, যেগুলি পরবর্তীকালে নিবেদিতা বারবার স্মরণ করেছেন।]

১৮৯৮, ৯ই মে :

"এরূপ একটি দিন কখনো ভুলবার নয়। গাছের তলায় বসে আমরা কথা বলছিলাম, এমন সময়ে সহসা ঝঞ্ঝা ধেয়ে এল। আমরা প্রথমে গেলাম নদীতে ঝুঁকে-পড়া পোস্তায়, তারপরে বারান্দায়। আর মুহূর্তমাত্র বিলম্বও করা যেত না। দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার অপর পার ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনে। অন্ধকারের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, ঘোর বজ্র-গর্জন, আর ক্ষণে ক্ষণে ঝলসানো বিদ্যুতের তীব্র আলোক।

প্রকৃতির এই ভয়ানক আলোড়ন যখন চলেছে বাইরে, তখন কিন্তু আমরা ছোট বারান্দাটিতে বসে অভিভূত হয়ে দেখছি গভীরতর এক নাটক। আমাদের ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চটিতে একটি মূর্তিই বর্তমান ছিলেন, তাঁর মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল সকল অভিনেতার ভূমিকা, তিনি মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমণ করছিলেন,—আর, যে নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল, তার বিষয়বস্তু—ঈশ্বরের জন্য মানবাত্মার প্রেম।......ক্রমে তার শিখা স্পর্শ করল আমাদেরও, সেই ক্ষণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার আগুন জ্বলল অন্তরে, ধাবমান নদীস্রোত যা নির্বাপিত করতে পারল না, নিঃশেষিত করতে পারল না মহা ঝঞ্ঝাও। 'বিপুল জলরাশি কি প্রেমের নির্বাপণ করতে পারে, বন্যা কি পারে তাকে প্লাবিত করতে?' প্রমিথিউসের চরণে আমরা সকলে নত হলাম, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন বিদায় নেবার আগে। 168379

২৫শে মার্চ :

শুক্রবার (২৭শে?) খ্রীষ্টানদের জ্ঞাপনোৎসবের দিনে (The Day of Annunciation— অর্থাৎ যেদিন দেবদূত এসে খ্রীষ্টমাতা মেরীকে 'তাঁর গর্ভে ভগবান্ জন্ম নেবেন', এইকথা জ্ঞাপন করেন) স্বামীজী আমাদের সকলকে মঠে (নীলাম্বরবাবুর বাগানের মঠে) নিয়ে গেলেন, সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পরে একজনকে (নিবেদিতাকে) ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষাদান করলেন। সেই প্রভাতটি জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত। পূজানুষ্ঠানের পরে আমাদের উপরতলায় নিয়ে যাওয়া হল। স্বামীজী শিব-যোগীর মত ভস্মবিভূতি, জটা, হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রসহ ভারতীয় গীত গাইলেন।[১]

---

[১] দীক্ষাদানকালে স্বামীজীর শিব-সাজের আর একটি বর্ণনা পাই স্বামীশিষ্য সংবাদের পূর্বকাণ্ডে। সময় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর দু'একদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির প্রভাত। স্থান একই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠ। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির মহাদিনে 'ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র' দেন; উদ্দেশ্য : 'ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণ পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে।...হিন্দু মাত্রেই পরস্পরের ভাই। ছোঁব না, ছোঁব না বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে।' ৪০।৫০ জন ভক্ত পৈতা নেন। কিছু পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠে হাজির হন। তার পরে—

'এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বামহস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষ বলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল। ঐ

১৮৯৮, ১১মে থেকে ২৫শে মে

আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন কথাবার্তাতে একটি বিচিত্র নূতন ব্যাপার আবির্ভূত হল, যা কষ্টকর হলেও শিক্ষাপ্রদ। একপক্ষে জাগল অদ্ভুত তিক্ততা ও অবিশ্বাস, অন্যপক্ষে বিরক্তি ও প্রতিরোধ। এখানে মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর এইকালের শিষ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন একজন ইংরাজ রমণী (অর্থাৎ স্বয়ং নিবেদিতা)। ইংরাজ হওয়ার মননগত তাৎপর্য, ভারতের স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইংরাজের পূর্বাপর ধারণার বদ্ধমূল প্রকৃতি, অপরদিকে নিজ জাতির ইতিহাস ও কীর্তির বিষয়ে উচ্চ ভাবাবেগ—এ সকলের যথার্থ রূপ সম্বন্ধে উক্ত শিষ্যাকে মন্দিরে দীক্ষাদানের পূর্বে পর্যন্ত স্বামীজীর কোনই ধারণা ছিল না। স্বামীজী দীক্ষার পরে তাঁকে উল্লাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি এখন কোন্ জাতি-ভুক্ত?' তাঁর উত্তর স্বামীজীকে চমকিত করেছিল। ইংরেজের জাতীয় প্রতীকের প্রতি তাঁর কী অপরিসীম আনুগত্য ও পূজা—ভারতীয় নারী যে আবেগে ঠাকুরপূজা করেন—সেই একই আবেগ এখানেও। স্বামীজীর বিস্ময় ও নৈরাশ্য এইকালে প্রায় অলক্ষ্য থেকে গিয়েছিল—বিস্ময়চকিত এক চাহনি—এই পর্যন্ত। তাঁর এই শিষ্যা কত অগভীরভাবে তাঁর জনগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তা বুঝেও পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে সমভূমিতে অবস্থানকালে তাঁর বিশ্বাস ও সৌজন্য কোনোমতে হ্রাস পায়নি। কিন্তু আলমোড়ায় দেখা গেল পাঠশালার শিক্ষা যেন শুরু হয়েছে, এবং, ও-ব্যাপারটা শিক্ষার্থীর কাছে সাধারণত যেমন অমনঃপূত হয়ে দাঁড়ায়, এখানেও তাই হয়েছিল, অসীম কষ্টের কারণ—তবু আধখানা নেওয়ার অন্ধতা দূর করতেই হয়; মনকে বদলাতে গেলে তার ভারকেন্দ্রে পরিবর্তনের দরকার হয়। এর এতটুকু বেশী নয়, কদাপি কোনো মত বা আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া নয়, একদেশিতা থেকে

সকল পরিয়া স্বামীজীর রূপের যে শোভা সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে। সেদিন যে যে সেই মূর্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ কালভৈরব স্বামী-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামীজীও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর চারিদিকে মূর্তিমান ভৈরবগণের ন্যায় অবস্থান করিয়া মঠভূমিতে কৈলাসাচলের শোভা বিস্তার করিলেন।'

স্বামীজী অতঃপর 'কূজন্তং রামরামেতি' স্তবপাঠ করেন; তারপর তানপুরা নিয়ে 'রাম রাম শ্রীরাম রাম'—এই ছত্রটি মাতোয়ারা হয়ে গাইতে গাইতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তারপরে সেই অবস্থাতেই 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ' গাইতে থাকেন। এই-ভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পরে তিনি নিজ অঙ্গ থেকে শিব-বেশ উন্মোচন করে স্বহস্তে সাজিয়ে দেন গিরিশচন্দ্রকে। সেই সঙ্গে বলেন, 'পরমহংসদেব বলতেন, ইনি ভৈরবের অবতার।'

স্বামীজীর ঐদিনকার ভাবাবস্থা সম্বন্ধে 'শিষ্য' লিখেছেন—'স্বামীজীর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্ধ-নিমীলিত নেত্রপ্রান্তে যেন প্রভাতসূর্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ টলিয়া পড়িতেছে। সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে, বুঝাইবার নহে, অনুভূতির বিষয়। দর্শকগণ 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।'

স্বামীজীর শিবভাব, এবং পরবর্তী সঙ্গীতাদির ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেশের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করার কারণ সঙ্গীদের সঙ্গে নিবেদিতা তাঁর প্রথম দীক্ষার দিনে স্বামীজীর আর একটি অনুরূপ অবস্থা দর্শন করেছিলেন।

মুক্তিদান ভিন্ন আর কিছু নয়। দেশ বা জাতি সম্বন্ধে সংস্কার ছেদনের শিক্ষাদান যখন স্বামীজী সমাপন করলেন, যাকে পরে ধারাবাহিকভাবে আর কখনো গ্রহণ করেন নি, সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার শেষেও তিনি কখনো শিষ্যার কাছে নূতন বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, বা নূতন মতের ঘোষণা দাবি করেন নি। সমস্ত ব্যাপারটি সেখানেই চুকিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রোত্রী মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু তিনি ভিন্ন-একটি চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছিলেন—এত সর্বাত্মকভাবে, এত প্রচণ্ডভাবে তা করেছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত না শিষ্যা নিজ শ্রমের দ্বারা এমন একটি মতে উপনীত হতে পেরেছিলেন, যার মধ্যে এই দুই আংশিক মত যুক্তিসংগত ভাবে ব্যাখ্যাত ও সমন্বিত হতে পেরেছিল—ততদিন পর্যন্ত তাঁর পক্ষে মানসিকভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হয়নি। 'তোমার যে দেশপ্রেম—সে পাপ ছাড়া আর কি!'—বহু সপ্তাহ পরে কোনো একটি ঘটনা সম্বন্ধে উক্ত শিষ্যার পক্ষপাতহীন মত পাওয়ার ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে তিনি তীব্রভাবে বলেছিলেন—'আমি তোমাকে এইটুকু শুধু দেখাবার চেষ্টা করছি যে, অধিকাংশ মানুষ কাজ করে স্বার্থের তাগিদে, আর তুমি অবিরত এই কথার বিরোধিতা করে বলতে চাইছ, কোনো কোনো জাতির সকলেই দেবতাবিশেষ। এমন মরীয়া অন্ধতা—দুর্বৃত্ততা ছাড়া আর কি।' অন্য যে প্রশ্নটিতে এই একই শিষ্যা চরম তিক্ত একগুঁয়েমি দেখিয়েছিলেন, তা সমসাময়িককালে পাশ্চাত্য-দেশে নারীর সমাদরের পক্ষে। যে-মন উদার ও নিঃস্বার্থভাবে সত্যকে বরণ করতে চায়, তার তুলনায় শিষ্যার সহানুভূতির সীমাবদ্ধতা এখন শিষ্যার কাছে খুবই তুচ্ছ ও স্থূল মনে হয়, কিন্তু ঐকালে তা গমনপথের সামনে মহা বিঘ্নকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা সেইভাবেই বজায় ছিল যে পর্যন্ত না তিনি অনুভব করেছিলেন—পরম প্রকাশ ঘটছে এক মানবদেহকে অবলম্বন করে—তার সামনে বাধাসৃষ্টির মত মহাভ্রান্তি আর কিছু হতে পারে না। যখন এই সত্যটি শিষ্যা পেলেন, তারপর থেকে যাকে গ্রহণ করা বা বোঝা সম্ভব নয়, তাদের বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকা সহজ হয়েছিল,— তাদের বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত যাতে যথাসময়ে গড়ে উঠতে পারে, সে জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভব হয়েছিল।

১৮৯৮, মে

......অন্তঃসংঘাত (স্বামীজী ও নিবেদিতার মধ্যে) তীব্রতর হয়ে উঠেছিল; আমাদের দলের বয়োজ্যেষ্ঠা একজনের (মিস ম্যাকলাউড) মনে হয়েছিল, আচার্যদেবের সেবা ও শান্তির প্রয়োজন। বিস্ময়ে, আবেগে তিনি জীবনযন্ত্রণার কথা বহুবার বলেছেন—তাঁর শান্তি ও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজনের পক্ষে আর কোন্ সাক্ষ্যের দরকার ছিল? সে বিষয়ে একটি দুটি কথা, ইঙ্গিতে—কিন্তু তাই যথেষ্ট; বহু ঘণ্টা পরে ফিরে এসে তিনি আমাদের বললেন, নির্জনবাস একান্তই তাঁর চাই, একাকী অরণ্যে প্রস্থান করবেন—শান্তি খুঁজে নেবেন।

তারপর উপরের দিকে তাকালেন। আকাশে উদিত দীপ্ত নূতন চন্দ্র। 'মুসলমানেরা নতুন চাঁদকে বরণ করে পরম আদরে। এস, আমরাও নতুন চাঁদের সঙ্গে নতুন জীবন আরম্ভ করি।' কন্যাকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। কন্যা বুঝলেন, পুরনো সম্পর্কের লয় হয়েছে; তার স্থানে নূতনতর গভীরতর জীবনের

প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তা যদিও স্বপ্নেও বোঝেন নি, তবু অনুভব করেছিলেন যে, সে এক অভিনব, অপরূপ মধুময় ক্ষণ।

এইভাবে সংঘর্ষের অবসান। স্বামীজীর সকল মত ও আদর্শের জন্য অতঃপর মুক্ত দ্বার। প্রথম দৃষ্টিতে সেগুলি যতই অসম্ভব বা অপ্রিয় বলে মনে হোক, আপাততঃ সেগুলি গ্রহণ করে, পরে অবসরমত বিচার ও বিবেচনার সিদ্ধান্ত।

২৫শে মে। তিনি চলে গেলেন। বুধবার সেদিন। শনিবার ফিরলেন। প্রতিদিন অরণ্যে দশ ঘণ্টা মৌন কাটিয়েছেন। সন্ধ্যায় তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করলে উৎসুক মানুষেরা এমন করে তাঁকে ঘিরে ধরত যে তাঁর ভাব ভঙ্গ হবার উপক্রম হত, আর তিনি পালাতেন। সত্যই—কী জ্যোতির্ময় এখন তিনি! নিজের মধ্যে সেই পুরনো সন্ন্যাসীকে আবার খুঁজে পেয়েছেন, যে খালি পায়ে হাঁটতে পারে, শীত-তাপ সইতে পারে, কাটাতে পারে একাহারে,—পাশ্চাত্ত্য যা নষ্ট করতে পারেনি। এই প্রাপ্তি, এবং নির্জনবাসের অন্য প্রাপ্তিগুলি এখনকার মত যথেষ্ট। গভীর কৃতজ্ঞতা এবং শান্তির মন নিয়ে তাঁকে ছেড়ে এলাম—তিনি তখন ছিলেন মিঃ সেভিয়ারের বাগানে, চারা গোলাপের মধ্যে, ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়।

*

অতঃপর পুনশ্চ নিবেদিতার পত্রাংশ উদ্ধৃত হচ্ছে :

৭ই অগস্ট, ১৮৯৮, মিসেস হ্যামণ্ডকে—

আমরা শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছি। কন্সাল-পত্নী (আমেরিকান কন্সাল মিঃ প্যাটারসনের স্ত্রী, স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত) কিছু আগে স্বামীর কাছে চলে যাওয়ায় আমি এখন একটা গোটা নৌকার মালিক। স্বামীজীর নৌকা কিছু দূরে। তার ঠিক পিছনে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের নৌকা, যাতে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে।......নদী দর্পণবৎ, মন্দ মন্দ বয়ে চলার সময়ে ধীরে বাতাসের স্পর্শ লাগে—স্বর্গ, একেবারে স্বর্গ! কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই সব কিছুর সমাপ্তি ঘটবে। একমাত্র সান্ত্বনা—হৃদয়ের সচেতন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে রেখেছিলুম এর প্রতিটি মুহূর্তকে।......

স্বামীজী সম্বন্ধে নানাজনের মনোভাবকে খতিয়ে দেখি। তোমার কাছে তিনি আচার্যদেব, আমার কাছে রাজা, মিসেস বুলের কাছে মেরী-কোলের শিশু যীশু। চমৎকার সব ভাব—নয় কি! বিশেষত শিশুর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যটুকু স্বতঃই মনে উদিত হয়।

এবার যা বলব তাতে চমকে যাবে। এক সপ্তাহের জন্য হিমালয়ের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম—১৮০০০ ফুট উঁচুতে! স্বামীজীর সঙ্গে হিমবাহ দেখতে গিয়েছিলাম, বাইরের লোকের এইটুকু জানলেই চলবে, বাকি অংশ নাই বা জানলে। আসলে আমরা অমরনাথের গুহায় তীর্থযাত্রা করতে গিয়েছিলাম, যেখানে স্বামীজী আমাকে শিবের কাছে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন বিশেষভাবে।

স্বামীজীর কাছে গভীর-গম্ভীর সেই ক্ষণ। তিনি একেবারে আত্মনিমজ্জিত—যদিও গুহামধ্যে মাত্র দু-মিনিট ছিলেন, তারপরেই নির্গত হয়ে আসেন পাছে ভাবাবেগে আত্মহারা হয়ে যান। দারুণ শ্রান্তও হয়ে পড়েছিলেন; দীর্ঘ মারাত্মক পথ ভেঙে তাঁকে উঠতে হয়েছিল, হৃদ্‌যন্ত্রও দুর্বল ছিল। কিন্তু তারপর থেকে সে কী বিশ্বাস আর সাহস আর আনন্দ তাঁর! তিনি বললেন, শিব তাঁকে অমর-বর দিয়েছেন, এরপর স্বেচ্ছায় ভিন্ন মৃত্যু নেই তাঁর। তাঁর সঙ্গে যে যেতে পেরেছি, এতে আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই আমার। এ আমার নিত্য স্মৃতি হয়ে রইল, নিশ্চয়ই, এবং তিনি সত্যই শিবের কাছে আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন, ...তাঁর মুখে সেকথা শোনার পর থেকে আমি দারুণ দ্রুতবেগে হিন্দু হয়ে উঠছি ভাবাদর্শে।

তাঁর দিব্যানুভূতিতে গভীরভাবে, তীব্রভাবে আমি আনন্দিত, কিন্তু আমার দারুণ যাতনার কথাও ভাবো, প্রিয় নেল আমার,—যাঁকে আমি পূজা করি, তিনি আমার সামনে অন্তরলোকে পূর্ণ হয়ে বিদ্যমান, অথচ আমি বাইরের রূপদর্শনের অতিরিক্ত কিছু পেলাম না। স্বামীজী সে অনুভূতিকে আমার কাছে জীবন্ত করতে পারতেন—কিন্তু তিনি রইলেন আত্মমগ্ন!

এখনো পর্যন্ত সেই সময়টির দিকে ফিরে চাইলে আমার হৃদয় দারুণ ক্ষোভে ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যায়। সে আমারই দোষ জানি, রাজাও আমাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করেছেন, এবং বিচিত্রভাবে আমি তাঁর মনের নিকটতর হয়েছি, এই তীর্থযাত্রার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞও, তবু—প্রায় মুঠোয় পেয়ে হারানোর তিক্ত দুঃখের শেষ কোথায়—যে-সৌভাগ্য হয়ত জীবনে আর আসবে না। আমার মন ক্ষোভে-রোষে আচ্ছন্ন ছিল—তিনি কথা কইতে চাইলেও আমি শুনতে চাইনি।

প্রিয় নেল, আমার কেমন যেন মনে হয়, তোমার সাহসী প্রাণে সান্ত্বনার আশ্রয় আছে, তাই তোমায় বলছি,—যদি তাঁর কাছে আমি বেসুরো হয়ে না বাজতাম! যদি আমি গোটা ব্যাপারটির অংশ হয়ে উঠতে পারতাম—একটু ধৈর্য ও সহানুভূতির দ্বারা। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। একমাত্র সান্ত্বনা—ক্ষতি যা, তা আমার, কিন্তু কী না ক্ষতি!

তুমি জানো কি, আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি যদি 'গুরু' কথাটিকে বাস্তব করে তুলতে না চান, তাহলে আমরা পরস্পর সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কি! এই বলে তাঁকে তিরস্কার করে নিজেকে কঠোরভাবে গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

তিনি কিন্তু মধুরতম মনোভাবে ছিলেন—এতটুকু রাগ নয়—আমার সুখ-সুবিধার দিকে শুধু লক্ষ্য। মনে হয় তিনি ভেবেছিলেন, আমি ক্লান্ত। নিজের বিষয়ে অধিক কিছু বলতে তিনি পারছিলেন না। পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে এলে তিনি বললেন, "মার্গট, ও বস্তু তোমাকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই—আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নই।" অপরূপ! অসচেতন দীনতার চরম!

কিন্তু তুমি জানো, এই অনিবার্য দুঃখভোগের অন্যতম কারণ আছে জাতিগত সংস্কারের মধ্যে। আমার আইরিশ স্বভাব সবকিছু প্রকাশ করে—হিন্দু সে রকম প্রকাশের কল্পনাও করে না। আর স্বামীজী গুরুগিরি সম্বন্ধে কিভাবে না সংকুচিত,

অপরপক্ষে আমি তাকেই সর্বদা চাইছি, ইত্যাদি। এ-ই যথেষ্ট স্বার্থপরতা। যাই হোক, মনে রেখো, আমি বাইরের অজস্র লোককে বলব, আমি অমরনাথে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে যে-কথা বললাম, তা বলব না কাউকে, এবং তুমিও, আমি দৃশ্যাদর্শনে গিয়েছিলাম, এর অতিরিক্ত এই তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে আসল কথা কারো কাছে ভাঙবে না।

*

[নিবেদিতা তাঁর জীবনের এই মহাসৌভাগ্যের কথা কখনো বিস্মৃত হন নি যে, এক বিরাট পুরুষকে তিনি চরম অনুভূতির অব্যবহিত পরেই দর্শন করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে কথাবার্তায় ও নানা রচনায় এই সৌভাগ্যের বার্তা তিনি নিবেদন করেছেন। 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থের গোটা দশম পরিচ্ছেদটি এই অমরনাথ যাত্রা ও স্বামীজীর শিব দর্শনের কথা নিয়ে রচিত। 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদটিরও নাম 'অমরনাথ'। নিবেদিতার অধ্যাত্মজীবনে এই তীর্থযাত্রার গুরুত্বের কথা মনে রেখে আমরা তাঁর লিখিত যাত্রাবিবরণ কিয়দংশে উধৃত করছি। এখানে জানিয়ে দেওয়া যায়, অমরনাথের মূল পথে যাত্রা আরম্ভ হয় ১৮৯৮-এর ২৯শে জুলাই, এবং শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন ঘটে ৮ই অগস্ট।—]

"আচ্ছাবলে আমরা জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখতে পেলাম।...প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ্নভোজন করলাম।...আহারে উপবিষ্ট হলে স্বামীজী তাঁর কন্যাকে তাঁর সঙ্গে অমরনাথের গুহায় তীর্থযাত্রার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে কন্যা শিবের কাছে উৎসর্গীকৃতা হবেন।......

২৯শে জুলাই। এর পর থেকে আমরা স্বামীজীর দর্শন অল্পই পেয়েছি। তীর্থযাত্রার ব্যাপারে প্রভূত উৎসাহ তাঁর। অধিকাংশ দিনই একাহারে। সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গে রুচি নেই। মাঝে মাঝে তাঁবুর জায়গায় আসতেন, হাতে জপমালা। আজ রাত্রে আমাদের দলের দুজন বাওয়ানে ঘুরতে গেলেন; একটি পবিত্র কুণ্ডকে কেন্দ্র করে জায়গাটি গ্রাম্য মেলার চেহারা নিয়ে গড়ে উঠেছে—ধর্মভাবে ভরপুর। এর পরে ধীরা মাতার সঙ্গে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে হিন্দী ভাষায় সাধুরা স্বামীজীকে ক্রমাগত যে-সব প্রশ্ন করছিলেন, সেই কথাবার্তা শুনতে সুযোগ পেলাম।

বৃহস্পতিবারে পহলগামে পৌঁছলাম। উপত্যকার নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনী পড়ল। আমাদের আদৌ ঢুকতে দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে স্বামীজীকে দারুণ আপত্তির সম্মুখীন হতে হল। নাগারা স্বামীজীকে সমর্থন করলেন। তাঁদের একজন বললেন, 'স্বামীজী আপনার শক্তিতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে তার প্রকাশ করা উচিত নয়।' এই কথায় স্বামীজী চুপ করে গেলেন। সেই বিকেলে তিনি তাঁর কন্যাকে নিয়ে সাধুদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরলেন, যাতে সে আশীর্বাদ পায় সকলের। ভিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে এ জিনিস ঘটে।......পরদিন আমাদের তাঁবু ছাউনীর পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।......

(সাধুদের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ-আলোচনার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা

পাই The Master গ্রন্থে।—"যাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু ছিলেন। তাঁহাদের তাঁবুগুলি গেরুয়া রঙের। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার বড় ছাতার চেয়ে আকারে বড় নয়। সাধুদের উপরে স্বামীজীর প্রভাব যেন বৈদ্যুতিক। অপেক্ষাকৃত বিদ্বান সাধুরা তাঁহার প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতেন; তাঁহার তাঁবু ভরিয়া যাইত, এবং যতক্ষণ দিবালোক থাকিত তাঁহারা কথাবার্তায় মগ্ন থাকিতেন। স্বামীজী পরে আমাদের বলিয়াছিলেন যে, 'শিব'ই তাঁহাদের আলাপের বিষয়। স্বামীজী মাঝে মাঝে জোর করিয়া বাহ্যজগতের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাঁহারা গম্ভীরভাবে ভর্ৎসনা করিতেন। বিদেশীরাও মানুষ,—তাঁহারা জোর করিয়া বলিতেন—স্বদেশ ও বিদেশে পার্থক্য করা কেন! অপরপক্ষে তাঁহাদের অনেকে আবার মুসলমান ধর্মের প্রতি স্বামীজীর প্রেম ও সহানুভূতির অর্থ বুঝিতে পারিতেন না। যে পরাজাগতিক চিন্তার জন্য তাঁহাদের কাছে স্বদেশ ও বিদেশে পার্থক্য নাই, তাহাই আবার এই সরলপ্রাণ মানুষগুলির কাছে জাগতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের একত্বের ধারণায় বাধা দিয়াছিল, কেননা প্রত্যক্ষত হিন্দু ও মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহাদের যুক্তি, পঞ্জাবের মৃত্তিকা নিজ ধর্ম-বিশ্বাসীর রক্তে সিক্ত। এখানে অন্তত স্বামীজী যেন আচারগত সংকীর্ণতা পালন করেন। ইহার উত্তরে স্বামীজী সেই সময়ের জন্য এমন কতকগুলি আচরণে বিরত রহিলেন, যাহাতে ভ্রাতৃস্থানীয় সাধুগণের প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল, যাহা অপরপক্ষে এই 'বর্তমানে প্রক্ষিপ্ত ভবিষ্যৎরূপী মনুষ্যটির' মতগুলিকে অধিকতর দৃঢ় ও গভীরভাবে তাঁহাদের মনে অংকিত করিয়া দিবার সহায়ক হইয়াছিল। এইসকল উত্তপ্ত বাদপ্রতিবাদের কালে আমাদের বিদেশী বুদ্ধি একটি বিচিত্র অসংলগ্নতা দেখিয়া আমোদবোধ না করিয়া পারে নাই, তাহা হইল—এই যাত্রার তহশীলদার স্বয়ং এবং আরও বহু কর্মচারী ও ভৃত্য ধর্মে মুসলমান, গুহায় উপস্থিত হইলে তাহার ভিতরে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ইঁহাদের প্রবেশে কোনো আপত্তির কথা স্বপ্নেও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তহশীলদার পরে বন্ধুসহ স্বামীজীর কাছে যথাবিধি শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আসিয়াছিলেন—এই ব্যাপারটিও, বিস্ময়ের কথা, কাহারও নিকট বিসদৃশ বা বিস্ময়কর মনে হয় নাই।")

৩০শে জুলাই। ভোর ৬টায় প্রাতরাশ করে আমরা বাহির হলাম। কখন ছাউনী স্থানান্তরিত হতে শুরু হয়েছিল, তা অনুমান করা শক্ত, কারণ অতি প্রত্যূষে আমাদের জলযোগ কালেই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী বা তাঁবু অবশিষ্ট ছিল। গতকাল যেখানে সহস্র সহস্র মানুষ ও তাদের তাঁবুর আবাস, সেখানে অগ্নিহীন বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত ভস্মরাশি ছাড়া আর কিছু নেই।

পরবর্তী বিশ্রামস্থল চন্দনবাড়ির যাত্রাপথটি কি সুন্দর! সেখানে এক গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় আমাদের তাঁবু পড়ল। সারা বিকেল বৃষ্টি হয়েছে। পাঁচ মিনিটের এক কথাবার্তা ভিন্ন স্বামীজীর দর্শন পাইনি। কিন্তু অন্য যাত্রী ও ভৃত্যদের কাছ থেকে অশেষ সদয় ব্যবহার পেলাম—মর্মস্পর্শী তা।......

পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির অপেক্ষা কঠিনতর। পথ যেন শেষ হয় না। চন্দনবাড়ির কাছে প্রথম তুষারবর্ত্মে—যাতে আমি খালি পায়ে হেঁটে যাই.

তার জন্য স্বামীজী জোর দিয়েছিলেন। জ্ঞাতব্য প্রতিটি জিনিসের খুঁটিনাটি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তারপরে পাহাড়ে পাহাড়ে পাক খাওয়া সংকীর্ণ পথে দীর্ঘ যাত্রা, তারপরে আবার দারুণ খাড়া চড়াই। প্রথম পর্বতটির শীর্ষের ভূমি 'এডেলউইস' ঘাসের গালিচায় মোড়া যেন। তার পরের রাস্তা স্তব্ধ-বারি শেষনাগের পাঁচশো ফুট উঁচু দিয়ে চলেছে। অবশেষে আমাদের তাঁবু পড়ল আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে, তুষারশৃঙ্গঘেরা শীতল আর্দ্র এক স্থানে। বহু নিম্নে ফারগাছগুলি। সারা বিকেল ও সন্ধ্যা ধরে কুলিদের জুনিপার গাছ সংগ্রহে নানা দিকে যেতে হল। তহশীলদার, স্বামীজী ও আমার তাঁবু কাছাকাছি; সন্ধ্যায় বড় করে আগুন জ্বালানো হল তাদের সামনে। ভালো জ্বলল না। হিমবাহ রয়েছে আমাদের অনেক নীচে। তাঁবু পড়ার পরে আর স্বামীজীর দর্শন পাইনি।

পাঁচটি তটিনীর সম্মিলন স্থল "পঞ্চতরণী" এত দূরের পথ ছিল না। তদুপরি সেই জায়গাটি শেষনাগের থেকে নীচে, শীত শুষ্কতর এবং আবহাওয়া সতেজকর। ছাউনির সামনে নুড়িতে ভর্তি জলহীন নদীতট, তারই মধ্য দিয়ে পাঁচ তটিনী প্রবাহিত। প্রতিটি ধারায় তীর্থযাত্রীদের স্নান করার বিধি; এক ধারায় স্নান শেষ করে আর্দ্র বস্ত্রে বাকি ধারাগুলিতে ক্রমান্বয়ে স্নান করার কথা। সম্পূর্ণ-ভাবে অন্যের নজর এড়িয়ে স্বামীজী অক্ষরে অক্ষরে এই বিধি পালন করলেন।......

এইসব উচ্চ অবস্থানে আমরা প্রায়ই বিরাট তুষার শৃঙ্গের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত দেখতাম। এইসব নীরব বিরাটেরাই হিন্দুর মনে ভস্মভূষণ মহাদেবের কল্পনা জাগিয়েছে।

মঙ্গলবার, ২রা অগস্ট। অমরনাথের মহাদিন। প্রথম যাত্রীদল নিশ্চয় রাত দুটোয় ছাউনী ছেড়ে এগিয়েছে। পূর্ণিমালোকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। সংকীর্ণ উপত্যকাপথে যখন নামছি—তখন সূর্য উঠল। যাত্রাপথের এই অংশটি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু আসল বিপদ আরম্ভ হল ডাণ্ডী ছেড়ে দিয়ে উঠতে শুরু করবার পর থেকে। একেবারে সোজা খাড়া পাহাড়ের গায়ে পশুদের চলার মতো একটি পথ উপরে উঠে অপর পারে নেমে গেছে অতি ক্ষুদ্র সিঁড়ির আকারে শষ্পাচ্ছাদিত ভূমিতে। পথের ধারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুষ্পরাজি—কমনীয় 'কলম্বাইন,' মাইকেলমাস ডেইজী, এবং বন্যগোলাপ— সেগুলির লোভে হাত বাড়াতে গেলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা। তারপর আরও ঢাল বেয়ে অবশেষে যখন তলায় নামা গেল, তখন আরম্ভ হল হিমবাহের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল অতি যন্ত্রণাদায়ক যাত্রা গুহার দিকে। গন্তব্যের মাইলখানেক আগে বরফ শেষ হল, সেখানে তুষারগলিত জলধারায় তীর্থযাত্রীদের স্নান করতে হবে। পৌঁছে গিয়েছি মনে হবার পরেও পাথরের উপর দিয়ে যথেষ্ট খাড়াই হাঁটা বাকি ছিল।

স্বামীজীর সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। তিনি পেছিয়ে পড়েছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, একথা খেয়াল না থাকায় আমি উপল-তটের পিছনে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে তিনি এলেন। দু'এক কথায় আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি স্নান করতে গেলেন। আধঘণ্টা পরে তিনি গুহায় প্রবেশ করলেন। উদ্ভাসিত মুখে অর্ধবৃত্তাকার স্থানটির একপ্রান্তে প্রথমে, পরে অন্যপ্রান্তে তিনি নতজানু হলেন। স্থানটি বিশাল—এমন যে ভিতরে বৃহৎ

গির্জা ধরে যেতে পারে। তার মধ্যে বিশাল তুষার-শিব এক গহ্বরের সঘন ছায়ায় অবস্থিত—যেন নিজ সিংহাসনে আসীন তিনি। কয়েক মিনিট......তারপরেই গুহাত্যাগ করবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত তাঁর কাছে। মহাশিবের পাদস্পর্শ তিনি করেছেন। অসীম চেষ্টায় তাঁকে আত্মসংবরণ করতে হয়েছিল—পাছে ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়েন—তিনি পরে বলেছিলেন। শরীরের শ্রান্তি এমন অবস্থায় গিয়েছিল যে, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যেতে পারত, একজন ডাক্তার পরে বলেন,—তা না হয়ে তা চিরদিনের জন্য আকারে বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর গুরুর কথাগুলি প্রায় ফলে যাচ্ছিল : 'ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, আর দেহ রাখবে না।'

'কী না আনন্দ পেয়েছি'—আধঘণ্টা পরে, নদীধারার উপরে একটি পাথরে বসে সহৃদয় নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে জলযোগ করতে করতে তিনি বললেন। সেখানে আমিও ছিলাম। 'শিবলিঙ্গকে মনে হল স্বয়ং শিব। আর ওখানে কোন জোচ্চোর ব্রাহ্মণ নেই, ব্যবসা নেই, খারাপ কিছু নেই। সবটাই পুজো—পুজো! কোনো ধর্মস্থানে আমার এত আনন্দ কখনো হয়নি।'

পরে তিনি প্রায়ই বিহ্বলকর দর্শনের কথা বলতেন, যা তাঁকে ঘূর্ণাবর্তের ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে মনে হয়েছিল। শুভ্র তুষারস্তম্ভের মহাকবিত্বদ্যোতক রূপের কথাও বলতেন। তিনিই প্রথম অনুমান করেছিলেন যে, একদল মেষপালকের দ্বারাই স্থানটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কোনো এক গ্রীষ্ম দিবসে যারা মেষযূথের সন্ধানে বহুদূরে অগ্রসর হয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে অদ্রব তুষারের সামনে দাঁড়িয়েছিল—একেবারে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সামনে! তিনি সর্বদা আরও বলতেন, অমরনাথ কৃপা করে তাঁকে বর দিয়েছেন—স্বেচ্ছায় না হলে তাঁর মৃত্যু নেই। আর আমাকে বিশেষভাবে বলেছিলেন, 'তুমি এখন বুঝতে পারছ না; কিন্তু তীর্থদর্শন তোমার হয়ে গেল, এর ফল ফলতে থাকবে। পরে আরও ভাল করে এর তাৎপর্য বুঝবে। ফল হবেই।'[২]

*

---

[২] এই অংশে নিবেদিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বামীজী যে-কথা বলেছেন, এর পূর্ণ তাৎপর্য 'Wanderings' বা 'The Master' গ্রন্থ থেকে বোঝা সম্ভব নয়। আমরা পূর্বে যে পত্র উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যেই এই উক্তির পটভূমিকা আছে। নিবেদিতা স্বামীজীর দিব্য দর্শনে আনন্দিত হয়েও নিজের পাশ্চাত্ত্য যোদ্ধৃস্বভাবে গুরুর কাছে ঐ অনুভূতির অংশ দাবি করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। স্বামীজীর পক্ষে তাঁর দাবি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত নিবেদিতার 'প্রাক্তন' ঐ অনুভূতির যোগ্যতা তখনি তাঁকে দেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে এই তীর্থযাত্রার ফল ফলবে, স্বামীজীর এই উক্তি সার্থক হয়েছিল। স্বামীজী নিবেদিতাকে শিবের কাছে উৎসর্গ করবার জন্য অমরনাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা নিবেদিতার পরবর্তী জীবনকে শিবময় দেখব। শুধু তাই নয়, হিমালয়ে শিবের পদে উৎসর্গীকৃতা নিবেদিতা দেহত্যাগও করেছিলেন হিমালয়ে, তুষারশৃঙ্গের দিকে দৃষ্টি মেলে। এটি হয়ত কাকতালীয়, কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষের জীবনে নিয়মিত কাকতালীয় ঘটে, এমন দেখা যায়।

পুনশ্চ পত্র উদ্ধৃত হচ্ছে—

২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, নেল হ্যামণ্ডকে—

(শ্রীনগর থেকে)......আসলে আমি স্বামীজী সম্বন্ধে আরও কথা বলবার জন্য বসেছি, কিন্তু কিভাবে আরম্ভ করব বুঝতে পারছি না। গতকাল তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন; আমরা হয়ত লাহোরে তাঁর সাক্ষাৎ পাব; কিংবা কলকাতায় ফিরে যাবার আগে দেখা নাও পেতে পারি।

পক্ষকাল আগে তিনি একাকী চলে গিয়েছিলেন; প্রায় আট দিন আগে ফিরে এলেন। পরিবর্তিত, উদ্দীপিত, দিব্য রূপে।

সে যে কী তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না—বাক্যের অতীত মহান সে বস্তু। আমার লেখনী যেন মর্মরিত স্বরে কথা বলতে শেখে।

শিশুর মত তাঁর কথা—জগজ্জননীর বিষয়ে; কিন্তু তাঁর সত্তা ও স্বর—সে একেবারে ঈশ্বরের। অন্তর্ধৃত পবিত্র গাম্ভীর্য ও আনন্দ-শিহরণ একই সঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাঁর উপস্থিতি থেকে—এমনই তার সুমহিম রূপ যে ঘরের দূর প্রান্তে সরে গেলাম নীরবে পূজা করবার জন্য—সর্বক্ষণ। "তারকার জন্ম আমরা দেখেছি, আমরা জেনেছি গূঢ় অর্থের একটি প্রকাশ।" সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখছেন—এ তেমনই এক সান্নিধ্য, যাঁর নয়ন পূর্ণ হয়ে আছে ঈশ্বরের রূপে। তাঁর কাছে এই মুহূর্তে 'লোককল্যাণকর্মের' চিন্তা অসহ্য। "শুধু মা-ই" সক্রিয়া। "দেশপ্রেম ভুল. সব ভুল"—ফিরে এসে তিনি বললেন। "সব কিছু মা।......সব মানুষই ভালো। শুধু আমরাই সকলের নিকটে যেতে পারি না।......আমি আর শিক্ষা দেব না কখনো। আমি কে, যে শিক্ষা দেব?"

এই মুহূর্তে নীরবতা, তপস্যা, আর প্রত্যাহারই তাঁর কাছে জীবনের মূল বস্তু, এবং সে প্রত্যাহার এমনই পবিত্র যে, তাকে স্পর্শ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। মনে হয় তাঁকে দেখে—"জগন্মাতার" সঙ্গে সজ্ঞানে অবস্থিত নয় এমন একটি মুহূর্তেরও মূল্য নেই।......

এই অপূর্ব গ্রীষ্মকালের দিকে ফিরে তাকাই যখন, তখন সবিস্ময়ে ভাবি,—ভাবের এমন সমুচ্চ স্তরে অবস্থানের দুর্লভ সৌভাগ্য পেলাম কি করে! এই মাসগুলিতে মহান ধর্মীয় ভাবসমূহের আলোকধারায় নিষ্নাত ও সঞ্জীবিত হয়েছি; আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ মানুষের চেয়ে ঈশ্বরই অধিক বাস্তব হয়েছেন। আর গতকাল সকালের শেষ কয়েক ঘণ্টা তো আমরা রুদ্ধশ্বাসে ঘনীভূত স্তব্ধ হয়ে ছিলাম. নড়তেও সাহস করিনি,—যখন তিনি মায়ের কাছে গান গাইছিলেন, আর আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এখন তিনি **শুধু ভালবাসা।** অধৈর্যের বাষ্প পর্যন্ত নেই—অন্যায়কারী অত্যাচারী সম্বন্ধেও নয়,—এখন শুধু শান্তি আর ত্যাগ আর ভাবাবেশ। "স্বামীজী আর নেই, চিরতরে বিদায় নিয়েছেন"—তাঁর শেষ কথা যা আমি শুনেছি।...

(১৩·১০·৯৮) 'মৃত্যুরূপা কালী' কবিতাটি লেখার পর থেকে স্বামীজীর অন্তর্মুখিনতা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে একদিন তিনি সকলের অজান্তে নিঃশব্দে চলে যান ক্ষীরভবানীর তীর্থকুণ্ডে। সেখানে আটদিন ছিলেন, যার বিষয়ে কিছু লেখা শক্ত কারণ তা এতই ঐশ্বরিক। সেখানে নিশ্চয় তিনি দারুণ দৈহিক ও

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এক অপরাহ্ণে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখ জ্যোতির্ময়। 'মা' ছাড়া মুখে আর কথা নেই। বললেন, অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তারপর থেকে তাঁর সাক্ষাৎ প্রায় মেলেই নি। তিনি একাকী রইলেন। 'মায়ের কোলে শিশুর মত আছি'—নিজেই বলেছেন। কী করে আমি তোমাকে অনির্বচনীয় জিনিস বর্ণনা করব! কিন্তু তুমি উপস্থিত থাকলে যা দেখতে সেইকথাই তোমাকে জানাতে চাই। আমি জানি, এগুলিকে তুমি কেবল সংবাদ বলেই নেবে না, গভীর পবিত্র বলে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করবে।

আমার নিজের মনে হচ্ছে (আমার কাছে সেইটাই বড় কথা) স্বামীজীর মধ্যে তপস্যার বেগ এত প্রবল যে, তিনি হয়ত আর কখনই পাশ্চাত্ত্যে যাবেন না, বা শিক্ষা দেবেন না। যদি তিনি মৌনের ব্রত নেন, বা চিরতরে তপস্যায় প্রস্থান করেন —তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। কিন্তু অপরপক্ষে একথাও সত্য হতে পারে, তাঁর ক্ষেত্রে এই ভাব শক্তির উৎস নয়, বরং আত্মতৃপ্তির হেতু।* সুতরাং আমি অনুমান করি, এই ভাবের উপরেও তিনি নিজেকে উত্তোলন করে বিশ্বের কাছে জ্ঞান ও ত্রাণের বিশাল উৎস হয়ে দাঁড়াবেন। জীবন থেকে সুখের ও সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা চলে গেছে, বেহিসেবীপনা বা অবিবেচনা অদৃশ্য,—তার জায়গায় এসেছে ব্রহ্মাণ্ডের মতই বিরাট আত্মার প্রকাশ, বিক্ষত যাতনার্ত, কিন্তু প্রেমে পরিপূর্ণ। যখন তিনি কথা বলেন, প্রশ্নের উত্তর দেন, এই ভাবই ফুটে ওঠে। তার কিছু কিছু মুখ ফুটে বলতে গেলেও যেন বাক্যের অতীত সেই মহিমা নষ্ট হয়। অদ্ভুত কথা হল, তাঁর সামনে এখন যে-ধরনের কথা অযোগ্য মনে হয় না তা হচ্ছে —কোনো রসিকতা বা মজার গল্প, যা আমাদের সকলকে হাসিয়ে দেয়। বাকি সময়ে, প্রতি মুহূর্তের ঐশী স্বরূপ আমাদের নিশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করে দেয়।

আরও কিছু বলতে হবে? তাঁর শেষ কথা যা শুনেছি—"স্বামীজী আর নেই"; পুনশ্চ—"যন্ত্রণার মধ্যেও পরম আনন্দ আছে।" কারো বিরুদ্ধে রূঢ় বক্তব্য নেই। এমনই ভাববিশালতার মধ্যে খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

পুনশ্চ তিনি বললেন, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি 'কালী দি মাদার' কবিতার প্রতিটি শব্দের অনুধ্যান তাঁকে করতে হবে। গতকাল তাঁর কথামত কবিতাটির প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে পড়তে হল তাঁর কাছে।

তিনি কথা বলে চলেছিলেন——"মা"র বিষয়ে কথা, তাই তার শব্দগুলি গরীয়ান্। চলে যাবার আগে মা'র সান্নিধ্যের স্পর্শ অনুভব করিয়ে দিয়ে তবে গেলেন। গতকাল না বলে পারিনি রুদ্ধশ্বাসে—"ঈশ্বর!"—তাঁর সম্বন্ধে।

একই ছন্দের অন্তর্ভুক্ত আমরা—তুমি এবং আমি—আমাদের ধারণার চেয়ে বৃহৎ এই ছন্দ। ঈশ্বর যেন এর যোগ্য করে তোলেন আমাদের। "মা উড়োচ্ছেন ঘুড়ি"— তিনি গেয়েছিলেন—

---

* এখানে পাঠকের স্বতঃই মনে পড়বে নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারের কথা : নরেন্দ্র যখন বলেছিলেন, সমাধিতে ডুবে থাকাই তাঁর চরম আকাঙ্ক্ষা তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, আমি ভেবেছিলুম তুই বটবৃক্ষের মত সকলের আশ্রয় হবি, তার বদলে আত্মমুক্তির জন্য ব্যস্ত হচ্ছিস!

শ্যামা মা উড়োচ্ছে ঘুড়ি
ভবসংসার বাজার মাঝে...
ঘুড়ি লক্ষের দু একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।

"ধুলোখেলা করছি মায়ের ছেলেরা, ধুলো উড়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে চোখ।"

রবিবার, আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'দার্শনিক রূপক বা নৈসর্গিক রূপকের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিমার ব্যাখ্যা করা যায় না। ভক্তির দর্শনলব্ধ প্রতিমার আকার। তারা যথার্থ।'

[*কাশ্মীরে স্বামীজী অনুভূতির মহারাজ্যের অধীশ্বর। অমরনাথের শিবদর্শনের* পরে ক্ষীরভবানীর মাতৃদর্শন। নিত্য ও লীলায় মুক্ত ও আবদ্ধ বিবেকানন্দের জীবন। অদ্বৈতপন্থী বিবেকানন্দ সৃষ্টিরূপের মধ্যে যেখানে আসীন সেখানে শৈব ও শাক্ত। অমরনাথের শুভ্র প্রলয় এবং ক্ষীরভবানীর কৃষ্ণ প্রলয়—উভয়ের স্বরূপই তিনি দর্শন করলেন। নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজী "তুষার স্তম্ভের" সুমহান কবিত্বের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে কোনো কবিতা রচনা করেন নি। সেই কবিতা রচনা করেছিলেন কৃষ্ণভয়ংকরীর সম্বন্ধে। সেই 'Kali the Mother' নামক কবিতা একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব, কারণ এ শুধু কাব্যকৃতি নয়, এ হল মানবভাষায় অনাহত ধ্বনির জাগরণ। প্রলয়ের এই মহাধ্বনি আর একবারমাত্র শোনা গেছে—ঈশ্বর-সখার কণ্ঠে, কিন্তু সেখানেও ভয়াতুর কণ্ঠের আর্তনাদ। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন বলেছিলেন :

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য,—মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥...
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥...
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি, দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু, সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ, সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা, বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা, বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা, স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা, ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং, ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ'—'আমি কাল। লোকক্ষয় করাই আমার স্বভাব। আমি পুরাতন। এই লোকসকলকে সংহার করিবার জন্যই আমি উদ্যত।' অর্জুন স্তুতি করে তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখতে চেয়েছিলেন। মহাকালী যখন তাঁর প্রলয়মূর্তি দেখালেন, তখন

তাঁর বিবেকানন্দ নামক সন্তান প্রসন্নমুখের কামনা করেননি— উল্লসিত হয়েছিলেন ভয়ঙ্করের সমীপবর্তী হয়ে। অধ্যাত্ম সাহিত্যে নূতন যোজনা বিবেকানন্দ এখানে করলেন।

কবিতাটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ :

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়!
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে—মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল নাম তোর, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

এই কবিতাটির পটভূমিকা বিষয়ে নিবেদিতা The Master গ্রন্থে লিখেছেন :

“কাশ্মীর যাত্রার উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায়* “ভয়ঙ্করের উপাসনাই” এখন একমাত্র কথা হয়ে দাঁড়াল। রোগ বা যন্ত্রণা একটি কথাই মনে পড়িয়ে দিত, “তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রী। তিনি স্বয়ং যন্ত্রণা এবং তিনিই যন্ত্রণাদাত্রী। কালী! কালী! কালী!”

একদিন বললেন, মাথায় চিন্তাগুলো পাক খাচ্ছে, সেগুলো লিখে না ফেলা পর্যন্ত শান্তি নেই। সেই সন্ধ্যাতেই যখন আমরা কোনো স্থান ভ্রমণ শেষ করে বজরায় ফিরলাম, শুনলাম তিনি এসেছিলেন, আমাদের জন্য রেখে গেছেন স্বহস্তে লেখা “কালী দি মাদার” কবিতাটি। প্রেরণার অগ্নিদাহে জ্বলতে জ্বলতে কবিতাটি লিখেছিলেন—শেষ করার পরে তীব্র আবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়েন,—একথা পরে শুনেছিলাম।”

এই ঘটনার পরে স্বামীজী ৩০শে সেপ্টেম্বর ক্ষীরভবানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, ফিরে আসেন ৬ই অক্টোবর।

* কাশ্মীরে একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য তাঁকে কাশ্মীরের মহারাজা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে জমি দেবার প্রস্তাব বৃটিশ রেসিডেন্ট নাকচ করে দেন। এই বিষয়টি পরে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

ক্ষীরভবানী থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, সেই সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবাবেশের কথা উদ্ধৃত পত্রে আমরা পেয়েছি, The Master এর 'ক্ষীরভবানী' অধ্যায়েও রয়েছে।

পত্রে নেই, এমন দু'একটি সংবাদ The Master-এর ঐ অধ্যায়টিতে আছে। যেমন স্বামীজী প্রত্যাবর্তন করেই "গাঁদা ফুলের মালা ছড়াটি নীরবে আমাদের মস্তকে একে একে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমাদের একজনের হাতে মালাটি অর্পণ করার পরে অবশেষে বললেন, 'এটি মাকে নিবেদন করেছিলাম।' তারপর বললেন। 'আর হরি ওঁ নয়, এখন শুধু মা, মা,।' হাসিতে ভরে গেল মুখ। আমরা একেবারে নীরব। চিন্তাকে পর্যন্ত স্তব্ধ করে দেয় এমন কিছুতে স্থানটি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—কথা বলতে চাইলেও পারতাম না। পুনরায় বললেন, "আমার সব দেশপ্রেম গেছে। সব গেছে। এখন শুধু মা, মা।"

একটু থেমে—"আমি ভুল করেছিলাম। মা বললেন, 'যদি অবিশ্বাসীরা আমার মন্দিরে ঢুকে আমার মূর্তি নষ্ট করে, তাতে তোর কি! তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি!' তাই দেশপ্রেম আর নয়। আমি এখন শিশুসন্তান।"...

তারপর স্বামীজী মস্তক মুণ্ডন করে চিরকালীন সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে যখন অবতীর্ণ হলেন তখন নিবেদিতার কল্পনার চোখে ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর তপস্যার রূপ জেগে উঠল : 'কল্পনানেত্রে দেখলাম—উপবাস, পূজা, কুণ্ডে পায়স ও বাদাম ভোগদান, এবং জনৈক পণ্ডিতের শিশুকন্যাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুমারী উমারূপে পূজা।' স্বামীজী বলেছিলেন, "আর কোনো কামনা নেই—শুধু ফিরে চাই সেই গঙ্গাতীরের মৌনী, নগ্ন পরিব্রাজকের জীবন। আর কিছু নয়, কিছু নয়। 'স্বামীজী' মরে গেছেন—চিরতরে চলে গেছেন। জগৎকে শিক্ষা দেবার দায় বইব আমি—আমি কে? সবই আস্ফালন, অহংকার। আমাকে মায়ের প্রয়োজন নেই—তাঁকে প্রয়োজন আছে আমার!—এ বোধ যখন জাগে, তখন কাজ মায়া ছাড়া আর কিছু নয়।"

স্বামীজী বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের ক্ষমার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন—"প্রেমই একমাত্র উপায়। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তাহলে তাকে ভালবাসো, ভালবেসে যাও যে পর্যন্ত না তার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।"

নিবেদিতা লিখেছেন, "যখন স্বামীজী এই সব কথা বলছিলেন, তখন যে বিশালপ্রাণতা বাঙ্ময় হয়েছিল তাঁর কথার মধ্যে—সে প্রাণকে প্রকাশ করব ভাষায়, সাধ্য কি আমার!"

দলের মধ্যে একজনের (নিবেদিতার) ইচ্ছা হয়েছিল 'পল্লব সমেত নাশপাতি ফলগুলি' দিয়ে স্বামীজীর পূজা করেন। তিনি বলেছিলেন. 'স্বামীজী, পূজার জন্যই এদের সৃষ্টি হয়েছে. কারণ এদের ফল হবে না।' স্বামীজী সুস্মিত মুখে তাকিয়েছিলেন. কিন্তু এমনই সঘন ছিল পরিবেশ যে. সে ইচ্ছা বাস্তবে পূর্ণ করার পক্ষে প্রয়োজনীয় আলোড়নটুকু ঘটানো সম্ভব হয়নি।

স্বামীজীর বিদায় বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা—

"তিনি চলে গেলেন। আমরা সকলে—ভৃত্যেরা. মাঝিরা. বন্ধুরা. শিষ্যেরা. পিতামাতা. পুত্রকন্যারা,—এগিয়ে গেলাম রাস্তায় দাঁড়ানো টোঙ্গা পর্যন্ত তাঁকে

বিদায় দিতে। একটি ছোট্ট নিটোল মূর্তি, বড় মাঝির চার বছরের মেয়েটি, অনেক দিন ধরেই স্বামীজীর প্রতি যার ভালবাসা সকলের চোখে পড়েছে, সে তার কেশ-কালো মাথাটির উপরে ফলের ঝুড়ি চাপিয়ে তাঁর পাশে পাশে হেঁটে চলল দৃঢ়পদে। হাসিমুখে তাঁকে বিদায় দিল—তিনি যখন চলে যাচ্ছেন গাড়িতে। আর আমরা, এই ছোট মেয়েটির চেয়ে যাদের বেদনা অল্প নয়, কিন্তু বয়স্থ বলে যাদের জটিল চিন্তা ও অনুভূতিতে ঐ শিশুর নিঃস্বার্থতা নেই—আমরা জানতাম না আবার কখন তাঁর দর্শন পাব,—কিন্তু এটুকু জেনেছিলাম যে, সেই দিনটিতে আমরা চিরন্তনের মধ্যে জীবিত ছিলাম, যার জ্যোতিচ্ছুরণের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হবে আমাদের ভাবী জীবন"]

এই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের অভিজ্ঞতার অনুভূতিকে নিবেদিতা যে ভাষায় নিবেদন করেছিলেন 'Wanderings' গ্রন্থের প্রারম্ভে, তা আপাতত যদিও গদ্যের ভাষা, আসলে কবিতারই ভাষা—মহাপুরুষসূক্ত। মুক্ত গদ্যচ্ছন্দে তার অনূদিত রূপ :

অপরূপ দিনগুলি, এই বৎসরের...
মূর্ত হয়েছিল আদর্শ অংক তার।
বেলুড়ের নদীতটের কুটীরে,
নৈনীতালে, আলমোড়ায় ও কাশ্মীরে,
হিমালয়ে—অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠস্বর,
যা বাহিত, ধ্বনিত হবে জীবন থেকে জীবনান্তরে।
তারই মধ্যে একবার...অন্তত একবার...
সহসা আলোকে উন্মোচিত অমরলোকের দ্বার।

লীলা—শুধু লীলা—

প্রেমকে দেখেছি আমরা।
সে এমন প্রেম, যা দীনতম অজ্ঞানতমের সমস্তরে নামে।
প্রেমকে দেখেছি আমরা,
যার চোখে এই পৃথিবী মধুময়, শুধু মধুময়।

হেসেছি আমরা বিরাট প্রতিভার খেয়ালে খুশীতে,
উত্তাপ নিয়েছি বীরব্রতের যজ্ঞকুণ্ড হতে,
আর দেখেছি, দেখেছি যেন, পরম লগ্নে
শিশু ভগবানের নয়ন-পদ্মের প্রথম উন্মীলন।
আমরা ছিলাম, সেখানে ছিলাম।

বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ছিলনা কোথাও, কিছুতে,
বেদনা এসেছে, বিঁধেছে বুকে, শোকস্মৃতি,
চলেও গিয়েছে,
উন্নীত হয়েছে দুঃখ আলোকতীর্থে,
তা হয়েছে জ্যোতির্ময়—নিঃশেষ করেনি আমাদের।

আমাদের যাত্রা-কথা বলতে পারি সে সাধ্য আমার নেই।
বরমুলায় আইরিস ফুল ফুটে আছে, এখনো দেখি,
ইসলামাবাদের পপ্‌লারের কাঁপন-ধরা পাতার তলায়
কাঁচ ধানের শিহর,
আরণ্য হিমালয়ে রহস্যনিশা,
দিল্লীর, আগ্রার রাজৈশ্বর্যমহিমা।
যদি পারতাম এদের শব্দপ্রতিমা রচনা করতে!
হায়—অসম্ভব, সে যে অসম্ভব!

এরা আর মানুষেরা,
স্নেহপূর্ণ, দয়াপূর্ণ, আমাদের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ
সেই মানুষেরা
বিরাজিত হোক নিত্যস্মৃতির মন্দিরে।

নব বিশ্বাসের উদয়ক্ষেত্র আমরা দেখেছি।
দেখেছি বিশ্বাসের জন্মদাতা পুরুষকে।
এমনি এক সান্নিধ্যে আমরা ছিলাম
যিনি আকর্ষণ করতেন সকলকে,
কান পেতে শুনতেন তাদের কথা,
বুক ভরে নিতেন তাদের ব্যথা,
ফিরে যেত না কেউ সে আশ্রয় থেকে।
দীনতা—যা সর্বতুচ্ছতাকে মুছে দেয়,
ত্যাগ—যা যাতনা ও মৃত্যুর অগ্রসর পদে
বর্ষণ করে আশীর্বাদ,
আমরা দেখেছি, আমরা জেনেছি।

যে-নারী প্রভুর চরণ ধুয়েছিলেন চোখের জলে,
মুছেছিলেন মাথার চুলে,
সে নারীর হাত ধরেছিলাম আমরা,
সেই পরম লগ্ন আমরা পেয়েছি, পেয়েছি,
হায়, সেই বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি ছিলনা আমাদের।

মৃত বাদশাহগণের উদ্যানে বসে স্বপ্ন ঘনালো চোখে :
এই বিরাট আত্মার মন্দিরে
কী হবে যোগ্য অর্ঘ্য ?
পৃথিবীর ঐশ্বর্যের যত সম্ভার,
রাজার মাণিক্যদ্যুতি সিংহাসন,
মহাবীরগণের আন্দোলিত পতাকা,

নগরীর উৎসবসজ্জা,
গর্বিত মানুষের বিলাস-প্রাসাদ,
যাজকগণের অঙ্গাভরণের আড়ম্বর,
গীর্জা বাতায়নের আলোকিত চিত্ররাজি—

প্রত্যাখ্যাত হল সবই, একে একে আমাদের নয়নের স্বপ্নে।

তখন দেখলাম ভিক্ষুকের সাজে তাঁকে,
বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, স্বদেশীর পূজার্হ মূর্তিতে,
সে জীবনের যোগ্য প্রচ্ছদ কি হবে দেখলাম :
ঘর্মাক্ত শ্রমের রুটি, কুটীরের আশ্রয়,
শস্যক্ষেত্রের বুক চিরে চলে যাওয়া
আঁকাবাঁকা মেঠো পথখানি।

তাঁকে ভালবাসত তাঁর দেশবাসী,
পণ্ডিতেরা শুধু—শুধু রাজনীতিক ?
না—যারা অজ্ঞান তারাও।
মাঝি প্রতীক্ষা করত জলের দিকে তাকিয়ে
কখন তিনি ফিরে আসেন,
কোলাহল করত ভৃত্যেরা, কাড়াকাড়ি করত
কে সেবা করবে তাঁকে, তাই নিয়ে।
সবার মাঝে তিনি, সবের মাঝে তিনি,
খেলার আবরণটি খসেনি কখনো।
'তারা খেলছে প্রভুর সঙ্গে'—তারা জানত চেতনায়।

এ মহালগ্নের স্পর্শ যারা পেয়েছিল,
তারা ধন্য, জীবন তাদের অর্থবান, অমৃতময়।
আর...রাত্রি-দীর্ঘ তালীবনে কেঁপেছে বায়ুর নিশ্বাস,
বলেছে মর্মরে
মহাদেব! মহাদেব! মহাদেব!

॥ ১৮৯৯ ॥

৬ মার্চ, ওলি বুলকে :

স্বামীজী এখন স্বস্থানে। আমি আবার পিতাকে পেয়েছি, যাঁকে হারিয়েছি দশ বছর বয়সে। স্বামীজী সত্যই শান্তিতে আছেন, শান্তি, শান্তি—অপরূপ মধুরতা এবং অপূর্ব শক্তি।

ভারতের খ্রীশ্চান হওয়ার বিষয়ে গতকাল তিনি প্রায় স্বগতোক্তি করছিলেন। মিশনারী-সংগঠন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী খুলছে—এবং কর্মচারীদের জোর করে খ্রীষ্টান করার কথা ভাবছে! একথা কি সত্য হতে পারে? শুনলেও লজ্জায় শিউরে উঠতে হয়। ম্যাদাম রোলান্ড হয়ত বলতেন, 'খ্রীষ্ট! তোমার নামে কী না চলছে!'

তিনি নিজের মনে যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'মিশনারীদের ঐ প্রয়াস থেকে জনগণকে বাঁচাবার চেষ্টা করার দরকারই বা কি? তাদের খাদ্য চাই—আমরা কি সে খাবার দিতে পারব?' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কথা শোনার পর থেকে আচার্যদেবের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তাঁর এই বাণীতে আলোকোজ্জ্বল হয়েছে আমার অন্তর। 'সব মতই সত্য'—ভারতীয় জনগণকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে এই সত্যটিই। তাদের কোনো একটি ধর্মীয় মত নিতে হবে। তারা খ্রীশ্চান হোক, যদিনা তার দ্বারা কিছু হারায়, এবং পরিবর্তে খাদ্য পায়, আর সমব্যবহার। কিন্তু যথার্থত আমার মনে হয় না, এর জন্য খ্রীষ্টধর্ম নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমরা নিশ্চিত যথেষ্ট সংখ্যক যুবকের মনে আগুন জ্বালাতে পারব, যাতে তারা সব কিছু ত্যাগ করে জগতের এবং মানবের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এবং সাম্যমন্ত্র প্রচার করতে পারে সক্রিয়ভাবে।......

কিছু পূর্বে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেলাম। "আমি আবার কাজের ঝোঁকে আছি" —বলতে বলতে তিনি এলেন। স্বামী সারদানন্দ বোম্বাই যাবেন অর্থসংগ্রহে, স্বামীজী নিজে কিছু সময় মঠে থেকে কাজ করবেন। সকলকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। অনেকগুলি ছেলেকে ভিক্ষায় বেরুতে হবে, কেননা তাদের সংস্থানের সামর্থ্য নেই। দেখলাম, স্বামীজী ভয়ঙ্কর সংঘাতের মধ্যে আছেন। যোগানন্দের এবং তাঁর নিজের অসুখ আবার বাড়তি বোঝা। যোগানন্দের জন্য প্রতিদিন ১০ টাকা। স্বামীজী বললেন, তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাক, তিনি চান না। মানুষ তৈরী তাঁর কাজ, কিন্তু সে-কাজ, স্বামীজী মনে করেন, আরও সহজে করা যাবে তাদের খেতে দিয়ে ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে—কষ্টে রাখার চেয়ে। শুধু দেহধারণের জন্য অতিরিক্ত লড়াই মানুষকে ডুবিয়ে দেয়, বিশেষত অপরিণতদের। কী সত্য এই কথা! দারুণ, দারুণ সত্য!......

এইসব কথার মধ্যে ভারত ও ভারতীয় জনগণের বিষয়ে তাঁর চিন্তাপ্রবাহ চলছিল—তাঁর মন এত দ্রুত সক্রিয় ছিল যে, আমার পক্ষে তাকে অনুসরণ করা শক্ত হয়ে উঠেছিল।—কি করে তাদের খাদ্যসংগ্রহের নতুন পথ বের করা যায়? কলোনি নির্মাণ, শস্য উৎপাদন,—মানুষ তৈরীর জন্য। কিভাবে ভারতের পুরনো শিল্পদ্রব্যের বাজার তৈরী করা যায় ইউরোপ আমেরিকায়? 'ট্রেড সিক্রেট' কেনবার টাকা জোগাড়

করা যায় কোথা থেকে? কিভাবে সেই 'সিক্রেট'-কে বৃহৎ উৎপাদনে প্রয়োগ করা যায়?—ইত্যাদি, ইত্যাদি।*......

এখানে আমার থাকা তাঁর পক্ষে বোঝার মত, ক্রমে বুঝতে পারছি। আমার সামনে কোন্ অনভিপ্রেত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, সে বিষয়ে য়ুম (ম্যাকলাউড) তোমাকে জানাবে। কিন্তু পেছিয়ে যাওয়া যে কাপুরুষতা। আমি সেকথা স্বামী সারদানন্দকে আজ বলেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'হাঁ, স্বামীজী সেদিন তোমাকে য়ুরোপে ফেরৎ পাঠাবার কথা বলছিলেন।' শুনে পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল। এখানে কত কাজ আছে করবার—ভগবান জানেন কি হবে—আমি কিছু ভাবতে পারছি না। তারপরে এরই সঙ্গে তাঁর (স্বামীজীর) সেই কথাগুলি শুনলাম —য়ুমকে হুবহু যা লিখে পাঠিয়েছি—কথাগুলি 'মা'-এর জন্যই নির্দিষ্ট:

'বাছা, আমাকে খুসী করবার জন্য বেশী কিছু জ্ঞানের দরকার নেই; শুধু গভীরভাবে ভালবাসো।'

১২ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

গতরাত্রে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। একজন সন্ন্যাসী বিকেল চারটের সময়ে দেখা করতে আসেন। তাঁকে বললাম, 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য আমি স্বামীজীকে 'ইন্টারভিউ' করব। তিনি ৬টার সময়ে তাঁর ফেরার নৌকায় আমাকে স্বামীজীর কাছে নিয়ে যেতে রাজি হলেন, যদি আমি ফেরার সময়ে হাঁটাপথে গাড়িতে ফিরতে রাজি থাকি। সদানন্দ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, আমরা হেঁটে ফিরেছিলাম। ব্যাপারটা চমৎকার দাঁড়িয়েছিল।

আটটার সময়ে সেখানে পৌঁছেছিলাম। রাজা গাছের তলায় আগুনের পাশে বসেছিলেন। তিনি নৌকা থেকে নেমে এসেছিলেন। মনে হয়, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মহিলার সাক্ষাতের পক্ষে তখন দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে।

'সাক্ষাৎকার'-প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'মার্গট, আমি বেশ কিছু দিন ধরে ঐ ন্যূনতম সংঘাতের পথ বেছে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। ওটা একেবারেই ভুল তত্ত্ব। তাছাড়া আপেক্ষিক কথাও বটে। আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, ও বিষয়ে আমি আর মন দিতে রাজি নই। পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকটি নিষ্ঠাবান মানুষের ইতিহাস। যদি কেউ আন্তরিক হয়, পৃথিবী তার পায়ের তলায় লুটোবে। আমি আর আদর্শকে তরল করতে রাজি নই—এবার আমি নির্দেশ করব শর্ত।†......

---

* ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির চিন্তায় স্বামীজী সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন। তার প্রভূত নিদর্শন নানাস্থানে রয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ১৮৯৮-এর ৭ই অগস্ট নেল হ্যামণ্ডকে নিবেদিতা লেখেন:

"একদিন আচার্যদেব আকাশকুসুম রচনায় ব্যাপৃত: 'বিহারের লোকবিরল অংশে কৃষি-খামার গড়ে তোলা হবে', ইত্যাদি। (তিনি অবশ্য বললেন, হতে হতে কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে যাবে।) তিনি তাঁর কল্পনা শেষ করলেন, 'মিঃ ও মিসেস হ্যামণ্ড এবং আরো প্রচুর ইংরেজ কর্মীকে নিশ্চয় আমি একাজে যোগাড় করে আনব—তাঁরা আমার জন্য একাজে আসবেনই।"

† 'ন্যূনতম সংঘাতের' কথাটি এখানে কিছু ব্যাখ্যা করা দরকার। আমেরিকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজীর সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে উক্তিসমূহ নিয়ে দেশের সর্বত্র তুমুল আলোড়ন হয়। প্রতিষ্ঠিত মতসমূহকে তিনি আঘাত করেন, সেই মতপক্ষীয়েরাও প্রতিঘাত করে

সবশেষে যখন বললাম, আগামী শনিবার, ২৫শে মার্চ আমাকে "আমৃত্যু সদস্য" করে নিন—রাজা তৎক্ষণাৎ বললেন—"তাই হবে।" গতকাল সকালে দুজনকে ব্রহ্মচর্য দিয়েছেন, তাও বললেন।

["সাক্ষাৎকারটি" বেনামে প্রবন্ধ ভারতের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে অবশ্য ন্যূনতম সংঘাতের বিষয়টি আলোচিত হয়নি। প্রকাশিত আলোচনার মূল বিষয় ছিল, ধর্মান্তরিত হিন্দুরা যদি স্বধর্মে ফিরে আসতে চায়, তাদের নেওয়া হবে কি না? স্বামীজী বলেন, নিশ্চয়ই। তারা কোন্ জাতিভুক্ত হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী জানান, তারা নিজেরা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে সংগঠিত হবে, ইষ্টসাধনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে তিনি চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের সমাজ সংগঠন ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করেন।

কোন্ পরিবেশে আলোচনা হয়েছিল, নিবেদিতা তা সংক্ষেপে সুন্দর বর্ণনা করেছেন—"সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেলাম এক সন্ধ্যায়, যখন তিনি গঙ্গার উপরে হাউসবোটের ছাতে ছিলেন। তখন রাত্রির সূচনা হয়ে গেছে। আমরা রামকৃষ্ণ মঠের পোস্তায় এসে নৌকা লাগালে, স্বামীজী নেমে এলেন কথা বলতে।

"স্থান ও সময় উভয়ই মনোরম। উপরে আকাশ, তারকাখচিত। চারিদিকে কুলকুল গঙ্গার প্রবাহ। এক পাশে মৃদু আলোকিত বাড়ির আভাস, যার পটভূমিকায় তালবৃক্ষ এবং উন্নত পত্রঘন তরুরাজি।"

আলোচনার সমাপ্তিতে—"সাদর শুভরাত্রি জানিয়ে এই সুমহান ধর্মাচার্য তাঁর লণ্ঠন তুলে ধরলেন, এবং প্রস্থান করলেন মঠবাড়ির দিকে, আর আমি গঙ্গার পথহীন পথের মধ্য দিয়ে, তার নানা বাঁক ও স্রোতের চাতুরীর মধ্য দিয়ে কলকাতায় ফিরতে লাগলাম।"]

১৬ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

গত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, তিনি বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বলতেন, 'লোক না পোক।' চিকাগোয় থাকাকালে তাঁর একটি দর্শন ঘটে; দুশ্চিন্তা ও অভাবে তিনি অর্ধমৃতের মত মেঝেয় লুটিয়ে আছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে স্পর্শ করে বলেছিলেন—'ওঠ্ ছোঁড়া ওঠ্! লোক না পোক।'

২৬ মার্চ, ওলি বুলকে

স্বামীজীর সর্বাঙ্গীণ কুশল। গতকাল তাঁর দর্শনে গিয়েছিলাম। তিনি আমার প্রথম দীক্ষার ঠিক এক বছর পরে গতকাল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী করলেন। এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ য়ুমকে লিখে পাঠাবার ইচ্ছা আছে—সেটি তোমাদের দুজনের জন্যই। এখন তোমাকে একটি পূজা-পত্র পাঠাচ্ছি—তোমার জন্য বিশেষভাবে

প্রচণ্ডভাবে। স্বামীজীর বন্ধুবান্ধবেরা এতে শঙ্কিত হন। বিভিন্ন দলের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করার অনুরোধ তাঁকে করা হয়, নিবেদিতা প্রমুখ কেউ কেউ সে চেষ্টায় অগ্রণীও হন। 'ন্যূনতম সংঘাতের' বিষয়ে স্বামীজীও গভীরভাবে চিন্তা করেন। চিন্তার ফল কি দাঁড়িয়েছিল—স্বামীজীর উপরের কথাতেই তা দেখছি।

পাত্রটিকে ভস্মে স্পর্শ করিয়ে নিয়েছি তাঁকে দিয়ে। খুব মজার, নয়! গতকাল সকালে তিনি বহু-আকাঙ্ক্ষিত পূজারীতি শেখালেন। ছোট মন্দিরটিতে আমরা একসঙ্গে পূজা করলাম। সমস্ত সময় তিনি অতি মিষ্টভাবে কথা বললেন, ঠিক যেভাবে মধুরস্বভাবা মায়েরা শিশুদের শিক্ষা দেন স্নিগ্ধতম স্বরে।

আমাকে আমৃত্যু ব্রহ্মচারিণী কেন করলেন? মনে হয়, অংশত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীদের পুরনো ধারার পুনঃ প্রবর্তনের জন্য, বাকি কারণ হয়ত,—আমি তাঁর চোখে উচ্চতর অধিকার লাভের যোগ্য নই।

২৭ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

গত শনিবারে আমার দীক্ষার বিবরণ বড়ো আকারে তোমাকে লিখে পাঠাবার কথা মনে মনে কতবার ভেবেছি। এখন আর তার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাচ্ছি না। তবু লিখবই।

সকাল ৮টায় মঠে পৌঁছাই। তারপরে মন্দিরে যাই। পূজার পুষ্পাদি না আসা পর্যন্ত আমরা মেঝেয় বসে রইলাম—রাজা বুদ্ধের কথা বলতে লাগলেন। জাতক কাহিনীর তাৎপর্যের কথা, অপরের জন্য পাঁচশো বার জীবনদান করলে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়—এইসব কথা তিনি বলছিলেন। ঠিক সেই সময়ের পক্ষে চমৎকার একটি ভাবব্যঞ্জনা, নয় কি?

পূজাদ্রব্যাদি এলে তিনি আমাকে পূজাপদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। অবশেষে তা পেলাম। সারাক্ষণ অতি মধুরভাবে কথা বলে বুঝিয়ে দিলেন সব কিছু। আমার মাথায় স্থাপন করবার জন্য তিনি যে সাদা ফুলটি দিয়েছিলেন, সেটি আমি তোমার জন্য সরিয়ে রাখি, পরে সেটিকে হোমের ভস্মে ছুঁইয়ে নিই তাঁর দ্বারা, তোমারই জন্য। ফুলটির গায়ের লালচে দাগ রক্তচন্দনের। তবে ফুলের সব শুভ্রতা জ্বলে গেছে, দেখতে পাচ্ছি। বাইরে কবিতার এক ছত্র লিখে পাঠিয়েছি, যে-কবিতাটি আমি গতকাল পড়েছিলাম। কবিতাটির মধ্যে আচার্যদেবের রূপ চমৎকার প্রতিফলিত —"আমি সেই গ্যাব্রিয়েল (এখন এই মুহূর্তে আমি যেভাবে তোমাকে বলছি)— ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান।" জনৈক অবতারের কাছে প্রণাম জানিয়ে পূজা শেষ হল, যাঁর নামটি এখন স্মরণ করতে পারছি না। পূজাবেদী পুষ্পসজ্জিত করার পরে তিনি বললেন, "এবার কিছু ফুল আমার বুদ্ধকে দাও। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে ভালবাসে না।"*

পূজা শেষ হলে নীচে গেলাম হোমের জন্য।......

অভয়ানন্দ বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমার ভালবাসা নির্বোধ ও আবেগপূর্ণ, কেননা আমি মাংস খাই যদি তিনি খেতে দেন, এবং তিনি যা যা বলেন, ঠিক তাই তাই করি, এবং তাঁর পক্ষে নিতান্ত সাধারণ যে-সব উক্তি, তাতে মাঝে

---

* এই ঘটনার এক বৎসর আগে স্বামীজী যখন নিবেদিতাকে প্রথম দীক্ষিত করেন, তখনো বুদ্ধের অনুসরণ নিতে বলেছিলেন—

'যাও, তাঁকে অনুসরণ করো, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে অপরের জন্য পাঁচ শতবার জন্ম নিয়েছিলেন!'

যাকে চমৎকৃত হয়ে পড়ি। আসল কথা আমার মনে হয়, যে-কেউ দেখতে পায় যে, আমি তাঁকে পূজা করি—যেটাই সত্য।

এত বিশালতা, এত মধুরতা, এত দীনতা—অভয়ানন্দ সম্বন্ধে স্বামীজীর—আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। নিউইয়র্কে শিক্ষাদানকালে নিজের সমাধিমগ্ন হয়ে পড়ার বিষয়ে স্বামীজী অভয়ানন্দকে বলেছেন : "সত্যই নির্বোধ আমি। শিক্ষকের নিজেকে সমাধিতে আত্মহারা হতে দেবার অধিকার নেই।"—আর এই উক্তিই, অভয়ানন্দ বলেন, স্বামীজীর কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ শিক্ষা!!!!! কথাটাকে অভয়ানন্দ আন্তরিকভাবে নিয়েছেন দেখতে পাচ্ছ।

আমার রীতি অবশ্য এরকম নয়—আমি তো ব্রহ্মচারিণী, সন্ন্যাসিনী নয়!*

[ম্যাকলাউডকে লেখা এই চিঠি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নিবেদিতার ব্রহ্মচারিণী ব্রতদীক্ষার বিবরণ পাই। তা ছাড়া দুটি মৃত্যুর বর্ণনা ছিল। প্রথমটি স্বামী যোগানন্দের মৃত্যু, দ্বিতীয়টি অজ্ঞাত একটি বালকের।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ স্বামী যোগানন্দ বিশেষভাবে মাতৃগতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শ্রীমা সারদাদেবী এবং মাতৃমণ্ডলীর মর্মান্তিক দুঃখকে কয়েক পংক্তিতে নিবেদিতা যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর লেখনীরই যোগ্য।

স্বামী যোগানন্দের মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়টি আমরা পরে পৃথকভাবে প্রকাশ করতে পারতাম। সেটিকে এখানেই কিন্তু প্রকাশ করছি, কারণ, এই মৃত্যু স্বামীজীকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, নিবেদিতার মনের উপরে যার প্রতিক্রিয়া পরবর্তী অনেকগুলি চিঠিতে প্রকাশিত।

এই সময়ের আগেও কয়েকটি চিঠিতে যোগানন্দের অসুখের প্রসঙ্গ আছে। যেমন ১৮৯৯-এর ৩০শে জানুয়ারী মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"ডাঃ সরকার বলেছেন, যোগীনন্দ (যোগানন্দ) যক্ষ্মায় মৃত্যুমুখে। আজ শ্রীমাকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু যোগীন মা এবং হতভাগ্য তরুণী পত্নীটির রক্তশূন্য শুষ্ক মুখ দেখে পালিয়ে এসেছি।......একদিন তোমাকে যোগীনন্দের বিবাহ-কাহিনী বলব।" ৭ই ফেব্রুয়ারী একই মহিলাকে লিখিত—"স্বামীজী যখন জানলেন যোগীনন্দ অনেক বল পেয়েছেন, তখন গতরাত্রে তিনি আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। সকলকে কী না ভালবাসেন তিনি!" ওলি বুলকে ২৬শে মার্চ— "যোগীনন্দ তোমার শুভেচ্ছা পেয়েছেন। তিনি এখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু সহসা খুব খারাপ লক্ষণ দেখা দিয়েছে—যে-কোনো সময়ে মারা যেতে পারেন।...যোগীনন্দ মঙ্গলবার মারা গেছেন। শ্রীমায়ের উপর নিদারুণ আঘাত।"

যোগানন্দের মৃত্যু বর্ণনার পরে যে বালকটির মৃত্যুকথা আমরা পেয়েছি, তার থেকে মহৎ মৃত্যু অল্পই দেখা যায়। বালকটির নাম আমরা জানি না, জীবনে সে কত বড় ছিল জানার সুযোগ হয়নি, কিন্তু কী অপূর্ব অবসান! যে-প্রশান্ত

---

* নিবেদিতাকে স্বামীজী ব্রহ্মচারিণী করেছিলেন, সন্ন্যাসিনী করেননি। অভয়ানন্দকে তিনি আমেরিকায় সন্ন্যাসিনী করেছিলেন। সন্ন্যাসিনী না করার জন্য নিবেদিতার নিগূঢ় অভিমান পূর্বে দেখেছি, এখানেও দেখলাম। এ অভিমান তাঁর ছিল। কিন্তু যখন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তখন অনুভব করেন, হয়ত এই ভবিষ্যৎ দর্শন করেই স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস দেননি।

মৃত্যুর জন্য মানুষ সাধনা করে, কল্পনার সাহিত্যে যার সাক্ষাৎ আমরা পেয়ে থাকি, তাকেই ঐ বালকটি পেয়েছিল বাস্তবে, নিজ জীবনে—শ্রীমায়ের ইচ্ছায়। সাধারণের মধ্যে অসাধারণের প্রকাশকে অনুভব করে নিবেদিতা ধন্য হয়েছিলেন,—কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে বর্ণনা করেছেন—যোগানন্দের মৃত্যু বর্ণনার পরে ঐ বর্ণনাটি আমরা উদ্ধৃত করব অন্তত একটি কারণে—আর এক মহাবালকের, যার মধ্যে তিনি শিশু ভগবানের প্রকাশকে অনুভব করেছিলেন—তাঁরই প্রশান্ত মৃত্যুর কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।]

মঙ্গলবার অপরাহ্নে যোগানন্দ মারা গেলেন। সন্ন্যাসীরা অধিকাংশই পাশে ছিলেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, 'ভাই, কেমন আছো, খুব যন্ত্রণা কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি সারাক্ষণ ব্রহ্মচেতনায় ডুবে যেতে চাইছি, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরে ধরা পড়ে আছে মন। একবার গীতা পড়ে শোনাও।' গীতা পাঠ করা হলে তিনি বললেন, 'আর কোনো যন্ত্রণা নেই, সব কিছু বিগলিত হয়ে যাচ্ছে, ব্রহ্মচেতনা আসছে।' বলতে বলতে হঠাৎ গলায় জোর এনে বললেন, 'ওঁ রামকৃষ্ণ!'—তারপরেই চিরসমাধি।

অপরূপ! অপরূপ!

স্বামীজী এসেছিলেন। প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ঘোষ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ভয় পেলেন—স্বামীজী না ফিরে অসুখে পড়েন। তিনি স্বামীজীকে জোর করে মঠে পাঠিয়ে দিলেন। তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

মাতাঠাকুরাণীর কাছে গেলাম। কাঁদছিলেন। যোগীনমা মাসের পর মাস শুশ্রূষা করেছেন—তিনি মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে—অশ্রুহীন, শব্দহীন। বহুক্ষণ সেখানে থাকবার পরে নীচে থেকে ৫০-৬০টি গলায় সমস্বরে শোনা গেল 'হরি ওঁ'!—মা বললেন, তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে দেখো!

সুগম্ভীর দৃশ্য। মৃত মানুষটি—গেরুয়া সিল্কের বিরাট পাগড়ি মাথায়—শরীর ফুলে ঢাকা, যেগুলি স্বামীজী ও অন্যান্যরা ছড়িয়েছিলেন—সদানন্দ ধরে আছেন উঁচু করে, জ্বলন্ত কর্পূর আন্দোলিত করা হচ্ছে সামনে, আর ঘরের ভিতর ও বাহিরের মানুষগুলি উচ্চারণ করে যাচ্ছে পুণ্য নাম।

এই সময়ে সদানন্দের মুখের চেহারা যদি দেখতে—একেবারে ঋষি!

অকস্মাৎ সুদীর্ঘ ক্রন্দন আকুল হল উপরতলায়—নীচের পূজার শব্দের সঙ্গে মিশে তা ছড়িয়ে পড়ল। পুরবাসিনীরা বুঝেছিলেন, এতদিন যিনি এই গৃহের কর্তা ছিলেন, তিনি চিরতরে চলে যাচ্ছেন। যোগীন মা'র তুষারশীতল স্তব্ধতা টুটে গেল—মনে হল তাঁর ও মায়ের বুক বুঝি ফেটে গেল। যোগানন্দ চলে গেলেন। বড় কোমল করে বিছানা পাতা হয়েছিল তাঁর জন্য—সব সুগন্ধ। বিছানা ঢাকা দেওয়া হয়েছিল হলুদ রঙের ফুলে, তাঁর দেহ শ্বেত পুষ্পে।

শ্মশানে ওঁরা চিতা সাজাতে সাজাতে সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন; তারপরে, ব্রহ্মানন্দ মুখাগ্নি করবার ঠিক আগে তাঁরা একে একে ক্ষমা চেয়ে নিলেন—যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে!

"আগুনের মাঝখানে ঠিক যেন শিবের মুখ"—সদানন্দ বললেন।

[২৬শে এপ্রিলের এক চিঠিতে নিবেদিতা শ্রীমায়ের বেদনার কথা লিখেছেন : "যোগানন্দের মৃত্যু মাতাঠাকুরাণী ও যোগীন মা'র কাছে দারুণ বেজেছে। মা 'মৃত্যু' কথাটি যেন সইতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা। 'জানি, জানি, সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সেকথা আমি জানি—কিন্তু সে যে আমার যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন।]

সদানন্দের মুখে আর একটি মুমূর্ষু বালকের কথা শুনলাম। মা তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

'তাহলে কি আমার মৃত্যু নিকটে?'—ছেলেটি বলেছিল।

'মায়ের আদেশ!'—ওঁরা কথা এড়িয়ে বললেন। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বলল, 'নিশ্চয়ই; মাকে আমার প্রণাম। তাঁর কথা তো শুনতেই হবে। আপনারা নিয়ে চলুন।' তখন ওঁরা শয্যাসুদ্ধ তাকে বাইরে আনলেন। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নত নেত্রে চেয়ে রইলেন। ত্রিগুণাতীত তার সারা গায়ে গঙ্গামাটিতে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ, তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার নাম লিখতে লাগলেন। ছেলেটি সেই লেখা দেখতে দেখতে বলল, 'ওসব নাম মুছে একটি নাম রাখো—আমি ঐ নামটি নিয়েই এতদিন বেঁচেছি, মরণের সময়ে ঐ নামটি নিয়েই যাব।' যখন তাই করা হল, তখন সে মায়ের দিকে তাকালো বিদায় নিতে। তারপর তাকে সকলে বয়ে নিয়ে চলে গেল। সারা পথ সে চমৎকার কথা বলে গেল। নদীতীরে পৌঁছান মাত্র—মৃত্যু ঘটল! ওঁরা যখন গঙ্গার ঘাটে ছিলেন, তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠে গর্জন করে আছড়ে পড়ছিল সমস্ত সময়—আমার মনে হচ্ছিল কী স্বাভাবিক! পবনদেব তাঁর সঙ্গীতের মহারথ পাঠিয়েছেন বিদায়ী আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য!

৫ এপ্রিল, মিস ম্যাকলাউডকে

যোগানন্দের মৃত্যুর পরে স্বামীজীর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। গত রবিবার জেনারেল ও মিসেস প্যাটারসন তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গাড়ি করে মঠে গিয়েছিলেন। মিসেস প্যাটারসন তাঁর অসুস্থতা ও শরীরের শীর্ণতা সম্বন্ধে যে নিদারুণ বর্ণনা দিলেন, তাতে আমি একেবারে বিপর্যস্ত। কী হবে—যদি মৃত্যু হয় তাঁর! পৃথিবী যে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে আমার কাছে মুহূর্তমধ্যে!

৮ এপ্রিল, মিস ম্যাকলাউডকে

যে রকম আশঙ্কা করছিলাম, স্বামীজীর শরীর ঠিক সেই রকমই অসুস্থ। তিনি প্রচুর হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছেন, যার ফলে বিপর্যয়। এখন একটু ভাল। সারদানন্দকে ফিরে আসার জন্য টেলিগ্রাম করেছেন, কারণ তিনি ইংলণ্ড যেতে বদ্ধপরিকর। তাঁর কোষ্ঠী আবার গণিয়েছি। শুনে স্বস্তি পেয়েছি যে, বৃহস্পতির প্রভাব আর ৯ বছর সক্রিয় থাকবে। এখন একটা মন্দ গ্রহ স্বাস্থ্যনাশ করছে ও শোকতাপ সৃষ্টি করছে, কিন্তু তার প্রভাব ১৮৯৯-এর ৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে ইতি হবে। তারপর তিনি এমন সাফল্য ও যশ পাবেন, যা পূর্বে কখনো পাননি। সুতরাং আমার ভাবনার হেতু নেই।......

জ্যোতিষ গণনা সম্বন্ধে বলতে চাই, এটা জেনেও সুখ—স্বামীজীর বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আছে। যতক্ষণ বৃহস্পতি জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে, ততক্ষণ জাতকের মৃত্যু নেই।......

বুধবার সকাল।—গতকাল ভোর পাঁচটার সময়ে...গেরুয়া পোষাকের এক দূত এসে ঘোষণা করলেন—'সিস্টার নিবেদিতা আছেন?—স্বামীজী এসেছেন!' আমি অবাক। তারপরে বিস্ময়-বিহ্বলতা ঝেড়ে ফেলে রাজাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি কি—তিনি আবির্ভূত—স্বাস্থ্যে ও আনন্দে জ্যোতির্ময়। কথাবার্তার জন্য স্বামীজী গিয়ে বসলেন পড়ার ঘরের বারান্দায়, আমি বিদ্যালয়ের সিঁড়িতে। মাঝে মাঝে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি উঠে চত্বরে পায়চারি করতে লাগলেন।

আমার আশঙ্কা ও তাঁর কোষ্ঠী গণনার কথা বললাম। তিনি ফেটে পড়লেন: 'কু-সংস্কারের আর একটি শব্দ যেন না শুনি! এসব তাড়াতে হবে—তার জায়গায় বসাতে হবে খাঁটি অদ্বৈততত্ত্ব।* হিমালয়ে একটি কেন্দ্র। যদি চাও—এখানেও একটি কেন্দ্র।' বিরাট ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণীর মত তাঁর চেহারা—'কাজ চাই—কাজ, কাজ। এ সপ্তাহে একটি বক্তৃতা হবে। তুমি বক্তৃতা দেবে, আমি হব সভাপতি। সারা কলকাতার ছাত্ররা আসবে। তারা আসবে—নিজের হাতে শহর পরিষ্কার করবে। তাদের "মৃত্যু-জ্বর" ধরাতে হবে। তার মানে বুঝতে পারো? আমার নিজের ছেলেদের সেই কথাই বোঝাচ্ছিলাম গোটা গতকাল ধরে—তারা এখন চাবুক-খাওয়া শ্বাপদের মত।'

দারুণ উত্তেজনাভরে পোস্টার তৈরীর আদেশ দিলেন।......

আমি...মঠে গিয়েছিলাম।।...স্বামীজীকে এত রোগা রুগ্ন আর ফোলা-চোখ দেখাচ্ছিল। হায়, প্রিয় রাজা! তিনি বললেন, কিছু দুশ্চিন্তায় তিনি ক্লান্ত। তিনি সবে পড়ানো শুরু করেছিলেন, এমন সময়ে আমার আসার সংবাদ পেয়ে উঠে আসতে পারলেন। সুতরাং আমি খুসী যে আমি গিয়েছিলাম।......

গতকাল তাঁর শীর্ণ দুর্বল চেহারা দেখে আমার বুক ভেঙে গেছে। যোগানন্দের মৃত্যুর পরে আমি বুঝেছি—কিভাবে না বুঝেছি—প্রিয় যম, বীর হওয়া খুবই ভাল, কিন্তু বীর হওয়ার চিন্তা আমাকে ক্রমেই ভীরু থেকে ভীরুতর করে তুলছে। ঐ সম্ভাবনার এতটুকু স্পর্শে যেন থরথর করছি। সে যেন ঈশ্বরের বিনাশের মত হবে। তাঁর বিদায়!—শান্তি দাও, শান্তি দাও!

---

* কোষ্ঠী গণনায় নিবেদিতার বিশ্বাস ছিল। তাঁর পত্রাবলীতে অনেক জায়গায় সেকথা পাই। বিখ্যাত হস্তরেখাবিদ্ কিরোর (Cheiro) সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। স্বামীজী অপরপক্ষে এই সব ব্যাপারকে মেয়েলি, ও কুসংস্কারবৃদ্ধিকর বলে মনে করতেন। এবং উদনুযায়ী তিরস্কারও করতেন। নিবেদিতা আগেকার আর একটি তিরস্কারের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'Wanderings' বইয়ে।—(১১ অগস্ট, ১৮৯৮)—"আজ হাত দেখার জন্য দলের একজনকে স্বামীজী ভর্ৎসনা করলেন। এ জিনিসটি সবাই চায়, তিনি বললেন, কিন্তু সারা ভারত একে হেয়জ্ঞান করে। যখন ও বিষয়ে বিশেষ একটু সমর্থন করার চেষ্টা করা হল, তখন তিনি বললেন, হাঁ, চেহারা দেখে চরিত্র বলার চেষ্টাতেও তাঁর সমর্থন নেই। 'বলতে কি, তোমাদের অবতারকে আরও সাধু বলে ধরতাম, যদি তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা ঐ সব অলৌকিক ব্যাপারগুলো না দেখাতেন। এই কাজ করার জন্য বুদ্ধদেব একবার এক ভিক্ষুর আলখাল্লা কেড়ে নিয়েছিলেন।'"

[কলকাতায় ইংরেজ মহলে কয়েকজনের সঙ্গে নিবেদিতার হৃদ্যতা হয়। সে বিষয়ে লেখার পরে—]

......এক্ষেত্রে আমাকে চালিত জীবনরীতি সম্বন্ধে যামলী ধারণা কিছু শিথিল করবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। কারণ ঐসব মহলে আমার কিছু যথার্থ কাজ করার আছে। গতকাল সহসা মাথায় খেলে গেল—এইজন্যই হয়ত স্বামীজী আমাকে সন্ন্যাসিনী না করে ব্রহ্মচারিণী করেছেন—এই কারণের কথা তিনি সচেতনভাবে ভাবুন আর নাই ভাবুন।

বুধবার সন্ধ্যা।—আসল কথা রাজার শরীর সত্যই ভালো নয়। বারবার বুকে হাত রাখছিলেন অস্বস্তিতে। গতকালকার অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি মনে হল। চায়ের ট্রে সাজিয়ে আনার জন্য আমি উঠে গেলাম। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণতর শিষ্যদের একজনের সঙ্গে কথা হতে লাগল। চমৎকার মানুষ। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভগিনী, তোমাকে একথা আমায় বলতেই হচ্ছে, আমি দেখেছি, আমাদের দেশে মহাপুরুষেরা অন্তত দীর্ঘজীবী হন না।'—য়ুম, মোটকথা আমি ভয় পেয়েছি। তিনি আর পাশ্চাত্ত্যে যেতে পারবেন না—এ বিষয়ে আমার পুরনো আতঙ্ক ফিরে এসেছে। আর, মাদ্রাজ-ভবিষ্যৎবাণী আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ও মথিত করেছে—'তিন বছরের মধ্যেই!' য়ুম, প্রিয় য়ুম য়ুম, যদি তুমি এখানে থাকতে! এই মানুষটিকে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি, যদি কিছু ঘটে, আমাকে যেন সময়মত সংবাদ দেওয়া হয়। অন্যদেরও সেকথা বলে যাব—দিনে রাত্রে, যখনই হোক, খবর যেন পাই।

কিন্তু সত্যই ভয়ের হেতু নেই। অবুঝ ভয়ের আক্রমণ। যোগানন্দের মৃত্যু ওঁকে নাড়া দিয়ে গেছে, একথা সকলে বলছে বলেই দুশ্চিন্তা। কিন্তু সত্যি কী যে দারুণ ভয় লাগছে। অবশ্য যদি কিছু ঘটে, আমি নিশ্চয় তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠাব, যদিনা বারণ করে পাঠাও তুমি। সুতরাং যদি এই চিঠি পাবার আগে কোনো তার না পৌঁছায়, তাহলে জেনো, আমি একটা ভীতু কাঁদুনে মেয়ে ছাড়া কিছু নই। কিন্তু য়ুম, কি আসন্ন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা— তত্ত্বদর্শন এখন কোনই সাহায্য করছে না। 'যদি সমাধি তাঁর আসন্ন হয়, তাহলে যাবার আগে তাঁকে একটু শান্তি আর বিশ্রাম দিও—আর তাঁর যন্ত্রণাটুকু নিতে দিও আমাকে।'—একথা বলা হয়ত ছেলেমানুষি, কিন্তু ভগবান যদি সত্যই স্বামীজীকে শেষক্ষণে যথেষ্ট কষ্ট দেন, তাহলে সে ভগবানকে আমি জানতেও চাই না, ভালবাসতেও চাই না। অনন্তকালের জন্য সেই ব্যক্তি-ভগবানের দিকে আমি দ্বার বন্ধ করে দেব, এই এক পরম পুরুষের প্রতি অবিচারের কারণে। হাঁ, তাঁর অন্যান্য দিকের মতই ব্যক্তিরূপের জন্যও আমি বাঁচব—কাজ করে যাব—থেমে যাবার পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু ঈশ্বর—না, না, ও-কাজ তিনি করবেন না, করতে পারবেন না—ওর থেকে শয়তানী নিষ্ঠুরতা আর কিছু হতে পারে না।......

কিন্তু এসব বলে তোমাকেও যন্ত্রণা দিচ্ছি, নিজেও পাচ্ছি। এসব কথা তোমাকে লেখা উচিত কিনা জানি না। কিন্তু তোমার কাছে কিছুই লুকোতে চাই না। তুমি অবশ্য বুঝবে, এই উদ্বেগ অকারণ; আর যদি টেলিগ্রাম না পাও, তাহলে জানবে তিনি মাসাবধি ভালই আছেন। শক্তি ও সান্ত্বনাপূর্ণ একটি দিব্য পত্র পাঠিও আমায়—আমি যে যোগানন্দের মৃত্যুর পরে চরম আঘাতের সম্ভাবনাকে ছুঁয়ে প্রায়

আছি—তাকে এড়াতে পারছি না কিছুতে। এ চিঠি যেন ঈশ্বর করেন আগামীকাল ডাকে ফেলতে পারি নির্বিঘ্নে, আর তুমিও যেন এ চিঠিকে গুরুত্ব দিও না। আমার স্থান পরিবর্তন দরকার এই বলে কদাপি যেন বাইরে যেতে আমাকে বলো না, কেন না, যতক্ষণ তিনি জীবিত আছেন এখানে, আমি তাঁর সান্নিধ্যের পরিধির বাইরে যেতে পারব না,—না, না, তা অসম্ভব—তিনি পূজ্য, প্রিয়, দেবতা—তিনি আমাকে ডেকেছিলেন অথচ আমি সাড়া দেবার জন্য নেই—একথা ভাবতেও পারি না। এই সমস্ত বছরটি ধরে কিভাবে আমার পূজা বেড়ে উঠেছে ভাবতেও স্তম্ভিত হয়ে যাই।......

বৃহস্পতিবার সকাল।—সদানন্দ এসেছেন। সদানন্দ বললেন, স্বামীজী বলেছেন, এটা কিছু নয়। কিন্তু সদানন্দ আমারই মত অনুভব করেন, রাজা কখনই তাঁর গুহা ছেড়ে যাবেন না। স্বামীজী সকলকে বলেছেন, যেখানেই তাঁর মৃত্যু হোক, তাঁর দেহ যেন এখানে আনা হয়। তিনি আরও বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন যে, গিরিশ ঘোষ সুদ্ধ কয়েকজন মিলে একটি মালার মত, যাদের মধ্যে একজনের দেহান্তর হলে অন্যরাও দ্রুত প্রস্থান করবেন। সদানন্দ বললেন, এসব কথা প্রত্যহ সকলে বলাবলি করছে। ঐ তালিকায় যোগানন্দই প্রথম।......

এখনো কিছুই ঘটেনি। কিন্তু সমাপ্তির নির্নিমেষ দৃষ্টি অনুভব করছি যেন।......

সকলে যেন প্রতীক্ষা করে আছে—উনি বলবেন, 'আমি আমার আমটি পেয়ে গেছি,'—আর তাহলেই সকলে জেনে যাবে। এর পিছনে আছে একটি কাহিনী—শ্রীরামকৃষ্ণ মৃত্যুশয্যায় তাঁকে একান্তে বলেছিলেন, 'ওরে, এই তোর আম, আমি তোর জন্য রেখে দিলুম।' এই উক্তির সঙ্গে সকলে প্রথম সাক্ষাতের অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণীকে যুক্ত করে দেখছে; তিনি বলেছিলেন, 'ও যখনি জানবে ও কে, তখনি দেহ ছেড়ে চলে যাবে।' সদানন্দ বলেন, আগে যখনি স্বামীজী অসুস্থ হয়েছেন, গুরুভাইরা বলেছেন, 'কিন্তু ও মারা যাবে কি করে, ব্রত যে সিদ্ধ হয়নি।' এই বিশ্বাসের জোর কিন্তু আর পাচ্ছি না।

ওঁদের দিয়ে কোষ্ঠী গণনা করিয়ে নিয়েছি। ওঁরা বললেন, আগামী ৯ বছরে রাজার জীবনের ভয় নেই, কিন্তু অসুস্থ থাকবেন। যে-ভাবেই হোক, তিনি বেঁচে থাকুন—স্বার্থপরের মত হলেও বলছি। তাঁর চরণস্পর্শ পায় যে পৃথিবী— সে ধন্য।

২৫ এপ্রিল, মিস ম্যাকলাউডকে

আগের কয়েক দিনের মত স্বামীজী ভাল ছিলেন না। তাঁর মতে এটা হাঁপানির জন্য, কেননা বাতাস ভারী হলেই অসুখটা মারাত্মক হচ্ছে। এর অর্থ, বৃষ্টির সময়ে তিনি এখানে না থেকে উত্তর বা পশ্চিম ভারতে থাকবেন। বক্তৃতা করা উচিত হয়েছে কি না গোলাপ মা তা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'আমরা সৈনিক, আমরা কি কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করি?' কিন্তু আমাকে বলছিলেন, তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে মহান মনু-বচন উদ্ধৃত করে বললেন, সন্ন্যাসী মরতেও চাইবে না, বাঁচতেও নয়।

১ মে, মিস ম্যাকলাউডকে

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ন্যাসিনী হতে গেলে কি ধরনের উন্নতি প্রয়োজন? উত্তরে দ্রুত বললেন, 'তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক।' ফলে আমার ইচ্ছা রুদ্ধ হয়ে গেল চিরতরে। তবু আমি অতি সতর্কভাবে বার করবার চেষ্টা করলাম, আমার ঘুরে বেড়ানো, নানা জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এসব তাঁর চোখে দোষের জিনিস কি না, যেটা আমার নিজের কাছেই অনুচিত বলে মনে হতে শুরু করেছে। তিনি জানালেন, না, তা নয়। সুতরাং সেই সন্ধ্যাতেই আমি বন্ধুদের জানালাম, আমি শুক্রবার-শুক্রবার আসতে থাকব, যদি তাঁরা চান।

৮ মে, মিস ম্যাকলাউডকে

স্বামীজীর সঙ্গে বসে কথা বলছিলাম। তিনি পরিচিত মানুষদের চরিত্রের উপরে বিচিত্র আলোকপাত করছিলেন। তিনি একবার বলে উঠলেন, 'আহা! যদি তুমি বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেতে!' তারপরে বললেন, ট্রাস্ট ডীডে (মঠের) সই হয়ে যাবে, এই সমস্ত জায়গায় তাঁর কোনো কিছুই থাকবে না, ভোটের অধিকার পর্যন্ত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রথম যেদিন দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বৃক্ষতলে বাস করার জন্য—সেইদিনের মতই তিনি মুক্ত।

'কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর সব দেশের সব কিছু ভাল আমার জন্য তোলা আছে; আমি তা পেয়েছি, ভবিষ্যতেও পাব'—পরিচিত দুষ্টুমিভরা ভঙ্গিতে তিনি যোগ করলেন।

তারপর তিনি বললেন, তাঁর বয়স যখন ১৩ তখন তিনি টমাস আ কেম্পিসের একখণ্ড বই পান, যার ভূমিকায় লেখককৃত সন্ন্যাসী মঠ ও তার সংগঠনের বিবরণ ছিল। বইয়ের সেই অংশটির আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল অফুরন্ত, 'যদিও কখনো ভাবিনি সেই জাতীয় কাজ ভবিষ্যতে আমাদেরই একদিন করতে হবে।' "টমাস কেম্পিসকে আমি ভালবাসি তুমি জানো, সেটি এবং গীতার প্রায় সবটুকু অংশ আমার কণ্ঠস্থ,—আমার দুটি প্রিয় পুস্তক,—কিন্তু বক্তৃতাগুলির মূল্য ঐ ভূমিকার বাইরে আমার কাছে বিশেষ কিছু নয়। আহা, যদি তারা শুধু জানাত, যীশুর খাদ্য পানীয় কি ছিল, তিনি কোথায় থাকতেন, ঘুমোতেন, কিভাবে তাঁর দিন কাটত, —তাঁর মুখে বসানো ঐসব বক্তৃতার বদলে! ঐ লম্বা লম্বা ভাষণ! আরে, ধর্মের মূল কথা-কয়টা আঙুলে গোনা যায়। তত্ত্বকথা নয়—মানুষটাই আসল—মানুষটা বেরিয়ে এলেই হল! কুয়াশা মুঠিতে ধরলে—ক্রমে তা মানুষের আকারে গঠিত হয়ে উঠল। মুক্তি নিজস্ব ভাবে কিছু নয়, ওটা মানুষের অভীপ্সার রূপ; মানুষেরই অভীপ্সা বলে স্বাধীনতা বা ঐ জাতীয় জিনিসের মূল্য। মানুষের মধ্যেই তার জাগরণ। সব কিছুই মানুষ।" এখন আমার মনে পড়ছে এসব কথা বলার আগে তিনি বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণের উক্তি নয়, রামকৃষ্ণের সঙ্গে যে-জীবন তাঁরা যাপন করেছিলেন, তারই প্রয়োজন,—সে জিনিস এখনো লেখা হয়নি।" এ পৃথিবী শেষ-পর্যন্ত কতকগুলি ধারাবাহিক ছবি, 'মানুষ তৈরী' যার মধ্যে সদা-বর্তমান লক্ষ্য।

আমরা মানুষের গড়ে ওঠা দেখে যাচ্ছি—শুধু তাই। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বুড়োদের সরিয়ে দিয়ে তরুণদের নিতেন শিষ্যরূপে।*............

বুধবার। বরাহনগর থেকে গাড়িতে সোজা বাড়ি না ফিরে আমরা গেলাম দক্ষিণেশ্বরে। এ পর্যন্ত ভূমিপথে আমি দক্ষিণেশ্বর যাইনি। অপূর্ব। গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। স্বামীজী অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঝড়ো রাত্রি—বাতাসের গোঙানি, জলের ফুঁপিয়ে কান্না। মিসেস রায়কে (সরলা রায়, পি. কে. রায়ের স্ত্রী) দেবার জন্য একটি পত্র সংগ্রহ করতে গেলাম—তিনটি ছোট পাতা জোগাড় হল। তারপর স্বামীজী এসে তোমার জন্য দুটি এবং মিসেস বুলের জন্য দুটি পাতা দিলেন। বহু পরে আমার মাথায় লাগল—আমরা সাতটি পাতা সংগ্রহ করেছি।

৭ জুন, মিস ম্যাকলাউডকে

আত্মনির্ভরতার জন্য স্বামীজী মঠে ব্যবসায়িক উৎপাদনের কথা বলছিলেন। জ্যাম-তৈরীর ভার আমাদের মেয়েদের উপর পড়বার কথা হচ্ছে। চমৎকার লাগছে পরিকল্পনাটা। কাঁচা আমের জ্যাম যে কী সুস্বাদু সে তুমি ভাবতেও পারো না। অবশ্য বাঙালী চাটনির কথা তুমি জানো। আমরা নিশ্চয় ও কাজ পারব। এর ফলে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের প্রসারও ঘটবে। সব কিছু মেয়েরা চালাবে—ভেবে দ্যাখো ব্যাপারটা! অবশ্য খুব সামান্যভাবে আরম্ভ করব। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেরা উপার্জন করে নেবার জন্য আমি মরীয়া।

[জ্যাম বা চাটনি তৈরীর ব্যাপারটা নিবেদিতা খুবই মনোযোগের সঙ্গে

---

* টমাস আ কেম্পিস কর্তৃক রচিত বলে অনুমিত Imitation of Christ নামক বইটি স্বামীজীর কাছে আকৈশোর প্রিয় বস্তু। তিনি "১২৯৬ সালে অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে...'ঈশা-অনুসরণ' নাম দিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন।" অনুবাদের ভূমিকায় স্বামীজী যা লিখেছিলেন তার কয়েক লাইন—'খ্রীষ্টের অনুসরণ নামক এই পুস্তক সমগ্র খ্রীষ্টজগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোনো রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর লিখিত,—লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিত বিন্দুতে মুদ্রিত।...তিনি এই পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন? যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ এবং বিলাসকে, ইহজগতের সমুদয় মানসম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন? পরবর্তী লোকেরা অনুমান করিয়া টমাস আ কেম্পিস নামক একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসীকে গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন। কতদূর সত্য ঈশ্বর জানেন। যিনিই হউন, তিনি যে জগতের পূজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'

এই লেখার সময়ে স্বামীজীর বয়স ২৭। জ্বলন্ত বৈরাগ্য তখন তাঁর। তিনি বইটির 'দীনতা, আর্তি ও দাস্যভক্তির', 'জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবের', প্রভৃত স্তুতি করেছেন। গ্রন্থটির মধ্যে 'গীতায় ভগবদুক্ত সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি' দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু স্বামীজীর পরবর্তী উক্তি অনুযায়ী তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল ভূমিকাটি, যাতে সন্ন্যাসী-সংঘ গঠনের বিবরণ অংশটি আছে। যুবক নরেন্দ্রনাথ অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে দাস্যভাবের মূল্য স্বীকার করলেও, নিজ জীবনে যে দাস্যভাবাশ্রিত সাধনাকে গ্রহণ করেননি, তা আমরা জানি। সুতরাং তিনি পরবর্তীকালে নিবেদিতার কাছে নিজ ধর্মজীবনে খ্রীষ্টীয় প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেননি, যদিও সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে কেম্পিসের গ্রন্থের প্রভাব স্বীকার্য। এই সঙ্গে নিশ্চয় যোগ করতে হবে—এক্ষেত্রে তাঁর মনের পিছনে বৌদ্ধ সংঘের কাহিনী কম প্রেরণা যোগায়নি।

নিয়েছিলেন। যে শিক্ষানীতি তিনি এদেশে প্রবর্তন করতে চাইছিলেন, তার মধ্যে শিক্ষাকালে স্বাবলম্বন ব্যাপারটা ছিল। স্বামীজীর প্রস্তাবটিকে নিবেদিতা এমনই গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিয়ে কার্যকর করার চেষ্টা করছিলেন যে সেটা স্বামীজীর কাছে কৌতুকের বিষয় হয়ে ওঠে। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০০-এর চিঠিতে স্বামীজী প্যারিসে লেগেট-ভবনে 'খেয়ালীদের কংগ্রেসের' বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে অনেকগুলি নামকরা লোকের 'খেয়াল' নিয়ে তামাশা করা আছে। তার মধ্যে দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌স, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, জনৈক সূর্যোপাসক ধার্মিক ব্যক্তি, জনৈক স্কচ প্রতিনিধি (সম্ভবত প্যাট্রিক গেডেস), নিবেদিতা ছিলেন। 'বিশ্বসমস্যার সমাধানই' ছিল আলোচনার বিষয়। প্রত্যেকেই নিজ মত বা নিজ গুরুর মত উপস্থিত করেছিলেন, এবং বাকি সকলেই তার প্রতিবাদ করেছেন। সমস্যার সমাধানের আলোচনা যখন ঘনীভূত এবং উত্তপ্ত, তখন—

"'চাটনিই সেই বস্তু'—দরজার কাছ থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমরা সকলে পিছনে তাকালাম। দেখি মার্গট। 'তা হল চাটনি'—মার্গট বললেন, 'চাটনি এবং কালীই জীবনের সর্বদুঃখ নিবারণ করবে; তা সকল মন্দকে গিলতে এবং সকল ভালকে চেখে উপভোগ করতে সাহায্য করবে।' বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন, সজোরে জানালেন, তিনি আর একটি কথাও মুখ থেকে বার করবেন না, কারণ বক্তৃতাকালে সমবেত শ্রোতাদের মধ্য থেকে জনৈক পুরুষ-জীবের দ্বারা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রোতাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি জানালার দিকে মাথা ঘুরিয়ে ছিল, এবং মহিলার প্রাপ্য মনোযোগ মহিলাকে দিচ্ছিল না, এবং মার্গট যদিও ব্যক্তিগতভাবে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী, তথাপি তিনি ঐ বিরক্তিকর লোকটির নারীজাতির প্রতি যথাবিহিত সৌজন্যের অভাবের কারণ জানতে চান। তখন সকলে জানালেন, তাঁরা মার্গটকে অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছেন, সর্বোপরি দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য সমানাধিকার, কিন্তু বৃথা চেষ্টা; এই ভয়াবহ জনতার সঙ্গে মার্গটের আর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না,—মার্গট বসে পড়লেন।"

একটি চমৎকার কৌতুক-নক্‌শা। বিবেকানন্দ, নিবেদিতার দুটি বাতিক নিয়ে মজা করেছেন, যে দুটি তাঁরই দান—চাটনি এবং কালী। এদের নিয়ে রসিকতায় তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না, যেহেতু বিবেকানন্দের 'চাটনি' যে কোনো বিরসকে সরস করতে সমর্থ এবং বিবেকানন্দের কালী রস ও রসিকসহ সর্বগ্রাসী। নিবেদিতা প্রথম জীবনে লণ্ডনে নারীর অধিকারের পক্ষে উৎসাহী কর্মী ছিলেন, তার উপরও সকৌতুক খোঁচা—সে খোঁচা তীক্ষ্ণতর যখন তিনি সমানাধিকারবাদীদের বক্তব্য ও আচরণের অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করেছেন। বিবেকানন্দ দেখেছেন এবং বলেছেনও বহুবার—পাশ্চাত্যে একদিকে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার, অন্যদিকে নারীর প্রতি শিভল্‌রির বাড়াবাড়ি—এ দুটো জিনিসের মধ্যে কোনই সঙ্গতি নেই।]

১৮ জুন, মিস ম্যাকলাউডকে

এই সপ্তাহের এক সকালে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি প্রগতি সম্বন্ধে আমার ধারণার উদ্ভটতা সম্পর্কে বললেন। সেই সঙ্গে যোগ করলেন—

প্রাণপণে কাজ করে যাও—'ক্লান্ত হয়ে ওঠার জন্য।' 'অথ মৃত্যুপ্রেমিক হও, মার্গট',—তিনি বলে চললেন। গৌরবময় উক্তি, নয়কি?

[অসুখের ধাক্কা খানিক সামলে স্বামীজী ১৮৯৯-এর ২০শে জুন ইউরোপ ও আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ পাশ্চাত্ত্য যাত্রা। যাত্রার কারণ অনেকগুলি : প্রথমত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে আন্তর্জাতিক ধর্ম-কংগ্রেসে যোগদানের আমন্ত্রণ, দ্বিতীয়ত ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারবাসনা, শেষত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, এই দুই ভূখণ্ডের উপরে যে প্রাচ্য-বিবেকানন্দ দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি তাঁর শেষ সম্ভাষণ জানাতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যকে। তাঁর এই যাত্রায় ইংলণ্ড পর্যন্ত জাহাজে ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। তুরীয়ানন্দকে নিয়ে যাচ্ছিলেন আমেরিকায় প্রচারের কাজে রেখে আসতে, নিবেদিতা যাচ্ছিলেন ভারতীয় কাজের জন্য ইউরোপে অর্থসংগ্রহ করতে, এবং সম্ভবক্ষেত্রে ভারত-সম্পর্কে আমেরিকার ভ্রান্তি দূর করতে।

২০শে জুন থেকে ৩১শে জুলাই, ১৮৯৯—এই দেড় মাসের সমুদ্রযাত্রাকে নিবেদিতা তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল বলেছেন। এমন বলার কারণ, এই সময়েই সর্বপ্রথম তিনি ধারাবাহিকভাবে স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পান, এবং আলমোড়ায় তীব্র মানসিক সংঘর্ষের পরে, মিস ম্যাকলাউডের কথায় বুঝতে পারেন, স্বামীজীর মত উদ্দীপিত মানুষকে তর্কে ব্যাপৃত রাখা নির্বুদ্ধিতা; একমাত্র উচিত কাজ ঐ অগ্নি কখন জ্বলে ওঠে, তার জন্য প্রতীক্ষা করা, জ্বলে ওঠার উপযোগী পরিবেশ রচনা করা, এবং জ্বলে উঠলে তার আলো ও উত্তাপটুকু গ্রহণ করা। এই মানসিক সংস্থিতি লাভ করার জন্য নিবেদিতার পক্ষে এই দেড়মাস স্বামীজীকে স্বরূপে দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া দুই মহাদেশের মধ্যবর্তী সমুদ্রের উপরে ভাসমান বিবেকানন্দ বহু চিন্তা ও যন্ত্রণার থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়েছিলেন বলে তাঁর অব্যাহত প্রকাশও সম্ভব হয়েছিল।

এই ভ্রমণের ফলশ্রুতি বিষয়ে নিবেদিতা The Master-এর মধ্যে লিখেছেন :

"ছয় সপ্তাহের এই ভ্রমণের দিকে যখন ফিরে তাকাই, দেখি যে, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা তা। স্বামীজীর সঙ্গলাভের সম্ভাব্য কোনো সুযোগই আমি ছাড়িনি, অন্য সঙ্গ প্রায় এড়িয়ে চলতাম।...এইভাবে আমি তাঁর মন ও ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন পরিচয়লাভের যে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম—তার জন্য কোনো কৃতজ্ঞতাই বড় কথা নয়।

এই সমুদ্রযাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিরাম ভাবপ্রবাহ এবং কাহিনীপ্রবাহ। কেউই জানত না কখন সহসা স্বামীজীর উপলব্ধির দ্বার খুলে যাবে, এবং নূতন সত্যের ঘোষণা জ্বলে উঠবে কণ্ঠে।"

The Master গ্রন্থে 'গুরুর সঙ্গে অর্ধপৃথিবী অতিক্রম' অধ্যায়ে নিবেদিতা এই ভ্রমণের অতুলনীয় বিবরণ লিখেছেন; স্বামীজী কোন্ ভাবে ও কাহিনীর মধ্যে ডুবে থাকতেন, তার সারমর্মও দিয়েছেন। মহাকালী ও মৃত্যুপূজার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের কথাও সেখানে পাই। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে নিবেদিতার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল 'মানবের' প্রতি স্বামীজীর অখণ্ড শ্রদ্ধার রূপ।

সেই 'মানব' কতকগুলি অধিকারে ও স্বার্থকামনায় বড় নয়, বড় তার আত্মিক শক্তিতে। 'সারা পৃথিবীর চোখে সতী বড় কেন, কারণ সে ইচ্ছাশক্তির মূর্তি।' এই মানুষের বিকাশ যেখানে বিরাট, সেই বিরাটত্বই তাঁর শ্রদ্ধা পেয়েছিল—'হাঁ, যত বয়স বাড়ছে, ততই দেখছি সব কিছু আছে পৌরুষের মধ্যে। এই আমার নতুন বাণী। যদি পাপ কিছু কর—পুরুষের মত কর। যদি পার বদমাশ হও—কিন্তু বড় আকারে।' স্বামীজী বলেছিলেন, বড় যে হবে, তাকে সহ্য করতেই হবে। প্রতিটি কামনার আনন্দ তার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—এই দেখাই তার নিয়তি। সারা জীবনের গান আসলে শেষের গান। এর মধ্যে মনুষ্যত্বমহিমা রূপ দেখে স্বামীজী বলেছিলেন : 'সিংহের মর্মে গিয়ে যখন আঘাত লাগে—তখনি সে প্রচণ্ডতম গর্জন করে, কেউটের মাথায় ঘা পড়লে সে হিস্ করে ফণা ধরে, আর মানুষ যখন হৃদয়ের গভীরে আহত হয়, তখনি তার আত্মার মহিমা মাথা তোলে।'

নিবেদিতা স্বামীজীর মানবপ্রীতির বিষয়ে সংহত আকারে বলেছেন—'সর্বোপরি মানবের পক্ষসমর্থন! কখনো পরিত্যক্ত হয়নি, কখনো দুর্বল হয়নি সে সমর্থন—সর্বদা উত্থিত হয়েছে অরক্ষিতের পক্ষে নূতন সংগ্রামে, দুর্বলের পক্ষে মহান বীরত্বে। আচার্য আমাদের এসেছিলেন, এবং চলেও গিয়েছেন; তাঁর পরিচিতজনদের মধ্যে যে অমর স্মৃতি রেখে গেছেন, তার মধ্যে মানবের প্রতি তাঁর ভালবাসার তুলনায় বড় আর কিছু নয়।'

এই যাত্রাকালে স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার নানা প্রসঙ্গ The Master গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নিবেদিতা সেখানে স্বামীজীর একান্ত মূর্তি অনেকটা আবৃত রেখেছেন। সেই নিঃসঙ্গ বিরাটের উপরে চকিত আলোকপাত করেছেন তাঁর পত্রে। সেই পত্রগুলির কিছু কিছু উদ্ধৃত হচ্ছে—]

২৮ জুন, মিস ম্যাকলাউডকে

মাদ্রাজে ব্যাপারটা বিশেষ উদ্দীপনাময়। দলে দলে লোক, গভর্নরের কাছে তাদের আবেদন, যাতে স্বামীজীকে তীরে নামতে দেয়। কিন্তু প্লেগ আইন বলবৎ, সুতরাং আমাদের জাহাজে আটক থাকতে হল। তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, কেননা সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজীর উন্নতি আকাশ-ছোঁয়া বলতে গেলে। উল্টোদিকে এক দিনের জনসংঘট্ট ও বক্তৃতাদি তাঁকে তাঁর বর্তমান দারুণ ভালো অবস্থা থেকে শ্রান্তির নিম্নতম গহ্বরে টেনে নামাত। নৌকা বোঝাই করে যারা জাহাজের ধারে হাজির হয়েছিল, তাদের উপহার নেওয়া, তাদের সঙ্গে সারাদিন কথা বলাতেই যথেষ্ট মন্দ ঘটেছিল।

মাদ্রাজে আলাসিঙ্গা জাহাজে উঠলেন, স্বামীজীর সঙ্গে কলম্বো যাবেন বলে। ফলে রাজা সারা সময়ে ক্যাবিনে প্রভূত স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন। ওঁরা তিনজন (স্বামীজী, তুরীয়ানন্দ ও আলাসিঙ্গা) একত্রে আহারাদি করেন; সুতরাং আমি টেবিলে একলাই বসছি এবং অন্য লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টায় আছি। সমুদ্রযাত্রাকে জাতিসমস্যার প্রকৃতি নির্ণয়ে লাগাবার এই সুযোগ আমার আকাঙ্ক্ষিত—একথা কি তোমাকে বলেছি? সমস্ত সময়ে ব্যাপারটার মজা খুব উপভোগ করছি। গৈরিক ও অন্যান্য রঙের পোষাক-পরা এত লোকের সমাবেশ হয়েছিল আমাদের বিদায়

সম্ভাষণ জানাতে এবং স্বামীজী যেসব মালা বা তোড়া বাতিল করেছিলেন সেগুলি পরতে বা নিতে এতই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম যে, আমরা কারা তা বুঝতে গোড়া থেকেই কারো কোনো অসুবিধা হয়নি। এই ব্যাপারটিকে আমার বিরুদ্ধে কেউ মনে রেখেছিল কিনা জানি না। প্রথম দিন-দুই স্বামীজী আমাকে খুবই সময় দিয়েছেন। যখনি কোনো লোক আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে, আমি মতলব করে আলাপের গতি তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি যে তাঁরই পতাকার তলবর্তী তা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা না হয়। অবিলম্বে দেখছি, প্রতিটি মহিলা আমার সঙ্গে জানাশোনা করে নিয়েছে আমার গুটিয়ে থাকা সত্ত্বেও। ফলে যুদ্ধে জয় হয়ে গেছে। বর্তমানে যথেষ্টসংখ্যক পুরুষ একের পর এক এসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারপরেই যদি "জনৈক নেটিভ" অপরদিকে এসে হাজির হয়, তৎক্ষণাৎ সরে পড়েছে।...তবে এ'রা সংখ্যায় কম। অন্যান্যরা কথাবার্তা বলতে থাকে, এবং যাবার আগে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করে যায়।

একে ইংরেজদের পক্ষে খুব গৌরবজনক আচরণ* বলি না, তবে একেবারে পাষণ্ডোচিত নয়—কি বল? আমি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করছি। এখানে বলা উচিত, এই রুটে যারা যাতায়াত করে, তারা খুব বিশিষ্ট কিছু মানুষ নয়; তবে যে-মানুষটি এই সদ্য আমার 'দলে' প্রবেশ করেছেন, তিনি চমৎকার ব্যক্তি, শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত, সুইনবার্ন ও রসেটীর ভক্ত, আমার প্রিয় ছবি বা কবিতা বা বইগুলি পছন্দ করেন। স্বামীজী এসে হাজির হলে তাঁর বিষয়ে এ'র মনোভাব কি হবে জানি না, আমি পরোয়া করি না, কেননা তাঁকে বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে না; আর দেখতে পাচ্ছি জাহাজের অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্কে এ'র বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। এইসব জানাশোনার মূল্য কি? ঠিক বলতে পারি না। আমি তো সারা ভারতের সব কিছু ব্যাপারকে ঠিক পথে চালাতে পারব না, তবু মনে হয়, যদি ৩০-৪০টি তরুণ ব্যক্তিও একমাসের সমুদ্রযাত্রার মধ্যে ভারত সম্বন্ধে সহজ প্রত্যক্ষ বুদ্ধিলাভ করে, যদি তারা স্বামীজীর পাদমূলে বসে আলোকের আকাঙ্ক্ষা বোধ করে—মূল্য তার অপরিসীম। তবু হায়—জাতিপার্থক্য একটা বিরাট বাধাক্ষেত্র।

আমরা তিন মহিলা জাহাজে, তার মধ্যে একজন আমেরিকান মিশনারীর পত্নী, স্বামীসহ যাচ্ছেন, সঙ্গে চারটি শিশু। তারা আমাকে তেমন বন্ধুভাবে দেখে না। কি করি, বেচারা, বড়ই দারিদ্র্যগ্রস্ত; সকরুণ অবস্থা; তাহলেও ওরই মধ্যে প্রাণে স্ফূর্তিও আছে; কিন্তু এত অসুস্থ চেহারা আর এতগুলি সন্তান—মোটেই ভাল নয় তাদের পক্ষে। ছেলেগুলিকে এখনি কিসব ভয়াবহ কথা বলতে শুরু করবে তারা, ভাবছি তাই। ওদের প্রতি কিছুটা স্নেহ বোধ না করে পারিনি, যদিও দূরে থাকতেই চেষ্টা করি, সতর্কতা হিসেবে। 'বোগেশ'—ওদের নাম,... ওঁরা পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় যাচ্ছেন।*

---

* স্বামীজী এই বোগেশ-পরিবারের মনোরম কথাচিত্র এঁকেছেন, বিদ্রূপে ও অনুকম্পায় মিশিয়ে:

"জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেছেন। একটি আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম

এখন পূর্ব সিংহলের বন্দরে আমাদের জাহাজ ভিড়ছে। একটা গোটা লীলাচ্ছবি দর্শন করছি। প্রাতরাশের আগে বসন্ত বায়ুর মধুর গন্ধের ছোঁয়া পেলাম। অবশ্য একমাত্র রাজাই স্বীকার করেছেন, আমার ভুল হয়নি।

গংগায় জাহাজে ওঠার পরে তাঁর উচ্চকণ্ঠ উক্তির কথা তোমাকে বলেছি: 'আড়াই বছরের কী বিরাট যন্ত্রণাভার নামিয়ে এলাম পিছনে এখন!' এসব কথা তোমাকে বলিনি কারণ এদের সুগভীর পবিত্রতার স্বরূপটি তোমার কাছে গোচর করার মত শক্তি আমার ছিল না; তিনি নিজের জননীর কথা কিভাবে বলেছিলেন, যে দারুণ যন্ত্রণা মাকে দিয়েছেন তার কথা; এবার ফিরে এসে বাকি জীবন তাঁরই সেবায় উৎসর্গ করবেন—এই প্রতিজ্ঞার কথা। তিনি আর্তচীৎকারে বলেছিলেন, 'দেখতে পাচ্ছ না, এখনই আমার খাঁটি বৈরাগ্য এসেছে! যদি পারতাম অতীত জীবনকে বদলে দিতাম। আর কোনো কারণে নয়—শুধু মাকে খুশী করার জন্য বিয়ে করতাম যদি আমার বয়স দশ বছর কম থাকত! এই সমস্ত বৎসরগুলিতে কেন যন্ত্রণা পেয়েছি?—উচ্চাশার উন্মাদ তাড়না—কিন্তু না না,'—সহসা আত্মসমর্থনের ব্যাকুলতায়—'আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নই, খ্যাতি আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'সেকথা নিশ্চয় ঠিক স্বামীজী!' আমি বললাম, 'ও ক্ষুদ্রতার কণামাত্র আপনার মধ্যে নেই; কিন্তু আমি বিশেষ খুশী যে আপনার বয়স দশবছর কম নয়।' এই কথায় আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

প্রিয় যম্, এইসব বিষয়ে যদি কোনো অধীর উক্তি করে থাকি পূর্বে, তুমি সে বিষয়ে একেবারে ভুলে যাবে। সর্বত্রব্যাপ্ত বিশাল এই প্রেমের প্রতি সম্ভ্রমে আমার চিত্ত এখন পূর্ণ। এসব কথা তুমি বুঝবে, আমার চিন্তার বিষয় এগুলি নয়, মন্তব্য করার অধিকারও নেই। কিন্তু তাঁকে প্রায় মেরে ফেলা হচ্ছিল। তিনি যে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন—এর জন্য অসীম কৃতজ্ঞতা। নিজেকে বলি দেওয়া খুবই বড় ব্যাপার, কিন্তু তার সচেতন উদ্দেশ্য হয়ত ভ্রান্ত, কে জানে!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁর অন্য মূর্তিও দেখলাম। তাঁর ভাবাবেগের সংগে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,—আর একটি মানুষের জীবনের ও সাধনার ন্যাসরক্ষক—

বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে; ছেলেমেয়েতে ৬টি সন্তান; চাকররা বলে, খোদার বিশেষ মেহেরবানি—ছেলেগুলোর সে অনুভব হয় না বোধহয়। একখানা কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরণী ছেলে-পিলেগুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে কেঁদেকেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয়। ডেকে বেড়াবার জো নেই; পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকো চুবড়িতে শুইয়ে, বোগেশ আর বোগেশের পাদ্রিণী জড়াজড়ি হয়ে কোণে চারঘণ্টা বসে থাকে। তোমার ইউরোপীয় সভ্যতা বোঝা দায়। আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি—বলে কি অসভ্য! আর জড়ামড়িগুলো গোপনে করলে ভাল হয় না কি? তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল করতে যাও! যা হোক প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে উত্তর-ইউরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রী-পুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি!

...টুটুল বলে একটি ছোট মেয়ে বাপের সংগে যাচ্ছে, মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটুলের ও বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে।...বোগেশের একটি এঁড়ে-লাগা ছেলের বড় অযত্ন। বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের উপর গড়িয়ে বেড়াচ্ছে! বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চামচে করে সুরুয়া খাইয়ে যায়, আর তার পা-টি দেখিয়ে বলে, 'কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!' (পরিব্রাজক)

অভিভাবক তিনি। 'যদি কেউ—কোনো পুরুষ বা নারী—আমাদের অর্থাৎ রামকৃষ্ণের সন্তানদের মধ্যে কোনো নারীর আমদানী করে, তাহলে তাকে, সেই অপরাধীকে, তরবারি হস্তে নিজে সংহার করব।'*

---

* সন্ন্যাস নিয়ে, সংসার ত্যাগ করে মায়ের প্রতি অবিচার করেছেন, স্বামীজীর মনে এই বেদনা চিরজাগরূক ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-আদিষ্ট কাজের উন্মাদনায় যতদিন তিনি ছিলেন—আমেরিকায় গমন ও প্রথম প্রচার-সাফল্য, ভারতীয় কাজের সংগঠন ইত্যাদি কালে তিনি স্বভাবতই উন্মাদনায় ছিলেন,—ততদিন মায়ের প্রতি অবিচারের জ্বালা চাপা ছিল অনেকটা, যদিও সম্পূর্ণ যায়নি। খেতড়ির মহারাজাকে স্বামীজী তাঁর কাজের প্রধান সহায় মনে করতেন, তা এইজন্য নয় যে, খেতড়ি নিবেদিতাদির মত তাঁর কাজে সাহায্য করেছেন, কিংবা ওলি বুলদের মত টাকা দিয়েছেন—তার মূলে আছে, খেতড়ি তাঁর মা ও ভাইদের পালনের আর্থিক দায়িত্ব তুলে নেওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত মনে ধর্মের ও মানবতার কর্মভার তুলে নিতে পেরেছিলেন। আমেরিকাতেও মায়ের কথা কখনো ভুলে যাননি, অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর বিষয়ে আবেগভরে বলেছেন, এবং প্রতাপ মজুমদার যখন কলকাতায় তাঁর নামে কুৎসা করতে থাকেন, তখন তাঁর সর্বাধিক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঐসব অসার কথা মায়ের কানেও উঠবে, 'যিনি তাঁর সেরা ছেলেটিকে দেশ ও ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন—সেই পুত্র বিদেশে জঘন্য নীতিহীন জীবন যাপন করছে—এই কথা তাঁর বুক ভেঙে দেবে।' আমেরিকা থেকে ফেরার পরে আবার মায়ের দুঃখ ও কান্না তাঁকে বিচলিত করে তুলল। আমরা ধরে নিতে পারি, বাঙালী মায়ের মতই এই মাও দত্ত বংশের ধারালোপের আশঙ্কায় নিত্য আর্তনাদ করেছেন স্বামীজীর কাছে। মাকে শান্ত করার জন্য স্বামীজী তখন একেবারে অস্থির। শ্রীবেণীচরণ শর্মা স্বামীজীর যে অপ্রকাশিত চিঠি ছাপিয়েছেন, তাতে দেখতে পাই, স্বামীজী নিজের ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছেন। এর পিছনে মায়ের তাগিদ, দত্ত বংশধারা (যে বংশে দুর্গাচরণ দত্ত, বা নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হয়েছে) অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং হয়ত মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথকে মনের দিক থেকে অধিকতর বিবাহযোগ্য বলে বোধ করা—এইসব কারণ থাকতে পারে।

মাতৃঋণ ও বংশের প্রতি ঋণ বোধহয় সন্ন্যাসীকেও স্বীকার করতে হয়। ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি বংশের প্রতি ঋণ শোধের কথা ভেবেছিলেন, আর মাতৃঋণ শোধ করার জন্য অভ্যস্ত রাজকীয়তা পর্যন্ত ত্যাগ করে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরেছিলেন। ১৮৯৮-এর ২২শে নভেম্বর খেতড়ির মহারাজার কাছে অতি দীনভাবে অর্থভিক্ষা করে যে পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটু অংশ—"আমার মায়ের প্রতি আমি শোচনীয় অবহেলা দেখিয়েছি। তদুপরি আমার দ্বিতীয় ভাই চলে গেছে। মা দুঃখে বিপর্যস্ত। আমার শেষ ইচ্ছা কয়েক বছর অন্তত মার সেবা করা। মার সঙ্গে আমি বাস করতে চাই। ছোট-ভাইয়ের বিয়ে দিতেও চাই যাতে বংশধারা থেমে না যায়। এর ফলে মায়ের ও আমার শেষ দিনগুলি সহজ হয়ে উঠবে। মা এখন থাকেন চালাঘরে। তাঁর জন্য ছোট পরিচ্ছন্ন একটি বাড়ি তৈরী করার ইচ্ছা, আর ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু রেখে যাওয়া, কেননা সে যে কোনোদিন ভাল কিছু রোজগার করবে, মনে হয় না।...আমি ক্লান্ত, ভগ্নহৃদয়, মৃত্যু-পথযাত্রী। বিশেষ প্রার্থনা জানাই, এই শেষ ইচ্ছাটি আপনি পূরণ করুন, আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহই দেখিয়েছেন, এই সহৃদয়তার কাজটি আপনার মহান ও উদার হৃদয়ের যোগ্য হবে। যদি করেন, তাহলে আমার শেষের দিনগুলি নিশ্চিন্ত সহজ হয়ে উঠবে...।'

খেতড়ির রাজার কাছে স্বামীজীর ইচ্ছা আদেশতুল্য। তিনি অবিলম্বে বাড়ি তৈরীর সম্ভাব্য খরচ এবং পরিবারপালনের খরচের পরিমাণ জানতে চাইলেন। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে স্বামীজী লিখলেন, 'পৃথিবীতে আজ আমি যা হয়ে উঠেছি, সে আপনারই সাহায্যের জন্য। আপনিই আমাকে দারুণ মনস্তাপ থেকে উদ্ধার করে পৃথিবীর সামনে পাঠিয়েছিলেন কিছু কাজ করার জন্য। কে জানে, মনের এই ভার মোচন করে আপনি হয়ত আমাকে আরও বড় কোনো কাজের জন্য পাঠাতে বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন।'

নিজের পরিবারের প্রতি অবহেলিত দায়িত্বের জন্য বিক্ষত হৃদয় স্বামীজী ১৮৯৯, ১২ ডিসেম্বর মিসেস ওলি বুলকে লিখেছেন—'বহু বৎসর আগে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম,

তুমি যেমন বলেছ ঠিকই তাই, সত্যই তিনি জানেন না তাঁর সামনে কি আছে। আমাদের যাত্রার আগে একদিন শ্রীমায়ের বসার ঘরে আমরা মধ্যাহ্ন আহার করছিলাম। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কবে ফিরব? আমি যথারীতি উত্তর দিলাম। 'ধর তুমি দু' বছরের মধ্যে ফিরলেই না'—তিনি নীচুস্বরে বললেন।

'কিন্তু স্বামীজী, ঐ সময়ের পূর্বেই আপনি আমাকে নিশ্চয়ই ভারতে ফেরৎ পাঠাবেন,'—ভাবী কাজের আলোচনাকালে অন্য একদিন বললাম।

'না না'—চমকে তিনি বললেন, ভয়-পাওয়া ছোট ছেলের মত, 'আমি এবার বাইরে বেশী দিন থাকবই না, আর তো আমার টাকা রোজগারের ক্ষমতা নেই।' তারপরে তাঁর সর্বশান্তি যেখানে সেখানেই ফিরে গেলেন—'মার্গট, এসব ব্যাপার নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে; মনে রেখো, মা-ই সব জানেন।'

আমার শিক্ষা আমি পেয়েছি; স্রোতের উপরে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যেতে শিখেছি। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই সাধ্যমত সকলকে জুটিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে, যাতে করে আমি লিখে, বক্তৃতা করে এবং ভিক্ষা করে তাঁর জন্য যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারি। তিনি যথেচ্ছ খরচ করবেন—যদি আমার মহাভাগ্যে তাঁকে তা করতে দিতে পারি! মধুময় রাজা! ওগো য়ুম, যদি এক্ষেত্রে তাঁর সামান্য সাহায্যেও আসতে পারি তাহলে আর কিছু চাই না। তোমার মিসেস স্কটের কথা আমি তাঁকে বলেছি, তারপর থেকে তিনি ধরে নিয়েছেন আমি আমেরিকা যাচ্ছি। নিম-এর (নিবেদিতার বোন) বিয়ের পরে তাঁকে অনুসরণ করব আমেরিকায়—এ-ই পরিকল্পনা। ব্যাপারটা চমৎকার। তিনি বললেন, আমেরিকা অবধি তাঁর সঙ্গে আমার ভ্রমণ করা চলবে না—কেননা মিশনারীগণ আমাকে কদর্যভাবে আক্রমণ করতে পারে। বুঝে দেখ, রাজারও সাংসারিক বুদ্ধি জেগেছে!...

তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি—অবশেষে আমার দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হয়েছে, তাঁকে পূজা করতে পেরেছি ফুল দিয়ে। গোলাপ এনে দিয়েছিল একজন, সেগুলিকে তাঁর পায়ের উপরে রাখার অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন—তারপর আশীর্বাদ করলেন।...

ঘন্টাখানেক তিনি ছিলেন, এখনই। কথায় কথায় প্রেমের প্রশ্ন উপস্থিত হল।

ইংরাজ পত্নী ও বাঙালী পত্নীর ভক্তি।

তাদের নিঃশব্দ যন্ত্রণাবহন, যদি প্রয়োজন হয়।

অশ্রুসমুদ্রে তরঙ্গায়িত মানবিক প্রেমের উপরে আনন্দের ও কবিতার ক্ষণকিরণপাত।

আর ফিরব না এই মনে করে। এদিকে আমার বোন আত্মহত্যা করল, সে-সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছল, আমার সেই দুর্বল হৃদয় আমাকে শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সেই দুর্বল হৃদয়ই আবার—আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু সাহায্য-ভিক্ষা করতে আমাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।...শান্তি আমি চেয়েছি, কিন্তু ভক্তির আধার আমার হৃদয় তা থেকে বঞ্চিত করেছে আমায়। সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম। তাই যখন আমার নিয়তি, তবে তাই হোক!"

১৯০০ খৃীষ্টাব্দের ২৫শে অগাস্ট নিবেদিতাকে লিখলেন—'এবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি মায়ের ইচ্ছা—আমি আমার আত্মীয়দের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর আগে যা ত্যাগ করেছিলাম, আনন্দের সঙ্গে আবার তা ঘাড়ে নিলাম।'

কেবল বেদনাশ্রুই অধ্যাত্মদর্শন আনে, আনন্দাশ্রু নয়।

মুখাপেক্ষিতায় অসীম দুঃখ—শুধু স্বাধীনতাতেই সুখ।

মায়ের ভালবাসা বাদ দিয়ে প্রায় সকল ভালবাসাতেই এই বন্ধন। আত্মসুখের কামনা সেখানে—প্রেমপাত্রের সুখ লক্ষ্য নয়।

তিনি বললেন, আগামীকাল ধরা যাক তিনি মদ্যপ হয়ে দাঁড়ালেন, তাহলে কার ভালবাসার উপরে তিনি নির্ভর করবেন? শিষ্যদের ভালবাসার উপরে নয়—তারা আতঙ্কে পদাঘাত করে তাঁকে বিতাড়িত করবে। তিনি নির্ভর করবেন কয়েক-জন (সব কয়জন নয়) গুরুভাইয়ের ভালবাসার উপরে। তাদের কাছে তিনি চিরদিনই এক থাকবেন।

'আর মার্গট, মনে রেখো, যখন আধ ডজন লোক এমন ভালবাসার অধিকারী হয়, তখনই জন্ম হয় নতুন ধর্মের, তার আগে নয়। সেই নারীর কথা আমার সর্বদা মনে পড়ে, যিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে সমাধিভূমিতে দাঁড়াতেন আর একটি স্বর শুনতে পেতেন। তিনি মনে করতেন, বাগানের মালীর কণ্ঠস্বর। তারপর যীশু যখন তাঁকে স্পর্শ করলেন, তিনি শুধু বলতে পারলেন 'My Lord and my God', আমার প্রাণ, আমার ভগবান্। শুধু ঐ—My Lord and my God। ব্যক্তির অন্তর্ধান। দেহের স্তরে ভালবাসার শুরু—তখন জান্তব। তারপরে তা উন্নীত মনের বা বুদ্ধির স্তরে। পরিশেষে আধ্যাত্মিক ভূমিতে। শুধু সবশেষেই—My Lord and my God। ঐ রকম আধ ডজন শিষ্য দাও আমাকে—জগৎ জয় করে নেব।—আহা! রামকৃষ্ণ পরমহংস যদি একটা হারেম রাখতেন তাহলে তাঁর জন্য পৃথিবী কেড়ে আনতাম।

জুলাই ৫, মিস ম্যাকলাউডকে

এই স্বর্গীয় সমুদ্রযাত্রা এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ কলম্বো ছাড়ার পর থেকে শরীরের দিক দিয়ে আমার কাছে কিছুটা কষ্টকর হয়েছে। আবহাওয়া অতীব জঘন্য ছিল, যদিও যতটা মন্দ হবে ভেবেছিলাম, ততটা মন্দ হয়ে দাঁড়ায়নি। ভাগ্য ভাল থাকলে এডেনে পৌঁছচ্ছি শুক্রবার, খুব দুর্বিপাক হলে শনিবার। রাজাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে। তাঁর ঘুম হচ্ছে ভালই। ধূমপান আর বরফজল খাওয়া প্রায় বন্ধ করেছেন। ইম্পিরিয়াল গেজেটের মধ্যে ডুবে আছেন। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ের জন্য অধীর। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ বা ওঠাপড়ায় তাঁর কোনই কষ্ট হচ্ছে না, বরং ভালই বোধ করছেন তাতে। আজ সকালে বললেন, 'ঘাড় থেকে বোঝা একেবারে নামিয়ে দিয়েছি।'

অসুবিধা সত্ত্বেও এমন সব মহাগৌরব-মুহূর্ত আবির্ভূত হয়েছিল, যার জন্য যে-কেউ পঞ্চাশটি সমুদ্রঝড়ের মধ্য দিয়ে যেতে রাজি হবে। রাজপুতানা বা ভারতীয় কাহিনী দিয়ে শুরু, তাতে মাতোয়ারা; কিন্তু এখন বেশী সময় ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা। পুরনো উদাসীনতা খসে পড়েছে; আমাকে অনুভব করাতে চাইছেন, আমার উপরে সত্যই কোনো কোনো জিনিস নির্ভর করছে,—আমার মধ্যে কোনো শক্তির বিকাশ দেখার প্রত্যাশায় আছেন, ইত্যাদি। সেই সব বিষয় সাক্ষাতে তোমাকে বলব। আর সব সময়ে তাঁর সেই দাবিটি গাঢ়তর, গভীরতর হচ্ছে—'আমি বিশেষ অর্থে কালীর ছেলে।' আমার কাছে প্রতীয়মান সত্য যা—যা

দিবালোকের মত স্বচ্ছভাবে দেখছি—এ বিষয়ে তাঁকে যেন কখনো বলো না : 'কালীর সন্তান নয়—সাক্ষাৎ শিব। দেবদম্পতি!'

একটি মধুর সংবাদ তোমাকে অবশ্য করে লিখছি, ট্রাস্ট ডীড সই করা হয়নি। ......গতকাল তিনি আমাকে বললেন, সেটিকে তিনি নিয়ে এসেছেন মায়ের রক্ষা-কবচ হিসাবে, যেন মা বলতে চান, 'সব কিছু ছেড়ে দিলে নেবার মত লোক এখানে এখনো নেই; আরও অল্প কিছু সময় দায়িত্ব তোমাকে বহন করতেই হবে।' কিভাবে না বিরাট ও শক্তিশালী মানুষ চাইছেন শিষ্যরূপে! 'মানুষ চাই—আমার মানুষ চাই—দাও আমাকে',—বারবার বলছেন। 'তুমি জানো, আমি কখনো টাকা বা ক্ষমতা চাইনি—শুধু মানুষ চেয়েছি। আমার চাই-ই তাই।'

কালী বিষয়ে আমার নতুন অনুভূতি জেগেছে। কলকাতায় শেষ দিনে তা পেয়েছি যখন আমি রাজার সঙ্গে এক কালী প্রতিমার পাশে বসেছিলাম, যেটি সরিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করি।

শায়িত ঈশ্বরের আবিষ্ট দৃষ্টির অনুসরণ করে দেখলাম, তা সত্যই দেবীর নয়নের সঙ্গে মিলিত, সদানন্দ যেকথা আমাকে বলেছেন, এবং তারপর দেখলাম, কিভাবে ব্যাপারটা জগন্মাতা সম্বন্ধে স্বামীজীর দর্শনের অনুরূপ। শুধু শিবের পক্ষেই ঈশ্বরসত্যকে ঐ মূর্তিতে দর্শনের সাহস করা সম্ভবপর, শুধু শিবই পদদলিত হয়েও ঐ প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ। বুঝতে পারছ সমস্ত ব্যাপারটা কত স্পষ্ট।......

কলম্বো সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। যথেষ্ট দেরীতে এবং অসুবিধার মধ্যে আমরা মাঝ দুপুরের পরে নৌকা থেকে অবতরণ করলাম। তারপর ক্রমান্বয়ে সমাদর ও সংবর্ধনা। শেষে জেটি থেকে গাড়ি চড়ে গিয়ে আমাদের প্রবেশ করতে হল একটি বাড়িতে যার বাইরে ঢাক ঢোল ও বাঁশীর আয়োজন, ভিতরে ঠাসা লোক আর টেবিল-ভর্তি ফল। লোকের সীমা নেই। কী সতৃষ্ণ ভক্তিতে তারা স্বামীজীকে দেখছিল! কালো কালো মানুষ, অনাবৃত দেহ, আলোয় ঝক্‌ঝকে। তারপর গরম। কিন্তু তাদের যে-কারো জন্য আমি সবকিছু করতে পারতাম—স্বামীজীকে তারা যেভাবে দেখছিল—তার জন্য। স্বামীজী নিজের ইউরোপীয় পোষাকের দিকে দেখালেন—তাতে ব্যত্যয় হল না কিছুই। যে-কোনো রূপেই তিনি তাদের সেই একই অবতার। তারপর তিনি একটি ছোট ফলে কামড় দিলেন, এক গ্লাস দুধে চুমুক দিলেন (সেই সময়েও একই গ্লাস থেকে আমাকে ঢেলে দিতে ভুললেন না, পানের জন্য),[১]......তারপরে যখন যাবার জন্য চলতে শুরু

[১] বিবেকানন্দের কল্পনাতীত সাহস। আজকের ভারতবাসীকে এই সাহসের পরিমাণ বোঝানো সম্ভব নয়। দক্ষিণ ভারতে ইউরোপীয়দের সঙ্গে সর্বসমক্ষে আহার! যিনি হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছেন!! ভারতের ঐকালীন সামাজিক আচারের বিষয়ে যাঁর কিছু জানা আছে, তিনিই বুঝবেন স্বামীজীর ভ্রূক্ষেপহীন শক্তির মহিমাকে। সোস্যাল রিফর্মাররা পর্যন্ত ম্লেচ্ছ সঙ্গে একত্র আহারে সন্ত্রস্ত ছিল।

আহারাদির ব্যাপারে গোঁড়ামি নিয়ে স্বামীজী কিরকম বাস্তব রসিকতা করতেন, তার নমুনা দিয়েছেন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্বামি-শিষ্য সংবাদে'। স্বামী যোগানন্দ, শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও নিবেদিতাসহ স্বামীজী আলিপুরে পশুশালা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে সুপারিনটেনডেন্ট রামব্রহ্ম সান্ন্যাল তাঁদের আপ্যায়ন করেন।—"তথায় চা ও

করলেন তখনকার আওয়াজ যদি শুনতে—'স্বামীজী কি জয়! পার্বতীপতি কি জয়!'—কান ফেটে যাবার জোগাড়। যখন বেরিয়ে এলাম সে কী জনতা—অবতরণের কালে। আমাদের প্রথম আতিথ্যদানকারী দম্পতি বিদায় দিতে এগিয়ে এলেন অগণ্য উপহারসহ; গৃহস্বামিনী লেডী কুমারস্বামী ইংরাজ মহিলা, তাঁর স্বামী মাদ্রাজী হিন্দু—চমৎকার মানুষ। যথেষ্ট ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সরকারের শাসনপরিষদের এই মাননীয় সদস্য সকলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনবার উচ্চকণ্ঠে শিবের জয় দিলেন, এবং তারপরে তিনবার—'স্বামী বিবেকানন্দ কি নমস্কার!'[২] জনতার উচ্চধ্বনির মধ্যে আমরা বোটে করে 'গোলকুণ্ডায়' ফিরে এলাম। জাহাজে উঠে, সেখানে পুনশ্চ অভ্যর্থিত হয়ে, নিজের ক্যাবিনে যখন ফিরে গেলাম, পরমানন্দে দেখলাম—আমার কপালে তখনো পূজার টিপ রয়েছে।

জুলাই ১৩, মিস ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী জগন্মাতা সম্বন্ধে একটা দারুণ বাংলা কবিতা লিখছেন, আর আমি সারা সকাল জনৈক সহৃদয় আমেরিকান মিশনারীর সঙ্গে ভারত বিষয়ে কথা বলছি।......

আর একটা ছোট্ট কথা—মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে এসে তিনি দেখলেন একজনের হাত দেখা হচ্ছে। যথারীতি তিনি নিজের হাত দেখাতে চাইলেন। সেই নিয়ে তাঁর কিছু মজা। স্বামীজী, আপনি যদি আমার হাত দেখে দেন—তাঁকে বললাম। স্বামীজী হেসে উঠে বললেন, 'উঁহু, হাত দেখতে জানি না; তবে আমি আর একটা জিনিস

জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজী অল্পমাত্র চা-পান করিলেন। নিবেদিতাও চা-পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিস্টার নিবেদিতা-স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া উহার অবশিষ্ট শিষ্যকে পান করিতে দিলেন।"

এখানেই ব্যাপারটার শেষ নয়। বাগবাজারে ফিরে আসার পরে সকলের মধ্যে বসে স্বামীজী যৎপরোনাস্তি দুষ্ট কৌতুক করতে আরম্ভ করলেন—"কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন—'আর এক কথা শুনেছেন—আজ এই ভট্‌চায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?'"

শিষ্য অবশ্য উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন—

"শিষ্য। তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম—আপনি পান করিয়া দিলেন, কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজী। তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে—এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চায বামুন বলে মানবে না।

শিষ্য। না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি।"

[২] এই কুমারস্বামী দম্পতি পরবর্তীকালে মনীষী ও শিল্পশাস্ত্রীরূপে বিখ্যাত ডাঃ আনন্দকুমারস্বামীর পিতামাতা। পরিব্রাজকে স্বামীজী লিখেছেন—"কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙায় নেবে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-শুনা হল। সার কুমারস্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু-পায়ে, কপালে বিভূতি।...কুমারস্বামীর বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং-কোকোনাট), দু' বোতল সরবৎ ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম।"

জানি, যা হাত দেখার চেয়ে উঁচুদরের; আমি তোমার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ চাক্ষুষ করে বলে দিতে পারি।' কিন্তু বললেন, ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ করলে স্বাস্থ্যের উপর দারুণ চাপ পড়ে, আর সন্ন্যাসীর তা করার অধিকার নেই। তা করতে আমিও তাঁকে বললাম না। শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখলাম কথাটা, কেননা তোমার শুনতে ভাল লাগবে।...... কিন্তু একাজ তিনি অ্যালবার্টের জন্য করেছেন, তা মনে পড়ল আমার।

জুলাই ১৫, মিস ম্যাকলাউডকে

যখন ভারতে এসেছিলাম, ব্যক্তিমানুষরূপে স্বামীজী সম্বন্ধে আমার প্রায় কোনো নির্ভরতা ছিল না। আলমোড়ায় সেই দারুণ সময়ে যখন তিনি আমাকে তাঁর জীবন থেকে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিয়েছিলেন—তখনো মূলে কোনো পার্থক্য হয়নি। এখন ভাল হোক, মন্দ হোক, তিনিই সব কিছু—তিনি আরও বড় হয়ে উঠেছেন। আমি আমার অনুরক্তিতে নিতান্ত ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছি। তাঁর সামান্যতম খেয়ালও আমার কাছে সর্বস্ব। যদি কেউ তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়, মনে হয় তার সত্তা মুক্ত হয়ে গেল। ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমার এমন ভালবাসা সম্ভব করলেন।

জুলাই ১৯, মিস ম্যাকলাউডকে

রাজা তাঁর বাংলা পত্রিকার জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মত খাটছেন ক্যাবিনে বসে।...বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশীর্বাদের মত হয়েছে, তোমাকে তা বলা দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এর জন্য একটি দীর্ঘপত্র রচনা করছেন—মজাদার রসিকতায় তা পূর্ণ, সেইসঙ্গে টিপ্পনী ও মন্তব্য এবং আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। বিদেশীয়ানা, ব্রাহ্মপদ্ধতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত রোষ, জনগণের প্রতি নিবিড় আশা ও ভালবাসা, গুরুর প্রতি দীপ্ত ভক্তি, চারিপাশের জীবন বিষয়ে ব্যাপক সন্ধানী দৃষ্টি,—সর্বোপরি বাংলা ভাষার উপরে কিছু ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন, যার ফলে তাঁর লেখা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠছে, যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাবকালের রচনা, যা সৃষ্ট হয়েছিল দারুণ কোনো লক্ষ্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে!!![1]

---

১ নিবেদিতা স্বামীজীর যে বাংলা পত্রিকার কথা বলেছেন, তা উদ্বোধন, এবং 'দীর্ঘপত্র' হল উদ্বোধনে প্রকাশিত 'বিলাতযাত্রীর পত্র', যে-নাম উদ্বোধনে প্রকাশকালের শেষের দিকেই পরিবর্তিত হয়ে 'পরিব্রাজক' হয়। এই নাম পরিবর্তনের হেতু, আমাদের অনুমান, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থটি, যার বিষয়ে স্বামীজী জানতে পারেন, কিংবা জার্নালেও ভুলে যেতে পারেন। এই নামসাদৃশ্যের প্রতি কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই হয়ত নামটি বদলে দেওয়া হয়।

উদ্বোধন পত্রিকার প্রতি স্বামীজীর মমত্বের নানা পরিচয় তাঁর পত্রাদিতে ছড়িয়ে আছে। অর্থকষ্টে যখন পত্রিকা চলা ভার হয়ে দাঁড়াল, তখন স্বামীজী তাঁর ভ্রমণকথা পত্রিকার জন্য লিখতে আরম্ভ করলেন (তৎসহ সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দও নিশ্চয় ছিল), এবং লেখাটি ভালভাবে বিজ্ঞাপিত করে প্রকাশ করলে পত্রিকার বিক্রী বাড়বে, এমনও বলেন।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে অসামান্য সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যের ইতিহাসে প্রথম পর্বায়ে স্তম্ভস্বরূপ এই গ্রন্থটি অপরপক্ষে সাহিত্যগুণেও প্রথম শ্রেণীর। সম্ভবত এ জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। বিশাল প্রতিভার এমন স্বচ্ছন্দ লঘু ও গভীর

তারপর কালীর উপরে তাঁর বিরাট কবিতা। তার একটি লাইন,—আহা তাঁর কণ্ঠে নাটকীয় আবৃত্তি যদি শুনতে,—

(আমি সেই নির্বোধদের একজন নই, যে—)

'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।'[১]

ধূমপান প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, জল প্রায় খান না। এ সবের উপরে, তিনি রাজা, আমার কাছে তিনি একসঙ্গে মা ও শিশু। আহা, পৃথিবীর এই মহানতম

লীলা একই পাত্রে, বাংলা সাহিত্যে পূর্বে দেখা যায়নি। বইটি এখন বাংলা সাহিত্য সমালোচকদের দ্বারা বহু আদৃত; এখানে এইটুকু শুধু যোগ করা যায়, বইটির প্রথম সাহিত্যিক সমালোচনার গৌরব সম্ভবত নিবেদিতার। রচনা চলাকালেই *পাণ্ডুলিপি পড়ে* বা শুনে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তার যাথার্থ্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। নিবেদিতার মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী বিশেষ উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের উপরে উৎপীড়ন করেছিলেন।

[১] *কবিতাটির উল্লেখ ১৩ই জুলাই, এবং ১৯শে জুলাই—এই দুই তারিখের চিঠিতেই* পাই। কবিতাটি ১৩ই বা তার অল্প আগে লেখা আরম্ভ হয়, দু'একদিনের মধ্যে শেষ হয়। ১৯শের মধ্যে শেষ হয়েছিল নিশ্চিত। এটির নাম 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। স্বামীজী Kali the Mother কবিতাটি প্রেরণার ক্ষণে লিখেছিলেন। তার মধ্যে অনুভূতিলোকে অপরোক্ষকৃত মহাকালীর প্রলয়চ্ছবি চিত্রিত। ঐ কবিতার মূল দর্শনকে স্বামীজী এই বাংলা কবিতার মধ্যে বাস্তব সংসারের নানা রূপের পটে স্থাপন করে দার্শনিক বক্তব্য-প্রধান করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে মাতৃভক্ত বীরসন্তানগণের প্রতি বীরেশ্বরের আহ্বানধ্বনিও ঘোষিত হয়েছে সমুদ্রকণ্ঠে। তেমন কয়েক ছত্র আমরা উধৃত করছি :

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্‌ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম্‌, বব-বব-বম্‌—বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল, বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা, লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায় আসোয়ার ঘোড়া হাতি॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থর্‌থর্‌, লক্ষ অশ্ববরপৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলাবরিষণ গুলি স্বন্‌ স্বন্‌, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥
আগে যায় বীর্যপরিচয় পতাকা নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্র মুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির-উদগার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনী, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে॥......

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে।
দুঃখভার এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

আত্মাকে অর্চনা করবার সুযোগ যারা পেল না, তাদের জীবনের কোনো মূল্য আছে কি?

এখন ডায়েরীর কথা।......ডায়েরীর নাম দিয়েছি 'De Gabriete'—(of Gabriel), যার অর্থ—'আমি গ্যাব্রিয়েল, যে দাঁড়িয়ে আছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে।'

আমাদের আচার্যদেবের পক্ষে 'গ্যাব্রিয়েল' আখ্যাটি সুন্দর হবে—শান্তি ও দিব্য-দর্শনের দেবদূত যিনি, যিনি মানবসমাজের জন্য পবিত্রতার মহান শুভ্রপদ্ম এনেছিলেন।

ওগো প্রিয় য়ুম, ইংলণ্ডের ভূমি স্পর্শ করবার আগামী ক্ষণটিকে কী যে আতঙ্কের চোখে দেখছি! তখন সে আমার পূজার এই দীর্ঘ ভাবোন্মাদনার অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। তখন যেন প্রাণের কোরকে যে-জিনিস একজনের জন্য সানন্দে রক্ষা করেছি, তাকে সজোরে উন্মাটিত করে দিতে হবে অন্যের কাছে। কী স্বার্থপরতা আমার! এসব কথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে, তবু জানি, প্রিয়তমা তুমি, তোমার অনন্ত ধৈর্যের মধ্যে আমার এই মনোভাবেরও ঠাঁই হবে।......

তিনি বললেন : আমার মত মানুষেরা চরমের সমষ্টি। আমি প্রচুরতম খেতে পারি, একেবারে না খেয়ে থাকতে পারি; অবিরাম ধূমপান করি, আবার তাতে সম্পূর্ণ বিরত থাকি; ইন্দ্রিয়দমনে আমার এত ক্ষমতা, অথচ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যেও থাকি;—নচেৎ দমনের মূল্য কোথায়!

জুলাই ২১, মিস ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী আজ একটু অসুস্থ, একটু অস্থির। আমার বিশ্বাস এখন তিনি সুখনিদ্রায়। ওগো প্রিয় য়ুম, তাঁকে কী যে ভালবাসি আর পূজা করি। ইচ্ছা হয় তিনি বলেন, তোমার হৃদয় উৎপাটিত করে উৎসর্গ কর আমাকে!

অগস্ট ৩, মিস ম্যাকলাউডকে

তিনি বলেন, পরিস্থিতি নিজেই নিজের রূপ নেবে। "মা-ই সব জানেন।" স্বস্তি! "মা" সত্যই জানেন। কী আশ্বাস একথা ভাবতে যে, কেউ "মা"র সঙ্গে এবং তাঁর (স্বামীজীর) সঙ্গে সর্বদা আছে যেখানে অপরের ঈর্ষা বা সমালোচনার দাম কানাকড়িও নয়। "যে পাথরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তা আমার চেয়ে অনেক বড়।"......

য়ুম, সেদিন রাত্রে মিসেস 'এফ', এবং মিস্ 'জি'-এর সাক্ষাতে তিনি অপূর্ব সব কথা বললেন। আট বছর যখন তাঁর বয়স, তখনই সমাধিমগ্ন হতেন, যদিও জানতেন না তা কি! আমি মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, তার রূপ তাঁর জানা আছে :

'বার কি পনের বছর আগে পাহাড়ের কোলে (হৃষীকেশে) একটা ছোট কুটীরে তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ ও আমি আছি। আমি জ্বরে মরণাপন্ন—ক্রমে শেষ অবস্থা ঘনিয়ে আসছে—এক সময় এল যখন আমার কাঁধ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—আমি মৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি...ক্রমে...ক্রমেই...তারপর আবার ফিরতে শুরু

করলাম। আমার কিছু করবার আছে।...যখন চেতনা ফিরে পেলাম, তুরীয়ানন্দ তখন চণ্ডীপাঠ করছে, আর সারদানন্দ কাঁদছে।'

তুরীয়ানন্দের কাছে ব্যাপারটার উল্লেখ করাতে তিনি বললেন, 'সত্যই অলৌকিক। উনি অলৌকিকভাবেই আরোগ্যলাভ করেছিলেন।'

সেদিন রাত্রি ছিল অন্ধকার ও ঝঞ্ঝামুখর। ভয়ংকর সময়ে, যখন তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর মৃত্যু হচ্ছে—একজন সন্ন্যাসীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গিয়েছিল দ্বারের বাহিরে—'ভয় পেয়ো না ভ্রাতৃগণ!' ঘরে প্রবেশ করে স্বামীজীর দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, তিনি একটা ওষুধ জানেন, যাতে আরোগ্যলাভ হবে—কোথায় পাওয়া যাবে, তাও তিনি জানেন। তা কিন্তু অনেক দূরে। তুরীয়ানন্দ পর্যন্ত স্বামীজীকে নাড়াচাড়া করতে ইতস্তত করছিলেন (স্বামীজী ঘুমুচ্ছিলেন; তুরীয়ানন্দের তখন সেবা করার পালা)। তখন আর একজন সন্ন্যাসী এসে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ওষুধ এনে দেবেন বললেন। ওষুধ আনার পরে তুরীয়ানন্দ সেটি খাওয়ালেন, পাঁচ মিনিট পরে মৃত্যুকে সরিয়ে জীবনের পুনরাবির্ভাব—ঐ তো তিনি এখনো বর্তমান...।

সমাধি সম্বন্ধে কিন্তু হিন্দুর আকাঙ্ক্ষার কথা বললেন—হিন্দু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেতন থেকে ঈশ্বরের স্মরণ করতে চায়। "যার ধ্যানে জীবন শেষ করবে, তাই দিয়ে শুরু হবে পরবর্তী জীবন।"

প্রাণের য়ুম, এই চিঠিগুলো অবশ্যই রক্ষা করো, যাতে পরে এগুলি পড়ে ডায়েরীর ধারা রক্ষা করতে পারি।...

...স্বামীজী বারবার বলেছেন, আমাকে আমার হৃদয়ের গভীরে নেমে সন্ধান করতে হবে প্রেরণার; তা পাবার পরে তাকেই বিশ্বাস করতে হবে আমাকে, আর কিছুকে নয়।...

অগস্ট ১২, মিস ম্যাকলাউডকে

কুক (শিল্পী এবেনিজার কুক) সেন্ট ফ্রন্সিস সম্বন্ধে আর্ল বার্নফের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলেন। ভাষণের পরে চার্চের সিঁড়িতে যখন দাঁড়িয়ে আছেন, ই. টি. এস. (মিঃ স্টার্ডি) তাঁর কাছে এগিয়ে এসে নীচু স্বরে বললেন, 'আর একজন খৃষ্টের জন্মের জন্য পৃথিবী প্রস্তুত, একথা কি আপনার মনে হয় না?' উত্তরে কুক বললেন, 'আপনি কি স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন?'

অগস্ট ১৭, মিস ম্যাকলাউডকে

নিম্-এর ভাবী স্বামী সম্বন্ধে আমি খুশী। সে আচার্যদেবের পাদমূলে নত হয়েছিল,—আমার মা, নিম, রিচ (ভাই)—সকলেই। সবই অপূর্ব।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মিস্ মুলারের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে আমার। ভাবতে চাই তিনি ব্যর্থ হোন, তবু যেন বিশ্বস্ত থাকি। যদি তিনি সাধারণ মানুষের মত হতেন, অপরিচিত, ঘৃণিত, অন্যের ভালবাসাহীন—তাহলে তাঁকে ভালবাসার মূল্য থাকত। কিন্তু এখন যা তিনি—তাঁকে ভালবাসা কি এমন কথা, যাঁর জন্য আকাশের তারকারা পর্যন্ত প্রতিধ্বনিতা করবে। যে-ঘরে তিনি ছিলেন, যে-চেয়ারে

বসেছিলেন—সে সবই যেন বিশ্বের মহাকেন্দ্র। সুতরাং প্রিয় য়ুম, দেখতে পাচ্ছ, আমরা ঐশ্বর্যবানকেই ভালবেসেছি। কল্পনা করো, স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁর বিরুদ্ধে, আর আমরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছি—সেই আনন্দকে।......

তাঁকে পূজো করা ছাড়া উচ্চতর আর কোন্ কাজ আছে? তাঁর চরণতল ছাড়া মহত্তর আর কোন ঠাঁই আছে কামনা করবার?

আমার হয়ে তুমি তাঁকে পূজো করবে, যেমন তোমার হয়ে আমি করেছি,—যখন তিনি তোমার কাছে হাজির হবেন।

অগস্ট ২৩, স্বামী বিবেকানন্দকে

প্রিয় রাজা,

আর কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি নিউইয়র্কে পৌঁছবেন, যেখানে আমার বিশ্বাস য়ুম স্বয়ং আপনার সঙ্গে মিলিত হবেন।

আমি বিশেষভাবে আশা করি, আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হবার মত সমুদ্র যথেষ্ট আলোড়িত ছিল। Londondy থেকে চিঠি পাওয়া গভীর আনন্দের বিষয় হয়েছে, কিন্তু আমি ডেট্রইটে কারো ঠিকানা জানি না বলে মিসেস ফাঙ্ককে তার জন্য ধন্যবাদ দিতে পারি নি। য়ুম, তাঁর বোন, এবং মিসেস বুলের সঙ্গে রিজলিতে যথার্থ শান্তির মধ্যে আপনার দিন চমৎকার কাটবে মনে করি। তার সব কিছু কিভাবে না আপনার আনন্দের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে! ভাগ্য বটে—আপনার ওখানে যাওয়া এবং অন্য সকলের ক্যাম্পে থাকা একই সময়ে ঘটল। গতকাল হ্যামন্ডদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা মিসেস হ্যামণ্ডের সঙ্গে একলা কাটাতে পেরেছিলাম রাত্রে এখানে। অপরূপ সে। মনে হল, সে যেন ভক্তিতে স্পন্দিত বিদ্যুতাধার। সে বলল, আপনাকে প্রথম দেখা মাত্র, যে-মুহূর্তে আপনি ক্লাসরুমে প্রবেশ করেছিলেন, তখনই তার জীবনে আপনার তাৎপর্য তার কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল, এবং সে তার স্বামীকে বলেছিল,—'এই সেই মানুষ যার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করে আছি।' তার 'ভিশন্' সম্বন্ধে সে বলল, সে আপনাকে বলেছে, 'আমি মিঃ স্টার্ডির মতই নিষ্ক্রিয়।' সে বলল, 'এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকতে পারে না। তা করা হয়েছে— ফলে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে এখন!' হয়ত খুব ভুল বলব না যদি বলি, হ্যামণ্ডরা, এবং টমসন, সেভিয়ারদের পথ মোটামুটি গ্রহণ করতে পারে ভবিষ্যতে।

আপনার শিষ্যা ইপসন-এর মিস্ ফ্রান্সিস উইলিয়ামস্ সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। যে-শান্তি ও জীবনের তাৎপর্য আপনি তার জীবনে দিয়েছেন—কখনো বক্তৃতার ইতস্তত দু'একটি বাক্যের দ্বারা, তারপরে হৃদয়ে মনোনিবেশ করা বিষয়ে সামান্য দু'একটি কথার দ্বারা—তার সম্বন্ধে তিনি গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন। এসবের অর্থ কি, কিভাবে এসব সাহায্য করেছে তা তিনি বলতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর জীবন যথার্থ তৃপ্ত হয়েছে, শান্তি পেয়েছেন তিনি। জোর করে কাজের জন্য এক গিনি দিলেন, যা দিয়ে পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট খুলেছি। আমাদের সাহায্য করতে পারলে বাঁচার কিছু অর্থ হয়—তিনি বললেন। আহা রে! তিনি ভারতের কথা শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু আমি যখন আবিষ্কার করলাম, তিনি কোনো এক

সময়ে কনভেন্টে ছিলেন, তখন আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলাম।

মিঃ কিং-এর চিঠি আপনাকে পাঠালেও আপনি অ্যাসিরিয়া-তত্ত্ব এবং মিসর-তত্ত্বের কোনো বইয়ের তালিকা আমাকে এখনো পাঠাননি। যাই হোক, সেগুলির অর্ডার আমেরিকা থেকে সহজেই দেওয়া যায়, এবং আপনি ম্যাসপেরোর...পেয়ে যাবেন।

মিসেস কলস্‌টনের কাছে লেখা মিস পোস্টারের এক চিঠি আজ সকালে পড়ে বেশ সজীব বোধ করছি। চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'রমাবাঈ এখানে এলে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম এই আশা করে যে, একজন খাঁটি মহিলাকে দেখব, এবং তাঁর কাজের বিষয় শুনব। কিন্তু যখন দেখলাম তিনি উগ্রচণ্ডা নারী ছাড়া কিছু নন, আদি ও অকৃত্রিম গরল উদ্‌গীরণ ছাড়া যাঁর কিছু করার নেই, তখন আমার হতাশা অনুমান করতে পারেন।' আমার সামরিক নাসিকায় এ যদি যুদ্ধাগ্নির গন্ধস্পর্শের মত কিছু নাও হয়, তবু এর থেকে লৌকিক পরিতৃপ্তি যে পেয়েছি, তাতে সন্দেহ নেই।

৭ই সেপ্টেম্বর আমি গ্লাসগো বা লিভারপুল ছাড়ব (যেখান থেকে টিকেট পাই)। তার জন্য বিয়ের পরেই রাত্রির ট্রেন ধরতে হতে পারে। আগামী কাল আমার ভাগ্যের বিষয়ে জানবার ভরসা রাখি; কিন্তু যদি পরিকল্পনামত কাজ করে উঠতে পারি, তাহলে নিউইয়র্কে পৌঁছচ্ছি ১৭ই সেপ্টেম্বর নাগাদ, অ্যালান লাইনের মঙ্গোলিয়ানে করে।

এম. তাঁদের ভালবাসা জানিয়েছেন মিঃ ও মিসেস লেগেটকে। মিঃ ম্যাকনীল মনে করেন, এই বসুন্ধরার মালিকানা ইংরেজ ও আমেরিকানদের—মেরুদণ্ডহীনদের পরিবর্তে। কিন্তু যখন আমি আমেরিকায় মানুষকে ব্যক্তিগত আক্রমণের স্বাধীন অধিকার সম্বন্ধে কিছু তথ্য শোনালাম, তখন তিনি বললেন, তিনি অবশ্যই তাঁর মত পুনর্বিবেচনা করবেন—আমেরিকানদের সম্বন্ধে।

এই ধরনের মানুষ, যাঁরা দলীয় গণ্ডীর বাইরে থাকেন, এঁদের দ্বারা আপনার মর্যাদার সহজ শান্ত স্বীকার ইংরেজ জীবনের এক অত্যন্ত স্নিগ্ধ অংশ—কি বলেন!

আপনার কন্যা,
নিবেদিতা

অক্টোবর ১২, মিস ম্যাকলাউডকে

বৃহস্পতিবার সকাল। প্রিয় প্রিয় য়ুম! এক বছর—এক বছর আগে! বরমুলো—জগজ্জননী—এবং বিদায়!

তুমি চলে যাবার পর থেকে আমাদের মধুময় আচার্যদেব—তাঁর বিষয়ে কোন্ ঐশ্বরিক আখ্যা যথেষ্ট হতে পারে!—ছন্নছাড়া বালকের মত, ধূমপান ভুলেছেন, আর বলছেন, 'এই ঈশ্বর-খ্যাপামি চলে যাক; রামকৃষ্ণ পরমহংস পাগল ছিলেন, তাঁর উপর শয়তান ভর করেছিল, তিনি আমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।' সবসময় মিসেস বুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন। আর এইসব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর-দ্যুতি বিকিরিত হচ্ছে—তুমি জানো। গত রাত্রে সহসা দশ মিনিটের জন্য মীরাবাঈ

—কিভাবে তাঁর স্বামী তাঁকে বৃন্দাবনে বিরাট মন্দির তৈরী করে দেবার কথা দিয়েছিলেন যদি তিনি বাইরে ঘুরে না বেড়ান। তাতে আমি বললাম, 'সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না কেন?'—নির্বোধের মতই বললাম। তিনি দীপ্ত হয়ে বললেন, 'তিনি এই পাঁকের জীব না কি? সম্মান ও রাজ্যের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁর স্বামীর ক্ষুদ্র যুক্তি কি তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল? ঐ লোকটির পক্ষে কি নিজেকে তাঁর স্বামীরূপে জাহির করা স্থূল, নিতান্ত পশুজনোচিত ব্যপার ছিল না—সত্য নয় কি?'

অক্টোবর ১৩, সকাল এগ্যারোটা। দেড়ঘন্টা ধরে এপাশ থেকে ওপাশে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করেছেন—আমাকে সতর্ক করেছেন তথাকথিত ভব্যতা, "মনোরম", "সুন্দর"-এর বিরুদ্ধে,—বহিরঙ্গ বিষয়ের ধারাবাহিক অনুভূতির বিরুদ্ধে। "হিমালয়ে চলে যাও"—বারবার বলতে থাকেন। "আবেগহীনভাবে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি কর। তা করতে পারলে পৃথিবীর উপরে বজ্রের মত ফেটে পড়তে পারবে। যারা বলে, কেউ কি আমাদের প্রচারে কর্ণপাত করবে—তেমন মানুষের প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। যার সত্যই কিছু বলার আছে, তার কথা পৃথিবী শোনেনি, এমন হয়নি এ পর্যন্ত। নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে ওঠো। তা কি করতে পারো—পারবে? তাহলে হিমালয়ে চলে এসো—সেখানে শেখো।" তারপরে তিনি শঙ্করাচার্যের বৈরাগ্যের ষোড়শ শ্লোকের আবৃত্তি করে চললেন, ধুয়াটি প্রতিবার গুন্‌গুন্ করে বললেন—Therefore you fool, go and worship the Lord.

কথনো কথনো সেটিকে বদলে বলতে লাগলেন—Therefore Margot you fool! সমাজ ও পরিবারের তুচ্ছ সম্পর্ক ছেদন করতে, ইন্দ্রিয়ের নিরন্তর প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মার শক্তিকে দৃঢ় করে ধরে রাখতে, বাসন্তী পুষ্পোদ্গমের উন্মাদনাকে কোমল শয্যা বা উত্তম ভোজনের মতই সম ইন্দ্রিয়ভোগ বলে অনুভব করতে, লোকের নিন্দাপ্রশংসাকে তুচ্ছ করতে—এইসব কিছু করার আদর্শই তিনি তুলে ধরেছিলেন। বারবার বললেন, 'তিতিক্ষার অভ্যাস করো'—অর্থাৎ শরীরের পীড়া বহন করো তার নিরাময়ের চেষ্টা না করে—সে বিষয়ে চিন্তাও না রেখে। কুষ্ঠরোগে যে-সন্ন্যাসীর আঙুল খসে যাচ্ছিল,—যিনি খসে-পড়া রোগকীটটিকে সযত্নে অবশিষ্ট অঙ্গুলী-সন্ধিতে স্থাপন করার জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁকেই দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করেছিলেন।

গতরাত্রেই একই প্রকারে বলেছিলেন দুঃখকে ভালবাসা ও মৃত্যুকে আলিঙ্গনের কথা।......

গতকাল শিবের বিষয়ে বলতে লাগলেন। মুক্তস্বরূপের কাছে ধ্যান পর্যন্ত বন্ধন। কিন্তু শিব পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সেই ধ্যানেই মগ্ন থাকেন। তিনি নিত্য অবতার। হিন্দুরা বিশ্বাস করে এইসব মহান স্বরূপের ধ্যান ও প্রার্থনা ভিন্ন পৃথিবী ভেঙে টুকরো হয়ে যেত তৎক্ষণাৎ (অর্থাৎ অন্যেরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেত না, ফলে স্বাধীনতাও পেত না), কারণ ধ্যানই হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্ভবপর সেবা—সবচেয়ে প্রত্যক্ষ সেবা।

তিনি হিমালয়ের তুষারের বিষয়েও বলছিলেন, সেই তুষারে বনভূমির সবুজে

ধারা কিভাবে বিগলিত হয়ে মিলিত হয়ে যায় সেই কথা—'মহাদেবের দেহে প্রকৃতির নিত্য সতীদাহ'—কালিদাস উদ্ধৃত করে বললেন। অপূর্ব—নয়? পুরুষের জন্য প্রকৃতির চিরন্তন তনুদান! এক বিশেষ মেঘ সম্বন্ধে কালিদাসের আর একটি ছত্র: পশ্চিম দিগন্তরেখায় ক্ষীণ চন্দ্রের মত তা শায়িত।

অক্টোবর ১৮, মিস ম্যাকলাউডকে

শুক্রবার মধ্যাহ্নভোজনের কালে স্বামীজী আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বললেন। নিজেকে ধিক্কার দিলেন—কিভাবে সেইসব দিনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে তাঁর চিত্ত বিষাক্ত ছিল, যার জন্য কেবলই প্রশ্ন ও যাচাই করেছেন—ঐ মানুষটি পবিত্র কিনা। ৬ বছর কেটে যাবার পরে তিনি বুঝতে পারলেন— 'পবিত্র' তিনি ছিলেন না, ছিলেন স্বয়ং পবিত্রতা। হাসিতে আর মজায় ভরপুর থাকতেন, অথচ তাঁর কাছে তখন সাধু ব্যক্তির পক্ষে বিপরীত আচরণই যেন প্রত্যাশিত ছিল!!......

আমরা মজা করে স্বামীজীকে খোঁচাতে লাগলাম (মধ্যাহ্ন ভোজনের আসরে): ধর্মাচার্যের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর বেপরোয়া উদাসীনতা, আর পোর্ট্রেট আঁকার ব্যাপারে তাঁর বিপুল গর্ব! (তিনি আমার তিন-চারটি পোর্ট্রেট এঁকে ফেলেছেন; সেগুলি, অন্য সকলে বলছে যে, এমনকি আমার চেহারার পক্ষেও মানহানিকর! কিন্তু তাঁর তো স্ফূর্তির সীমা নেই—মিষ্টি রাজা!)। সহসা তিনি ঝাড়া দিয়ে উঠে বললেন, 'দেখ Love একটা কথা আর Union আর একটি কথা। Love-এর চেয়ে Union অনেক বড় জিনিস।

'ধর্মকে আমি ভালবাসি না, আমি অভেদ তার সঙ্গে। সেটাই আমার জীবন। যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয়েছে, যার মধ্যে মানুষ যথার্থ কিছু করেছে, তাকে সে ভালবাসে না; আমরা সেটাকেই ভালবাসি যা আমার সঙ্গে এখনো বিচ্ছিন্ন। আপনার স্বামী (ওলি বুলকে বললেন) সঙ্গীতকে ভালবাসতেন না, যা তাঁর জীবনের সদা-ভিত্তি, তিনি ভালবাসতেন ইঞ্জিনীয়ারিংকে, যেটা তিনি অপেক্ষাকৃত কম জানতেন। ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে এখানেই তফাৎ। এইজন্যই জ্ঞান ভক্তির চেয়ে বড়।......

লাঞ্চের আগে তিনি আমাকে নিয়ে প্রথমবারের জন্য গেলেন মিসেস ভগ্যানের সাক্ষাতে; ফেরার পথে পত্নীপূজার বিরুদ্ধে ফেটে পড়লেন। মাতৃত্ব অনেক বড় পত্নীত্বের চেয়ে। 'আমরা, প্রাচ্য দেশের লোকেরা, দু'একটা জিনিস জানি। বিবাহ বিরাট তপস্যা ছাড়া কিছু নয়।'

এর পরে কোন্ কথা বলি? রবিবার সন্ধ্যায় মিসেস শহ্ শেষবারের জন্য এখানে নৈশ আহার করলেন। আমরা শোপেনহাওয়ারের নারী বিষয়ক উক্তি সশব্দে পড়লাম, এবং মিসেস শহ্-কে আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেলাম; স্বামীজী আর তুরীয়ানন্দ আমাদের পাহারাদার হিসাবে চললেন। তাঁকে ছেড়ে আসবার পরে আমি মৃদুস্বরে স্বামীজীকে বললাম,—গভীর রাত্রে এমনকি নিজের পদশব্দ পর্যন্ত আমি সইতে পারি না। অপূর্ব চন্দ্রালোকিত রাত্রি; আমরা গাছে-ঢাকা পথ ধরে নীরবে ফিরতে লাগলাম—একটি শব্দও যেন ভাবাবহ ভঙ্গ করত। তারপর স্বামীজী বললেন, ভারতে গভীর রাত্রে শিকারের সন্ধানে বাঘ যখন বেরোয়, যদি তার লেজ বা থাবার সামান্যতম শব্দও হয়, সেগুলিকে ক্রোধে সে দংশন করে, রক্তাক্ত

না হওয়া পর্যন্ত। তারপর বাতাসে গা মিলিয়ে কিভাবে যায় বোঝালেন। তারপরে তিনি পাশ্চাত্য নারীদের পক্ষে শান্তভাবে সৌন্দর্যকে আত্মসাৎ করে পরে অন্য সময়ে মনে মনে তার অনুবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন।

মিসেস ভগ্যান-প্রদত্ত পাঠ থেকে তোমার জন্য নচিকেতা-উপনিষদের একটি ছত্র রেখে দিয়েছি : 'বাসনার যখন বিলয় হয়েছে, ছিন্ন হয়েছে হৃদয়গ্রন্থি, তখনই অমরতা পেয়েছে মানুষ।'

কিন্তু আহা!—সোমবারের অপরাহ্নটি! মিসেস ব্রিগস্ ও আমি সোফা ও মেঝের উপরে বসে; তিনি শুধু বলে চললেন—চললেন—চললেন—যে-কালে তোমার দেবদূতীর মত বোনটি (মিসেস লেগেট) সকলকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। যেন ভারতে আছি আমরা তখন। যেসব মানুষ অদ্বৈতবাদ ও বৈদিক সাহিত্য পছন্দ করে তাদের কাছে আমার নিজেকে খুবই ছোট মনে হত, কিন্তু সেদিন তার ভিন্নপক্ষের কী রূপই না দেখলাম।

শুরু হল রামপ্রসাদের গান দিয়ে। তোমাকে কথারম্ভের সমস্তটাই দিতে চাই, বিনা ছেদে :

যে দেশে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা জেনেছি॥

ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তারে দিয়ে, মা,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

নূপুরে মিশায়ে তাল
সেই তালের এক গীত শিখেছি।
তাধিম তাধিম বাজছে সে তাল
নিমিরে ওস্তাদ করেছি॥

প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি
উভয়ে মাথায় রেখেছি,
আমি কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম
ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

From the land where there is no night
Has come unto me a man.
And night and day are now nothing to me.
Ritual worship is become for ever barren.

My sleep is broken. Shall I sleep any more?
Call it what you will, I am awake.
Hush! I have given back sleep unto Him whose it was.
Sleep have I put to sleep for ever.

The music has entered the instrument,
And of that mode I have learned a song.
And that music is always playing before me.
And concentration is the great teacher thereof.

Prasad speaks—Understand O Mind these words of science,
The secret of Her whom I call my Mother,
Shall I break the pot before the market?
Lo the 6 philosophies could not find the Kali.

"রামকৃষ্ণ পরমহংস একটি দীর্ঘ শ্বেতসূত্র তাঁর ভিতর থেকে নির্গত হতে দেখতে পেতেন, শেষপ্রান্তে পৌঁছে—আলোকরাশি। তারপর সেই আলোকপুঞ্জ বিদীর্ণ হলে দেখা যেত বীণা হস্তে জননী তার মধ্যে বিরাজিতা। জগজ্জননী বীণা বাজাতে শুরু করতেন। তারপরে সুরগুলি পশুপাখীর রূপ ধারণ করত, পৃথিবীর সৃষ্টি হত, সুষমায় বিন্যস্ত হত সবকিছু। তারপরে মাতা বীণা বন্ধ করতেন, আর অদৃশ্য হয়ে যেত সমস্তই। জ্যোতি অস্পষ্ট হয়ে আসত ক্রমে, পরিশেষে আলোকপুঞ্জ, সূত্র আরও হ্রস্ব, তারপরে নিজের মধ্যে বিলীন......

"কী অপরূপ দৃশ্য ভেসে আসে আমার চোখের সামনে—আমার সারা জীবনের অপরূপতম দৃশ্যগুলি। পূর্ণ নৈঃশব্দ্য, শৃগালের চীৎকারে শুধু সে নীরবতা কচিৎ বিঘ্নিত, অন্ধকারে দক্ষিণেশ্বরের বিরাট পঞ্চবটীর আসন। রাতের পর রাত, সারা রাত, আমরা সেখানে বসেছি,—তখন আমি বালক—তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে গেছেন।"

"আপনি কি তাঁর পাশে বসতেন, না সামনে, স্বামীজী?"

"উভয় রকমেই। সে তো কয়েক দিনের বা কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার নয়,—বছরের পর বছর!!—হরি ওম্! হরি ওম্!"

হাঁ য়ুম, ৬ই অক্টোবরের পরে, এক বছর পরে, তাঁকে আবার ঐ পুরনো মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুনলাম—'হরি ওম্! হরি ওম্!'

তিনি বলে চললেন।—"গুরুই শিব; তাঁকে শিবের মত পূজা করতে হয়, কারণ তিনি বৃক্ষমূলে বসে শিক্ষা দেন, অজ্ঞান তিমিরান্ধকার নাশ করেন। সব কিছুই উৎসর্গ করতে হবে. নচেৎ শুভকর্ম পর্যন্ত বন্ধনের সৃষ্টি করে কর্মফল সঞ্চিত করবে। হিন্দুরা এক ভাঁড় জল দিলেও বলে পৃথিবীকে, পৃথিবীকে, কিংবা জগন্মাতাকে! কিন্তু একটি মাত্র সত্তা আছেন যিনি বিনা ক্ষতিতে সব কিছু গ্রহণ করতে পারেন. যিনি অক্ষয়, অব্যয়, অজর. অমর; যিনি পৃথিবীর গরল পান করে নীলকণ্ঠ—সেই শিবকে সব কিছু দাও।"

তারপর বৈরাগ্যের কথা : "যৌবনে আত্মোৎসর্গ কী মহান্ (এই প্রসঙ্গে রাত্রে আবার এলেন এবং অ্যালবার্টকে আত্মোৎসর্গের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ), আর কী দুঃখজনক যদি বার্ধক্যই দেবার থাকে! যারা বার্ধক্যে আসবে তারা নিজের মুক্তি পাবে, কিন্তু অনেকের পথদ্রষ্টা গুরু হতে পারবে না, আর যারা যৌবনে আসবে তারা নিজেদের লাভ ছাড়াও বহুজনকে বহন করে নিয়ে যাবে।"

তারপর বিদ্যালয়ের বিষয়ে : "মার্গট, তোমার ইচ্ছামত শিক্ষা দাও। A. B. C-র জন্য বেশী ব্যস্ত হয়ো না— ওগুলির মূল্য সামান্য। যত পার তাদের রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, শিব, কালী শেখাও। আর এইসব পাশ্চাত্ত্যের লোকদের ঠকিয়ো না, কদাপি তাদের বলো না যে, তাদের অনুরূপ A. B. C, তাদের শিক্ষাপদ্ধতি দেবার জন্য তুমি টাকা চাইছ। বলো যে, পুরনো ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা শিক্ষাই তুমি দিতে চাইছ। সাহায্য দাবি কর, তাকে কিনবার চেষ্টা করো না। মনে রেখো, তুমি মায়ের দাসী। যদি তিনি তোমাকে কিছু না দেন, কৃতজ্ঞ বোধ করো যে, তিনি তোমাকে মুক্তি দিলেন। আমি তো চাই, মা আমাকে মুক্তি দিন।"

[ভক্তি, বৈরাগ্য ও ভাবাবেশের এক অপরূপ অবস্থায় স্বামীজী এইকালে ছিলেন। রামপ্রসাদের গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি তাঁর উদ্দীপনের কাজ করেছে। আধ্যাত্মিক অভিমানে অস্থির হয়ে স্বামীজী বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল ছিলেন, তাঁর উপর শয়তান ভর করেছিল, তিনি আমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন, ইত্যাদি। কোন্ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে চূর্ণ করে তারই ধূলি দিয়ে নূতন মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, তার কিছু বিবরণ আমরা উপস্থিত করছি কথামৃত থেকে, বিশেষ করে এইজন্য যে, স্বামীজী-গীত ঐ 'ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই' গানটি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়েছিলেন সেক্ষেত্রে, যার পটভূমিকায় ছিল নরেন্দ্রনাথের গাওয়া কয়েকটি গান, যা 'আগুন জেবলে দিয়ে গিয়েছিল' শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্তে। এখানে জানিয়ে রাখি, 'ঘুম ভেঙেছে' গানটির পাঠ আমরা কথামৃত (পঞ্চম খণ্ড) থেকেই নিয়েছি। রামপ্রসাদ-পদাবলীর কোনো কোনো সংস্করণে কিছু ভিন্ন পাঠও দেখা যায়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১২ই ফাল্গুন, ১২৯১ শুক্লাষ্টমী—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব পালন করছিলেন ভক্তবৃন্দ। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, বিনোদ, হাজরা, রামলাল, রাম, নৃত্যগোপাল, মণি মল্লিক, গিরিশ, মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সকালে কীর্তনীয়া কীর্তন করছিল : "কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে আসিতে দেরী হইতেছে। কোন রাখাল বলিতেছে, মা যশোদা আসিতে দিতেছেন না। বলাই রোখ্ করিয়া বলিতেছে, আমি শিঙা বাজিয়ে কানাইকে আনব। বলাইয়ের অগাধ প্রেম। কীর্তনীয়া আবার গাহিতেছেন।—শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। গোপীরা, রাখালেরা বংশীরব শুনিতেছে, তাহাদের নানা ভাবের উদয় হইতেছে। ঠাকুর বসিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। নরেন্দ্র কাছেই বসিয়াছিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। নরেন্দ্রের জানু

এক পা দিয়া স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন। নরেন্দ্র সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। কীর্তন চলিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে আস্তে আস্তে বলিলেন, 'ঘরে ক্ষীর আছে নরেন্দ্রকে দিগে যা!'...কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে আদর করিয়া মিঠাই খাওয়াইতেছেন।......

"ভক্তেরা ঐ ঘরেতেই ঠাকুরের অন্নাদি আহারের আয়োজন করিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাহিতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গাহিতেছেন—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি॥
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি
সমাধি-মন্দিরে মা, কে তুমি একা বসি॥
অভয় পদকমলে প্রেমের বিজলী জ্বলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

নরেন্দ্র যাই গাহিলেন, 'সমাধি-মন্দিরে মা, কে তুমি গো একা বসি!' অমনি ঠাকুর বাহ্যশূন্য সমাধিস্থ।......

নরেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরের বারান্দায় অনেকক্ষণ গল্প করিতেছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়িতে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এইবার নরেন্দ্র ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—'তুই হাজরার কাছে বসেছিলি! তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী! হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।'......

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর অনুগত।......(সহাস্যে)—ওর মন্দের ভাব, আর আমার মেদীভাব। নরেন্দ্রের উঁচু ঘর, অখণ্ডের ঘর।......(নরেন্দ্রাদির প্রতি)—সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর গীতার সার কি? গীতা দশবার বললে যা হয়—ত্যাগী ত্যাগী।......

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—হাঁ গা, আমার সব কথা তোমরা কি কচ্ছিলে? আমি খাই দাই থাকি।

গিরিশ—আপনার কথা আর কি বলব? আপনি কি সাধু?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধু-টাধু নয়। আমার তো সাধুবোধ নাই।

গিরিশ—ফচ্‌কিমিতেও আপনাকে পারলুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি লালপেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, আজ বড় যে রঙ, লালপেড়ের বাহার! আমি বললুম, কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।

এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে তানপুরাটি পাড়িয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন, ঠাকুর অধৈর্য

হইয়াছেন। বিনোদ বলিতেছেন—বাঁধা আজ হবে, গান আর একদিন হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন আর বলিতেছেন—এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে, তানপুরাটি ভেঙে ফেলি। কি টং টং—আবার—'তানা নানা নেরে নুম্' হবে।

ভবনাথ—যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্ত হয়।

নরেন্দ্র (বাঁধিতে বাঁধিতে)—সে না বুঝলেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া শুনিতেছেন। নিত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া শুনিতেছেন—

১। অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তরযামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবসযামিনী।

২। গাওরে আনন্দময়ীর নাম।
ওরে আমার একতন্ত্রী প্রাণের আরাম॥

৩। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রের কাছে বসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কথা কহিতেছেন।—'গান গাইব? থু থু!......উদ্দীপনের জন্য শুনতে হয়। তারপর—কি হলো আর কি গেল! আগুন জ্বেলে দিলে! সে ত বেশ! তারপর চুপ! বেশ তো, আমিও তো চুপ করে আছি, তুইও চুপ করে থাক! আনন্দরসে মগ্ন হওয়া নিয়ে কথা। গান গাইব? আচ্ছা, গাইলেও হয়। জল স্থির থাকলেও জল, আর হেললে দুললেও জল।'

নরেন্দ্র কাছে বসিয়া আছেন। তাঁর বাড়িতে কষ্ট, সেজন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকেন। তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। এখনও সর্বদা জ্ঞানবিচার করেন। বেদান্তাদি গ্রন্থ পড়িবার খুব ইচ্ছা। এক্ষণে বয়স ২৩ বৎসর হইবে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। (নরেন্দ্রের প্রতি সহাস্যে)—'তুই ত 'খ' (আকাশবৎ); তবে যদি টেক্‌সো না থাকত! কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি 'খ'। একদিন তার বাড়ি গিয়ে দেখি, সে চিন্তিত হয়ে বসে আছে, বেশী কথা কচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছ কেন? সে বললে—টেক্‌সোওয়ালা এসেছিল; সে বলে গেছে, টাকা যদি না দাও তাহলে ঘটি-বাটি সব নীলাম করে নিয়ে যাব; তাই আমার ভাবনা হয়েছে। আমি হাসতে হাসতে বললাম,—সে কি গো, তুমি ত 'খ', আকাশবৎ! যাক, শালারা ঘটি-বাটি নিয়ে যাক, তোমার কি?

তাই তোকে বলছি, তুই ত 'খ'—এত ভাবছিস কেন? কি জানিস, এমনি আছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অষ্টসিদ্ধির একটি থাকলে কিছু শক্তি হতে পারে, কিন্তু আমায় পাবে না। সিদ্ধাইয়ের দ্বারা বেশ শক্তি, বল, টাকা—এইসব হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ হয় না।

আর একটি কথা—জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অনেকে বলে অমুক বড় জ্ঞানী। বস্তুতঃ তা নয়। বশিষ্ঠ বড় জ্ঞানী—পুত্রশোকে অস্থির হয়েছিল। তখন লক্ষ্মণ বললেন, রাম, একি আশ্চর্য! ইনিও এত শোকার্ত! রাম বললেন, ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে; যার আলো-বোধ আছে তার অন্ধকার-বোধও আছে;

যার ভাল-বোধ আছে, তার মন্দ-বোধও আছে; যার সুখ-বোধ আছে, তার দুঃখ-বোধও আছে। ভাই, তুমি দুইয়ের পারে যাও, সুখ-দুঃখের পারে যাও, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও।—তাই তোকে বলছি, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও।......

সন্ধ্যা হইল। ক্রমে ঠাকুরদের আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। আজ ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমী। ৬।৭ দিন পরে পূর্ণিমার দোলমহোৎসব হইবে।

ঠাকুরবাড়ির মন্দিরশীর্ষ, প্রাঙ্গণ, উদ্যানভূমি, বৃক্ষশীর্ষ—চন্দ্রালোকে মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। গঙ্গা এক্ষণে উত্তরবাহিনী, জ্যোৎস্নাময়ী, মন্দিরের গা দিয়া যেন আনন্দে উত্তরমুখ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়া নিঃশব্দে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। উৎসবান্তে এখনও দুই একটি ভক্ত রহিয়াছেন। নরেন্দ্র আগেই চলিয়া গিয়াছেন।

আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। মাস্টারও সেইখানে দণ্ডায়মান আছেন ও ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আহা, নরেন্দ্রের কী গান!

মাস্টার—আজ্ঞা, 'নিবিড় আঁধারে' ঐ গানটি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ। ও গানের খুব মানে। আমার মনটা এখনো যেন টেনে রেখেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আঁধারে ধ্যান, এইটি তন্ত্রের মত। তখন সূর্যের আলো কোথায়?

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালো রূপ দিগম্বরী হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে।

ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গিরিশের গায়ে হাত দিয়া গান গাহিতেছেন—

১। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়......
২। এবার আমি ভাল ভেবেছি......

(স্বামীজী-গীত পূর্বোদ্ধৃত 'যে-দেশে রজনী নাই' গানটি এরই অংশ)।

গিরিশকে দেখিতে দেখিতে যেন ঠাকুরের ভাবোল্লাস আরও বাড়িতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার গাহিতেছেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।"

(কথামৃত—পঞ্চম খণ্ড)

কথামৃতের বর্ণনা চিত্রবৎ, ঐতিহাসিক বাস্তবতায় অসাধারণ, কিন্তু এই খণ্ড-চিত্রগুলি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময়, বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্ব অনেকসময় পাই না, যা পাওয়া যায় সারদানন্দের রচনা থেকে। কোন্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাঙতেন, গড়তেন—সেই দিব্য শিল্পীকে বুঝবার জন্য এখানে স্বামী সারদানন্দের নয়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনার মাত্র কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি—

"সেই জ্যোতির্ময় পরিবেশে এখনো আমার মন ভাসিতেছে। অপরূপ মানুষটি। —যেখানে যখনই থাকিতেন ঐ আলোক-বিচ্ছুরিত পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন। যখনই

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহার মধ্য হইতে যে রহস্যময়, অনির্দেশ্য সকরুণ যাতনা উচ্ছ্বলিত হইয়াছে—সে সম্মোহন হইতে আমার মন এখনো মুক্তি পায় নাই।" (অনূদিত)]

২৭ অক্টোবর, ম্যাকলাউডকে

আমার একান্তবাসের মধ্যে গত রবিবার রাত্রে স্বামীজী এসে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। ঘণ্টাখানেক ছিলেন। প্রতিটি মুখ্য অবতার প্রকাশ্যে বা গোপনে মাতৃ-উপাসক—এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা জানালেন। "নইলে তাঁরা শক্তি পাবেন কিভাবে?" শিব ও কালী তাঁদের আরাধ্য হতে বাধ্য। তারপরে রামায়ণের কথা। একটা বিচিত্র কথা তোমাকে বলি—যখন সদানন্দ রামায়ণের কথা বলেন, তখন আমার নিতান্ত বিশ্বাস হয় যে, **হনুমানই** রামায়ণের নায়ক, আর স্বামীজী বললে **রাবণই** কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়।...

রামকে কমললোচন বলা হয়। সীতা-উদ্ধারে মায়ের সাহায্য পাবার প্রার্থনা তিনি করেছিলেন। কিন্তু রাবণও মায়ের কাছে প্রার্থনা জানান। রাম এসে দেখেন, রাবণ মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট। রাম বুঝলেন, তাঁর পক্ষে দারুণ কিছু করা দরকার। তিনি হাজার-এক পদ্ম দিয়ে মায়ের অর্চনা করার ব্রত নিলেন। লক্ষ্মণ মানসসরোবর থেকে পদ্ম নিয়ে এলে রাম তাঁর মহামাতৃযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। শরৎকাল তখন। মাতৃপূজার সময় বসন্তকাল। রামের এই অকালবোধনের স্মারক হিসাবেই অতঃপর শরৎকালে মহাপূজা আরম্ভ হয়। শ্রীরামচন্দ্র মায়ের শ্রীচরণে পদ্ম অর্পণ করতে লাগলেন—হাজার পদ্ম পর্যন্ত দিলেন ("এদিকে মা একটি পদ্ম চুরি করে নিয়েছেন!") —কিন্তু একি, শেষ পদ্মটি যে পাওয়া যাচ্ছে না! কিন্তু রাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি হার মানবেন না, ছুরিকা চেয়ে নিয়ে নিজের নয়ন উৎপাটন করতে যাচ্ছেন—তাঁর নয়ন নীলকমল বলে কথিত—তখন মা তাঁর ভক্তির কাছে হার মানলেন, আশীর্বাদ করলেন মহাবীরকে: তারই বাহুবলের জয় হবে। অবশ্য রামের বাহুবলের জয় ঠিক হয়নি, রাবণের ভাই-ই শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তারই ফলে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে।

রাজা বলেন, "কিন্তু ঐ বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরও মহত্ত্বের একটি ক্ষেত্র ছিল। রামের রাজসভায় তিনি বসেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে রাবণের বিধবা পত্নী এলেন দেখতে—কে সেই যোদ্ধা যে তাঁকে স্বামী ও পুত্রহারা করেছে। রাজসভাসমুখে রামচন্দ্র সঙ্গিনী পরিবেষ্টিত রানীকে অভ্যর্থনার জন্য উত্থিত—কিন্তু কোথায় রাজকীয় ঐশ্বর্য-ভূষিতা মহারানী? হিন্দুবিধবার অনাড়ম্বর পোষাকে এক নিতান্ত সাধারণ নারী! 'মহিলাটি কে?' রামচন্দ্র বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন রাজভ্রাতাকে। উত্তরে তিনি বললেন, 'এই সেই সিংহিনী যাকে তার সিংহ ও শাবকদের থেকে আপনি বঞ্চিত করেছেন। তিনি এসেছেন আপনাকে দেখতে!"

ওগো য়ুম, নারীত্বের কী সমুচ্চ আদর্শই না স্বামীজীর! নিশ্চয়ই আর কোথাও এই **প্রচণ্ড আদর্শ** নেই, শেক্সপীয়ারে নেই; অ্যাসকাইলাসেও নেই যখন তিনি অ্যান্টিগনকে এঁকেছেন, কিংবা সফোক্লিস, যখন তিনি এঁকেছেন অ্যালসেসটিসকে। নারীত্বের আদর্শের বিষয়ে স্বামীজীর কথাগুলি পুনরায় পড়ার পরে (নিবেদিতা

আলোচনার সারাংশ লিখে রাখতেন) বুঝলাম, তার সব কিছু, প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত ভাবী পৃথিবীর নারী-আদর্শের রক্ষাকবচ, কিন্তু প্রথমত এবং প্রধানত নিজ দেশের জন্য; সে আদর্শের যথার্থ যোগ্য কেউ হতে পারল কি না, সেটা বড় কথা নয়।

মঙ্গলবার রাত্রে ধাপে ধাপে তিনি অপূর্ব ভক্তির আবেশে উন্মত্ত হতে লাগলেন। হৃষীকেশের কথা বললেন; সেখানকার প্রতি সন্ন্যাসীর স্ব-নির্মিত কুঠিয়া, সন্ধ্যায় ধুনির আগুন, সেই আগুনকে ঘিরে ছোট ছোট আসনে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীরা, আর মৃদুস্বরে উপনিষদের আলোচনা; "কারণ ধরে নেওয়া হয়, সন্ন্যাসী হবার আগেই মানুষ সত্যকে পেয়েছে, তার বিচারবুদ্ধি শান্ত হয়েছে, এখন শুধু বাকি ঐ সত্যকে উপলব্ধি করা।" সুতরাং আলোচনা বা তর্কের প্রয়োজন নেই। হৃষীকেশে তাই পর্বতের অন্ধকার সানুদেশে, জ্বলন্ত ধুনির চারপাশ ঘিরে শুধু উপনিষদেরই আলাপ। তারপর ক্রমে নীরবতার মধ্যে হারিয়ে যায় কণ্ঠস্বরগুলি, প্রতিটি সন্ন্যাসী নিজের আসনে খাড়া হয়ে বসে থাকেন, তারও পরে একে একে নিঃশব্দে উঠে যান নিজের কুঠিয়ায়।

বুধবার একই ধরনের কথা বললেন নানা সময়ে। একবার এমন একটি বক্তব্যে উচ্ছ্বসিত হলেন, যার চেয়ে বড় কথা তাঁর কাছ থেকে শুনিনি—"হিন্দুধর্মের প্রধান ত্রুটি, তা একমাত্র ত্যাগের ভিত্তিতে মুক্তিপথ দেখিয়েছে। গৃহী এখানে নিজেদের নিম্নাবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। তার জন্য কর্মমার্গ, ত্যাগের কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু আমি প্রশ্নটির সমাধান অন্যভাবে করতে পেরেছি। ত্যাগ সকলেরই মূলে জীবননীতি। যদি কেউ মনে করে যে এর বাইরে আছে—সেটা মায়া ছাড়া কিছু নয়। আমরা সবাই বিরাট শক্তিপুঞ্জকে অনুভব করার জন্য সংগ্রাম করছি। তার অর্থ কি এই নয় যে, আমরা সবাই যত দ্রুত সম্ভব মৃত্যুর দিকে ধাবিত—আমরা সকলেই। যে স্থূলদেহ ইংরেজটি মনে করে, পৃথিবীকে অধিকার করাই তার কাম্য, সে আসলে আমাদের অধিকাংশের চেয়ে তীব্রভাবে মরবার জন্য লড়াইয়ে মত্ত। আত্মসংরক্ষণেচ্ছা ত্যাগেরই বিশেষ চেহারা। মন্দ ভালোরই বিশেষ একটি রূপ। বাঁচার উৎকণ্ঠা মৃত্যুপ্রীতির অন্যতম আকার।"......

বুধবার রাতে রাজা পবিত্রতা সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলেন,—কিভাবে পবিত্রতার অনুশীলন ও সঞ্চার করতে হবে। প্রসঙ্গটি যখন গভীর থেকে গভীরতর স্তরে অবতরণ করছিল, তখন নির্বোধের মত কি একটা করে তাঁর ভাব ভঙ্গ করলাম। পরে আমি তাঁর সঙ্গে একলা রইলাম, যখন সকলে চলে গেল। এমন একটি ব্যাপার নিয়েও বেশী মুহ্যমান হতে চাইছি না, যেহেতু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস প্রসঙ্গটি আবার ফিরে আসবে, তখন যদি আমি নাও থাকি, অন্য কেউ সেটা লাভ করবে—সেটি বিলম্বিত হওয়ার জন্য মহত্তর রূপে বিদীর্ণ হবে। "ব্রহ্মচর্য যেন ধমনীতে ধমনীতে ঈশ্বরাগ্নির মত জ্বলতে থাকে"—তাঁর শেষ কথা বিষয়টি সম্বন্ধে।

গতরাত্রে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত্রে তিনি কিছুসময় শিখদের ও তাদের দশ গুরুর বিষয়ে বললেন। গ্রন্থসাহেব থেকে গুরু নানকের এক কাহিনী শোনালেন। তিনি মক্কা গিয়েছিলেন, সেখানে কাবা মন্দিরের দিকে পা করে শুয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ মুসলমানেরা এসে তাঁকে জাগিয়ে প্রায় মেরেই ফেলে আর কি—ঈশ্বরের আবাসের দিকে পা করে শোয়ার স্পর্ধা! তিনি ধীরে চোখ মেলে শুধু বললেন, 'কোন্ দিকে

ভগবান নেই. সেই দিকে আমার পা-টি ঘুরিয়ে দাও।' সেই মধুর উত্তরই যথেষ্ট হল; অনেকে তাঁর মত গ্রহণ করল।......

একটি বিচিত্র জিনিস তোমাকে বলবার জন্য সংগোপনে রেখেছি। কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে ওলিয়ার কাছে সমালোচনা করে বলেছে—স্বামীজী কথা বলার সময়ে তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। যথাসময়ে সেটি আমার কানে এসেছে। সুতরাং তারপরে তাঁর কথা বলার কালে ঐ কথাগুলি আমার মনে পড়েছিল, এবং আমি অন্যত্র তাকাতে চেষ্টা করেছিলাম। তখনই আমি বুঝলাম. আমি কেন মিসেস জনসনের দৃষ্টি এড়াতে চাই। যেহেতু স্বামীজীর মুখ ছাড়া প্রতিটি মুখের দিকে চাইলে একটা বাধা অনুভব করি, চোখ সরিয়ে নিতে হয়, বাড়ির বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়. আর যদি তাঁর দিকে তাকানো যায়, মনে হয়, মুক্ত দ্বারপথে সোজা তাকিয়ে আছি অনন্তের দিকে। তাঁর মধ্যে আত্মসচেতনতা একদম নেই. এইজন্যই কি এরকম হয়!

৪ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে

তোমাকে বলা উচিত. যদিও বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—জগৎ থেকে অব্যাহতির জন্য আবার তাঁর সেই ব্যাকুল কথা, পুরনো রীতিতে। সারা জীবন ধরে ধন-মানের বিরুদ্ধে ঘৃণার স্তোত্র উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু এখনই তার যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে শুরু করেছেন। এ পৃথিবী অসহ্য। 'এ আমি কোথায়!'—হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—মুখে সব হারানোর সে কী অপরিসীম শূন্য দৃষ্টি! তারপর বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—"রামকৃষ্ণ. তোমারই জন্য—(একটু থেমে)—ঠাঁই দাও. ঠাঁই দাও, শুধু তোমার চরণেই যে মানুষের আশ্রয়।' কী মুহূর্ত—কাতর ক্রন্দন,—তোমার উপস্থিতি আমি কতই চেয়েছি এইকালে।

"এ শরীর চলে যাচ্ছে। কঠোর তপস্যায় এর ক্ষয় হোক। প্রতিদিন উপবাস করে দশহাজার 'ওঁ' মন্ত্র জপ করব—শুধু একলা, গঙ্গাতীরে, হিমালয়ে—'হর হর' ডাকব—মুক্তি! মুক্তি! আবার আমার নাম বদলাবো: এবার আর কেউ সন্ধান পাবে না। আবার নতুন করে সন্ন্যাসের দীক্ষা নেব—আর ফিরব না,—না—না—না।"

তারপর আবার সেই হারানো দৃষ্টি, আর দারুণ ভাবনা—ধ্যানের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন! "আমি সব হারিয়েছি—সব হারিয়েছি—ম্লেচ্ছ! তোমাদেরই জন্য।" তারপর মধুর হাসি—দীর্ঘশ্বাস—এবং প্রস্থান।

১১ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে

গত রবিবার—ভাবো একবার!—স্বামীজীর সঙ্গে একই বাড়িতে আছি আমরা। গত শনিবার স্বামীজীর 'এ আমি কোথায়'-জাতীয় দারুণ শূন্য ভাবের বিষয় তোমাকে লিখেছি বলেই মনে হয়। সে ভাব কিছুটা গেলেও হতাশা সম্পূর্ণ যায়নি— মুখে তার ছাপও রয়েছে।......

রবিবার প্রাতরাশের পরে আগ্নেয়গিরির বিদারণ! সকলের মাঝে তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, আর কতদিন এভাবে ঝুলে থাকব আমি? রীতিমত গালাগালির মেজাজে। তারপরেই আর্দ্র কোমল কণ্ঠে মৃদু কয়েকটি শব্দ—তার রূপ তুমি

জানোই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কতখানি মনের কথা এগুলি? তাঁর রূঢ়তায় সদাশয়তা ছিল না। তাছাড়া এর প্রয়োজনই বা কি ছিল, আমি তো অনেক দিন ধরেই কাজে লাগবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব। এখানে যদি থাকি সে তাঁরই সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী। স্বামীজী তা সমঝে বুঝলেন। ওলিয়া ঘর থেকে উঠে যাবার সময়ে, তার ও অ্যালবার্টার সঙ্গে চিকাগো যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। এই আমন্ত্রণ আমাকে গ্রহণ করতে হবে—স্বামীজী বিধান দিলেন। তারপরেই মহাগৌরবের বিস্ফারিত আকার। জানালেন, যদি আমার স্বাস্থ্য তাঁর থাকত, তাহলে পৃথিবী জয় করে ফেলতেন। আমি ক্ষত্রিয়—তাঁরই **পরিবারের** লোক, তা কি জানতাম? আমি ব্রাহ্মণ নই। কৃচ্ছ্রসাধনাই পথ, ইত্যাদি ইত্যাদি।—প্রচণ্ড, সন্দেহ নেই। পরিশেষে আশীর্বাদ করলেন, যার মধ্যে গুরু হারিয়ে পিতা জেগে উঠল, যখন তিনি বললেন, "পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার জন্য লড়াই কর। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে আমি যেন এই পাই।" ও! য়ুম!

সুতরাং আমার যাত্রা ঠিক হয়ে গেল। ওলিয়া আমার আশ্রয়দাত্রী, অ্যালবার্টার সঙ্গে।......রবিবার বিকালে জিনিসপত্র......বাঁধাছাদা করছি—তিনি কয়েকটি সিল্কের পাগড়ি নিলেন বালিকাদের দেবার জন্য। তারপর দু'টুকরো কাপড়, গেরুয়া রঙের, মিসেস বুলের জন্য। তিনি আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন জিনিসগুলি দেবার জন্য। সেখানে মিসেস বুল বসে লিখছিলেন। পাগড়িগুলি স্বামীজী একপাশে রাখলেন।

প্রথমে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর গেরুয়া কাপড়টি মিসেস বুলের কোমরে জড়িয়ে দিতে দিতে তাঁকে সন্ন্যাসিনী বলে সম্বোধন করলেন, এবং এক হাত তাঁর মাথায় রেখে অন্য হাত আমার মাথায় রেখে, বললেন: "রামকৃষ্ণ পরমহংস আমায় যা দিয়েছিলেন, আমি সে **সব কিছু** তোমাদের দিলাম। এক নারীর কাছ থেকে আমাদের কাছে যা এসেছিল, আমি তা দিলাম দুই নারীকে। এর দ্বারা যা সম্ভব তাই করো। আমি আর নিজেকে বিশ্বাস করি না। আগামীকাল কি করব জানি না, যাতে আমার কাজ হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে। এক নারী—জগন্মাতার—কাছ থেকে যা এসেছিল, নারীরাই তাকে শ্রেষ্ঠভাবে রক্ষা করতে পারবে। তিনি কে, কি, জানি না; তাঁকে দেখিনি; কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁকে দেখেছিলেন, স্পর্শ করেছিলেন—(আমার জামার হাতা স্পর্শ করে)—ঠিক এইভাবে। আমি এইটুকু জানি, তিনি হয়তো এক বিরাট বিমূর্ত শক্তি। যাই হোক, তোমাদের উপর ভার চাপিয়ে দিলাম। আমি চলে যাচ্ছি শান্তি পেতে। আজ সকালে আমি প্রায় পাগলের মত—কী করবো—কী করবো—সেই চিন্তায় আর চিন্তায়—যখন লাঞ্চের আগে ঘুমোতে যাচ্ছি। তখন এই কাজটি করার কথা মাথায় এল, ভারী আনন্দ পেলাম তাতে। এ একটি পরিত্রাণের মত। এতদিন ধরে একে বহন করেছি, এখন ত্যাগ করলাম......"

তিনি কি এই কথাগুলিই বলেছিলেন! মনে হয় তাই। ঘটনাটা ঘটেছিল, আমার ধারণা, নিশ্চয় তিনটে নাগাদ, বা সামান্য কিছু পরে, কারণ তখনো দিবালোক ছিল, এবং তার অনেক পরে তাঁর সঙ্গে বাঁধা-ছাদার কাজে আবার ফিরে গিয়েছিলাম, তাই মনে হচ্ছে; তিনি বিস্মিত হলেন, যখন তাঁকে নীচে অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে যেতে বললাম; বাকি কাজ আমি একলাই সেরে নিতে পারব,—তিনি নিশ্চিন্ত

বালকের মত চলে গেলেন।......তিনি বললেন—কী যে আনন্দবোধ হচ্ছে।......

সুতরাং য়ুম, এইভাবেই আমার জীবনের "চরম ঘটনা" ঘটল—জীবনের বিরাট সন্ধিলগ্ন—আমার এবং সারার।

পরদিন তিনি রিজলিতে এলেন। মিসেস লেগেট, মিসেস আর স্মিথকে তাঁর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারলেন, কেননা তাঁর বাণীর জন্য তিনি তৃষার্ত। সে বাণী মিসেস স্মিথ প্রার্থনা করলে স্বামীজী বললেন—"আমার কোনো বাণী নেই। আগে মনে হত তা বুঝি আছে, কিন্তু এখন জেনেছি, এ পৃথিবীর জন্য আমার আর কিছু নেই। যা আছে—সব নিজেরই জন্য। এ স্বপ্নমায়া আমাকে ভাঙতে হবে।" কথাগুলি আমি যখন পুনরাবৃত্তি করছি কী দুর্বল নিষ্প্রাণ আর খণ্ড বোধ হচ্ছে—যখন তিনি বলেছিলেন, কী না ছিল তার শক্তি ও মহিমা!

তারপরে মিসেস বুল, মিসেস ব্রিগস্ ও আমি তাঁকে পেলাম কয়েক ঘণ্টার জন্য। তিনি শিবের বিষয়ে বলছেন,—এই কয়মাস যার বিষয়ে নিরন্তর বলে এসেছেন, —এবং শুকদেবের কথা। *শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজীর কালী-দর্শনপূর্ব দিনগুলিতে তাঁকে* 'শুক' বলে ডাকতেন। শুকের কাছে জগতের সবটাই খেলা, জীবন খেলা, ব্রহ্মাণ্ড খেলা। "আমি জানি, শুক জানে, এবং হয়তো ব্যাস কিছুটা জানলেও জানতে পারে"—শিবের উক্তি।

সুপবিত্র—সুমহান—বাক্যমনাতীত ক্ষণ। গোড়ায় মায়ের কথা বলতে লাগলেন তাঁর নিজস্ব দুষ্টু ছেলের ভঙ্গিতে : মা তো নয়, শয়তানী; তার কিছু পরে সে ভাব ভুলে গেলেন, কোমল হয়ে এল কণ্ঠ, আর পুজায় পূর্ণ :

সর্ববস্তুতে বিরাজমানা মাতা যিনি
তাঁকে নমস্কার!
যাঁকে মহামায়া বলে জগৎ ঘোষণা করে
তাঁকে নমস্কার!

তুমি দাও সকল আশীর্বাদ,
তুমি দাও সকল শক্তি,
তুমি দাও সকল বাসনা,
তুমি পরম করুণাময়ী—তোমাকে নমস্কার, নমস্কার!
তুমি মহারাত্রি, তুমি মোহরাত্রি,
তুমি মৃত্যুরাত্রি—ভয়ঙ্করী!
তোমাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার!

তারপর শোনালেন :

বাতাস বইছে বিবেকের,
সমুদ্র বইছে আশীর্বাদ,
স্বর্গের পিতা মধুময়,
মধুময় অরণ্যের বৃক্ষ, মধুময় গবাদি পশু,

মধুময়, জ্যোতির্ময় পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা পর্যন্ত,
ওঁ মধু! মধু! মধু!

[একই জাতীয় স্তোত্র উচ্চারণের ঘটনার উল্লেখ নিবেদিতা আরও করেছেন। যেমন Wanderings গ্রন্থে : (১৩ জুন, ১৮৯৮) "বাস্তবিকই সেই অপরাহ্ণটি যেন শুধু অনুবাদের শুভলগ্ন বলিয়া মনে হইল; তিনি হিন্দুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর মন্ত্রগুলির একটির কতিপয় স্থল আমাদের নিকট অনুবাদ করিয়া দিলেন :

মধুময় পবন সুমধুর আমাদের কাছে।
সমুদ্রসকল মধু বহিতেছে আমাদের জন্য।
আমাদের ক্ষেত্রের শস্যসকল মধু আনয়ন করুক।
মধু আনুক উদ্ভিদ ও ওষধিসকল।
গবাদি পশু মধু দান করুক।
আমাদের আকাশরূপী পিতা মধুময় হোন আমাদের কাছে।
মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

(তারপর তাঁর কণ্ঠ ধ্যানের গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল)—

ওঁ মধু! ওঁ মধু! ওঁ মধু!"

সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারণসহ আশীর্বাদের ঘটনার আর একটি সুগভীর বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দে'র দ্বিতীয় খণ্ডে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের 'পিকাডিলিতে রয়েল ইনস্টিটিউটের ওয়াটার পেণ্টিং গ্যালারিতে' স্বামীজী রাজযোগের উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতার সমাপ্তিতে যা ঘটেছিল, সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা থেকে দেখা যাক :

"রাজযোগের নানাপ্রকার স্থূল অঙ্গের ও বহুপ্রকার সমাধির বিষয় কয়েকদিন লেকচার দিয়া উহা সমাপ্ত করিতে স্বামীজী মনস্থ করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে লেকচারের বিষয়টি শেষ হইলে, তিনি ক্ষণিক স্থির, নির্বাকভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি রূপান্তরিত হইলেন। পূর্ব ব্যক্তি, পূর্ব ভাবভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, নেত্রের দৃষ্টি ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন হইল, এবং তৎপরিবর্তে একটি অভিনব স্বতন্ত্র ব্যক্তি এখন তাঁহার ভিতর হইতে পরিস্ফুট হইল। এইবার তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল :

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

সংস্কৃত শ্লোকটি উচ্চারণ ও আবৃত্তি করিতে স্বামীজীর প্রায় আট দশ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। এক একটি চরণ উচ্চারণ করিতেছিলেন, আর কি যেন স্থির নেত্রে লক্ষ্য করিতেছিলেন ও নির্বাকভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। পুনরায় আর একটি পংক্তির উচ্চারণ ও পূর্ববৎ নিস্পন্দ ও নির্বাকভাবে অবস্থান। এইরূপে সমুদয় শ্লোকটি শেষ হইল। সংস্কৃত ভাষায় উহা বলা হয়, কেহই উহার অর্থ বা উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল না, কিন্তু নাদব্রহ্ম এরূপ প্রত্যক্ষ বা শক্তিমান বস্তু যে, স্বামীজী যখন ঐ শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই ঐ গৃহমধ্যে গালিচার উপর চেয়ারে উপবিষ্ট বিশিষ্ট শ্রোতাগণ (প্রায় ১৫০/২০০ জন) নিঃশব্দে চকিতে স্বীয় চেয়ার সরাইয়া গালিচার উপর নতজানু হইল, এবং করজোড়ে ও নতমস্তকে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাত্র চেয়ার সরাইবার শব্দ প্রথমে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর গৃহটি সম্পূর্ণভাবে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। শুধু দেওয়ালগাত্রে গ্যাসের আলোটার সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছিল। উক্ত শ্লোক উচ্চারণকালে প্রত্যেক শব্দ, মাত্রা, যতি, ছন্দ ইত্যাদি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, এবং কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সাম্যস্পন্দনটি কিরূপ, তাহা তিনি সকলকে দেখাইয়াছিলেন।......সংস্কৃত শ্লোকটি বলিবার পর তিনি ইংরাজিতে উহা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আশীর্বচনটি শেষ হইলে পূর্বের মত এই রাত্রে স্বামীজীর সহিত বাক্যালাপ করিতে কাহারও সাহস হইল না। তাঁহাকে তখন বোধ হইতেছিল যেন তিনি স্বতন্ত্র জগতের লোক, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। আশীর্বাদ শেষ হইলে তিনি গম্ভীরভাবে গৃহত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে অতি সসম্ভ্রমে সকলে চলিল।"]

কিন্তু তাঁর গোপন ভাবনার বিষয়ে চোখ বুজে থাকতে পারছি না। তাঁর আচার্য তাঁর উপর শক্তি অর্পণ করার পরে মাত্র এক-দেড় বছর বেঁচেছিলেন; ঠিক তেমনি তিনিও অল্পদিনই বাঁচবেন। জীবন তাঁর কাছে যন্ত্রণা। আমাদের সুখের জন্য এ জীবন সহ্য করতে তাঁকে বলতে পারব না—কিন্তু ওঃ য়ুম—য়ুম—যদি তোমার প্রার্থনার কোনো মূল্য থাকে চিরন্তনের কাছে—তাহলে দেখো, তাঁর অবশিষ্ট সময় যেন জয়শ্রী ও লীলায় পূর্ণ থাকে। আমার সহস্র মরণ হোক, সহস্র জ্বলন্ত নরকে আমি যেন নিক্ষিপ্ত হই পরবর্তীকালে, তার আগে, আমি প্রার্থনা করি—না, আমি দাবি করি পরম পুরুষের কাছে—পরিবর্তে যেন তাঁর জীবিতকালে আমি তাঁর শ্রীচরণে দু'একটি জয়মাল্য অর্পণ করে যেতে পারি। ঈশ্বরের যদি মায়ের প্রাণ হয়,—নিশ্চয় এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হব না।

[নিবেদিতা এখানে স্বামীজীর যে মনোভাবের কথা বলেছেন, সে ভাবটি এইসময়ের কিছু পরে লেখা স্বামীজীর চিঠি থেকেও পাই। তিনি ১৭ জানুয়ারী, ১৯০০, চিঠিতে ওলি বুলকে লিখেছেন—"আমি এখন আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনার উপরে বেশী বিশ্বাস করি। জো এবং মার্গট মহাপ্রাণ, কিন্তু আমাকে চালিয়ে চলার আলোক এখন 'মা' আপনার হাতেই অর্পণ করছেন। আপনি কি আলোক পাচ্ছেন?......আমি শিশু বই আর কিছু নই। আমার আবার কাজ কি?

আমার শক্তি—সে তো আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছি। পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছি। বক্তৃতামঞ্চে বাণী প্রচার করতে আর পারব না। এসব কথা কাউকে বলবেন না— জো-কেও নয়। আমি খুশী। বিশ্রাম চাই আমার। আমি যে ক্লান্ত, তা নয়, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় হবে বাণী নয়, অলৌকিক স্পর্শ—রামকৃষ্ণের মতো! শব্দ গেছে আপনার কাছে, আর স্বর গেছে মার্গটের কাছে। ওসব আর আমার কাছে নেই। আমি খুশী। সব ছেড়ে দিয়েছি। শুধু আমাকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।"

স্বামীজীর কাছ থেকে 'শক্তি' লাভ করার পরম আনন্দ ও গৌরবের পরেও নিবেদিতার হৃদয় আতুর হয়েছিল একটি আশঙ্কায়—নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শক্তি-সঞ্চারের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র এক-দেড় বৎসর বেঁচেছিলেন। এক্ষেত্রেও কি তাই ঘটবে! নিবেদিতার আশঙ্কা বাস্তব হয়েছিল। স্বামীজী কিছু বেশী বেঁচেছিলেন—আড়াই বৎসর।]

২২ নভেম্বর, মিসেস ওলি বুলকে

পাশ্চাত্ত্যে তাঁর আগমন সূর্যোদয়ের মত, কিংবা ঈশ্বরাবির্ভাবের মত। তিনি যেন গতি ও শক্তির দুই পাখায় ভর করে উড়ে এসেছেন।

২৫ নভেম্বর, মিসেস ওলি বুলকে

স্বামীজী যা ঠিক, ভারত সেই ভাবেই তাঁকে গ্রহণ করেছে—মুক্ত পুরুষরূপে। "জনৈক আমেরিকান কথিত স্বামীজীর গোমাংসাহারের" গল্প, এবং মাদ্রাজ সেই পরীক্ষায় কিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে—সে কথা বললাম। সকলে তাতে অভিভূত হয়ে গেল—ভারত তার গোমাংসভোজী সন্তানকে তুলে নিয়েছে, তার পাশে দাঁড়িয়েছে!

৪ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

মধুর বা নিষ্ঠুর, স্বামীজী যাই বলুন, সব কিছুকে তোমার ভালবাসার মনোভাব অধিকাংশের কাছে অচিন্তনীয় ব্যাপার। ভাল ও মন্দের মধ্যে ঈশ্বরের সমবিকাশের, সমদৃষ্টির, বেদনাবহনের এবং ঐ জাতীয় অজস্র জিনিসের একমাত্র ব্যাখ্যা ওর মধ্য থেকে আমি করতে পেরেছি। কিন্তু অনেকেই ব্যাপারটাকে অবাঞ্ছিত মনে করে সরে গেছে।

কিন্তু মেরী হেল* ও আমি আজ বিকালে একটি গুরুতর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। যে-লোকের স্বভাব বিষণ্ণ ও নৈরাশ্যময়, সে যন্ত্রণার উপর আধিপত্য, স্ফূর্তি বজায় রাখা ইত্যাদি 'ক্রীশ্চান সায়েন্সের' সাধারণীকরণ নীতিতে সহজে বেড়ে উঠতে পারে, আর অপরদিকে তোমার আমার মত উৎসাহী স্বভাবের মানুষের পক্ষে যে-ভূমিকা নেওয়া যায় তাই নিয়েছি,—তুমি নিয়েছ "জীবনের ব্যর্থতাকে" ভালবাসার ভূমিকা, আর আমি যন্ত্রণাকে অর্চনার। আমরা আমাদের বিপরীত অবস্থাকে কামনা করি।—বুঝতে পারছ! মেরী হেল সম্বন্ধে আগে যে-কথা বলেছি তা ঠিক—তার

* মেরী হেল স্বামীজীর "প্রিয় ভগিনী", হেল-ভবন আমেরিকায় স্বামীজীর নিজ গৃহ, কিন্তু মেরী হেল স্বামীজীর বেদান্তকে গ্রহণ করেননি, তিনি ক্রীশ্চান সায়েন্সের ভক্ত ছিলেন।

সহনের শক্তিতেই সে মহান। কিন্তু ব্যাপারটা সে নিজে জানে না। সে 'ক্রীশ্চান সায়েন্সের' মামুলী নীতিতে আসক্ত, এবং উল্টোদিকে আমাদের বিষয়ে বলে, আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। সে কিন্তু সদাই গৌরবময়।

খুব অদ্ভুত নয় কি—দু'জন মানুষ (নিবেদিতা ও মেরী হেল) পাশাপাশি বসে স্বপ্ন দেখছে যে, একজনের প্রতি (স্বামীজীর প্রতি) ভালবাসার সূত্রে তারা পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, অথচ সেই একই ভালবাসা দুইরূপে, দুই ধর্মের মধ্যে দিয়ে দু'জনের কাছে ভাববহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন স্বামীজীর ক্ষেত্রে—এই ভয়ংকরের অর্চনা কি তাঁর কাছে নূতন কিছু? আমার তা মনে হয় না। এখন মনে হচ্ছে, আমি তাঁর মধ্যে একেবারে সূচনা থেকেই কোনো একটা জিনিসের সম্ভাবনা দেখেছিলাম,—সে সম্ভাবনার অর্থ, তিনি কিছু একটাকে পেয়েছিলেন তারই সঙ্কেত,—এবং আমি মনে করেছিলাম, তার চাবি তিনি আমাকে দেবেন। পরে সে কথাই সত্য হল। ভয়ংকরের অর্চনা ইদানীং আরও প্রবল হয়েছে—অতীব অতীব—সম্প্রতি সেই 'চাবি' এবং পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছেন—কিন্তু সে জিনিস তাঁর মধ্যে প্রথম থেকে ছিল। আমার প্রতিটি কথা সত্য তুমি বুঝবে, কিন্তু মেরী হেলের কাছে যখন বলি তখন তার পক্ষে স্বামীজীর অতি সহজ ও সাধারণ ভাবগুলির অর্থ বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই সব বিরাট ভাবরাজির পাশে সাধারণ জীবন কী যে সাধারণ মনে হয়, কি বলবো!

হিন্দুর সেই বক্তব্য : বদ্ধ আত্মা আর মুক্ত আত্মা; নদীতটে বাঁধা নৌকা আর সূর্যালোকে দ্রুত ধাবমান নৌকা; ঘটনাচক্রে ও স্বার্থে বাঁধা জীবন; সর্বোত্তমেরই সাধ্য পরম স্বাধীন জীবন! কী সত্য, কী গভীর ও সহজাত এই তত্ত্ব—স্তব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করি নিজেকে : আমি মুক্ত তা কি সত্য? একি সত্য যে আমি মুক্তই আছি চিরদিন, শুধু তা জানি না......।

অবশ্য মুক্তি পূর্ব থেকে ছিল। কিন্তু আর এক দিক থেকে সে মুক্তি পেয়েছি যেদিন আমাকে ও সারাকে ব্রহ্মচারিণী করা হয়েছে। তুমি যেহেতু আগে থেকেই মুক্ত আছ, তোমাকে তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়নি।

১৪ ডিসেম্বর, মিস ম্যাকলাউডকে

বালক ত্যাগানন্দ আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল। সে বলল, স্বামীজীর বহির্জীবনের বিষয় সে কিছুই মনে করতে পারছে না,—কেননা তাঁর কাছে থাকার সময়ে সে সর্বসময় সচেতন থাকত যে, সে ঐশী শক্তির সান্নিধ্যে রয়েছে।

১৫ ডিসেম্বর, স্বামী বিবেকানন্দকে

"মিসেস বেল"-এর বাড়ি থেকে,
চিকাগো, শুক্রবার

আমাদের প্রিয় পিতা,

সারাদিন আপনার কাছে চিঠি লেখার ইচ্ছার আনন্দে আছি। গতরাত্রে এত ক্লান্ত ছিলাম যে, একটি শব্দও লিখতে পারিনি।

মেরী খুড়ী* আমাকে শিকড়সুদ্ধ তুলে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন, একেবারে আরাম বিলাসের মধ্যে, কয়েক দিনের জন্য. এবং এখানে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝলাম গত কয়েক সপ্তাহ আমি কি রকম গুরুগম্ভীর হয়ে কাটিয়েছি। বুঝলাম. হাসি কি উপাদেয় জিনিস! বুঝতেই পারছেন মিস হ্যারিয়েট ম্যাকিণ্ডলি এখানে আছেন।

তারপর মেরী খুড়ী ডিনারে রইলেন. সন্ধ্যাটা কাটালেন. সুন্দর লাগল। আজ তাঁর জন্মদিন।

সোমবার সকাল।—আমি কি আপনার খুব বদ মেয়ে নই—আমার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতার কাছে? তবে শুনেছি পিতা আমার খুব দরিদ্র নন. আর ইদানীং বৃদ্ধও নন; তিনি নাকি রীতিমত তরুণ আর উৎফুল্ল ক্রীড়াশীল হয়ে উঠেছেন. সত্যি! সুতরাং প্রিয় পিতা, প্রতি হাত আমরা কোনো না কোনো পুরাতন প্রবাদ উল্টে ব্যবহার করি. সেটা এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে: যখন ইঁদুর থাকে দূরে, তখন বেড়াল নাচে জোরে!

স্বামীজী—স্বামীজী—স্বামীজী—যদি কথাটা সত্য হয়—হয়—হয়! যদি 'মা' আপনার স্বাস্থ্য ফিরে দেন, নিজেকে আবার শরীরে শক্তিমান বলে অনুভব করতে পারেন, যে ভার বইতে চাইছেন তার সামর্থ্য পেয়ে যান—তাহলে এ জীবনে আর কিছু চাই না। শুধু 'মা' যেন আপনাকে পুরাতন গহ্বরে পুনরায় নিক্ষেপ না করেন। আমার মস্ত আশা, তিনি তা করবেন না।

পরের শনিবার পর্যন্ত আমি এখানে আছি। ঐদিন এখানে যারা জমেছে তাদের যে-যার জায়গায় চলে যাওয়ার কথা। আমিও নিজের আস্তানায় ফিরে যেতে পারব। অতীব চমৎকার সময় কেটেছে: এর দ্বারা মেরীর মত অন্যান্যদেরও বিশেষ করে জানবার সুযোগ হয়েছে বলে। ইসাবেলকে অপর তিনজনের মধ্যে আমার উপর সবচেয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন মনে হল, যেটা আমার আশার অতীত ছিল।

কিছু মহিলা একদিন এসেছিলেন কনভেন্ট-সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তাঁদের একজন বললেন, 'আমি কখনো ক্যাথলিক হতে চাইনি, তবু কোনো একটা কনভেন্টে প্রবেশ করার কামনা করেছি সারাজীবন—সেকথা কিন্তু প্রকাশ করার কথা কখনো ভাবিনি। কার্যগতিকে বিয়ে করলাম, এখন দুটি শিশু নিয়ে আমি বিধবা; ভারতের বালবিধবাদের বিষয়ে সেদিন রাত্রে আপনি কিছু বলেছিলেন. তার দ্বারা গোটা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হয়েছে, আমার নিজের প্রতি অসন্তোষের রূপও।' অপর মহিলাটি এখনো বিবাহিত নন; তিনি বললেন—'আমি বৈরাগ্যের বিষয়ে জানতে চাই. আমাকে আরও কিছু বলুন।' আমি তাদের দুজনকেই বললাম. কিভাবে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কিছুই বিশ্বাস করতাম না. আমি কিভাবে সেদিন কেবল একটি শব্দই আপনার কাছে শুনেছিলাম—'বৈরাগ্য'—কিভাবে আজ পর্যন্ত ঐ শব্দটি ছাড়া আর কিছু না শুনে চলেছি। আমরা উভয়ে

* মেরী হেল। স্বামীজী মেরী হেলকে বোন বলতেন, সেইজন্য কন্যা নিবেদিতার কাছে মেরী হেল 'খুড়ী'।

যে-মুহূর্তটিকে কল্পনায় দেখেছি তা যেন মনে হল আমার কাছে এসে গেছে—ঐ শব্দটির জন্য প্রতীক্ষমান সত্তাগুলির কয়েকটি যেন সংকেতে সাড়া দিয়েছে। ছোটখাট মানুষটি প্রিয় মিসেস অ্যারো এ নিয়ে এমন প্রতিবাদের হৈ চৈ তুলেছেন যে, ব্যাপারটার যৌক্তিকতা বোঝাতে আমাকে গভীরে প্রবেশ করতে হচ্ছে। আমি তাঁকে ভালবাসি,—আর আপনার সুন্দর চিঠিখানি শব্দটির ('বৈরাগ্য') উপরে স্থায়ী মুকুট।

আপনার কন্যা,
মার্গট

......অভয়ানন্দের চিঠি স্বর্গীয়—নয় কি? ইসাবেল আপনাকে হৃদয়ভরা ভালবাসা পাঠিয়েছে।

॥ ১৯০০ ॥

৬ মে, ম্যাকলাউডকে

এখন এখানে। হ্রদের দিকে চোখ মেলে আছি। নত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে নিম্নের বৃক্ষশীর্ষের উপর দিয়ে। কয়েকদিন এখানে আছি। মিসেস কুনলী ওয়ার্ডের সঙ্গে বাস করছি। বিরাট জানালার পাশে একাকী বসে। Pavlo এবং Francesca পড়ছি ঘণ্টাখানেক। কী সুন্দর! স্বামীজীর মুডকে যেন আমি নিজের মধ্যে অনুভব করছি, যে-মুড থেকে তিনি বলেন : আমরা সকলে, এই বিশ্বসৃষ্টি, এমনকি ঈশ্বর পর্যন্ত শব্দের অর্থবিকাশ ছাড়া কিছু নয়। একদিন আমি মুক্তিতে উত্তীর্ণ হব; তখন আমি নিশ্চয় জানি, এক বিশাল ধ্বনি আমার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হবার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। সেদিন আমার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বাক্যে স্ফুরিত হবে মানবপ্রাণ। তখন আর কাহিনীর চারিদিকে ছবির মালা গেঁথে যাওয়া নয়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিঝলকে চকিত অভ্রান্ত বেগে আবর্তিত হবে জীবন-নাট্য—পরিণতির দিকে যা দ্রুত ধাবিত। তারও পরে, আরও পরে, একটি দিব্য শব্দপ্রতিমা, সুপ্রাচীন......অথচ ভাবী-গর্ভ বাণীমূর্তি, যার মধ্যে সকল নাট্যের নিশ্চিত মহামিলন।

দেখছ, এখনো প্রতীক-পূজক রয়ে গেছি—অনন্ত অনির্বচনীয়তাকে শব্দে প্রকাশের এই আকৃতি!

চেয়ে দেখছি, নীল বিশাল জলরাশির অশান্ত চূর্ণ তরঙ্গ—আমার জানালার কয়েক পা নীচেই যেন জলরাশি ছড়িয়ে আছে, নিষ্পত্র বৃক্ষশাখায় মাঝে মাঝে তাতে ছেদ পড়েছে, শাখাগ্রের শরতীক্ষ্ম কোরকের আঘাতে এখানে ওখানে কাঁপমান ধারি, শাদা পাখী নীল জলের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে উত্তরে দক্ষিণে, দেখে মনে হচ্ছে মর্মরিত বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়ে গলাগলি করে তারা ছুটছে।

তোমাকে শুধোব ভাবছি—মুক্তির মহাদিনে তুমি কি চাইবে! না, তুমি শব্দ চাইবে না, বিদারণধ্বনি নয়—আমি জানি। তুমি চাইবে সকলকে ভালবাসতে হয়তো, কিংবা সকলের বেদনাভার নিতে, সকলের জন্য দগ্ধ হতে, কিংবা চাইবে—কোনো 'ভিশন্' না-দেখার অধিকার,—এই হবে তোমার প্রার্থনা, যদি সত্যই নিজের জন্য কিছু চাইছ, এইভাবে আমি তোমাকে কল্পনা করতে পারি!

আমার এ স্বপ্ন খুবই স্বার্থপর—কি বল! কিন্তু শব্দের শক্তির মধ্যে এমন কিছু একটা রহস্যময় শক্তি আছে, যা আত্মাকে নাড়া দেয়—যেমন দুলছে ঐ সম্মুখের জলরাশি, বৃক্ষরাজি, যেমন পাভলো ও ফ্রানসেসকো।*

১৮ মে, ম্যাকলাউডকে

গত রাত্রে একটি চমৎকার চিন্তা মাথায় উঠেছে। স্বামীজী কি অর্থে কালী-পূজাকে মৃত্যুপূজা বলেন তা তুমি জানো! আমি কালীকে সেই দৃষ্টিতেই ভাবছিলাম—এমন সময়ে মনে হল, একটি ক্ষুদ্র রক্তপথ তাঁতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তাঁর নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করলেই তিনি আরও পেছিয়ে যান, আরও, আরও, শেষে এক বিশাল ঘনকৃষ্ণ দ্বারে রূপান্তরিত হন। সেখানেই পথের শেষ। তারপরেই অনন্তের সমুদ্র। কালীই মৃত্যু।

তাঁর নাম স্মরণমাত্রে এখন ঐ বিশাল ঘনকৃষ্ণ দ্বারের ছবি আমার মনে জাগে।

['Reminiscences of Vivekananda' নামক গ্রন্থে ভগিনী নিবেদি...

---

* নিবেদিতা যে-শব্দতত্ত্বের কথা বলেছেন, তা বহুলাংশে স্বামীজীর কাছ থেকে পাওয়া। স্বামীজীর বাণী ও রচনার নানাস্থানে এই শব্দতত্ত্ব উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর 'দেববাণী' থেকে সামান্য কিছু উধৃত করছি :

"(১৮৯৫, ১৯শে জুন, স্বামীজী নিউ টেস্টামেণ্টের 'জনের গ্রন্থখানি' নিয়ে ছা... বললেন, 'তোমরা সকলেই খ্রীষ্টান বলে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র দিয়ে আরম্ভ করাই ভাল')—"জনের গ্রন্থারম্ভে এই কথাগুলি আছে—'আদিতে শব্দ মাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিত বিদ্যমান ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম।' হিন্দুরা এই 'শব্দ'কে মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব ... থাকেন, কারণ এটা ব্রহ্মেরই শক্তি। যখন এই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা মায়াবরণের ... দিয়ে দেখি তখন তাকে আমরা 'প্রকৃতি' বলে থাকি। শব্দের দুটো বিকাশ, একটা এই 'প্রকৃতি'—এইটেই সাধারণ বিকাশ। আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণ।"

পুনশ্চ (৩০শে জুন)—"প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে,—একটি হচ্ছে ভাব, দ্বিতীয়টি ঐ ভাবদ্যোতক 'শব্দ'—আমাদের এই দুটিকেই নিতে হবে। কি আইডিয়ালিস্ট, কি মেটিরিয়ালিস্ট, কারও মত খাঁটি সত্য নয়। ভাব ও তার প্রকাশ, দুই-ই আমাদের নিতে হবে।"

পুনশ্চ (১২ই জুলাই)—"এই জগৎ-প্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক শব্দ-রাশিমাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই জগৎ-প্রপঞ্চকে সৃষ্টি করতে পারি, আবার নাশ করতে পারি। এক সম্প্রদায়ের কর্মীদের মত এই যে, শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফলস্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমরা প্রত্যেকে এক একজন সৃষ্টিকর্তা। শব্দবিশেষ উচ্চারণ করলেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা যাবে। মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন, 'ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি'।"

পত্র থেকে সংকলিত যে-স্মৃতিকথা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ১৯০০ খৃীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে নিউইয়র্কে স্বামীজীর বক্তৃতার অপূর্ব ভাবাবহের বর্ণনা পাই। এই চিঠি আমরা পাইনি। তাই বর্ণনাটি উদ্ধৃত হচ্ছে :

স্বামীজী সদ্য বক্তৃতা করেছেন।

আগে-ভাগে গিয়ে দ্বিতীয় সারির বাম প্রান্তে আসন নিয়েছিলাম, যে-আসন আমি সর্বদা নিতাম লণ্ডনে, যদিও এক্ষেত্রে তা তখনি মনে পড়েনি।

তারপর যখন বসে তাঁর আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, এক বিরাট স্পন্দন, শিহরণ, ঢেকে দিল আমায়, কারণ আমি অনুভব করলাম, বাইরে বিশেষ কিছু মনে না হলেও আমার জীবনের এক পরীক্ষা-মুহূর্ত সমুপস্থিত! শেষবার যখন এইভাবে বসেছিলাম, তারপরে কত কি এল গেল, কত কি ঘটল! আমার ব্যক্তিগত জীবন—দাঁড়িয়ে কোথায়? হারিয়ে গেছে। পরিত্যক্ত পরিচ্ছদের মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাকে, যাতে করে এই মানুষটির চরণতলে নতজানু হতে পারি। ভুল হয়ে দাঁড়াবে কি তা—মরীচিকা? না কি তা হবে পরম নির্বাচন?—কয়েক মুহূর্ত বাকি, তারপরেই তা ঘোষিত হবে!

তিনি এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর আগমন, শুরু করার আগে তাঁর নীরবতা—সমস্তই অতি মহান এক স্তোত্রসংগীত। এক সুবিশাল আরাধনা।

অবশেষে কথা বললেন। খুসীতে হাসিতে তাঁর নীরবতা ভংগ। জিজ্ঞাসা করলেন : বক্তৃতার বিষয়বস্তু কি হবে? কে একজন বলল, বেদান্ত-দর্শন। তিনি আরম্ভ করলেন :

অভেদ, সর্ববস্তুর একত্ব।......'সুতরাং সকল জিনিসের পরিণতি একত্বে। যাকে বহুরূপে দেখি,—কাঞ্চন, প্রেম, দুঃখ, পৃথিবী—সবই আসলে ঈশ্বর।...... বহুকে দেখি আমরা, যদিও যথার্থত বর্তমান আছেন সেই এক-বস্তুই।...... অভিব্যক্তির মাপের পার্থক্য অনুযায়ী নামগুলির পার্থক্য হয়। আজকের জড়, আগামীকালের চেতনা। আজকের কীট, কালকের ঈশ্বর। এই যে-সব পার্থক্যকে এত সমাদরে আমরা বরণ করি, এ সব কিছুই পরম ও চরম এক অস্তিত্বের অংশমাত্র—সেই চরম ও পরম অস্তিত্বের নাম—মুক্তি।

আমাদের সকল সংগ্রাম মুক্তির জন্য—আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না, মুক্তি চাই।......মানুষের জ্বলন্ত অশান্ত, অতৃপ্ত তৃষ্ণা—আরো আরো আরো—আরো চাই। তোমরা আমেরিকান, তোমরা আরো চাইছ। গভীরে দেখলে এই বাসনা মানুষের অসীমত্বের দ্যোতক। অসীম মানুষ একমাত্র তৃপ্তি পেতে পারে অসীম কামনায়, এবং—অসীম প্রাপ্তিতে।'

অপরূপ বাক্যগুলি, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আছড়ে পড়তে লাগল, আমরা উত্থিত হলাম অনন্তে, সাধারণ মানুষ আমরা, হয়ে গেলাম আশ্চর্য শিশুর মত, যে শিশু আকাশের সূর্য-চন্দ্র-তারকার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে—সেগুলিকে শিশুর খেলনা ভেবে।

অসাধারণ কণ্ঠ বেজেই চলল :

'অসীমকে সাহায্য করতে পারে কে?......অন্ধকারের মধ্যেও যে-হাত তোমার কাছে পৌঁছেছে, সে হাত তোমারই, আর কারো নয়।'

তারপর, সে-ই বুকে বাণ-বেঁধা সকরুণ বিলম্বিত যাতনা, পৃথিবীর অতি বড় লেখনীও যাকে আভাসে প্রকাশ করতে অসমর্থ : 'আমরা—অনন্তের স্বাপ্নিকেরা—আমরা দেখব সীমার স্বপ্ন—হায়!'

আহা, কী ভুল তারা করে যারা বলে কণ্ঠস্বর কিছু নয়—ভাবই সব। স্বরের উত্থান পতনেই শব্দের কবিতায় সঙ্গীতের সঞ্চার হয়— জীবনের হাটের কোলাহলে আনে মাত্রা ও যতি, সেই সঙ্গে যেন ধ্বনিত হয় গীর্জার অর্ধালোকিত পার্শ্বদেশে কোনো এক স্তবমন্ত্রগান—সে সুর এসেছে, সে গান বেজেছে আজ এই প্রহরে।

অবশেষে—সব কিছু নেমে এল—থেমে এল—আর মিলিয়ে গেল একটি ভাবনায় : 'যদি এই অনন্ত একত্ব মুহূর্তের জন্যও বিঘ্নিত হয়, যদি একটি পরমাণুকেও চূর্ণ ক'রে স্থানচ্যুত করা হয়—তাহলে আমি দেখতে পাব না, কথা বলতে পারব না তোমাদের সঙ্গে, যে-আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কথা বলছি......হরি ওঁ তৎ সৎ!'

আর আমি! জীবন যে-অনন্ত গভীর জিনিস আমাদের জন্য ধরে আছে তার সাক্ষাৎ পেলাম। আগের মতই ঐ জায়গায় বসে শোনা,—কিন্তু বুদ্ধির সে অস্থির জ্বালা, অভিনবের জন্য কম্পন-শিহরণ আর নয়।

ঐ যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন—ওঁর মুঠিতে ধরা আমার জীবন। তিনি একবার যখন আমার দিকে তাকালেন, তাঁর দৃষ্টিতে দেখলাম লেখা আছে—যে-লেখা আমার হৃদয়েও : পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আদর্শের স্থায়ী বোধ,—ভাবাবেগ নয়।]

১ জুন, ম্যাকলাউডকে

তোমাকে চিঠি পাঠিয়ে, অন্য কাজ করার জন্য বেরিয়ে তুরীয়ানন্দের কাছে হাজির হয়ে শুনি—স্বামীজীর দেড়টায় আসার কথা!! তিনি এলেন। বিকালটা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে [অনেকখানি] হেঁটেছেন—বাইরে ক্লান্তির সামান্যতম লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু তাঁর অসুখ ছিলই। ছোট একটা অপারেশন হয়েছিল, যেটা সম্পূর্ণ সারেনি এখনো। টাকাকড়ির ব্যাপারে খুবই সতর্ক, প্রতিটি পেনী পর্যন্ত বুড়ো কৃপণের মত গুণে গুণে খরচ করছেন—দেখে হেসে বাঁচি না!

২৪ জুন, ম্যাকলাউডকে

ধীরা মাতাকে (মিসেস ওলি বুল) অতি মিষ্টি এক চিঠি পাঠিয়ে আমার আমেরিকাবাসের ইতি করছি বর্তমানের মত। স্বামীজীর ভাগ্য কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তাঁকে তা লিখেছি। স্বামীজীকে দেখাচ্ছে দেবতার মত—কিংবা শ্রেষ্ঠ দেবদূত গেব্রিয়েলের মত। এর দ্বারা ধীরামাতা অনুমান করে নেবেন—সারা পৃথিবীর মাথা স্বামীজীর পদতলে আনত।......

যুদ্ধ, যুদ্ধ—এসব কথাই সত্য—অতি সত্য। তিনি যে-রূপে এখন দৃশ্যমান—তাতে সারা পৃথিবীর কিছুই তাঁর প্রতিরোধ করতে পারবে না। সত্যই ঐশ্বরিক। আজ সকাল এগারোটায় মাতৃপূজোর বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ তোমরা পাবে—সেটার নোট নেবার জন্য যদি ১০ ডলার খরচ করতে হয়—তবুও। বিরাট ঘটনা হবে। তাঁর সামনে কেউ একজন বক্তৃতার বিষয়টি প্রস্তাব করলেন। তিনি ফিরে হাসলেন : 'মাতৃপূজো? ঠিক! ঐ বিষয়েই বক্তৃতা করব, করতে গভীর আনন্দ পাব'—সেই পুরনো জ্যোতির্ময়, স্বতঃস্ফূর্ত, মুক্তস্বরূপ।

সেদিন সকালে তিনি ৩৪-তম রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিছু সংবাদ নিয়ে। আমি যে-পরামর্শ দিলাম, তা তাঁর কাছে অনুচিত মনে হল। আহা—যুদ্ধ!—যদি তাঁর চেহারা তখন দেখতে! এমন একটা ঝলক দেখতে দুষ্টুমি করাও চলে। তিনি বললেন, "মনে রেখো! আমি মুক্ত! মুক্ত! মুক্ত হয়ে জন্মেছি!" তারপর মার কথা বলতে লাগলেন—কিভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন, তার কথা। পৃথিবী চূর্ণ হয়ে যাক, কিন্তু তিনি হিমালয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। ইউরোপীয়েরা কখনই ধর্মের প্রচার করতে পারেনি, কারণ তারা সবসময় পরিকল্পনা করেছে। তার মধ্যে দু'একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী শুধু ধর্মের কাছে পৌঁছেছে। তিনি নন, মা-ই সব করেন। মা যাই করুন, সবই সমান বাঞ্ছনীয়। একদা শিব উমার সঙ্গে কৈলাসে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ উঠে পড়লেন; উমা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমার এক ভক্ত প্রহৃত হচ্ছে, তার সাহায্যে আমি যাচ্ছি।' পরমুহূর্তে ফিরে এলেন। উমা তখনি ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'আমার সাহায্যের দরকার হবে না—সে নিজের সাহায্য নিজেই করছে।'

তারপর তিনি যাবার আগে আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ঠিক, ঠিক, তুমি মায়ের সন্তান।' আমি সরে গিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললাম—কেন জানি না মনে হল, সেটি একটি মহাক্ষণ।

[Reminiscences থেকে :

জুলাই ১৫। আজ সকালে গীতার উপর পাঠ অপূর্ব। শুরু হয়েছিল—সর্বোচ্চ আদর্শ সকলের জন্য নয়—এই বিষয়ে সুদীর্ঘ ভাষণসহ। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সাধু ক্ষত থেকে স্খলিত কীটটিকে পুনরায় ক্ষতে স্থাপন করে বলেছিলেন, ভ্রাতঃ তোমার আহার্য তুমি গ্রহণ করো। এই জিনিস যার কাছে বীভৎস ও অশ্রদ্ধাকর, তার জন্য অপ্রতিরোধের আদর্শ নয়। অপ্রতিরোধ বা অহিংসা পালন করতে হয় রুগ্ন শিশুর প্রতি মায়ের ভালবাসার মনোভাব নিয়ে। কাপুরুষ যখন অহিংসার অভিনয় করে, কিংবা সিংহ তা করে মুখব্যাদান ক'রে—তখন ব্যাপারটা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠে।

এস, আমরা খাঁটি হই। আমাদের প্রাণশক্তির শতকরা ৯০ ভাগ খরচ হয় আমরা যা নই, অন্যের কাছে নিজেদের সেইভাবে তুলে ধরার চেষ্টায়। আমরা যা হতে চাই, তাই হওয়ার চেষ্টায় ঐ শক্তির যোগ্য ব্যয় হওয়া উচিত। এইভাবে কথা বয়ে চলল—এক অবতারের কাছে নমস্কার দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল।

তোমাকে নমস্কার, ব্রহ্মাণ্ডের তুমি গুরু,
যার পাদপীঠ পূজিত হয় দেবগণের দ্বারা।
অখণ্ড আত্মা তুমি,
তুমি ভবরোগবৈদ্য,
তুমি দেবগণেরও গুরু,
তোমাকে নমস্কার করি,
তোমাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার—!

ভারতীয় সুরে এই স্তোত্র—স্বয়ং স্বামীজীর কণ্ঠে!

সমস্ত ভাষণটির মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছিল : খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের পশ্চাদ্‌গামী। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ সর্বোচ্চ নীতিকেই পৃথিবীর অনুসরণীয় পথ বলেছেন, অপর পক্ষে কৃষ্ণ সবকিছুর ধ্রুব রূপকে দেখেছেন, সর্বাঙ্গে, সর্বাংশে, বিরোধী আদর্শসমূহকে নিয়েই। যাঁরা স্বামীজীর এই চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়—স্বামীজী কেন সরবে বলে উঠেছিলেন : " 'দি সারমন্ অন দি মাউণ্ট' মানুষের আত্মার উপরে নূতনতর আর একটি বন্ধন।"

এখনকার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে স্বামীজী জীবনকে তার বাস্তবরূপে বুঝে তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের মনোভাব দেখাচ্ছেন। তিনি 'এটা নয়, এটা নয়' মনোভাব কম দেখাচ্ছেন; বেশী ফুটছে—'এই দেখছি, যার পরিণতি এই'—মনোভাব।......

মধ্যাহ্নভোজের পরে বাংলা কবিতার বিষয়ে বললেন। তারপর জ্যোতিষের বিষয়ে। আকাশের তারকারা কি চোখের ভ্রম—খেয়ালী সন্দেহ হাজির করলেন সে-বিষয়ে; কেননা মনুষ্য-অধ্যুষিত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী থেকে—তেমন পৃথিবী সমূহের অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব—কোনো সংকেত আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না কেন?

হিন্দুশিল্পের উদ্ভট চেহারা প্রসঙ্গে কারণ দেখিয়ে বললেন, এর মূলে আছে আত্মিক চেতনাকে দেহবস্তুতে পরিবেশনের জাতীয় প্রবণতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, অধিকাংশ দেহগত বা বস্তুগত জিনিসের আত্মিক প্রতীক রয়েছে, বস্তুর বাইরের চেহারার তুলনায় প্রতীকের চেহারা নিতান্ত পৃথক ও উদ্ভট।

গতকাল বললেন, শিশুকালে সচেতনভাবে ঘুমোতে যাচ্ছেন, এব্যাপার প্রায় তাঁর ঘটেনি। রঙিন আলোর একটি গোলক তাঁর কাছে আসত, সেটিকে নিয়ে তিনি যেন সারারাত খেলতেন। কখনো কখনো সেটি তাঁর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফেটে যেত বিপুল আলোক ছড়িয়ে, আর তিনি হারিয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই যে-সব প্রশ্ন করেছিলেন, তার মধ্যে এ-বিষয়ে প্রশ্নও ছিল : 'ঘুমোবার সময়ে তুমি কি কোনো আলো দেখ?' 'হাঁ,'—তাঁর সবিস্ময় উত্তর— 'কেন, সবাই কি ঘুমোবার সময়ে তাই দেখে না?'

সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন বললেন, এই অতি-মানসিক বিষয়টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তাঁর মনঃসংযোগের ক্ষমতা জন্মলব্ধ, পরে অর্জিত জিনিস নয়। একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত, অভিজ্ঞতার প্রতিটি স্তরকে স্মরণ রাখায় স্বামীজীর সহজাত ক্ষমতা অতিমানবিক ক্ষমতা; বুদ্ধের সেই শেষ দর্শনেরই এক অংশ এটি, সন্দেহ নেই।

আমরা যখন শেষপ্রান্তে পৌঁছব, তখন আর আমাদের অতীত অবতরণগুলির

বিষয়ে জানতে চাইব না। ম্যারিয়া, টেরেসা, পেট্রার্ক, এবং সবার কোনো তাৎপর্যই আমাদের কাছে থাকবে না, কিন্তু আমাদের উপলব্ধির পর্যায়গুলির মূল্য বজায় থাকবে। এই জিনিসটি তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। আমি এখন তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনছি; সবকিছুই বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এত স্বতঃসিদ্ধ লাগছে, যা ইচ্ছাশক্তির ক্ষেত্রে অপ্রাপণীয় মনে হয়। আমি নিজেকে বলি: 'অতীতে কী না কালো মেঘ আমাকে ঢেকে রেখেছিল? এত অন্ধ আর অজ্ঞান কেউ হতে পারে!' তুমি যখন আমাকে কঠিন ও শীতল ভেবেছিলে—ঠিকই ভেবেছিলে। আমি নিশ্চয় তাই ছিলাম, এবং তা হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে অনুভূতিকে বর্জন করে শুধু মনের দ্বারা কোনো জিনিসকে দেখার ধারাবাহিক চেষ্টার জন্য।

স্বামীজী এখন ভক্তি ও আবেগের বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর; তাকে তাড়াতে হবেই—বলছেন তিনি। কিন্তু যে-ভূমি থেকে তাঁর যাত্রা শুরু, সেখানে মন ও হৃদয়ের কি অসাধারণ একত্ব! যেহেতু তাঁর মন ও হৃদয় উভয়ই পূর্ণ বিকশিত, তাই কোনো একটিকে বাদ দিয়ে চলতে অসুবিধা হয় না।...]

১০ অগস্ট মিসেস ওলি বুলকে

...বুদ্ধ বলেছিলেন, জীবন তার মূলে স্বভাবে নরক। জীবনের অনেকখানি পথ না মাড়িয়ে মানুষ কেন একথা উপলব্ধি করে না তা বুঝতে পারি না। যৌবনে কেন আশার সোনার স্বপ্ন সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে! বহু বহু দিন আগে কি বুঝতে পারা যায়নি যে, সহসা বিস্মিত করে দিয়ে ঐ জ্ঞান বর্ষিত হবে! ব্যক্তিগত কষ্টের জন্য জীবনের রূপকে ভয়ংকর বলছি না,—সে কষ্ট আমার কিছুই নেই। ভয়ংকর হল, প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে মানুষের জীবন চূর্ণ করতে হয়। মিষ্টির দোকানে ভূতের মত খাটে কিছু লোকে যাতে অন্যে সুখ পায়। এই হল সত্য চিত্র। ঈশ্বরকে পর্যন্ত কামনা করতে পারি না, কোনো কোনো মানবিক কামনাকে নিপীড়িত না করে। এমন কোনো আনন্দ আমাদের কাছে আসে না যা যন্ত্রণায় পরিবর্তিত না হয়। 'মানবজীবন নিত্য স্বর্ণ-ক্রুশে গাঁথা আছে।'

কোটিপতি সম্মোহিত হয়ে শুধু চেয়েই থাকে তার স্বর্ণভাণ্ডারের দিকে। তারপর দারুণ আতঙ্কে একদিন দেখে, সে সব কিছুই পাপের পুঞ্জ ছাড়া কিছু নয়। এ ভীষণ দুঃস্বপ্নের কি ইতি নেই? 'স্থান' ধ্বংস হয় প্রলয়ে, তখন সব একাকার, কিন্তু 'কালে'র সমাপ্তি কোথায়?

কিন্তু এসবই তো শূন্য কথা মাত্র। আমাদের গভীরতম প্রকৃতিতে, স্বভাবের গহনে গহনে বাসনার শিকড় প্রবিষ্ট হয়ে আছে। মৃত্যু কি জীবনের মতই? আমি ভাবতাম—আমি তাই জেনে গেছি। ভেবেছিলাম, ওকথা ভাবা খুবই সহজ। কিন্তু তা নয়। এমনকি সুখ ও দুঃখকেও সমভাবে দেখতে পারি না। যেটুকু অংশে তা পারি, তার পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র।

শুধু কি একটি স্বপ্ন ভাঙতে হবে—হাজার হাজার স্বপ্ন! পর্দার পর পর্দা সরাই—তার পিছনে উদ্‌ঘাটিত হয় দৃশ্যের পর দৃশ্য। শক্তির লোভ জেগে থাকে দূরতম দিগন্তে। সত্যে মানুষ পৌঁছবে কি করে?

দম্ভ, পরচর্চা, আত্মবিজ্ঞাপন, গর্ব, অপরের সম্বন্ধে ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা কখনো

মরে না। এগ্‌নলি হয়ত বিলাসবাসনার চেয়ে কম নোংরা কিন্তু এগ্‌নলিকে মারা বিশ হাজার গ্‌নণে শক্ত।

এসব কথা মনে আসছে কেন? জানি না। কিন্তু মন উন্ম্‌ক্ত করতেই হবে আমাকে।

আমরা যেন আলোআঁধারির কণ্টক বনে আটক পড়ে আছি—আমরা সকলেই—*বের হওয়ার পথ নেই কোথাও।* এই শ্‌ন্য প্রান্তরের আলেয়া হল অপরকে সাহায্য করার স্বপ্ন, যা আমাদের ন্‌তনতর প্রহেলিকার দিকে নিয়ে যায়। নরকের মধ্যে **আনন্দ কিভাবে সম্ভব?** আর যদি আনন্দ না থাকে, সাহায্যই বা থাকে কি করে? না-পেতে চাইতে পারে মান্‌ষ (অন্তত আত্মপ্রবঞ্চনা করে ভাবে—সে পেতে চায় না!) —কিন্তু **দেওয়ার** স্বপ্ন যে মরে না। দেওয়ার কথা এখানে ছেড়ে দেওয়া যাক, কিন্তু অন্যের জন্য **যন্ত্রণা সহন** তো করা যায়! কী তুচ্ছ এই পরিকল্পনা। কিন্তু অন্যের জন্য সহনের আকাঙ্ক্ষা যে রয়েছে, তা-ই অন্‌ভব করতে হবে। বিরাট একটা কিছু **আছে।** আমরা আমাদের অশক্তি ও নৈরাশ্যের মধ্যেও নিজের প্রেমের বিষয়ে সচেতন। আমাদের সচেতন হতে হবে, এই সমস্ত সীমাবদ্ধতার পারে কি আছে তার বিষয়ে। হয়তো তাই। কিন্তু তার র্‌প জানি না। আমি নিজস্বভাবে সেখানে পৌঁছতে পারব না, যদি না স্বামীজী আলোকিক শক্তিতে তা আমাকে দেন। সেটা এখন বেশ ব্‌ঝেছি।......*তিনি কি আমাকে তা দেবেন? হায়, ওগো মহীয়সী সারা! তোমাকে* চুপি চুপি বলি—তিনি দিতে পারেন না। আমি যে তাঁকে দিতে চেষ্টা করতে দেখেছি আগে। যদি পারতেন, আগেই দিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর আছে—এই দেবার শক্তি আছে। কিন্তু পাওয়ার ব্যাপারে অনেকখানি যে নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করে। তা যে আমার নেই—সত্যই নেই। এমন দার্‌ণভাবে কি আমি পেতে চেয়েছি যার জন্য সব কিছ্‌ হারাতে প্রস্তুত? আমি কি মনপ্রাণ, সর্ব স্বাচ্ছন্দ্য (আসল স্বাচ্ছন্দ্য; বহিরঙ্গ স্বাচ্ছন্দ্য ভিন্ন জিনিস; বিছানা নরম হোক বা শক্ত হোক, নিদ্রাই আসল জিনিস—সেটাই স্বাচ্ছন্দ্য), স্নেহ মমতা এর জন্য বিসর্জন দিয়েছি? আর ও'রা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী—কি ত্যাগ করেছেন!—কী না ত্যাগ করেছেন?

স্বামীজী নিজে আমাকে বলেছেন, উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা 'জ্বরের মত' তাঁকে অধিকার করেছিল,—তিনি যেখানে যে-অবস্থাতেই থাকুন ঐ সংগ্রাম চলছিল,—চব্বিশ ঘণ্টা একটানা বসে, একই আসনে, তারই জন্য। এ আকাঙ্ক্ষা কার আছে?

ম্‌খে এসব কথা বলা কত সহজ যে, আমি **ম্‌ক্তি** চাই না, আমি সেবা করতে চাই, বলি দিতে চাই নিজেকে; সেবার প্রয়োজন যখন থাকবে না তখন আত্মবলির কথাও উঠবে না—তখনই ম্‌ক্তির সাধনা করা যাবে।

এ চিঠির কথা কাউকে বলো না। এসব কথা কেন লিখে পাঠালাম নিজেই জানি না।......এসব কথা গভীর বাস্তব ও অবাস্তব একই সঙ্গে—কি বল?

[এই পত্রটি আত্মবিশ্লেষণম্‌লক স্‌গভীর একটি রচনা। নিবেদিতার আধ্যাত্মিক আক্‌তি এবং মানবপ্রেমের দ্বন্দ্ব গাঢ় রেখায় অঙ্কিত এখানে। ব্যক্তিম্‌ক্তি ও মানব-সেবার যে-দ্বন্দ্ব গ্‌র্‌ বিবেকানন্দের জীবনে, সেই একই দ্বন্দ্ব শিষ্যার জীবনেও।

বোধহয় এ দ্বন্দ্ব সকল সম্বন্ধে চেতনার অধিকারী মানুষের জীবনেই ঘটে। বিবেকানন্দ তাঁর গভীরতর জিজ্ঞাসা, যাতনা ও প্রাপ্তির মহিমায় যে জীবনযন্ত্রণার উপরে কখনো কখনো বিরাজ করতে সমর্থ ছিলেন, সেই সমচ্ছ লোকের অধিবাসিনী না হওয়ার জন্য শিষ্যাকে এই জীবনের হিসাব মেটাতেই হয়েছে বারে বারে, এবং সেইজন্যই হয়তো বাইরের জগতের কাছে তাঁর মূর্তি স্পষ্টতর—সেবা ও প্রেরণা প্রত্যক্ষ। নিবেদিতাকে বলা যায়, বিবেকানন্দের মহাজীবনের সংগ্রামক্ষেত্রের বহু পতাকার একটি, সর্বোচ্চ একটি আন্দোলিত পতাকা, বাইরের বাতাসে যার বস্ত্রখণ্ড দুলেছে, কিন্তু যার প্রোথিত দণ্ড শিহরিত হয়েছে নিরন্তর ভিত্তি-পৃথিবীর আলোড়নে।

এই পত্র রচনার অল্প পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী দেশের ব্রিটানী থেকে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একাকী ইংলণ্ড যাত্রা করেন 'ভারতীয় কাজের জন্য সহায় ও সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে'। নিবেদিতা কতদিন ইংলণ্ডে থাকবেন, কিভাবে কাজ করবেন তার কোনো স্থির পরিকল্পনা ছিল না। পুরনো বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কি ভারতীয় কাজের দায়িত্ব আর বোধ করবেন ভবিষ্যতে? বহু বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে স্বামীজীকে, আর একটি নূতন দলত্যাগের জন্যও তিনি প্রস্তুত। শিষ্যার জীবনেও এটি একটি সংকটক্ষণ। স্বামীজী তা জানতেন। এর পরে কি ঘটল তা নিবেদিতার বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যাক :

> ব্রিটানীতে আমার অবস্থানের শেষ সন্ধ্যায় নৈশ আহার সমাপনের খানিক পরে যখন আঁধার নেমেছে, লতাপাদপমণ্ডিত আমার ক্ষুদ্র পাঠগৃহের দ্বারে সহসা তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বাগানে যাওয়ার জন্য আমাকে ডাকলেন। আমি বেরিয়ে তাঁকে দেখলাম—তিনি এসেছেন তাঁর একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে, যাঁর কুটীরে একত্র তিনি ছিলেন—কুটীরে যাওয়ার পথে এসেছেন আশীর্বাদ জানাতে।
>
> আমাকে দেখে বললেন, 'মুসলমানদের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্প্রদায় আছে, যারা এতই গোঁড়া যে, প্রত্যেক নবজাত সন্তানকে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে দিয়ে বলে : যদি আল্লা তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, তবে মরো, আর যদি আলি সৃষ্টি করে থাকেন, দীর্ঘজীবী হও। শিশুকে তারা যে-কথা বলে থাকে, আমি তাই তোমাকে বলছি আজ রাত্রে, তবে উল্টো করে : পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়ো; আর—যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি ধ্বংস হও! যদি মা ব্রহ্মময়ী তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, বেঁচে থাকো!'
>
> পরদিন প্রভাতে, উষার পরেই, তিনি আবার এলেন বিদায় দিতে। ইউরোপে তাঁর সর্বশেষ স্মৃতির দিকে যখন ফিরে তাকাই, দেখি : আমি বসে আছি কৃষকের পণ্যবাহী গাড়িতে—গাড়ি চলেছে—ওদিকে প্রভাতের আকাশের পটে তাঁর মূর্তি, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ল্যানিয়'-তে আমাদের কুটীরের বাহিরের পথে, ঊর্ধ্বে উত্থিত হস্ত—প্রাচ্যের অভিবাদন—আশীর্বাদও।]"

॥ ১৯০২ ॥

[মহাপ্রলয় এবং পৃথিবীর নবজন্ম—১৯০২ খৃীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাইয়ের পরে নিবেদিতার মানস-পৃথিবীর কথা বলতে গেলে বলতে হয়। স্বামীজী ৪ঠা জুলাই দেহত্যাগ করেন। এ মৃত্যু নিবেদিতার জীবনে মহাপ্রলয়েরই তুল্য। মুহূর্তের জন্য 'মহানৈতিতে' আচ্ছন্ন হয়েছিল নিবেদিতার অন্তর। কিন্তু স্বামীজীর ভাষায়, 'সৃষ্টিগর্ভ মহানৈতি'—নিবেদিতার নবজন্মও হয়েছিল—বিবেকানন্দের ভারতবর্ষের কুমারী জননীরূপে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে ব্যবহারিক জগতে নিবেদিতার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন—বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। বিষয়টি বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে, এবং তারও পরে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে বলব।

দেহত্যাগের পূর্বে স্বামীজীর উক্তি ও আচরণের বিষয়ে নিবেদিতার অপূর্ব রচনা পাওয়া যাবে 'The Master' গ্রন্থে। সেই রচনা সুপরিচিত। এখানে পুনঃ-উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধারণ্যে বলেন নি এমন অনেক তথ্যও নিবেদিতার ব্যক্তিগত পত্রে আছে; তার অল্পবিস্তর পাঠক এখানে পাবেন।]

১৬ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

কী অসাধারণ মহান হয়েছিল শেষ দৃশ্য তা কি জানো? শত্রুরাও এমনকি রুদ্ধশ্বাসে পূজা করেছে! সান্ধ্য ধ্যানের অন্তে নিঃশব্দ দেহত্যাগ—জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত। 'আমার মরণ মহামরণ হবে; হর! হর! হর! বলতে বলতে চলে যাব'—বহুদিন আগে তিনি একদা বলেছিলেন মনে পড়ে। সেকথা সত্য হল। মালা এখনো শুকোয়নি, বর্ম অটুট, সবই ঠিক আছে—তিনি চলে গেলেন। স্বামীজী! স্বামীজী! আপনার অন্তরের অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ করতে পারি—আপনার ব্যক্তিগত খেয়াল বা দুর্বলতার অনুসরণের পরিবর্তে।* মহান শিষ্যত্বের সঙ্গে দুর্বল শিষ্যত্বের পার্থক্য হল, প্রথম ক্ষেত্রে আচার্যের নৈর্ব্যক্তিক দিকেরই—ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয়—ব্যাখ্যা করা হয়।......যা হওয়া উচিত ছিল তার থেকে কত বদলে গেল। দুমাস আগে স্বামীজী কত রুষ্ট হয়েছিলেন। আর সন্ন্যাসীরাও কত নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেছেন তাই আমার পালন করা উচিত। কিন্তু এখন যা করছি, তা না করে

* এই সময়ে নিবেদিতা রাজনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন; তাতে স্বামীজী নানা সময়ে কঠোর নিষেধ করেন। স্বামীজীর এই নিষেধাজ্ঞাকে তাঁর ব্যক্তিগত খেয়াল বলেই নিবেদিতা এই সময়ে মনে করেছিলেন, এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করাকে মনে হয়েছিল তাঁর দুর্বলতার পরিচয়। কিছুদিনের মধ্যেই নিবেদিতা কিন্তু স্বামীজীর কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। ২১. ১২. ১৯০২ তারিখের এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—"বিচিত্র কথা হল, এই গোষ্ঠীর (বালীগঞ্জ গোষ্ঠী—সরলা দেবীদের) সর্ববিধ সংস্রব থেকে আমাদের ছেলেদের দূরে রাখার জন্য আমার ইদানীং উৎকণ্ঠা, যা পূর্বে আমার সংস্রবাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর বিরক্তি ও উদ্বেগ ব্যাখ্যা করে দেয়।" এই চিঠিটি পরে অন্য প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত হবে।

পারলাম না। আমি এখন ভাব-রূপ; আমার পক্ষে অন্য কিছু মেনে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যু সহজ।

আর বেশী লিখব না। সমস্ত পৃথিবীটাই পূজারত। কিন্তু জানি, তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ পূজামন্দির তোমার হৃদয়। তুমি পীড়িত, আর তোমাকে ক্লান্ত করব না।

২৮ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

সদানন্দ অতীব চমৎকার। আমার কাছ থেকে প্রথম পেলেন তাঁর (স্বামীজীর) অবস্থার বিবরণ। ৪ মে তারিখে চলে যাবার আগেই সদানন্দ বুঝেছিলেন কিছু ঘটবে, কারণ স্বামীজীর 'করুণা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল', খুব নত কোমল লাজুক ভাবে তিনি তাকাতেন, নিজের মনে হাসতেন,—ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন,'এবার ও চলে যাবে, ঠাকুরের মতই, কারণ প্রতিদিন ঠাকুরকে দেখছি ওর মধ্যে।'

......সদানন্দ জানেন, তিনি সর্বদাই আমাদের মধ্যে আছেন। যদি আমরা অন্যায়ও করতে চাই 'তিনি রক্ষা করবেন।' সদানন্দ তাঁর কাছে সন্ন্যাস নেন হৃষীকেশে। তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামীজী, যদি আমার পতন হয়?' তিনি বলেছিলেন, 'হাজার পতন হোক, কিছু এসে যায় না, আমারই দায়িত্ব, আমিই তোমাকে বেছেছি, তুমি আমাকে বাছো নি।'......

শেষের তিন বা চার মাস তিনি ভোর সাড়ে তিনটে, চারটের সময় সকলকে ডেকে তুলতেন ধ্যানের জন্য। নদীতে ডুব দিয়ে সাড়ে চারটের সময়ে মন্দিরে সবাই হাজির হত। বহুদিন প্রভাতে যেন আমিও জেগে উঠতুম, তারপরে বসে শুধু প্রণাম করতুম—মিনিটখানেকের জন্য। কিন্তু এখন আবার সকালে ক্লান্ত বোধ হয়, তাই ঘুমিয়ে থাকি।

২৮ অগস্ট, মিসেস হ্যামণ্ডকে

তুমি নিশ্চয় শুনেছিলে, গোটা শীতকাল ধরে স্বামীজী খুবই পীড়িত ছিলেন। বারাণসী থেকে ফিরলে পরে তাঁকে দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম। তবু কারো মনে হয়নি তিনি দেহত্যাগ করবেন। তাঁর যে অনেক কাজ বাকি। সেই সময়কার প্রথম সাক্ষাতে তিনি বলেছিলেন, তিনি চলে যাবেন, আমরা ভেবেছিলাম তিনি জাপান যাবেন।*......এরপর তিনি নিরাময়ের জন্য কঠোর প্রয়াস পান। উষ্ণতম তিন মাস তাঁকে জল খেতে দেওয়া হয়নি, পরিবর্তে শুধু দুধ খেয়ে থাকতে হয়েছিল। তাঁকে জ্যোতির্ময় দেখাত, লণ্ডনে যেমন দেখেছি। এই মাসগুলিতে তিনি সকলকে রাত সাড়ে তিনটে-চারটেয় উঠবার জন্য তাগিদ দিতেন। গঙ্গাস্নান করে ধ্যানের জন্য তাদের মন্দিরে বসতে হত সূর্যোদয়ের পূর্বেই। কিন্তু তাঁর স্নায়ু জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল—উন্নতি যদি কিছু হয়ে থাকে বাইরের শরীরের। মন

* এই সময়ে স্বামীজীর জাপানে যাবার কথা চলছিল। ওকাকুরা তাঁকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন।

বা স্নায়ুর অবস্থা যাই হোক না কেন, অপরূপ ঐশ্বরিক আলোক অপ্রতিহতভাবে দীপ্ত হতে দীপ্ততর হয়েছে। শেষের প্রায় দশ দিন আগে থেকে পরিবর্তন দেখা গেল। আট দিন পূর্বে ফিরে আমি তাঁর কাছে গেলাম; তিনি বললেন; 'মনে হচ্ছে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি; আর বিরাট তপস্যা ও ধ্যান আমার উপর নামছে; মন্দিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই এখন।'

তাঁর কথার মাঝখানে একটি টিকটিকি ডেকে উঠল। এখানে সকলের কুসংস্কার, টিকটিকির ডাক সত্য হয়। কিন্তু স্বামীজী আরও অন্তত তিন চার বৎসর আছেন, এবিষয়ে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে, ব্যাপারটার কল্পনাও মনে জাগেনি। এ ঘটনা রবিবারের। শুক্রবার তিনি ছেড়ে গেলেন।

বুধবার আমি আবার গেলাম। সকাল ন'টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ছিলাম। আহা, কী মধুরতা! মনে হয় তিনি জানতেন, আর দেখা হবে না। কী আশীর্বাদ! কী মধুরতা! বলে তা বোঝানো যাবে না। কিন্তু যদি আমি জানতাম—যদি! তাঁকে বেশ ভাল দেখাচ্ছিল বলে আমার মাথায় তখন একটিই চিন্তা—কি করে তাঁকে যত্নে, সাবধানে রাখা যায়! তাই এমন কোনো বিষয় উত্থাপন করিনি যাতে উত্তেজনাবৃদ্ধি ঘটতে পারে—বেশী সময় থাকতেও আমি ভয় পেয়েছিলাম পাছে বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যদি জানতাম—তাহলে প্রতিটি মুহূর্ত কত মূল্যবান—অথচ কী অসহ্য হয়ে উঠত!

জোর করে আমার পরিচর্যা করলেন, একথা কাউকে বলো না যেন। খাওয়ার সময়ে বাতাস করতে লাগলেন। খাওয়ার পরে হাত ধুইয়ে দিলেন। আমি বললাম—'অসম্ভব—এ কাজ আপনি আমার জন্য করবেন!—এ তো আমার কাজ।' তিনি হাসলেন। তারপর নিজস্ব বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললেন—'কিন্তু যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' আমার ঠোঁটে এসে গেল বলে ফেলি—'সে তো তাঁর শেষ ক্ষণে—।' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে কথা বলিনি।

চলে এলাম। শুক্রবার তিনি কলকাতায় সংবাদ পাঠালেন—'এখন সবচেয়ে ভালো।' মন্দিরে কাটালেন দুপুর পর্যন্ত, তারপর তিনঘণ্টা ধরে ছেলেদের সংস্কৃতের এক পাঠ দিলেন। সমস্ত বিকেল ধরে বহু লোকের সঙ্গে অনির্বচনীয় মধুরতায় কথা বললেন। সাড়ে চারটের সময়ে তাঁর পাঠানো সংবাদ কলকাতায় পৌঁছল। ঐ সময়ে এক কাপ গরম দুধ ও জল পান করলেন। তারপরে বেড়িয়ে এলেন দু'মাইল। ফেরার পরে সকলকে সরিয়ে দিলেন যাতে একাকী ধ্যানে বসতে পারেন, সন্ধ্যালগ্নে। অদ্ভুত কথা বলি, সেদিন প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে উত্তরপশ্চিম দিকে মুখ করে ধ্যানে বসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে তিনি ফিরে শুয়ে পড়লেন। এক বালক ব্রহ্মচারীকে ডেকে বাতাস করতে ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন। ঘুমোলেন প্রশান্তভাবে।

সহসা ঘুমের মধ্যে শিহরণ, কান্না যেন, গভীর এক শ্বাস, অনেকক্ষণ বাদে আর একটি শ্বাস—সেই শেষ। আমাদের প্রিয়তম আচার্যদেব আর নেই। জীবনের সন্ধ্যাসঙ্গীত স্তব্ধ, পৃথিবী নীরব, আর মুক্তির অরুণোদয়।

শেষের দিনগুলিতে কী মাধুর্যের আর আশীর্বাদের ছায়া আমাদের উপর বিস্তার করেছিলেন—সে কথা বলার শক্তি কার আছে!

নিশ্চয় জেনো, প্রিয় তোমরা, তাঁর বিরাট হৃদয় হিসাব নেবার সময়ে তোমাদের বিস্মৃত হয়নি। আ—হা, এখনো আমাদের তিনি মনে রেখেছেন, তার অনেক অনেক ইঙ্গিত পেয়েছি। চিরসমাধির অর্থ যাই হোক না কেন, তার মধ্যে নিহিত আছে তাঁর বিশাল শক্তি—উদ্ধারের, পরিত্রাণের।

কিন্তু আমার কামনা—সবাই ভুলে যাক তাঁকে, যাতে তিনি সচ্চিদানন্দের মধ্যে বিলীন থাকতে পারেন, এ জীবনযন্ত্রণার স্মৃতি যেন তাঁকে সেখানে বিক্ষুব্ধ করে না তোলে।

ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর মূল সাধনার উত্তরাধিকার নিতে আমার প্রাণ কী যে ব্যাকুল কি বলব! দীর্ঘ—দীর্ঘ যদি হয় ভয়ঙ্কর পথ, তবু সে আনন্দের যাত্রা। আমি যেন এই ব্রতের শক্তি পাই, জ্ঞান পাই, যেন বিশ্বস্ত থাকি,—এই প্রার্থনা করো। আমার জন্য আর কিছু চেয়ো না। না না না—আর কিছু চাই না। প্রিয় নেল, তিনি নেই—একথা সত্য নয়; তিনি আছেন—সর্বদা আছেন আমাদের মধ্যে। শোক পর্যন্ত করতে পারছি না—শুধু কাজ করতে চাই।

৪ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে

দিন চলে যায়। প্রতিদিনের শেষে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে দেখি যে, আমি সত্যই আমার পিতার নিজস্ব কাজই গ্রহণ করেছি।......

১৪ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে

শেষ বুধবার সকালে পিছনের বারান্দায় বসে কথা বলার সময়ে শেষ যে-প্রসঙ্গ তিনি করেছিলেন তা তোমাদের বিষয়ে পূর্ণ।—লেগেটের* মত ভালবাসতে কোনো পুরুষ পারেনি; তাঁর সুগভীর ব্যবসায়িক সাধুতা, চরিত্রের শুচিতা, লেডী বেটীর জন্য উদ্বেগ—ইত্যাদি। লেডী বেটীর (মিসেস লেগেট) বিষয়ে: তাঁর ভাবালুতা-হীনতা, নিজ পছন্দের বিষয়ের সঠিক নির্বাচনে তাঁর বিশেষ বুদ্ধি। আর তুমি!—নিতান্ত শিশুসুলভ বিশ্বাসের সঙ্গে (কথাটি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিলেন) উদ্ভট সন্দেহের—ডাঃ এলমার গেটস্-এর বিষয়ে—বিচিত্র মিশ্রণ! যথার্থত তাঁর মন তোমাদের নিয়েই ছিল—অতীতের স্মৃতিচর্বণায় নিমগ্ন, যে-অতীত তাঁর কাছে নিত্য বর্তমান। আর—এমনকি তাঁর চলতি কোনো ভাবনার ছোঁয়া পেয়েছে কেউ, সেও তো মহা আশীর্বাদ!

জীবজন্তুগুলির গল্প তিনি করলেন। পুরনো মজার ভঙ্গিতে 'গেজেট' শব্দটি বললেন, যা হেল-কন্যাদের উদ্দেশে আমার দীর্ঘশ্বাস এবং চিন্তাকে উদ্রিক্ত করল—সুতরাং তাদেরও তিনি স্মরণ করেছিলেন।

শেষ শুক্রবারে কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে পুরনো মিষ্টভঙ্গিতে কথাবার্তা বলেছিলেন। কথার সময়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতাও ছিলেন। সেই অপরাহ্ণে স্বামীজী ছেলেদের বলেছিলেন: 'কেউ যদি কখনো আমাকে নকল করে, তাকে

---

* মিস ম্যাকলাউডের ভগিনীপতি মিঃ লেগেট, স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী ও আমেরিকার বেদান্ত-আন্দোলনের সহায়ক।

পদাঘাতে দূর করে দেবে। আমাকে নকল করতে চেয়ো না।' হাওড়া রোড পর্যন্ত তিনি বেড়িয়ে এসেছিলেন—যে-পর্যন্ত তুমি প্রায়ই ভ্রমণ করতে।

তোমার জন্য আসল বার্তা কিন্তু এসেছিল চিতাগ্নি থেকেই। দুটোর সময়ে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি—বিছানার উপর পাতা একটি বস্ত্রখণ্ডের দিকে তাকিয়ে আমি সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ওটাও কি পোড়ানো হবে? ওটাই যে শেষবার আচার্যকে আমি পরতে দেখেছি।' সারদানন্দ সেই কাপড়টি আমাকে দিতে চাইলেন। আমি নিতে পারলাম না, শুধু বললাম, 'যদি যুমের জন্য পাড়ের কাছে কোণের একটুকু কেটে নিতে পারি—।' কিন্তু ছুরি বা কাঁচি কিছুই ছিল না আমার কাছে। তাছাড়া কাজটা দেখতেও ভাল হত কি না সন্দেহ। সুতরাং কিছু করলাম না। ছ'টার সময়ে—পাঁচটার সময়ে কি?—আমার প্রথম চিঠিতে সময়টি ঠিক লেখা আছে, মনে হয় ছ'টাই হবে,—হঠাৎ কে যেন আমার জামার হাতায় টান দিল। চোখ নামিয়ে দেখি—অগ্নি ও অঙ্গার থেকে অনেক দূরে আমার পায়ের কাছে উড়ে এসেছে ঠিক সেই দুই-তিন ইঞ্চি বস্ত্রখণ্ড—আমার প্রার্থিত। সমাধির অপর পার থেকে সে যেন তাঁর পত্র, তোমার জন্য—আমার ধারণা। তাই আমার মনে হয়, সে জিনিসটিকে তিনি হারিয়ে যেতে দেবেন না ডাকের গোলযোগে।

ব্যাপারটা গিরিশবাবুকে শোনালে তিনি শুধু শান্তভাবে বললেন, 'এ জিনিস অপরিচিত নয়।' তাঁর কাছে এ জিনিস খুবই স্বাভাবিক—কারণ স্বামীজী—আমাদের স্বামীজী মারা যাননি।—প্রিয় য়ুম! দেখতে পাচ্ছ না—এখন তিনি স্বয়ং তিনি—তিনি মৃত নন— জীবিত জীবিত চিরজীবিত। আর একটু কথা আছে। আমি জানি, কোনো বিশেষ ভাবে তিনি কিছু সময়ের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতে বদ্ধপরিকর। সে ব্যাপারটি কি? তা কি—কোনো বিষয় থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করতে চাইছেন ঘিরে রেখে? নাকি তিনি আমাদের বেগে চালিত করে বিজয়শ্রী দান করবেন? প্রিয় য়ুম, তিনি **তখন** এটা-সেটার বিষয়ে কী বলেছিলেন, সেকথা তোমার জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। **এখন** তিনি কী বলছেন, সেটাই আসল কথা। তাঁর প্রকাশ কি স্তব্ধ হয়েছে!

[স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও তাঁর অশরীরী উপস্থিতিকে নিবেদিতা নানা-ভাবে অনুভব করেন। আরও কেউ কেউ তাই করেন। এর পর থেকে নিবেদিতা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান তত্ত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হন। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহান্তের পরে যীশুখ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়ে ভক্তদের দর্শন দিয়েছিলেন, এমন কথিত আছে। স্বামীজীর "পুনরুত্থান" সম্বন্ধে নিবেদিতা এমনই স্থিরপ্রত্যয় হয়েছিলেন যে, The Master গ্রন্থের শেষে এ বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যোগ করেন। নিবেদিতার মত যুক্তিবাদী মনস্বিনী কোনো কিছুর পক্ষে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ না পেলে তাকে মেনে নেবেন এমন ভাবাই যায় না।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরের পত্রে নিবেদিতা এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবের কথা লিখেছেন—

"সেদিন ১৩ ডিসেম্বর, শনিবারের সন্ধ্যা; সদানন্দ বললেন, খণ্ডগিরিতে ক্রীসমাস ইভ উদ্‌যাপন করতে গেলে কেমন হয়! মর্মরিত বৃক্ষসহ দক্ষিণে

খাড়া পাহাড়, তাতে জনহীন গুহাগুলি—আর আমরা নীচে ঘাসের উপরে বসে আছি দীর্ঘ-শিখা কাঠের আগুনকে ঘিরে। সদানন্দ ও ভাইপো (স্বামী শংকরানন্দ) রাখালিয়া সাজে—দীর্ঘ দণ্ড নিয়েছে, কম্বলে আধখানা ঢেকেছে মাথা। আমরা পড়তে লাগলাম প্রাচ্যের জ্ঞানী মানুষদের কথা, মাঠবাসী রাখালদের কাছে রাত্রে দেবদূতগণের আগমনের কথা।

পাতার পর পাতা, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে এগিয়ে গেলাম। সেই শেষ অধ্যায়ের সত্যতা ও সরলতা কী অপূর্বভাবে অনুভূত হয়ে উঠল—যার মধ্যে ফেলে-যাওয়া শিষ্যদের কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্য ঈশ্বরপুত্রের আকৃতির ইতস্তত রেখাংকন।......

'পুনরুত্থান' আর আমার কাছে স্পষ্ট স্থূল অলৌকিকতা নয়। অতি গভীর আধ্যাত্মিক মানুষের কাছে যা প্রায়শঃ অনুভূত হয় এমন বাস্তব সান্নিধ্য,—একবার সে অনুভূতির সূচনা হলে তা একেবারে সর্বগ্রাসী চেতনা। পাকা সন্দেহবাদীর ক্ষেত্রেও একই ঘটে। পুনরুত্থিত জীবনের চল্লিশটি দিন —ক্রুশবিদ্ধ হবার পূর্বেকার তিন বৎসরের অপেক্ষা বহু বহু গুণে ঘনিষ্ঠতর, মধুরতর, পবিত্রতর, অথচ অধরা ও অতীন্দ্রিয়।

আমার কি মনে পড়েনি যে—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সপ্তাহমধ্যে স্বামীজী 'একটি জ্যোতির্ময় রূপ দেখেছিলেন!' আমার নিজ ক্ষেত্রেও—তাঁর জ্বলন্ত চিতা থেকে উড়ে-আসা বার্তা—অন্য একজনের কাছে পাঠানোর জন্য! মঠের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যখন সম্পূর্ণ ছিন্ন হল, সেই গোড়ার দিনগুলিতে এইসব মুহূর্ত কি আমাকে স্মরণ করতে হয়নি? এ-ই পুনরুত্থানের সত্যতা কি বুঝিনি! এবং সেই কালে 'পুনরুত্থান'-লেখকের দুর্গতি কি আমি স্বয়ং উপলব্ধি করিনি, যে-লেখককে এখানে-ওখানে ফুটে-ওঠা ইশারাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার চেষ্টা করতে হচ্ছে, কিন্তু দেখছেন, তাঁর নিজ লেখনীতেই ইশারাগুলি স্থূল অবয়বে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে!

মেরী ম্যাগডালেনের গল্পটি। 'এই লোকটি যদি প্রফেট হয় তাহলে এর জানা উচিত এই নারী কে এবং কি জাতীয়?' একেবারে সঠিক ঘটনা। আমরাও কি অনুরূপ ক্ষেত্রে হাজারবার ছিদ্রান্বেষী সমালোচনা শুনিনি?

মনে উদিত ভাবনার তৎক্ষণাৎ উত্তরও এসেছিল—প্রত্যক্ষ উত্তর, একইসঙ্গে অপ্রত্যক্ষও এবং সুমহান। অপরূপ কথা—প্রাচ্যের প্রাণবাণী যেন উন্মোচিত হয়েছিল একটিমাত্র ভাষণে। আমিও শুনেছি ঠিক একই ধরনের উত্তর একই জাতীয় ভাবনার ক্ষেত্রে।

প্রান্তরবাসী রাখালদের বিষয়ে সদানন্দ বললেন, দেবদূতেরা নিশ্চয়ই তাদের কাছে এসেছিলেন, কারণ তারা সাদা-মাঠা লোক। সদানন্দের মতে, রাখালদের অমার্জিতভাব কাহিনীর সত্যতা দেখিয়ে দেয়, কারণ তাদের পক্ষে কথার কারুকার্য করা সম্ভব নয়। 'কিন্তু মেরী এই সমস্ত জিনিস অন্তরে ধরে রেখেছিলেন এবং তার অনুধ্যান করতেন......'

The Story of Mary and Martha.
The Last Judgment, 'In as much as ye did it unto one of the least of these, ye did it unto the—' India itself!
The three Disciples who Offered themselves . . .

অতএব খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের পুরাণ-কথা পুনরায় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে পুনঃ-নির্ধারিত, পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত—এই প্রাচ্য দেশের প্রজ্ঞা, চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনের দ্বারা আলোকিত হয়ে।"

খণ্ডাগিরিতে এই খ্রীসমাস ইভ উদ্‌যাপনের বিবরণ নিবেদিতা তাঁর The Master গ্রন্থে দিয়েছেন—একথা আগেই বলেছি। ঐ বিবরণীতে পাই, তাঁরা Gospel of St. Luke পাঠ করেছিলেন। খৃীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে দেবদূতগণের যে-গীতির কথা তিনি বলেছেন তা হল :

Glory to God in the highest,
And on earth peace,
Goodwill toward men!

উদ্ধৃত পত্রে নিবেদিতা যে কথা লিখেছেন, তাকে আরও সুসংবদ্ধ চিন্তায় গ্রথিত করেছেন গ্রন্থমধ্যে। অংশটির অনুবাদ দিচ্ছি :

"যীশুর মহাজীবন সমগ্রতঃ আলোচিত হল। তারপর তাঁর মহামৃত্যু এবং পুনরুত্থান। গ্রন্থের চব্বিশ-এর অধ্যায়টি থেকে একের পর এক ঘটনা পড়ে যেতে লাগলাম।

এই কাহিনী এই সময়ে কানে যেভাবে বাজতে লাগল আগে তেমন কখনো হয়নি। সন তারিখযুক্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণসিদ্ধ আইনসঙ্গত দলিল-বিশেষ নয়, যার বিশ্বাসযোগ্যতা বিভিন্ন অংশের প্রাঞ্জলতা ও সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল,—তার পরিবর্তে অস্পর্শ ও অনির্বচনীয়ের দ্রষ্টার প্রায়-রুদ্ধশ্বাস, আকুতিপূর্ণ অর্ধব্যক্ত উচ্চারণতুল্য মনে হল। পুনরুত্থানের ঘটনা আমাদের কাছে গ্রহণ বা বর্জনযোগ্য এক বিশেষ ঘটনার বিবরণ না হয়ে তা চিরকালের আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির রূপ নিল, যাকে একজন কেউ অনুভূতিতে পেয়েছেন, শব্দে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সব সময়ে সফল হননি। সমস্ত অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ, ইঙ্গিতপূর্ণ, বিশ্বাস উৎপাদনের এক ব্যাকুল প্রয়াসের মত—শুধু পাঠকের জন্য নয়, কিছু পরিমাণে স্বয়ং লেখকের জন্যও।

কারণ, আমরাও কি অনুরূপ পুনরাগমনের চকিত ঝলক পাইনি, 'পুনরুত্থান'-কাহিনীর পাশেই যাকে স্থাপন করা যায়! স্বয়ং আচার্যদেব সচেতন স্পষ্ট ভাষায় যে-কথা বলেছেন তা কি সহসা মনে পড়েনি এবং তার তাৎপর্য কি উপলব্ধ হয়নি : 'আমি অনেকবার লোকান্তরিত আত্মাদের এ জগতে ফিরে আসতে দেখেছি, এবং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরের সপ্তাহে দেখেছি সেই জ্যোতির্ময় মূর্তিকে!'

আমরা এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালাম : অদৃশ্য প্রভুকে পুনর্দর্শনের জন্য শিষ্যরাই শুধু ব্যাকুল হন না, গভীরতর আকুতি বোধ করেন স্বয়ং অবতার তাঁর ছেড়ে-আসা শিষ্যদের কাছে ফিরে আসতে, সান্ত্বনা দিতে ও আশীর্বাদ জানাতে।

'পথিপার্শ্বে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, তখন কি আমাদের হৃদয় শিখাময় হয় নাই?'—এমনই উদ্দীপ্ত ক্ষণ আমরা কি বহুবার পাইনি, জানিনি?—আচার্যদেবের মহাসমাধির পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে—যখন আমরা প্রায় বিশ্বাসই করেছিলাম যে তিনি সত্য সত্যই আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আছেন।

'রুটি-প্রসাদ ভাগ করিয়া দিবার সময়ে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল'।—এও ঠিক। কোথাও একটু স্পর্শ, বা একটি শব্দ, মধু মুহূর্তে, কিংবা সহসা আলোকে উদ্ভাসিত অন্তর, জ্ঞানের লব্ধ দ্যুতি,—নানা সময়ে প্রাপ্ত এর যে-কোনো একটিই সেই গোড়ার সপ্তাহগুলিতে 'হাঁ তিনি আছেন', এই অনুভূতিতে হৃদয়কে মথিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; সেইসঙ্গে সংশয়ও ছিল, ঐ 'দর্শন' হয়ত আমাদেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষার রচনা; সেইসঙ্গে ছিল নিশ্চয়তা—আমাদের প্রার্থনার টানেই ঐ আবির্ভাব।

পুনরুত্থানকাহিনীর আপাদমস্তকে বিশ্বাসী কেউ যেভাবে পরবর্তীকালে গল্পটির পুনর্গঠন করেছেন—আমরা সে-রাত্রে খণ্ডগিরিতে পাঠকালে সেই অংশে মনোযোগ দিলাম না। পরবর্তীকালে চুনকাম করা কাহিনীর ভিতর থেকে ঝলসে-ওঠা সহজ সরল পুরাতন বিবরণীর দিকেই আমাদের মন গেল, যার মধ্যে সহসা-দর্শনের হর্ষ, অদর্শনের বিষাদ, একাদশ শিষ্যের একত্র হয়ে পরস্পর চুপিচুপি বলাবলি—'সত্যই প্রভু পুনরুত্থিত হইয়াছেন',—এবং আশীর্বাদপ্রাপ্তি অন্তে বিদায়।

পাঠকালে আমাদের বোধ হল, পুরাতন কাহিনী কোনো শারীরিক প্রত্যাবর্তনের কথা বলেনি। তার পরিবর্তে—প্রভু ও শিষ্যগণের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির সহসা অভাবিত সম্মিলন, প্রভুর ইচ্ছা ও ভালবাসার প্রত্যাবর্তন, শিষ্যের প্রার্থনার চকিত ঊর্ধ্বগমন প্রভুর উদ্দেশে, যিনি, বৈদিক উক্তি অনুযায়ী এখন জ্যোতির্ময় স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত, আমাদের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম এবং গভীর জগতে ক্রিয়াশীল—যে-বিষয়ে ইন্দ্রিয়-ভূমিতে আবদ্ধ আমরা কোনই ধারণা করতে সমর্থ নই।

আবার সেগুলি এমন বস্তুগত ব্যাপার ছিল না যে, সকলেই সমভাবে এইসব অর্ধ-শ্রুত, অর্ধ-দৃষ্ট ক্ষণিক আভাসগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে সমর্থ। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্নেরা সেগুলি ধরতেই অপারগ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্নের কাছেও ঐগুলি সংশয়সাপেক্ষ, উদ্গ্রীব আলোচনা সাপেক্ষ, ক্রমপরম্পরায় গ্রন্থনযোগ্য, এবং হৃদয়ের কোমল অনুভূতিমধ্যে ধারণযোগ্য বিষয়। খ্রীষ্ট-শিষ্যগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম এবং সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্যদের মধ্যেও কেউ থাকতে পারেন যিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু তবু...তবু...সেই রাত্রে আমরা যারা পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় খ্রীষ্টীয় পুরাণকথা পাঠ করেছিলাম খণ্ডগিরির গুহাগহনে ও আরণ্য পরিবেশে —আমরা অনুভব না করে পারিনি যে, ঐ কাহিনীর ভিতরে ও বাহিরে একটি সত্য ঘটনার সূত্র ওতপ্রোত হয়ে আছে; কোনো একজন মানব পলাতক অভিজ্ঞতার ক্ষণ-উদ্ভাসিত জ্যোতি-রেখাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন কোনো এক স্থানে এবং কোনো এক সময়ে—আমরা তাঁরই পদচিহ্ন সন্ধান করছিলাম। আমরা

তেমনই বিশ্বাস করেছিলাম, তেমনই অনুভব করেছিলাম, কারণ যতই ক্ষণকালীন হোক অনুরূপ সময়ে অনুরূপ উন্মোচন আমাদের কাছেও হয়েছিল।"

পুনরুত্থান সম্বন্ধে নিবেদিতার বিশ্বাসের পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়াও তাঁর পরম বিশ্বাসভাজন একজনের 'দর্শনে'র সমর্থনও ছিল। বৎসরখানেক পরে লেখা একটি চিঠি এখানে আগেই উদ্ধৃত করছি: (মিস্ ম্যাকলাউডকে—১৪ জানুয়ারী ১৯০৪)—

'জাপানের কর্মক্ষেত্র যদি তুমি স্বয়ং আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে না দিতে, তাহলে সদানন্দ কখনোই সেখানে যেতেন না—তাঁর দেহে স্বামীজী সেই ভূমিতে যেতে চান, এই আমার বিশ্বাস। এরপর যে-কথা বলতে যাচ্ছি সেকথা ভবিষ্যতে আমার কাছে বা-অপর কারো কাছে কখনোই তুলবে না; অত্যন্ত পবিত্র গোপন বস্তুর মত একে রক্ষা করবে। **স্বামীজী সদানন্দের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন।** সেই আবির্ভাবের কালে সদানন্দের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সদানন্দ পূর্ণ হয়ে আছেন এই বিষয়ে। তিনি অনুভব করছেন—চরম সিদ্ধি পেয়ে গেছেন। তিনি জানেন যে সবই সত্য এবং আমরা পৌঁছে গেছি।]

১১ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে

তুমি রিজলিতে। সবই কেমনভাবে না মনে পড়ছে!...আঃ সেই ঘরটি, মহা আশীর্বাদের ঘরটি...।

তোমাদের হলঘরের আগুনের পাশে বসে আছি—এই ছবি অগণ্যবার দেখি—বসে আছি আর তিনি বলে যাচ্ছেন—বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যায়—

সবই মনে হচ্ছে ব্যর্থ। শুধু ব্যর্থ নয় সেই সেই মহাজীবন। তার পূর্ণ বিজয়।

॥ ১৯০৩ ॥

২০ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

(বিকেল তিনটে, মাদ্রাজের ক্যাসল কারনেন থেকে)। আজ স্বামীজীর জন্মতিথি, সুতরাং তোমাকে কিছু লিখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারা সকাল পূজায় কেটেছে। এখন ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিচ্ছি। আগামী কাল সকালে কলকাতা যাত্রা করব। বাড়ি পৌঁছে তৃপ্ত পাব।...স্বামীজীর প্রতিটি মতকে এখন ফিরে ফিরে অনুভব করতে পারি। আমি যেন অনুভব করছি দশহাজার বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারি, যাদের কথা তিনি সর্বদা বলতেন,—যেমনভাবে তিনি রামকৃষ্ণ তৈরী করার কথা বুঝতেন, ভাবতেন।

২৮ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

আমি শুধু শক্তি চাই—সর্বপ্রকার শক্তি। শক্তি আর আলোক। দশ বছরই তাহলে যথেষ্ট।......

সত্যই আমি একাকী কাজ করে আনন্দ পাই, স্বামীজীর মতই। প্রিয় যুম, তিনি 'মানুষ চাই' বলে আর্তনাদ করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, যবনিকাপাতের পূর্বে কোন্ ভাবের জন্য তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন তা পরিষ্কার হবে না। সেই সেই ভাব যখন উন্মোচিত হবে, তখন তার চারিদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে সমবেত হবে। রামকৃষ্ণের মত তিনিও অসচেতন, যদিও তিনি যে অসচেতন হতে পারেন একথা ভাবতেই পারতেন না।

মানুষ নিজেরাই আসবে—কারও সাহায্যের দরকার নেই। তিনি চুম্বক—যার টানে ইস্পাত টুকরো হয়ে ছুটে আসে।

২৩ এপ্রিল, সেন্ট ডোরাকে

(সেন্ট ডোরা গুরুতর অসুস্থ)

প্রিয় সেন্ট ডোরা, যদি তুমি সত্যই এত শীঘ্র ছেড়ে চলে যাও, এবং যদি তুমি তারপরে তাঁর সাক্ষাৎ পাও (পাবেই জানি), যাঁর উদ্দেশে আমার সকল প্রার্থনা নিবেদিত, তাঁকে বলো, তিনি যেন আমার হৃদয়ের গভীরে দৃষ্টিপাত করে দেখেন, সেখানে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততার কোনো হানি ঘটেছে কি না—যে-বিশ্বাস তিনি পূর্ণভাবে ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁকে অন্ততঃ একথা বলো—একমাত্র তিনিই ভাঙেন বা ভাঙতে পারেন। এই আশিসই তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই। তাঁকে আরও শুধিয়ো, অবতারই তো শুধু পৃথিবীকে বলতে পারেন—'আমাকে যেভাবে পারো ভালবাসো, আমাকে ভালবাসাই মুক্তি।' (এই কথাগুলি স্বামীজী বলেছিলেন।)।......

তুমি তাঁকে কোন্ সংবাদ দেবে? তিনি পিছনে একটি ভাব রেখে গিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই, কোনো ভাবকেই তার শুদ্ধ স্বরূপে কাজে পরিণত করা যায়নি। সুতরাং মানুষ লড়াই করতে বাধ্য;—যদি তার সংগ্রাম সফল হয়, সে সাফল্যই সম্ভবতঃ হবে চরম পরাজয়। কিংবা যদি সাফল্য না ঘটে—সেই যে প্রত্যক্ষ পরাজয়—তাকে বরণ করার মত সাহস আমার নেই।

'তাঁর ভালবাসা চিরন্তন—আমাদের তরে।'

সত্য নয় কি?

...আমাদের মধ্য থেকে চলে যাবার পরেও তিনি আবার স্পর্শ করতে, সাহায্য করতে, পথ দেখাতে চেয়েছেন। তোমার রোগের ও নিঃসঙ্গতার ক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ কি এখনো তোমার সাথে আছেন? তাঁর সঙ্গে একলা আছ—তোমার হৃদয়ভরা কী না কৃতজ্ঞতা! কোনো উৎকণ্ঠা নেই—দায়িত্ব নেই—রোগে তুমি মুক্ত-প্রাণ।

প্রিয় সেন্ট ডোরা, তুমি কি বুঝতে পারো—কী তোমার অসীম ভাগ্য!......

তোমার 'দর্শনে'র সৌভাগ্যে কতই না ঈর্ষা হয়! 'চির শান্তি'র সঙ্গে তুমি আমাদের সংযোগসূত্র—আমাদের কাছে তোমার অস্তিত্বের মূল্য কতখানি তুমি

জানো না। জীবন ব্যর্থ মনে হয়। অথচ এখনো, যদি তুমি বলো যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন—আমি তা বিশ্বাস করব।

২৯ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে

তুমি নিঃসঙ্গ। তোমাকে কাছে পেতে কত না চাই। কিন্তু তা আমি পেতে পারছি না। কেন তা তুমি বুঝবে, আমি জানি। ব্যর্থতা বা সফলতা—বিশ্বস্ত থাকতেই হবে আমাকে। যদিও ব্যর্থতাই প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে, তবু তিনি তাঁর বিরাট হৃদয় নিয়ে যখন আমাদের চেয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিতে এইসব জিনিস দেখেন, তখন হয়ত আমরা যেখানে নৈরাশ্য ও নিঃসহায়তা দেখছি—তিনি দেখেন সাফল্য।......

ঈশ্বর শক্তি দিন। তাঁর (স্বামীজীর) নামে যেন সাহসদীপ্ত সত্যবাণী উচ্চারণ করতে পারি। আমার সেই বাণীতে যেন প্রবাহিত হয় তাঁর অবিকৃত অব্যাহত জীবন। তার ফলে আমি যেন দেখি—আবার প্রদীপ্ত হয়েছে তাঁর মুখ শেষ বিশ্বাসে; *তিনি অনন্তে প্রস্থান করছেন এই জেনে যে, আমি তাঁকে নিরাশ করিনি।* এই—এই—এই—আমার প্রার্থনা।

২০ মে, ম্যাকলাউডকে

নিজের মধ্যে বিরাট আত্মবিশ্বাস বোধ করেছিলাম—পৃথিবীকে উল্টে দিতে পারে এমন জীবনীশক্তি যেন আমার মধ্যে! অথচ আমি শূন্যে আর্তনাদ করছি—বাতাসেই তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! আঃ—স্বামীজী! আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস কী গভীরই ছিল!

কিন্তু তাঁদের আমি ক্ষমা করতে পারি না; 'তাঁদের' বলতে—শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী। কিন্তু তাহলেও, পৃথিবীর বিনিময়েও, আমি স্বামীজীর শান্তি বিঘ্নিত করব না। আমি শুধু তাঁর বোঝা তাঁরই জন্য বইতে চেয়েছি!—যদি আমাকে সরে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া হত! তুমি জানো, আমি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছি! তাঁরা এক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করতে, ঠিকপথে রাখতে পারতেন! হাঁ, ঠিক, তবে কিনা আমাকে তো কখনোই ঠিকভাবে চালানো সহজ নয়!

১৮ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে

আমার মধ্যে বিরাট শক্তিকে অনুভব করছি—দর্শনের, অনুভবের, ভক্তির,—দেখছি এমন শক্তি যা অতীব অতীব বিরল। পুরুষের বিচারশক্তিতে যেন নৈতিক পক্ষাঘাত এসে গেছে। যারা মানুষ হিসাবে ভালো, তারা আজেবাজে জিনিসে ব্যস্ত—যখন ধর্মযুদ্ধের হুঙ্কারে তাদের চারিদিক বিদীর্ণ করার কথা! আর যারা মন্দ তারা তো তাতেই ডুবে আছে।

২৩ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে

মনে হয় তুমি জানো এই শীতে পাশ্চাত্যে যাচ্ছি না। মিঃ স্টেড্‌কে লিখে দিয়েছি, তাঁর প্রস্তাব নিতে পারব না, যদিও তাঁর প্রস্তাব আমার যে-কোনো

কল্পনার অতীত ছিল।* কিন্তু এত বেশী পথ এখানে খুলে যাচ্ছে,—বেট-এর স্কুল, মুসলমান-সংযোগ, আমাদের সঙ্গে মিস লকউডের যোগদানের সম্ভাবনা, বিজ্ঞানের কাজ, পল্লীর জন্য হাজারো পরিকল্পনা,—এইসব দেখে মনে হচ্ছে স্বামীজীর ইচ্ছা আমি এখন এখানে থাকি। আর এখানে থেকে কাজ করাই তো শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রধান ও স্থায়ী ইচ্ছা। 'আর তাঁর ইচ্ছাই আমার শান্তি।'...তাঁর জীবন সম্বন্ধে সর্বদা অনুধ্যান করে যাব, ইতিমধ্যে বহু ভাব সেই ধ্যান থেকে মনে জেগেছে।

॥ ১৯০৪ ॥

২১ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী বিষয়ে চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। তিনি তাঁর শেষ অসুখে বিছানায় শায়িত। সহসা তিনি আমাদের সকলকে ব্যক্তিগতভাবে স্মরণ করলেন। খুব মৃদু মধুরভাবে কিছু বললেন। তারপর—'মার্গট, তোমার এত চুপচাপ থাকার দরকার নেই, পরের বার এই দরজায় এসো কোনো গাড়িতে, আর খুব পাজি গাড়ি হোক তা,'—তিনি বললেন। স্বপ্ন কত উদ্ভট হয় জানোই, কিন্তু আমার ধারণা হল—এই স্বপ্নটি, আমি যে স্বামীজীর ব্যক্তিগত ভালবাসাকে স্মরণ করেছিলুম, তারই ছদ্মবেশ। তিনি মুখরতা অপছন্দ করবেন না। তিনি খুবই জানতে চাইবেন কেন মানুষ তাঁর কাছে এসেছে!

১৭ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

বছরের চাকা ঘুরে আমরা আবার একই দিনে ফিরে আসি। পরের শুক্রবার, ২৫শে মার্চ—এইদিন আমার 'নিবেদিতা' নামের জন্মদিন। তাহলে আমি সাত বৎসরে পড়লাম। তাঁর সেবায় ধন্য হোক ঐ দিন। নির্দোষ, নিখুঁত হোক আমার সেবা—কিন্তু সে যে বড় বেশী আকাঙ্ক্ষা।

তোমার কি মনে পড়ে কিরো† ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—আমি ৪২ থেকে ৪৯-এর মধ্যে মরব। এখন ৩৬ চলছে। সুতরাং বৃত্তটি সম্পূর্ণ হলে মনে হয়। মনে হয় মারা যাব ১৯১২-তে।

[নিবেদিতা ১৯১১-র অক্টোবরে মারা যান। ১৮৯৯-এর মার্চে 'নিবেদিতা' নামে

* উইলিয়ম স্টেড 'রিভিউ অব রিভিউজ' নামক ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাময়িক পত্রের সম্পাদক, নিবেদিতাকে সাংবাদিক জীবন গ্রহণের জন্য লোভনীয় প্রস্তাব করেছিলেন। ভারতে আসার আগেই মিঃ স্টেডের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল।

† বিশ্ববিখ্যাত হস্তরেখাবিৎ। ইনি নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গেও।

দীক্ষালাভের পরে ১২ বৎসরের বৃত্ত সত্যই সম্পূর্ণ হয়েছিল। বৃত্ত পূর্ণ হবার পরে নিবেদিতা মাত্র ৬ মাস বেঁচেছিলেন।]

য়ুম, এই বৎসরগুলিতে সত্যই কি ভারতের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটবে? আমি কি দেখে যেতে পারব—আমি সত্যই স্বামীজীর কিছু কাজে লেগেছি! আমি তাই চেয়েছি—শুধু তাই চাই। চাইবও ভবিষ্যতে। শুধু চাইব—যেন তাঁর বোঝা তাঁর পক্ষে আমি বয়ে যেতে পারি। যদি আমি শুধু অনুভব করতে পারি যে, পৃথিবীর এপারে আমি তাঁর কাজে আছি বলে, ওপারে তাঁর বিরাট আত্মা দায়মুক্ত,—মুক্ত—আনন্দে ও লীলায়, তাহলে সেই অনুভূতিতেই আমার সর্বস্ব —আমার স্বর্গ, আমার নিত্য, শাশ্বত। মুক্তি আমার কাছে তুচ্ছ। এমনকি, কথা আমার মুখে উদ্ভট ঠেকবে তবু বলছি,—এমনকি আমি চাই না যে তিনি আমার পাপ ক্ষমা করুন, তিনি ঈশ্বর হোন আমার কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তি-সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রুক্ষেপ করি না, আমি শুধু তাঁর দায় বইতে চাই, যাতে তিনি মুক্ত থাকেন—ঈশ্বরানন্দ-ভোগে। সে কোন্ আত্মা যাঁর বিষয়ে এমন স্বপ্ন দেখা যায়, এবং সে স্বপ্ন যে সত্য তাও অনুভব করা যায়! সে আত্মা কি স্বয়ং ঈশ্বর নয়?

৪ মে, ম্যাকলাউডকে

এখন বৎসরের সেই সময়টি চলছে যে-সময়ে একদিন বেলুড়ের কুটীরে সুখে দিনগুলি কেটেছে। রাঙা আগুনের মত ফুলে ভরে গেছে গাছ। লীচুও খাচ্ছি প্রতিদিন। মনে পড়ে তোমার—কলকাতার দোকানে কেনাকাটা করে দিন কাটানো, নৌকায় এসে সমস্ত ফলগুলি খেয়ে ফেলা, আর সারাকে বলা যে, সেই ভোজনের গন্ধটুকুই তার জন্য বাকি আছে এখন! আজ অনেকটা ঠাণ্ডা, ঝড় ঘনিয়ে আছে বলে। সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে—বারান্দায় এপাশ থেকে ওপাশে পায়চারি করছেন স্বামীজী, আর বলছেন ঈশ্বরপ্রেমের কথা!

আ—হা—! তিনি যা আমাদের দিয়েছেন তা আমাদের মধ্যে কেউ যদি অন... দিতে পারত!

আমার দীক্ষার দিনে মস্ত নীল একটি নৌকা-আকারের ফুলের কথা তো... মনে পড়ে, যা আমরা অগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলুম? ফুলটির নাম অপরাজিতা (যে পরাজিতা হয়নি); ফুলটি আলো সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একথা জেনে কি সুন্দর লাগছে না!

সেইসব দিনের বিমিশ্র চেতনা কী অপূর্ব আর মনোরম, কারণ সে চেতনা তাঁর প্রতি ভালবাসার স্বর্ণসূত্রে বোনা। আর এখন কখনো কখনো আমার চি... শীতল, নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে—সে সব নিয়ে আমি এত ক্লান্ত হয়ে উঠি! ক্লান্ত! ক্লান্ত! ভাবগুলিকে কাজে পরিণত করার মানুষ এত অল্প! কত ... তুমি জানো না। দিন দিন ক্রমেই শিখছি—কাজের নিখুঁত যন্ত্র প্রায় বিরল, শিখছি—এক ধরনের নৈতিক কূটতা থাকে, যা আত্মাভিমান, আন্তরিকতা-হীন অগভীরতা ও আবেগশূন্যতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে; আর যার ওবস্তু আ... সেই বালক বা লোকটিকে আহ্বান করে লাভ নেই, কারণ সে কিছুই করবে ...

এক এক সময়ে মনে হয়, আমার যেন একথা বলার অধিকার এসে গেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতই,—'সদ্গুরু যথেষ্ট পাওয়া যায়, উত্তম শিষ্য পাওয়াই দুষ্কর।'

৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

সেই রাত্রি! স্বামীজীর মহাপ্রস্থানের মহারাত্রি! 'ঈশ্বরের সকল সন্তানের পক্ষে বিশেষ স্মরণের এক রাত্রি।'

৪ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে

তোমার সেই চিঠিগুলি বড় ভাল লাগে যাতে তুমি তাঁর কথা কিছু কিছু বল যা আগে শুনিনি। এবারকার তেমন কথা : আমার শিক্ষার জন্য তিনি বছরের পর বছর ব্যয় করেছেন যা অন্য কারো ক্ষেত্রে করেননি। এমন কথা শোনার পরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

১৫ অক্টোবর ম্যাকলাউডকে

খ্রীষ্টীয় মত নিঃসন্দেহে চিরন্তন সত্য, কিন্তু সে কেবল মূল সম্ভাবনায়। তাকে গতিশীল হয়ে উঠতে হলে কালোপযোগী নূতন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। স্পেনস্ যে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংঘে প্রবেশ করেছে, সে আর কিছু নয়, প্রস্তর ও কণ্টকের পথে হাঁটার ব্রত নিয়েছে। ভয়ের সূচনা তার পর থেকে।

স্বামীজী একদা আমাকে বলেছিলেন, 'মার্গট, তোমার শিষ্যদের ধর্ম তুমি তৈরী করে দাও, আর যদি পারো তাতে কিছু সার্বভৌমিক ভাব প্রবেশ করিয়ে দিয়ো। কিন্তু মনে রাখবে, গোটা পৃথিবীতে ৬ জন লোকও ঐ ধর্মের জন্য প্রস্তুত নয়।' আমার মনে হয় একথা মোটামুটি সত্য। কিন্তু আর একটি জিনিস সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত। তা হল : সাম্প্রদায়িকতার (sectarianism) অতি গভীরে প্রবেশ করার পরেই তবে মানুষ পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে পারে।......যদি এই পথে আমি কিছু পেয়ে থাকি তার কারণ একদা আমি অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলাম। আর তোমাকে মনে রাখতে হবে—কালীপূজাও সাম্প্রদায়িক ব্যাপার।

স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কালে আমার মূল প্রয়োজন ছিল—সংস্কার-সমূহ (superstitions) কি অর্থে সত্য তাই জানা। সুতরাং অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে সার্বভৌমিক তত্ত্ব শিখতে পারে—আমার মূল শিক্ষার বিষয় ছিল, কিভাবে শাশ্বত সত্যের সঙ্গে প্রতিটি পুরাণ-কথা বা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। সেই কালে আমি সকল বিশ্বাসের মিথ্যাত্বে অপরিবর্তনীয়ভাবে নিঃসংশয় হয়েছিলাম। তবু আমার ভক্ত-স্বভাব আমাকে বলেছে—এই শেষ কথা নয়। আমি নিদারুণ দোটানায় ছিলাম। তারপর পেলাম **শিক্ষা**।

কাশ্মীরের অরণ্যমধ্যে সেই রাত্রির কথা তোমার মনে পড়ে—যখন তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং আমি যখন বলেছিলাম, "সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে"—তখন কি রকম দ্রুত তিনি সায় দিয়েছিলেন!

প্রিয় য়ুম......আমার জন্য প্রার্থনা করো, কেবলই প্রার্থনা করো—আমি যেন তাঁর ইচ্ছাপ্রবাহের শূন্য ধারাপথ হতে পারি। তোমার সমস্ত জীবনও যেন আত্মসাৎ

করে নিতে পারি, আর তার দ্বারা ঐ প্রার্থনা সফল করতে পারি। আমার সমগ্র জীবন এবং শক্তিও অপ্রচুর মনে হয়। সেবা করতে, দিতে, এত সময় চলে যায়—গ্রহণের, সঞ্চয়ের সময় যে পাই না। আমাকে ঐভাবে তুমি পূর্ণ করে তোলো যাতে গতি না স্তব্ধ হয়!

৮ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

ওঃ য়ুম, এক ছোকরার সঙ্গে দীর্ঘ তর্ক হল এখনি। এখানকার মানুষের মনের মধ্যে 'সেক্যুলার' জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ঘৃণা কী গভীরে প্রবেশ করে আছে কী বলব! আধ্যাত্মিক অহমিকা এদের চিন্তা করতে উৎসাহ দেয়—খুব বড় বাসনা মানেই বিরাট মহত্ত্ব। জীবনপথের প্রতি পদক্ষেপে প্রাণপণে প্রচণ্ডভাবে কাজ করার এবং আত্মত্যাগ করার প্রয়োজন যেন নেই! সন্ন্যাসী বেশধারী যে-কেউ, তার থেকে অনেক সাহসী ও মহৎ যে-কোনো মানুষ সম্বন্ধে ঘৃণাভরে কথা বলবে, যে-হেতু *অন্য মানুষটি সন্ন্যাসী নয়!*

তবু আমি নিজের উপর বা নিজের বুদ্ধির উপর এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছি না কারণ স্বামীজী অনেক সময়ে এটা-ওটা বিষয়ে আমাকে ধমকাতেন, কিন্তু তবুও তিনি সেইসঙ্গে আমাকে সর্বমনপ্রাণ দিয়ে নিজের পথ বেছে নেবার জন্য সজোরে চালিত করেছেন। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে অন্য কোনো পথ নেই।

হাজার হাজার শিষ্য জোগাড় করতাম—যদি পারতাম! ভবিষ্যতে আত্মত্যাগে সমর্থ সেই হাজার হাজার আত্মাকে হাটে-বাজারে, বিদ্যালয়ে, ল্যাবরেটরীতে, স্টুডিয়োতে ছড়িয়ে দিতাম শিষ্যরূপে এবং যদি দেশের সেক্যুলার জীবনকে গঠন করতে পারতাম, তাহলে সেক্ষেত্রে ভগবান ও শয়তানের মধ্যে সন্ন্যাসীকে নিয়ে লড়াই বাধিয়ে দিতাম। অথচ আমি নিশ্চয়ই ধর্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন নই।

॥ ১৯০৫ ॥

১১ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

আমি এখন জ্ঞানার অধ্যায়ে পৌঁছে গেছি—আর অনুমানের মধ্যে নেই। তুমিও কি—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আঃ! স্বামীজী আমাকে যা দিয়েছেন—যদি ঈশ্বর সকলকে তা দিতেন! যদি তিনি (স্বামীজী) শুধু দিয়েই যেতেন—সর্বোচ্চ দান! কারণ এখন আমি আর কোনোমতে ভিক্ষা করতে, প্রার্থনা করতে, দাবি করতে লজ্জিত নই। অধিকাংশ লোককে এখন আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে আমি পরাস্ত করতে পারি! আমি যা চাই তা দারুণভাবে চাই। তাঁকে আমি **পাবই!** প্রত্যাখ্যান?—নৈব চ। *যে-খুঁটিতে* নিজেকে বেঁধেছি তার নাম ঈশ্বর। সুতরাং পাওয়ার বস্তু পাবই।

আমার এই শক্তির বোধ কী বিচিত্র! কারণ আমরা দুই অন্ধকারের মধ্যবর্তী একটা বিন্দু ছাড়া আর কি—অনন্তের তিমিররাত্রে ধূলির এক পরমাণু—অসীম

শূন্যের গহ্বরে পতিত ঘূর্ণ্যমান পালক বই তো নই—তবু প্রত্যেক মানবসত্তায় সমগ্রের শক্তি। কিন্তু তাই ঠিক—সর্বসময় ঠিক—অন্য কিছু হতে পারে না। সেটা জানাই রহস্যের বস্তু। কে যেন বলেছেন: 'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভার একটি তুষারকণাকে নিজ স্থানে স্থির রাখে'—তুষারকণাটি যদি তা জানত—জেনে উপভোগ করত!

৮ ফেব্রুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

ঝিলামের উপরে যাপন করা দিনগুলিতে কিভাবে না ফিরে যেতে চাই! রাত্রিগুলি—তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়া। 'আ-হা! হারিয়ে যাওয়া হাতের ছোঁয়া, নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠের শব্দ—তারই জন্য!'

কিন্তু চল! চল! সে দিনগুলি যেমনভাবে চলে গেছে, আমরাও তেমনি চলে যাব—তারকার নীচে ঘুমিয়ে পড়া পার্বত্য সানুদেশের শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে অন্তর।

১৬ ফেব্রুয়ারী, ম্যাকলাউডকে

প্রিয় য়ুম, আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমি হয়ত ভারতে আর আসবে না, আমি হয়ত যাব না পাশ্চাত্যে। যদি তাই হয়—আমরা আর কখনো মিলব না! অদ্ভুত! অদ্ভুত! পৃথিবী রইল, জীবনও রইল, তবু তোমার সাক্ষাতে এলাম না—বিচিত্র বটে! তবু তা ঘটতেই পারে। তবু—মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুপারের জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কতই সহজ হয়ে আসে! মৃত্যুর একেবারে পূর্ব পর্যন্ত স্বামীজী কিভাবে 'তাঁর বুড়ো লোকটির' সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার ভাবে বিভোর থাকতেন, আমি তা দেখেছি। তা যদি সত্য হয়—সত্য না হবে কেন—তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রেও পুনর্মিলন ও হিসাব-নিকাশ থাকবে না কেন? যেমন, তিনি সেই প্রথম ভারতীয় সন্ধ্যায়—সাত বছর আগে—আমাকে বলেছিলেন—এক পক্ষকাল আগে সে দিনটি গেছে: 'বৎসে! তুমি খুবই ভাল করেছ, খুবই ভাল।' এই হিসাব-নিকাশের জন্য কত না তৃষার্ত ছিলাম।......

আমি নিশ্চিত অনুভব করি, তিনি যা ছিলেন আরও বেশী করে তাই হয়ে উঠবেন—কতখানি, তা সহজে কল্পনা করা শক্ত। তাঁর মধ্যে ছোটখাট জিনিসগুলি তাঁর চরিত্রের গভীরতম, বিশিষ্টতম লক্ষণ।......কিন্তু য়ুম,—ওঃ য়ুম—মনে হয় আরও কোথাও না কোথাও অ্যাসফোডেল এবং ক্রোকাসের প্রান্তর থাকবে, তার মধ্য দিয়ে জলধারা প্রবাহিতও হয়ে যাবে—সেখানে তুমি এবং আমি তাঁর জ্যোতির্মণ্ডলে বাস করব, আর তাঁরই সঙ্গে ঘুরব ফিরব।

কাশ্মীরের স্বপ্নদর্শন—কী অপরূপ! আমার আরও মনে হয়, মৃত্যুর পরে সেই সময়ে অপার্থিব শান্তি ঘনাবে, তারি মধ্যে সমস্ত জীবনের সংস্কারকে সঞ্চিত করে নির্মাণ করা হবে নূতন চরিত্রের, নূতন প্রাণের। তখনকার প্রার্থনা—ঈশ্বরের হাতে যেন সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়ে ওঠার গলিত ধাতু হয়ে উঠতে পারি—যেন বিগলিত হই তাঁরই সঞ্চারিত ইচ্ছার তাপে—যেন আমাদের আমিত্ব কোথাও নির্মাণের কাজে বাধার সৃষ্টি না করে।

তারপর প্রত্যাবর্তন—অবকাশের অন্তে ভৃত্যের মত, শান্তির অন্তে সৈনিকের মত—নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে। এমনি আমার উপলব্ধি—ইচ্ছাশক্তির বোধ—যা বিস্তারিত হবে ভবিষ্যৎ নানা জীবনে, আর আচ্ছন্ন ও উৎসর্গ করবে তাদের—সকলকে।

১২ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী অতীতের লুথার বা মহম্মদের মত। জাতীয় মনের হর্ম্যনির্মাণে তাঁর বিশ্বাস রূপ নেবে। সর্ব মত ও জাতির ত্রিশ কোটি নরনারীর জীবনের উপরেই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। সেইসঙ্গে হয়ত, পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে নূতন যুগের অভ্যুদয়।......

সেই মন্দিরভবনের নির্মাণে আমি যেন একটি ইঁটও বহনের যোগ্য হই।

জ্বরে পড়ে থাকার সময়ে নানা অপূর্ব চিন্তা জাগত। যেমন, ইতিহাসে এই প্রথম একজন পুরুষ তাঁর 'মিশন্' দিয়ে গেলেন এক নারীকে। কিন্তু এখন আমি ভবিষ্যতে দেখছি শান্তি ও অবসর—আমার মূল্য আর বেশী মনে হচ্ছে না। দেখা যাক কি হয়।

৪ মে, ম্যাকলাউডকে

সেদিন সন্ধ্যায় সহসা নদীতে ঝড়ে পড়ে সারদানন্দ প্রায় ডুবে মরছিলেন—খুব বেঁচেছেন। সেই ঝড়ের কথা কি মনে পড়ে তোমার—ঝড়, অন্ধকার, বারান্দা, আর স্বামীজীর এপাশ-ওপাশ পায়চারি! ওঃ যুম, তোমাদের সঙ্গে তখন থাকতে পেয়েছিলাম—তার জন্য কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

হাঁ, একথা সত্য যে, নূতন আনন্দ, নূতন অভিজ্ঞতা ছাড়া কাজ করা সম্ভব নয়। শুধু অতীতের উপর বাঁচা যায় না। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতেই বেঁচে ছিলেন না। প্রতিদিন তিনি নূতন শিক্ষা দিতেন, জীবনকে নূতনভাবে তৈরী করতেন। সবই সত্য। আমি আর লিখতে পারছি না—বড় ক্লান্ত।

১৬ মে, ম্যাকলাউডকে

বাইরে ঝড়ের রাত্রি। ঘরে ঘরে ধাক্কা খেয়ে ঝড়ের ক্রন্দন। যেন মনে হয়, অনন্তের জন্য আত্মার ক্রন্দন।

২১ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

শুনলাম, স্বামীজী যখন মঠ (বরাহনগর) ত্যাগ করে চলে যান, যার পরে চিকাগো-ব্যাপার সমাপ্ত না করে ফিরে আসেন নি—যাবার সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলেন—দশহাজার লোককে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দীক্ষিত না করে তিনি ফিরবেন না। এখন তুমিও সেই কাজই করছ—সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ আর মানুষকে তাঁর (স্বামীজীর) নাম দিচ্ছ।

ওঃ প্রিয় যুম, একটি অতুলনীয় বৎসর সে-কি নয় যখন তুমি আর আমি বেলুড়ের ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতাম, যখন আমরা পাহাড় পর্বত দেখেছি—কাশ্মীর, অমরনাথ —এবং আমি একাকী বাস করেছি একটি ক্ষুদ্র গলিতে। অপূর্ব বৎসর—যতই দিন

যাচ্ছে, যতই সে-বিষয়ে চিন্তা করছি, মনে হচ্ছে তাই—অপূর্ব! আর তুমি হৃদয়কেন্দ্রে আসীন। তিনি যা তাই ছিলেন, নিজ স্বরূপেই, কিন্তু তুমিই শিখিয়েছিলে কেমন করে অহংকে দমন করে সেই গৌরবের আলোকরেখা দর্শন করতে হয়। এ ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।

১৫ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে

খুবই মনে হচ্ছে, তুমি এই শীতে আমেরিকায় থাকবে। তোমার আশ্রয়ের শান্তি ও মধুরতা, আর শুধু স্বামীজীর স্মরণ—অনেক কিছুর বিনিময়ে এ জিনিস পেতে আমি ব্যাকুল। তবু একথা বলাও যেন অন্যায়—অকৃতজ্ঞতা!—যখন মনে পড়ে কী পরম দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছে! নিজ জীবনের সামনে সম্ভ্রমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে আমাকে,—বিশেষ পর্দাটির সামনে, যার উপরে নিজস্ব ঈশ্বর-দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে—সেই দর্শনকে বাস্তবে, বহিরঙ্গে জীবনদান করবার দায়িত্বে। স্বামীজী যে-সব কথা বলেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক সত্য বোধ হয় তাঁর নিরন্তর সচেতন করানো আমাদের : যেখানে সেবা করেছি আমরা, সেখানে আসলে আমরা পূজার অধিকার পেয়েছি।

বহু জিনিস আবিষ্কার করতে পারছি : সর্বসময় **স্বাধীনতার** সন্ধান,—স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক হলে মধুরতম সুখের সঙ্গেও মুহূর্তমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার ক্ষমতা—এই হল সত্যের সেরা প্রকাশ। উত্তম ও অধম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার সামর্থ্য, বরং ক্ষুধার্ত থাকব তবু কদাপি অখাদ্য গ্রহণ করব না—এ জিনিস মুক্তির অধিক নিকটবর্তী—যা আগে এমনভাবে আমার কল্পনায় আসেনি।

আর একটি জিনিস—সেই অপূর্ব সরলতাই যথার্থ ধীরতার অঙ্গ। দার্জিলিঙ ত্যাগের কালে...... আমার টেবিলের উপর থেকে Burne Jones-এর আঁকা Holy Grail -এর একটি ছবি আমি নিয়ে আসি। সেই সময়ে আমার মনে হল—Holy Grail -এর Angel হতে পারলে কী অপূর্ব না হয়! এক্ষেত্রে যদি কেউ বুঝতে পারে যে, ঐ রকম একটি অখণ্ড পূজাই একজনের সমগ্র কর্তব্য এবং সেই বুঝে সম্পূর্ণ আত্মদান করতে পারে! তারপর দেখলাম—আমাদের প্রত্যেকেরই পূজার Holy Grail আছে, এবং তাঁকে পাওয়ার পরে থাকে অতন্দ্র নয়নে তাঁর অর্চনার অখণ্ড কর্তব্য।

মসীময় যখন দিন তখন ঈশ্বর ঘোষিত হন মানুষের ভালবাসার ও আত্মদানের সামর্থ্যে। তারপর সহসা যবনিকাপাত, প্রিয়তমের আবির্ভাব ও বাঙ্ময় কণ্ঠ। সত্য নয় কি?

৬ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

পুরনো চিঠি উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। তোমার অনেক চিঠিই আবার পড়ে ফেললাম। দেখলাম, তুমি কোনো একটা জায়গা, 'এমনকি কোনো মানুষকেও' দুবার দেখতে প্রায় চাও না। দেখলে ভালবাসার আবেগ নাকি শুকিয়ে যায়। কিন্তু আমি তো হাসতে হাসতে তোমার কাছে ফিরে যাই—পূর্বের মতই! এই রহস্যময়

সম্পর্কের সূত্র কি? আমি কখনোই মানবো না স্বামীজীর স্মৃতির সূত্রে আমি বাঁধা আছি, কারণ আমি কখনোই মানবো না স্বামীজী কখনো স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হতে পারেন, কিংবা আমরা যারা তাঁকে ভালবাসতাম তাদের কাছে নিত্য গরীয়ান্ উপস্থিতি ভিন্ন আর কিছু হতে পারেন! তবু পৃথিবীর লোকের দৃষ্টিতে তোমার আমার সম্পর্ক ডাক-মারফৎ!!

কত না ইচ্ছা করে, আবার মিলিত হয়ে কোনো শান্ত স্থানে দীর্ঘদিন কাটাই। সেখানে থাকবে বৃক্ষরাজি, প্রবাহিত তটিনী, তৃণদল, আকাশের তারকা এবং বিশ্রাম —সেখানে আমরা স্বর্গকে পাব, ইন্দ্রিয়ের স্বর্গ নয়—আত্মার স্বর্গ। তুমি বোধহয় এখন আর নির্জন জায়গা অপছন্দ করো না! কিন্তু আমি এমন একজনের সঙ্গে থাকতে চাই, যে এই নির্জনের শান্তিতে তৃপ্তি পাবে নিশিদিন—চিরদিন। আমি এত ক্লান্ত! বছরের পর বছর বিশ্রাম কাকে বলে যেন জানিনি।...সদাই রণশঙ্খ. যখন আমাকে ঘিরে নয় তখন দু' পা দূরে। অসুখে পড়েও ব্যস্ত হতে হয়েছে নিরাময়ের জন্য—যাতে শীঘ্র কাজে যেতে পারি। আর কাজ?—সে কাজের চেহারা অযোগ্য, জঘন্য, ইচ্ছা ও বিষাদের নানা রেখায় আঁকা বাঁকা।

॥ ১৯০৬ ॥

১২ জানুয়ারী, ওলি বুলকে

বাড়ির চারদিকে ঝড়ের হা-হা স্বর। শুনলে তোমার মনে হত—ওপার থেকে ভেসে-আসা রোদনভরা কণ্ঠস্বর, এই পৃথিবীর জন্য। শান্তি! শান্তি! মহাপ্রাণ! রাত্রি আঁধার—তবু 'দর্শন' জেগে আছে। মায়ের ডাকে সাড়া আসবেই। বলিদান তিনি পাবেন। নতুন যুগের অরুণোদয় হবে।

[এখানে উল্লেখযোগ্য—১২ জানুয়ারী স্বামীজীর জন্মতারিখ।]

১৫ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

ইউরোপের অনেক কিছু দেখতে চাই, অনেক মানুষের সঙ্গে আবার সাক্ষাতের বাসনাও আছে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিশেষভাবে মনে হচ্ছে যে, সেখানে আর কখনো যেতে পারব না। ভারতে যে-প্রতিটি মুহূর্ত আমি ব্যয় করেছি তাতে স্বামীজীর অভিপ্রায়মত কাজ হচ্ছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

১২ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে

স্বামীজী আমার জীবন কিভাবে কল্পনা করেছিলেন, আর তা কত পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এসব যখন ভাবি তখন বুক ভেঙে যায়। যদি সর্বক্ষণের উক্ত

আবহাওয়া সহ্য করা সম্ভব হত তাহলে তাঁর ইচ্ছামত মেয়েদের নিয়ে বাস করা সম্ভব হত। কিন্তু গরম সহ্য করা অসম্ভব, সত্যই অসম্ভব,—আমার এই অসুস্থতাতেই তার প্রমাণ হয়েছে। এই কারণের জন্য, স্বার্থপরতার জন্য নয়, কাজের বদল হয়েছে।

ইংলণ্ডে যাবার আগের রাত্রি ব্রিটানিতে—মনে পড়ে তোমার। আমি তোমাকে বলেছিলাম—অজানার উদ্দেশে যাত্রা করছি—শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়ের দিকে—কিন্তু মধুময় পিতার থেকে সরে যাচ্ছি—তখন তুমি সহৃদয়তার সঙ্গে আমার কথাকে নিয়েছিলে!

কখনো কখনো মনে হয়, এই তো প্রথম প্রয়াস,—আবার, বহুবার, কাজের সুযোগ আমি পাব। এগারো শো বছর কাটার আগে খ্রীষ্টধর্ম সেণ্ট ফ্রান্সিসকে সৃষ্টি করতে পারে নি, পনের শো বছর কাটার আগে সেণ্ট থেরেসাকে। কে জানে তাঁরা কতবার চেষ্টা করেছিলেন!—এবং নিজেদের ব্যর্থতাকে অনুভব করেছিলেন! পুনশ্চ—আমি কিন্তু ঐরকম কীর্তির কোনো লক্ষণ দেখছি না আমার ক্ষেত্রে, বরং কিছু নিম্নাবতরণ! তবু—তবু—আমি আঁকড়ে থাকব—চেষ্টা করে যাব। কিন্তু এখানে পথ খোলা নেই মনে হচ্ছে। যেখানে নিজের পথ বেছে নিয়ে নিজ আদর্শ প্রয়োগ করার অনিবার্য প্রয়োজন—সেখানেও নীরবতা ও আনুগত্যই একমাত্র পথ! কিন্তু—কিন্তু—আমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করছি—তা কি সত্য? তা কি সত্য? আমার হয়ে উত্তর দেবে কে?—কে!

॥ ১৯০৭ ॥

২৮ মার্চ, ম্যাকলাউডকে

বছরের এই সময়েই তোমার কাছে বেলুড়ে প্রথম এসেছিলাম। সে কথা কি মনে পড়ে? সে সব দিনের কথা সদাই মনে জাগে। কারণ এখন আমি আবার এক বিস্তীর্ণ সবুজ স্থানে রয়েছি—সন্ধ্যায় ঝড় ওঠে—স্মৃতিতে ভেসে আসে সেই সন্ধ্যা—এবং 'ভগবানের প্রতি ভালবাসা।' ঈশ্বরপ্রেম যদি কেউ দেখে থাকে—তাঁর মধ্যেই দেখেছে। অন্যত্র আমরা ঈশ্বরপ্রেমের যে-রূপ দেখি তা আসলে মানবপ্রেমের দুর্বল নিষ্কাশন ছাড়া কিছু নয়।

সময় দ্রুত ছুটছে। কাজে আর পুণ্যে ভরা দিন ক্যালেণ্ডারের পাতায় কাড়াকাড়ি করে ছুটছে—সচেতন হবার আগেই বছর কেটে যায়। একটি বছর!—যাকে আর ফেরানো যাবে না। ফেরাতে চাইও না—কারণ সমাপ্তি হবে মধুতম, মহত্তম। কিন্তু যাওয়ার পথে তার মূল্য এমনভাবে স্বীকার করা হয় যে চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ করা উচিত হবে না। আমাদের সোনার বছরটির সম্বন্ধে আমি তাই ভাবি। সে সময়ে আমাদের আনন্দ এতই তীব্র হয়েছিল যে, তার থেকে বেশী কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। তাই নয় কি? আর সেই চিন্তাতেই তো সান্ত্বনা।

৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে

ইউরোপে দীর্ঘ ভ্রমণ-সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে ভাবছি—এর ফল কী হবে। কিভাবে না প্রার্থনা করছি বিশ্বস্ত থাকতে—থাকতে—থাকতে। শেষের এই বছরগুলি এত আনন্দ ও মধুরসে ভরা যে, ভয় হয় পাছে জীবনের মধুমায়ায় আটকে পড়ি, এর লূতাতন্তুতে বাঁধা পড়ে যাই। সুখের ও আসক্তির বন্ধন। আমি আদর্শকে উপলব্ধি করতে চাই, ঘটনার ঘটা নয়। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছি। অনেক ছোট, সংকীর্ণ জিনিসের মধ্যে বড় হয়ে উঠলে ত্যাগের অর্থ হারিয়ে যায়। এখানেই সৌভাগ্যবান পায় তত্ত্ব বা নীতির পরিবর্তে মানবদেহে মূর্ত আদর্শ পূজার জন্য। 'আমার নিজস্ব যারা এসো আমার কাছে।' যতই যা হোক, আমাদের সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা 'তাঁর নিজস্ব'।

২৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে

যদি স্বামীজী চান আমি একটা-কিছু করি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমার যাত্রার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং তিনি আমাকে ফিরিয়েও আনবেন। এখন তাঁর হাতেই সব ছেড়ে দিতে পারি সহজে।

১৭ জুন, ম্যাকলাউডকে

স্বামীজী অবশ্যই সারা পৃথিবী জয়ের জন্য জন্মেছিলেন, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে কত সীমাবদ্ধ! যেমন আমি—আত্মার ফসল সংগ্রহ করতে পারি না!

॥ ১৯০৯ ॥

৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে

ব্রিন্দিসি ছুঁয়ে আছি। মহাবেদনার সপ্তম স্মৃতি-বার্ষিকীতে তোমার জন্য দু'এক কথা : যিনি ছিলেন বুদ্ধ এবং শঙ্কর, না—প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বে যিনি স্বয়ং আলোকস্বরূপ—তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আমরা পড়ে আছি মাটিতে। কিন্তু তাঁর থেকে আমরা তো বিচ্ছিন্ন নই, কারণ তিনি দেহবস্ত্র ত্যাগ করেছেন কিন্তু হারাননি কিছু—আমাদের দৃষ্টি শুধু বিভ্রান্ত হয়েছে ক্ষণিকের জন্য। সাতটি বছর—ধ্বনিময়—যেন তার মধ্য দিয়ে পরবর্তী পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। তুমি যে উত্তীর্ণ হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ সেই আলোককে অনির্বাণ রাখতে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়েছ। সে আলোক জ্বলুক, জ্বলুক বাতায়নে যেখানে তুমি তাকে স্থাপন করেছ, অনন্তকালের জন্য।

[এখানে উল্লেখযোগ্য ৪ জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগের তারিখ।]

॥ ১৯১০ ॥

৭ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

এখনো উষার আলো ফোটেনি—তুষারে আচ্ছাদিত সর্বদিক। চা-এর পরে দীর্ঘ-সময় শুয়ে আছি আর প্রার্থনা করছি—আমরা যেন সকলে আমাদের আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে ক্ষুদ্র গোপন স্থান রক্ষা করতে পারি যেখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, আর আমরা অন্যের প্রভাব বা সম্মোহন এড়িয়ে অব্যাহতভাবে বেড়ে উঠতে পারব। আমি জানি এ দাবি সঙ্গত, কারণ স্বামীজী পূর্ণ ছিলেন এতে, আর একেই তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের আধার করে তুলেছিলেন। এই বেষ্টনীর বাইরে অনেকের সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল, নিজ সীমান্তের বাইরে তাদের প্রতি তিনি মনোযোগ দিতেন, কিন্তু এর ভিতরে পদক্ষেপের ন্যূনতম সম্ভাবনা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল, এবং এই অন্তর্লোকের অবিঘ্নিত বিস্তারকেই তিনি বলতেন 'স্বাধীনতা'।

এই স্বাধীনতা—পরিসর এর যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, প্রিয় য়ুম,—একে কি অখণ্ড রাখতে পারব! সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য যেন দিন দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে বজায় রাখতে পারি।

২৮ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে

......এইসব কথা তোমার কাছে অহংকার বলে ঠেকবে, মনে হবে যেন, শুধু আমারই, আমারই কাজে সত্য আছে। কিন্তু এক অর্থে কথাটি সত্য। স্বামীজী আমার হাতে সূত্রের এক প্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তাই ধরেই চলেছি।......

[নিবেদিতার পত্রে স্বামীজী-প্রসঙ্গের শেষে গুরু ও শিষ্যার অলৌকিক সম্পর্কের একটি ব্যাখ্যা অংশতঃ উপস্থিত করছি। ব্যাখ্যাকার মোহিতলাল মজুমদার। মোহিত-লালের কেবল মনীষাই ছিল না, বিপুল হৃদয়াবেগও ছিল, যার দ্বারা তিনি চিন্তা বস্তুকে মর্মগোচর করাতে পারতেন। গুরুর নিকটে নিবেদিতার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মহা আধ্যাত্মিক কাহিনীর তাৎপর্য মোহিতলালের মত আর কেউ উদ্ঘাটিত করতে পারেননি বলে তাঁর রচনার কিছু অংশ উপস্থিত করার দায়িত্ব বোধ করেছি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় ভগিনী নিবেদিতার উপরে লিখিত প্রবন্ধ থেকে নিম্নের অংশ সংকলিত :

"গুরুর সহিত এই শিষ্যার যে-সম্পর্ক—অধ্যাত্মজীবনের সেই এক অভিনব আত্মীয়তার তত্ত্ব....... তেমন আত্মনিবেদনকাহিনী আমাদের কোনো ভক্তমাল গ্রন্থে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কেমন করিয়া এই গুরুলাভ করিয়া-ছিলেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিজেই তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে (*The Master as I Saw Him*) লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গুরুবাদের একটি শাণিত খড়্গ—যেমন দিব্য প্রভাসমুজ্জ্বল, তেমনই নির্মম; সেই খড়্গের

নীচে নিবেদিতা তাঁহার আত্মাভিমানী দেহটাকে—তাঁহার যতকিছু পূর্ব সংস্কার, এবং প্রাণ ও মনের যতকিছু কামনাকে—বলি-স্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে ভারতের হিতার্থে উৎসর্গ করিবার কালে বলিয়াছিলেন—'যদি আমার নিজের কোনো অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমা শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।'

ইহার পর নিবেদিতার যে-জীবন আরম্ভ হইল, তাহা এমনই সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন যে, বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজপতাকায় তাহার জয়ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে-অগ্নি তিনি আপন হৃদয় পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবক শিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোকটুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন।......

এমন কত মহাজীবনের মহান আত্মোৎসর্গ যুগে যুগে সকল জাতির সাধনাকে সংবর্ধিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছে; ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না, সন্ধান চায়ও না। তাহার কারণ ইতিহাসের লক্ষ্যই অন্যরূপ। যাহারা ইতিহাসকে গড়িয়া তোলে তাহাদের পরিচয় করা সহজ; যাহারা সেই গড়ার উপাদান হইয়া বা সেই গঠনশিল্পীর যন্ত্র হইয়া শিল্পীর কীর্তিকে সম্ভব করিয়া তোলে, তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। যে গড়ে তাহার একরূপ আত্মাভিমান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই যাহাকে সেই গঠনের উপাদান, উপকরণ বা যন্ত্র হইতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিমান না থাকাই আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ সেই গঠন-শিল্পী; ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে তাঁহার হাতে যন্ত্রস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন—একজনকে যেমন দুর্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইয়াছিল, অপরকে তেমনই সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিতে হইয়াছিল।

সেই আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। গুরুর নিকট শিষ্যের আত্মনিবেদন একটা অসামান্য কিছু তো নয়ই, বরং অতিশয় সাধারণ। ভক্তির অর্থ তাহাই। কিন্তু সাধারণভাবে, যে-সকল কারণে, এইরূপ আত্মবিলোপ দুঃসাধ্য নয়—নিবেদিতার পক্ষে তাহার বিপরীতগুলিই প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাবজীবনে নয়,—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়া প্রায় অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হয়। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য যে আচার অনুষ্ঠানগত পরিবর্তন মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, তাহার শতসহস্র দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু একই দেহে জন্মান্তরগ্রহণ যে সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিতাকে না দেখিলে কেহ কখনও বিশ্বাস করিত না। এই একটি দিক দিয়াও তাঁহার জীবন অনন্য-সাধারণ—এমন বোধহয় আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন জাতিটাই বদলাইয়া গিয়াছে; তাঁহার রক্তেও যেন বাঙালী-হিন্দুর জন্মজন্মান্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন ভাবধারা পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে। ভারতের সেবায় এই

শিষ্যাকে উৎসর্গীকৃত করিবার সময়ে গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে তোমার পূর্ব জীবন, পূর্ব সংস্কার, পূর্ব অভ্যাসের স্মৃতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে হইবে; দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্তুতে অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি এই দেশের সন্তান, এই জাতিই তোমার জাতি।' গুরুর ঐ বাক্য এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া? এ কোন্ যাদুশক্তির খেলা! নিবেদিতার বয়স তখন আটাশ বৎসর—তিনি য়ুরোপীয় ভাব-চিন্তা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছেন— আশ্চর্য ধীশক্তি ছিল তাঁহার। সেই ধীশক্তি, চরিত্রবল ও স্বাধীনচিন্তা এবং অধ্যয়নশীলতার বলে তিনি তৎপূর্বেই একটা তত্ত্ব ও তাহার সাধনপন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব জন্মান্তর-গ্রহণের রহস্যভেদ করিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়।......

স্বামীজীর নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজী তাঁহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; সেই গ্রন্থ (*The Master as I Saw Him*) জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব আত্মকাহিনী হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। এই কাহিনীতে এবং অন্যত্র গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একটি আত্মিক সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিতে দেখি—আমাদের জ্ঞানে তাহার কোনো নাম-নির্দেশ করিতে পারি না। গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক আমাদের দেশে নূতন নয়; সেই সম্পর্কে যত প্রকারভেদ আছে—সাধনমার্গ, অধিকার এবং শিষ্যের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চরিত্র অনুসারে, তাহাতে যে বৈচিত্র্য ঘটে তাহাও কিছু কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু স্বামীজীর সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঐ সম্পর্ক এমনই অপূর্ব যে তাহা চিন্তা করিলে দেহধারী আত্মার অনন্ত লীলা একটা নূতন রসরূপে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। একদিকে স্বামীজীর সেই দৃপ্ত পৌরুষ—যে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল দুর্বলতাকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, আর একদিকে তেমনই তেজস্বিনী নারী—সে তেজও যজ্ঞবেদীর হোমানলশিখার মত। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্বলন্ত পৌরুষই যে তেজস্বিনী নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই—ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে এই তেজ যে কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরঙ্গগণ সকলেই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।......

এই যে তেজ, চিত্তের এই দুর্দমনীয়তা ইহাই ছিল তাঁহার জন্মগত, প্রকৃতিগত সম্পদ; ইহাই ছিল তাঁহার নিজ আত্মার মূলধন। গুরু বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বলে এই বস্তুটিকে তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং ইহা যে হোমাগ্নির মতই পবিত্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই ইহা তো কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। যুবক নরেন্দ্রের মধ্যেও ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠিক এই বস্তুই দেখিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রও ঠিক সেই কারণে বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। অতএব গুরু ও শিষ্যের প্রথম দর্শনে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—উভয় ক্ষেত্রে তাহা প্রায় এক। শেষে নরেন্দ্র যেমন

বলিয়াছিলেন,—'আমাকে জয় করিয়াছিল তাঁহার অদ্ভুত প্রেম', ভগিনী নিবেদিতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সেই দুর্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম,......—পর্বতের মত অটল এবং পাষাণের মত কঠিন সেই পুরুষের অন্তরে যে-প্রেমের সুধানিস্যন্দিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইত না। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রেমের স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন—তেমন করিয়া বোধহয় আর কেহ করে নাই; কারণ সে প্রেম এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে অগ্নিশিখায় দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর প্রতি যে-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার মূলে যদি নারীপ্রকৃতিসুলভ কোনো আকুতি মর্মান্তিকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন; নিবেদিতা নিজেরই পুণ্যবলে তাঁহার গুরুর সেই ব্যক্তিসম্পর্কহীন মহাপ্রেমের (যে প্রেমের আমরা ধারণাই করিতে পারি না) অপূর্ব রস আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা জানি, স্বামীজীর পুরুষ-আত্মা প্রকৃতির বশ্যতা আদৌ স্বীকার করে নাই; মায়াকে একেবারে উড়াইয়া না দিলেও তাহাকে জয় করিয়া, বশ করিয়া, তিনি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কল্যাণী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে নারীপ্রকৃতি ছিল, তাহাকেও তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরম স্নেহে তাহাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই যে স্নেহ—ভগিনী নিবেদিতা তাহাতেই তাঁহার নারীহৃদয়ের গভীরতম পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন।......

তাঁহার গ্রন্থে (*The Master as I Saw Him*) তিনি গুরুর শেষ-জীবনের শেষ দিন কয়টির কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সর্বশেষে স্বামীজীর তিরোধানকথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই দিনের সেই ঘটনা—একটি সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ বিবৃতি ছাড়া এমন একটি কথাও তাহাতে নাই, যাহাতে তাঁহার নিজ প্রাণের এতটুকু হাহাকারও শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করার পর পাঠকমাত্রেই ঐখানে পৌঁছিয়া যতটুকু উদ্বেল না হইয়া পারে না, এবং সেইজন্য যে সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে, লেখিকা তাহাতেও বিমুখ। আমারও রীতিমত আশাভঙ্গ হইয়াছিল। তারপর যখন স্বামীজীর পৃথক জীবনকাহিনীতে তাঁহার সেই তিরোধানের বিস্তৃত বিবরণপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি আচরণের কথা অবগত হইলাম, তখন নিজের বিমূঢ়তাকেই ধিক্কার দিলাম। মৃত্যুর পরদিন বেলা ১টা—২টা পর্যন্ত স্বামীজীর শবদেহ একটি কক্ষে শয্যার উপরে সযত্নে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল; নিকটে ও দূরে তাঁহার সেই আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ায়, এবং অন্ত্যেষ্টি-কালে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব সুযোগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পক্ষে সে কেমন সংবাদ? কে তাহা বুঝিবে? বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি? পরে কেবল ইহাই দেখি যে, স্বামীজীর সেই শবদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একখানি পাখা

হাতে লইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। সে মূর্তি ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তরঙ্গ; চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাঁপিতেছে না। তিনি কেবল একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন। তখনও সেই সেবার অধিকারটি ত্যাগ করিবেন না! বুদ্ধের পরম স্নেহাস্পদ ও নিত্য সহচর আনন্দের কথা মনে পড়িল। তিনিও তাঁহার গুরুর মহাপরিনির্বাণ সময়ে শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরও কঠিন, এ ধাতু অগ্নিতেও গলে না। তাঁহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে কোন্ কবি, কোন্ সাধক, তাহা আমি জানি না।

উপরে আমি যে-প্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে করিয়াছি, তাহার প্রয়োজন ছিল। ভগিনী নিবেদিতার এই যে আত্মোৎসর্গ—এই জাতিকে তিনি যে এমন চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং তাহাকে এমন করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ সন্ধান করিতে হইলে কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে না। পদ্মফুল খুব বড় ফুলই বটে, তথাপি সূর্যের আলোক ব্যতিরেকে তাহা প্রস্ফুটিত হয় না। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশকে যে এত ভালবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়া তাঁহার জীবনটাকে তাহার সেবায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সেই গুরুরই প্রীত্যর্থে। তাঁহার গুরু যাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনিও তাহাকে ভাল না বাসিবেন কেমন করিয়া?...... গুরুর সহিত একাত্ম হইয়া, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার হৃদয় নিঃশেষে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়া, তিনি যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে এই দেশের এবং তাঁহার গুরুর সেবা। এমনই হয়; জগতের ইতিহাসে নরনারীর যত মহাবস্থবদান-কাহিনী আছে—প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণা। ঐ প্রেমের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব—আর সকলই জগতের পক্ষে মিথ্যা। সেই প্রেমকে আমরা একটা সাধারণ বস্তুরূপেই জানি, কখনও বা সেই সাধারণ বস্তুর একটী বিশেষ রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হই; কিন্তু তাহার পরম রূপ—সেই অপর রূপ— আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কারের অতীত; ভগবদ্‌প্রেমই বলো, আর গুরুভক্তিই বলো, কোনো নামেই তাহাকে বিশেষিত করা যায় না। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য —এ সকল সম্পর্ক আমাদের সংস্কারের পোষকমাত্র; প্রেম এক রূপ, তাহার দুই রূপ নাই। যাহার অন্তরে এই প্রেম নাই, সেই ব্যক্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা কীর্তন করে; তাই গুরুবাদ তাহার নিকটে আর কিছুই নয়—বৃহতের বেদীমূলে মানুষের ক্ষুদ্র অহংকে বলি দিবার যজ্ঞ-যূপ, প্রেমের অমৃতপানে আত্মাকে আনন্দস্বরূপে অধিষ্ঠিত করিবার পানপাত্র, এবং তাহারই প্রয়োজনে অদ্বৈতের একরূপ দ্বৈতবিলাস; ইহা যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা মানবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষমাত্র, ততদিন ঐ হীনযান অপেক্ষা এই মহাযানই তাহার প্রশস্ততর পন্থা হইয়া থাকিবে, এবং 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' নয়—ভগিনী নিবেদিতার ঐ জীবন এবং তাঁহার অপূর্ব সাধনাই মানুষকে সেই আশ্বাসে চিরদিন আশ্বস্ত করিবে।"

মোহিতলাল গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের এই যে ব্যাখ্যা করলেন, এর সত্যতার পক্ষে অন্য কোনো প্রমাণ দেবার প্রয়োজন নেই, নিবেদিতার একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করলেই চলবে। ১৭ অগস্ট, ১৮৯৯-তে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

'তাঁর কাছে কার কি স্থান, তা এক কথায় নির্ণয় করার চেষ্টা বৃথা। নামে তা কন্যা, ভগিনী বা বন্ধু—যা হোক হতে পারে—কারণ পৃথিবীর কাছে কোনো একটি আখ্যা বুঝবার পক্ষে সহায়ক; কিন্তু যদি কেউ তোমাকে বা আমাকে পরজীবনে স্পর্শ করে, তখন আমরা চিরন্তন স্মৃতিতে জেগে উঠে বলতে পারব স্বতঃই—'প্রিয়তম! প্রিয়তম!'—পুনর্মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।'

স্বামীজী বিষয়ে নিবেদিতার প্রবন্ধ

স্বামীজী সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সন্ধান আমরা করে উঠতে পেরেছি। এর মধ্যে তিনটি প্রবন্ধকে আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করি। একটি প্রবন্ধ বিশেষ পরিচিত ও বিখ্যাত—যেটি *Complete Works of Vivekananda* -এর ভূমিকারূপে লিখিত। অসাধারণ সেই রচনা। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর মনোজগতে বিবেকানন্দের ভূমিকার তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিবেদিতা যে গভীরতা ও সংহত মহিমার সঙ্গে উদ্ঘাটন করেছেন—সে জিনিস অল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়। এই রচনায় বহু বাক্য আছে যা ধ্রুব বাক্যের মর্যাদা পাবার যোগ্য। রচনাটির অনুবাদ পাওয়া যাবে 'বাণী ও রচনার' প্রথম খণ্ডের গোড়ায়। সেইসঙ্গে সেখানে 'চিকাগো বক্তৃতা' পুস্তকের বিশেষ ভূমিকারূপে লিখিত নিবেদিতার রচনাটির অনুবাদও দেওয়া হয়েছে। রচনা দুটি সহজে প্রাপ্তব্য বলে আমরা এখানে দিচ্ছি না।

তবে প্রথম রচনাটি থেকে কিছু অংশ মূলে উদ্ধৃত না করে পারছি না :

"We have (in these volumes of the Works of the Swami Vivekananda) what is not only a gospel to the world at large, but also, to its own children, the Charter of the Hindu Faith. What Hinduism needed, amidst the general disintegration of the modern era, was a rock where she could lie at anchor, an authoritative utterance in which she might recognise herself. And this was given to her, in these words and writings of the Swami Vivekananda.

For the first time in history. . . . Hinduism itself forms here the subject of generalisation of a Hindu mind of the

highest order. . . Long after the English language has disappeared from India, the gift that has here been made, through that language, to the world, will remain and bear its fruit in East and West alike. What Hinduism had needed, was the organising and consolidating of its own idea. What the world had needed was a faith that had no fear of truth. Both these are found here.

Of the Swami's address before the Parliament of Religions, it may be said that when he began to speak it was of 'the religious ideas of the Hindus', but when he ended Hinduism had been created. . . . .

. . . . It was the religious consciousness of India that spoke through him, the message of his whole people, determined by their whole past. And as he spoke, in the youth and noonday of the West, a nation sleeping in the shadows of the darkened half of earth, on the far side of the Pacific, waited in spirit for the words that would be borne on the dawn that was travelling towards them to reveal to them the secret of their own greatness and strength. . . .

The Swami Vivekananda would have been less than he was, had anything in this Evangel of Hinduism been his own. . . . He stands merely as the Revealer, the interpreter of India of the treasures that she herself possesses in herself. The truths he preaches would have been as true, had he never been born. Nay more, they would have been equally authentic. The difference would have lain in their difficulty of access, in their want of modern clearness and incisiveness of statement, and in their loss of mutual coherence and unity. Had he not lived, texts that today will carry the bread of life to thousands might have remained the obscure disputes of scholars. He taught with authority, and not as one of the Pundits for he himself had plunged to the depths of realisation which he preached, and he came back, like Ramanuja, only to tell its secrets to the pariah, the outcast and the foreigner.

['The many and the One are the same Reality, perceived by the mind at different times and in different attitudes'—the doctrine realised and preached by Vivekananda].

It is this which adds its crowning significance to the Master's life, for here he becomes the meeting-point, not only of the East and West, but also of past and future. If the many and the One be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation. No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion. To have and to hold is as stern a trust as to quit and to avoid."

দুটি প্রবন্ধের অনুবাদ আমরা দিয়েছি, *The National Significance of the Life of the Swami Vivekananda* এবং *Swami Vivekananda as a Patriot*। দুটি প্রবন্ধই স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে লিখিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি ২৭শে জুলাই মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার 'বেঙ্গলী' পত্রিকাতে পুনর্মুদ্রিত হয় ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২-তে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি যশোহরের 'ব্রহ্মচারিন্' নামক ইংরাজী পত্রিকাতে প্রকাশিত হবার পরে পুনর্মুদ্রিত হয় বিপিনচন্দ্র পালের নিউ ইণ্ডিয়াতে ২রা অক্টোবর, ১৯০২-তে। এই দুটি প্রবন্ধই *Vivekananda in Indian Newspapers* নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সেখান থেকেই এখানে গৃহীত।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তাঁর বিষয়ে নিবেদিতা-প্রদত্ত অনেকগুলি বক্তৃতার সংকলন *Vivekananda in Indian Newspapers* গ্রন্থে রয়েছে। সেগুলিও প্রায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মূল্য পাবার যোগ্য, বিশেষতঃ বোম্বাইয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাটি। কিন্তু গ্রন্থস্ফীতির ভয়ে সেগুলির অনুবাদ দেওয়া যায়নি।

পূর্বোক্ত *The National Significance* নামক প্রবন্ধটি ভাবগুণে ও সাহিত্যগুণে উচ্চাশের এবং প্রকাশমাত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে প্রকাশিত রচনাদির মধ্যে এইটিই সর্বোত্তম সন্দেহ নেই, এবং ভারতীয় পটভূমিকায় বিবেকানন্দের মহাজীবনের গুরুত্ব এমনভাবে পূর্বে উদ্ঘাটন করা হয়নি। পরবর্তীকালে নিবেদিতা এবং রোমা রোলাঁ এই বিষয়টিকে আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করেছেন, তবু বলা যায়, পরবর্তী বক্তব্যসমূহের অধিকাংশের বীজ এই কয়েক পৃষ্ঠার প্রবন্ধের মধ্যেই রয়েছে। নিবেদিতা তাঁর মনীষা ও হৃদয়বত্তাকে উজাড় করে দিয়েছিলেন এই রচনার মধ্যে।

প্রবন্ধটি রচনার পিছনে একটি ব্যক্তিগত-দিকও ছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগে বেদনার্ত বহু দূরের একটি মানুষকে সান্ত্বনা দেবার জন্যও প্রবন্ধটি রচিত—যাঁর

...ছে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব নিবেদিতার লেখনীতে কিছু জীবন্ত হয়ে পুনশ্চ আলোক-...ণ করতে সমর্থ। নিবেদিতা ৯ নভেম্বর, ১৯০২ মিস ম্যাক্লাউডকে লিখেছেন—'হিন্দুর ঐ প্রবন্ধটি। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই ওটি লিখিত, আর শুধু ...ই বুঝতে পারবে, কত মন্দ হয়েছে লেখাটি।'

লেখাটি 'কত মন্দ হয়েছে!'—তা যে মিস ম্যাকলাউডই কেবল বুঝবেন, মাত্র ...তিনিই, তাতে সন্দেহ নেই, কারণ তাঁর কাছে বিবেকানন্দের জ্যোতির্ময় স্বরূপের প্রকাশ কোনো লেখনীরই সাধ্য নয়। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে এটি একটি অনবদ্য রচনা, সহস্র কণ্ঠে এর জয়ধ্বনি উঠেছিল, নিবেদিতার পত্রেই তার প্রমাণ আছে। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"বলে নিই, নিগু (ওকাকুরা) পর্যন্ত লেখাটিকে 'একেবারে ভালবেসে ফেলেছে'। সেই কথাই সে বলল। বোম্বায়ের বৃহৎ সভাগুলি (নিবেদিতা যাতে স্বামীজী সম্বন্ধে ও ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন) এই লেখার জন্যই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং প্রবন্ধটি নিজের কাজ করেছে—সন্দেহ নেই।"

জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ভূমিকা

[The National Significance of the Life of the Swami Vivekananda]

পৃথিবীর কাছে 'বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত মানুষটির দৈহিক অস্তিত্ব এখন এক মুষ্টি ভস্মমাত্র। পাঁচ বৎসর ধরে আমাদের নদীতীরে যে-আলোক নিঃসঙ্গে জ্বলেছে—তা এখন নির্বাপিত। দেশে দেশে প্রতিধ্বনিত সুমহান স্বরধ্বনি মৃত্যুতে নীরব। এই বিশাল আত্মার কাছে জীবন এনেছে ঝঞ্জা, হেনেছে আঘাত,—সমাপন কিন্তু শান্তি। শান্তি! সান্ধ্য আরাত্রিকের শেষ শব্দ যখন মিলিয়ে গেল—ঘনিয়ে এল মহাকালীর মহারাত্রি—তখনই এল মৃত্যুর আশীর্বাদ, নিঃশব্দে। আহত ক্লান্ত দেহ শায়িত রইল, বিজয়ী আত্মা ফিরে গেল 'নিজ নিকেতনে'—চির সমাধিতে।

তিনি চলে গেলেন—প্রথম সাফল্যের মালা কণ্ঠে এখনো অম্লান। তিনি চলে গেলেন—যখন নূতনতর, বৃহত্তর আহ্বান কর্ণে ধ্বনিত। মধ্যে দু'একবারের কথা বাদ দিলে অসুস্থতার বেশী সময় তাঁর কেটেছে নদীতীরের সুদৃশ্য আবাসে। অবহেলায় বিশাল খ্যাতিকে উপেক্ষা করে তিনি সেখানে থাকতেন—উদ্যানের বৃক্ষলতা, পশুপাখীর মধ্যে—আর শিক্ষা দিতেন সমবেত শিষ্যদের সহজ ছন্দে। নিজের করণীয় কর্তব্যকে কঠোরভাবে সংহত করে বলতেন—'মানুষ তৈরীই' আমার ধর্ম। আর সেই মানুষ তৈরীর কাজ করেছেন দিনের পর দিন, অব্যাহত পরিশ্রমে—গুরুরূপে, পিতারূপে, শিক্ষকরূপে—যখন যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবে। তাঁর বিদায়-দিনের অপরাহ্ণে পর্যন্ত কি তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের শিক্ষাদান করেননি তিন ঘণ্টা ধরে? এমন মানুষের কাছে বাইরের সম্মান বা নেতৃত্বের গৌরবের মূল্য কিছুই নয়। পাশ্চাত্ত্যবাসের সময়ে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী অনেক বন্ধু তাঁর হয়েছিল—তাঁরা পারলে সানন্দে তাঁকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতেন। কিন্তু তাঁর কাছে সমস্ত বিলাস ঐশ্বর্য সত্ত্বেও প্রতীচ্য-পৃথিবী আকর্ষণহীন। ভিক্ষুকের জীর্ণ কন্থা,

কলকাতার নোংরা গলি, স্বজাতির অক্ষমতা অনেক বেশী প্রিয় তাঁর কাছে বিদেশীয় গৌরবময় জীবনের তুলনায়। প্রাচ্য-অভিমুখে এই চিরযাত্রী—এ'কে পাশ্চাত্যে যাঁরা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, মুষ্টি তাঁদের আলগা করে দিতে হয়েছিলই।

পাশ্চাত্য তাঁর কাছ থেকে কোন্ বার্তা পেয়েছিল যার জন্য অত মানুষ তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যদের অন্যতম বলে বন্দনা ও বরণ করেছিল? নিজের সপক্ষে বিশিষ্টতার দাবি তিনি করতেন না; ব্যক্তিগত জীবনকথা বলতে চাইতেন না। গুরুভাইদের অপেক্ষা অধিক-বিশিষ্টতা তিনি দাবি করেছেন, এমন কথা তাঁর মুখে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত ও আস্থাভাজন একজনও কখনো শোনেননি। বাইরের মানুষের কাছে কোনো বিশিষ্ট ধর্ম, বা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ নাম, বা কোনো বিশেষ গুরুর পক্ষে প্রচার করতেন না। অপরপক্ষে, তাঁর মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের বেগবান ধারা প্রবাহিত হত। যেন হিমালয়ের মহারহস্যরাজ্য থেকে প্রত্যক্ষ আহৃত নির্মল পুণ্যবারি তিনি বুদ্ধিজীবী, অধ্যাত্মরসপিপাসু পৃথিবীর মানুষের উপর বর্ষণ করতেন। ভারতের বিরাট বিচিত্র ধর্ম-সংস্কৃতিকে ও পুণ্যাত্মাদের প্রত্যক্ষে দর্শন অবশ্যই তিনি করেছেন। তথাপি তিনি উপনিষদ ছাড়া প্রামাণ্যরূপে আর কিছু উদ্ধৃত করতেন না, বেদান্ত ভিন্ন প্রচার করতেন না। আর মানুষের অন্তরাত্মা তাঁর কথা শুনে শিহরিত হয়ে উঠত, কারণ এই একজন ধর্মাচার্যের কথা তারা প্রথম শুনল যিনি সত্যে ভীত নন।

শিবের সেই গানটি আমাদের জানা আছে: 'শিব পথ দিয়ে যাচ্ছেন, কেউ বলে তিনি পাগল, কেউ বলে দানব, আর কেউ বলে—উনি কে জানো না? স্বয়ং ঈশ্বর।' এইভাবে ভারত জানে—প্রত্যেক বিরাট চরিত্র বিরোধী আদর্শের মিলনভূমি। শিষ্যদের কাছে বিবেকানন্দ চিরদিন সন্ন্যাসের সর্বোচ্চ আদর্শ—তাঁর সকল প্রেরণার মধ্যে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রকাশই মুখ্য।—'আমার গুরু যেমন, তেমনি আমিও যেন বিদায় নিতে পারি খাঁটি সন্ন্যাসীরূপে, কামকাঞ্চন ও খ্যাতিতে নির্বিকার থেকে,'—তিনি একদা তীব্র আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন।—'ঐ তিনের মধ্যে খ্যাতির প্রলোভন দূর করাই সবচেয়ে কঠিন,'—তিনি যোগ করেছিলেন। অথচ যে-নিয়তি তাঁকে তাঁর বৈরাগ্যের জ্বলন্ত তৃষ্ণায় অস্থির করেছে, সেই নিয়তিই তাঁর মধ্যে গৃহীর আদর্শকে মূর্ত করেছিল; পালনে ও রক্ষণে ব্যগ্র, পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন অনুধাবনে ও অনুধাবন করানোয় উৎসুক, জীবনের সংগঠন ও ইতিহাস রচনায় অগ্রসর—আদর্শ গৃহী। এই দিক থেকে তিনি বাস্তবিকই Benedict, Bernard, Robert de Citeaux এবং Loyola -র সগোত্র। একথা বলা যায়, ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাসে সেন্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসির মধ্যে যেমন একবার ভারতীয় সন্ন্যাসের গৈরিকচ্ছায়া পড়েছিল, তেমনি অপরদিকে বিবেকানন্দের মধ্যে নবজন্ম নিয়েছিল পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের মহান সেন্ট-অ্যাবটগণ।

তিনি যেমন অতীন্দ্রিয় ঊর্ধ্বচেতনার সুবিরাট প্রকাশ, তেমনি আবার একই সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেশপ্রেমিকদের একজন। জাতীয় চিত্তের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার যুগে তাঁর আবির্ভাব এবং তিনি প্রগতিতে নির্ভয় ছিলেন। ঐতিহ্যে বিশ্বাস হারিয়েছে যখন মানুষ, তখন তিনি পুরাতনকে নমস্কার করেছেন। তিনি জাতির নিয়তি-পুরুষ; নবপ্রত্যয়ের নেতাদের মতই তিনি চেতনার নূতন তরঙ্গাঘাত

করেছেন। তাঁর মত পুরুষের মধ্যে প্রকাশিত হয় ভবিষ্যতের পূর্ণ 'বেদ'। একথা অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে—বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মহিমা বুঝবার সময় এখনো আসেনি। ধর্মের প্রাণপূর্ণ বীজ তিনি বপন করেছেন, কিন্তু ফসলের সময় হয়নি। অপরদিকে, 'দেশপ্রেমিক' বিবেকানন্দকে দেশ পেয়ে গিয়েছে এখনি—তাঁর মৃত্যুর শঙ্খধ্বনিতে! আচার্য যখন শিষ্যবৃন্দের মধ্য থেকে বিদায় নিলেন, শ্মশানের অগ্নিশিখার সামনে সমালোচকের গুঞ্জন যখন স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন শোনা গেল —স্বাধীনতার বিশাল কণ্ঠ অব্যাহত মহিমায় নিনাদিত,—আর সারা জাতি সাড়া দিল এক স্বরে।

নানা দেশের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার বিরল সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে দেখেছেন। উচ্চ নীচ সকলে তাঁকে গ্রহণ করেছে। তাঁর অসাধারণ দীপ্ত মনস্বিতা সব কিছু দৃষ্ট বস্তুরই পরিমাপ করতে পেরেছে। 'আমেরিকা শূদ্র-সমস্যার সমাধান করবে কিন্তু কি ভয়ঙ্কর আলোড়নের মধ্য দিয়ে,' —তিনি বারবার বলতেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণকালে পাশ্চাত্ত্যের ধনলোভ ও পীড়নলালসা দেখে তাঁর মত বদলে গেল। এর বিপরীত দিকে তুলনামুখে তাঁর মনে জাগল বহু শতাব্দী পূর্বে চীন-প্রবর্তিত এশিয়ার পুরাতনী নৈতিক সভ্যতার শান্ত মহিমা ও স্থিতিশীলতার কথা। তাঁর অসাধারণ মনীষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অপূর্ব মানবতা। আফ্রিকার জাতিগুলির বিরুদ্ধে একবার জনৈক আমেরিকান ঘৃণা প্রকাশ করলে তিনি তাকে যেভাবে নাজেহাল ক'রে তোলেন—তাতে প্রকাশিত হয়েছিল নিগ্রোদের সম্বন্ধে মানবতার অপূর্ব আশ্বাস। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে যখন তাঁকে কখনো কখনো নিগ্রো বলে মনে করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে (যে-ভুল ধরা পড়া মাত্র সেখানকার সর্বাধিক দায়িত্বশীল পরিবারগুলি প্রচুর সমাদরের মধ্যে তা সংশোধন করেছে)—তখন তিনি কখনো প্রতিবাদ করে নিজের পরিচয় দেননি।—'তা করলে আমার ভাইকে কি অসম্মান করা হত না?'—পরিচয় না দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সহজভাবে বলতেন। তাঁর কাছে প্রতি জাতিরই নিজস্ব মহিমা ছিল—তারই দ্বারা উজ্জ্বল দেখতে চাইতেন তাকে। তুর্কী জাতি ভিন্ন ইউরোপ, আদিম সন্তানগণ ছাড়া মিশরের অস্তিত্ব যেন তাঁর কল্পনায় ছিল না। ইংলণ্ড তাঁর কাছে এমন এক দেশ যেখানে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে মানুষ আনুগত্যের রহস্য শিক্ষা করেছে, এবং জাপানীর দেশপ্রেম?—অন্য কারো সঙ্গে তার তুলনা করাও পাপ।

নিজ দেশবাসীর জন্য বিবেকানন্দ কোন্ উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন? যে-গৈরিক বহির্বাস তিনি ত্যাগ করে গেলেন, তাতে জাতির কোন্ জীবনমন্ত্র লিখিত ছিল? সেই গৈরিক বস্ত্রখণ্ডকে কি ঊর্ধ্বে কেতনরূপে উড়িয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে?—নিশ্চয়ই। কারণ তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন ব্যর্থতা যাঁর স্বপ্নেও আসত না। সেই এক পৌরুষ, যা 'শক্তি' ভিন্ন কিছু উচ্চারণ করেনি। ভাবালুতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্রোহী এই মানুষের বিষয়ে মিশনারী-কুৎসাগুলি কি এখনো কানে বাজছে না? তার কয়েকটিকে কি বিপরীত পক্ষে গর্বের বস্তু বলে ঘোষণা করব না? বিদেশীর সামনে তিনি শিক্ষাদাতা আচার্য-রূপেই দাঁড়াতেন—অন্য কোনো চেহারায় নয়।—'স্বামীজীর বিরাট প্রতিভার ভিত্তিতে

আছে তাঁর মহান মর্যাদা—এক কথায় তা মহারাজোচিত!'—তাঁকে বিশেষভাবে জানতেন এমন একজন ইংরাজ বলেছিলেন। প্রাচ্য সম্মুখীন হবে পাশ্চাত্যের কাছে চাটুকার রূপে নয়, ভৃত্যরূপে নয়—সম্মুখীন হবে গুরুরূপে, আচার্যরূপে। তিনি নিজে কখনো ব্যক্তিগত প্রভুত্বের পতাকা নত করেননি সেখানে। 'ইউরোপীয়রা আমাদের ধর্মে নেতৃত্ব দেবে? ?—ধিক!!!'—তাঁর কণ্ঠের ঘৃণার তীব্রতা গোটা কথাটাকে হাস্যকর করে তুলত।—'আমি কখনো প্রতিশোধের কথা বলিনি,'—তিনি একবার বলেছিলেন —'আমি বলেছি আত্মশক্তির পক্ষে। আমরা কি সমুদ্রের জলকণার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার কল্পনা করতে পারি? সেটা কিন্তু একটা মশার পক্ষে মস্ত কিছু।'

ভারতীয় কোনো কিছুর জন্য তিনি কুণ্ঠিত বা ক্ষমাপ্রার্থী ছিলেন না। বিদেশীর অতি-মার্জিত বুদ্ধিতে হয়ত ভারতীয় কিছু জিনিস স্থূল বর্বর ঠেকেছে। সে সব জিনিস তিনি অস্বীকার করলেন না, কমাবার বা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করলেন না, পরন্তু নিজের বিরাট শক্তিকে প্রয়োগ করলেন সেই বস্তুটির সমর্থনে, আর তার ফলে হতভাগ্য সমালোচকটি নিজের যুক্তির দড়ি গলায় আটকে অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগল। যেমন একটি ঘটনা: জনৈক ইংরাজ জাহাজে তাঁকে হিন্দু পুরাণ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাসূচক প্রশ্ন করেন। তারপর যা ঘটল ভুলবার নয়। স্বামীজী, খ্রীস্টীয় ধর্ম-কাহিনীর তুলনায় হিন্দু পুরাণকে সমুচ্চে স্থান দেওয়ার পরে বেদ বা উপনিষদকে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমায় স্থাপন করলেন, এমন প্রচণ্ড যুক্তির সঙ্গে যে, উক্ত ইংরাজ একেবারে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেলেন। এমনই সব ক্ষণে, যখন জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করছেন, তখন ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কোনো মূল্যই ছিল না তাঁর কাছে। এমন মনোভাবকে সবসময়ে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে তা যথার্থই অপ্রীতিকর। কিন্তু কী প্রচণ্ড পৌরুষ!—শত্রুরাও স্বীকার করবে। পুনশ্চ বলা যায়, বিবেকানন্দের কাছে ভারতের সব কিছু সমানভাবে, সম্পূর্ণভাবে পবিত্র:—'মুক্তিকামী সকলকেই এই ভূমিতে জন্ম নিতে হবে!'—তাঁর ধর্মবোধ স্নিগ্ধ নির্ঘোষে জানিয়েছে। চিকাগোর বিশ্বমেলায় আগত যে-কোনো ভারতীয়কে—ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান-পার্শী যাই হোক না কেন—যে-বাড়িতে তিনি অতিথি সেখানে আপ্যায়নের জন্য হাজির করতে পারতেন, আর গৃহস্বামী জানতেন, যদি সমাদরে কোনো ত্রুটি হয়—বিবেকানন্দকে তদ্দণ্ডে হারাতে হবে।

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি তিনি—তবু যখন দেখলেন ভারত-উদ্ভূত এক ধর্মের প্রতিনিধি নিজ ধর্মের পক্ষে বক্তব্য সুচারুরূপে প্রকাশ করতে পারছেন না, তখন তিনি তাঁর জন্য ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন, যে-ধরনের উচ্চাঙ্গের বক্তব্য নিজ ধর্মের পক্ষে হাজির করা উক্ত প্রতিনিধির পক্ষে কদাপি সম্ভব ছিল না।*

হাতে করে খাওয়ার মত হিন্দুজীবনের সহজ রীতিগুলি ইউরোপীয় শিষ্যগণকে শেখাতে তিনি অসম্ভব যত্ন নিতেন।—'মনে রাখবে, যদি ভারতকে ভালবাসতে চাও, তাহলে সে যেমন আছে সেইভাবে তাকে মেনে নিয়ে ভালবাসবে, নিজের মনোমত ভেবে নিয়ে নয়,'—তিনি প্রায়ই বলতেন। বাস্তব ভারতীয় জীবনযাত্রার মর্যাদার পক্ষে তাঁর প্রচণ্ড দৃঢ়তা পর্বতের মত উন্নত মহিমায় বর্তমান থেকে তাঁর

* এখানে নিবেদিতা বৌদ্ধ-প্রতিনিধি অনাগারিক ধর্মপালের কথা বলতে চেয়েছেন।

অনুরক্ত ইউরোপীয় শিষ্যগণের নিকটে যে অপরূপ কাব্যের সৌন্দর্য ও শক্তিকে উন্মোচন করেছে, তার নাম ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনকাব্য। সদ্য দাঁত-ওঠা কোনো মত বা পথের পক্ষে সোৎসাহ সমর্থন জানানোর মত ব্যাকুলতা তাঁর কখনো ছিল না। প্রতি দেশের সর্বোত্তম বস্তু তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি পুরনো হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন; সরল জীবনের সৌন্দর্যে এতই গর্বিত ছিলেন যে, পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেন নি।—'রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী'—মৃত্যুর প্রায় দু'দিন পূর্বে বলেছিলেন। ঐ কথা বলার পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বহুবার বলা গল্পটি আবার বললেন : কিভাবে সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত ধুতি-চাদর গায়ে, খড়ম ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে ভাইসরয়ের আলোচনাকক্ষে হাজির হয়েছিলেন, এবং তাঁর বেশবাসে আপত্তি করা হলে বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলেছিলেন—'যদি আমার চালচলন এত অপছন্দ তাহলে আমাকে ডাকা হয়েছে কেন?'

স্বামীজীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এইসব ঘটনার আকর্ষণ আছে। গুরুতর কথা হল—এই কাহিনীগুলির মধ্য দিয়ে কোন্ বিশ্বাসের মূর্তি উন্মোচিত? তা কী, তার লক্ষ্য কী?—উত্তরে বলা যায়, তাঁর সমস্ত জীবন এক কথায় হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কারের সাধনা। দু'পয়সার ডাক টিকেট, সস্তার রেল-ভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এদের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল। যদি ভারতের সত্যই কোনো মৌল ঐক্য থাকে, তাহলে ঐ সমস্ত জিনিসগুলি বড় জোর তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে ঐক্য কি সত্যই আছে? তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন, প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন প্রতিটি মানুষের কাছে, তার ফলে যে-ভারতের দর্শন পেলেন তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, গভীর ও ব্যাপক। এই মহাসন্ধানের সিদ্ধিগৌরবে মহীয়ান হয়েই তিনি ধর্মমহাসভায়—এবং তার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে—নিশ্চিত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন : হিন্দুধর্ম একটি পরম সত্য ঘোষণা করেছে—'মুক্তি!' —আর হিন্দুধর্মের সেই বাণী যে-কোনো ধর্মের বিরোধী আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ। তাঁর স্বদেশবাসী অন্য দেশীয় মানুষের সমকক্ষ নয়—একথা তাঁর কখনোই মনে হয়নি। ভারতের কেন্দ্রীয় জাতীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে ধর্মের মধ্যে, একথা মনে রেখেও তিনি মনে করতেন, ভবিষ্যতে ধর্মশক্তির সঙ্গে আরও বহু শক্তির অভ্যুত্থান হবে এদেশে।

বর্ণাশ্রম প্রথার সুগভীর অনুশীলন তিনি করেছিলেন। কথাবার্তার সময়ে ঐ প্রথার আত্মবিরোধ কিংবা বৈশিষ্ট্যের বহু রূপ তিনি উন্মোচন করতেন। তিনি দেখেছিলেন—ভারতের ঐক্যের সূত্র আছে তার আত্মসংরক্ষণে! সকল মুসলমানই এক জাতি, সকল খ্রীষ্টান তাই, কিংবা সকল পার্শী। এদের মধ্যে পার্শীদের বাদ দিলে, মুসলমান ও খ্রীষ্টানেরা জাতিপ্রথায় অবিশ্বাসের দ্বারা এক জাতি। সেই কথাই বলা যাবে ব্রাহ্মসমাজ বা সেই ধরনের অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় সম্বন্ধে। কিন্তু সকলেরই পশ্চাৎপট রচনা করে আছে সাধারণ মৃত্তিকা, প্রাচীন সভ্যতার সুন্দর ঐতিহ্যের পুনরাবর্তন, আর জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনগুলি—যা সাধারণ প্রেম বা ঘৃণার সৃষ্টি করে।

প্রতিটি ভারতীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আশা-আদর্শকেই তিনি কেবল শিক্ষা করেননি—তাদের গৌরবস্মৃতিকেও বরণ করেছিলেন। কলকাতার হিন্দু পল্লীর এই সন্তান কলকাতার গঙ্গাতীরেই জীবন সমাপন করবার জন্য ফিরে এসেছিলেন—তবু পাঞ্জাব সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপনা দেখে মনে হত পাঞ্জাবই বুঝি তাঁর জন্মস্থান, কিংবা একই কারণে রাজপুতনা, বা হিমালয়খণ্ড—এমনই অন্যত্রও। গুরু নানকের, মীরাবাঈয়ের, তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে ঝঙ্কৃত হত তাঁর কণ্ঠে। পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ সিংহের বীরকাহিনী, দিল্লী বা চিতোরের ইতিহাসকথা, শিব-উমা-রাধা-কৃষ্ণের বা বুদ্ধের জীবনগাথা জড়াজড়ি হয়ে থাকত তাঁর মুখে। বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক। তাঁর অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই জীবন্ত। তাঁর প্রাণ-মন-আত্মা এক জ্বলন্ত মহাকাব্য, যা 'ভারত' এই নামোচ্চারণে মহারহস্যব্যাকুল।

বেলুড়ের বিশ্রামকক্ষে বসে বিবেকানন্দ সর্ব পৃথিবীর মানুষকে গ্রহণ করতেন, প্রত্যক্ষে বা পত্রে। বাইরের কোলাহল নীরব হয়ে এলেও ভারতের হৃদয়ের গভীরে তাঁর অটল আসন। তাঁকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না, কিংবা কম ক্ষেত্রেই তেমন অভিপ্রায় ছিল। এমন কোনো আশার বাণী ছিল না যা তাঁর কানে বাজেনি, এমন কোনো বেদনা ছিল না যা তিনি জানেননি,—তিনি চেয়েছেন এর মধ্যে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে, উদ্দীপিত করতে। ধর্মনেতাদের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তাঁর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল—তাঁর দেখা ভারতের সঙ্গে অন্যের দেখা ভারতের কোনই ঐক্য ছিল না। কারণ তিনি মুঠিতে ধরেছিলেন, যা অখণ্ড, মূলীভূত, প্রাণগত। প্রাণের উৎস-রহস্য তিনি জানতেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়স্পর্শ করার ভাষা তিনি জানতেন। আর এই সকল জ্ঞানের দ্বারা তিনি নিশ্চিত স্পষ্ট আশাবোধ করতে পেরেছিলেন।

অন্যেরা যে-যাই ভুল করুক, তাঁর কাছে এদেশ নবীন। ভারতের ভাষাসমূহ অকর্ষিত, সম্ভাবনায় নমনীয়। ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে। যন্ত্রণা ও সহনের মধ্য দিয়ে আজ যে-নবচেতনার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাবী পরিবর্তনের তা প্রথম স্তর মাত্র। তাঁর মতে, ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদাপি। একথা সত্য, তাঁর বিশাল হৃদয় বিদেশীর প্রয়োজন উপলব্ধি করে সর্ব মানুষের পক্ষেই আশার বাণী উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তিনি অপরপক্ষে অন্যের সাহায্যভিখারী ছিলেন না। দানের ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দাতারই, গ্রহীতার নয়। বাহির থেকে তিনি আশাও করতেন না, আশঙ্কাও নয়। ভারতের আত্মিক স্বরূপের পুনর্ঘোষণা, সমুদ্রলক্ষ্যে জাতির প্রাণগঙ্গাকে নবপ্রবাহে সঞ্জীবিত ও উচ্ছ্বসিত করে তোলাই তাঁর সন্ন্যাসের তাৎপর্য। তাঁর কাছে সন্ন্যাস মানে পরিপূর্ণ সেবা ও আত্মদান। ভারত তাঁর কাছে হিন্দু, আর্য, এশীয়। সে ভারতের যৌবনকামনা আধুনিক সভ্যতার বিলাসদ্রব্য নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করতে পারে, সে অধিকার নিশ্চয় তার আছে—কিন্তু প্রত্যাবর্তন সে কি করবে না? করবেই, কারণ তার প্রাণের গভীরে আছে নীতি, তপস্যা আর আধ্যাত্মিকতা। গঙ্গাতীরে প্রশান্ত চিত্তে যে-জাতি মৃত্যুপ্রতীক্ষা করে, তার পক্ষে দীর্ঘদিন যান্ত্রিক ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত থাকা সম্ভব নয়।

বুদ্ধ ত্যাগধর্ম প্রচার করেছিলেন—তার ফলে ভারত দুই শতাব্দীর মধ্যে বিশাল

সাম্রাজ্যের রূপে ধরল। সে ভারত আবার সকল ধমনীতে তাঁর জীবন-স্পন্দন অনুভব করুক। তাহলে জগতের কোনো শক্তিই নবজাগ্রত ভারতের সম্মুখীন হতে পারবে না। শুধু দেখতে হবে, ভারত যেন তার নিজস্ব জীবনের মধ্যে জীবনলাভ করে—অন্যের অনুকরণে নয়; বিদেশীর কাছ থেকে আদর্শ ধার না করে সে যেন নিজের অতীত ইতিহাসের সত্যরূপের থেকে প্রেরণা পায়।

যে নিজেকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বল হয়ে যায়। যে নিজেকে শক্তিমান মনে করেছে, সে দুর্ভেদ্য হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তাই জাতির জন্য, প্রতিটি মানুষের জন্যও বটে, বিবেকানন্দের একটি মাত্রই বাণী ছিল—তাঁর কণ্ঠে নিশিদিন মন্দ্রিত সেই মন্ত্র :

ওঠো! জাগো! শ্রেয়োলাভ না করে নিবৃত্ত হয়ো না।

দেশপ্রেমিকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ

[*Swami Vivekananda as a Patriot*]

স্বামীজীর দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য—তা দেশকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। 'দেশ' কি নিয়ে গড়ে উঠেছে সে-বিষয়ে ভারতের সকল ধর্মাচার্যের মত তাঁর ধারণাও জটিল ও ব্যাপক। বিদেশীদের চরিত্র ও রীতিনীতি থেকে তিনি বেশী কিছু পাবার আশা করতেন না। মাঝে মাঝে তিনি ইউরোপীয়দের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের মনে কঠোরভাবে মুদ্রিত করিয়ে দিয়েছেন একটি কথা—'তাদের কাজ করতে হবে কালা আদমীর অধীনে।'

ভারতে পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণ আন্দোলন থেকে যা-কিছু পাওয়া সম্ভব সবই তিনি পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে। রামকৃষ্ণ-দর্শনের পরে তাঁর জীবন হয়ে দাঁড়াল—জাতীয় ভাবধারার প্রগতিশীল পুনরুদ্ধার-সংগ্রাম। অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের নিষ্ঠাবান ছাত্র তিনি ছিলেন না কিন্তু তাঁর প্রাচ্য সহজবুদ্ধি ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির কাছে একথা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল যে, পাশ্চাত্ত্যে যেখানে বিশাল ভূমিখণ্ডকে একলা হাতে চাষ করতে হয়, সেখানকার শ্রম-বাঁচানো যান্ত্রিকতাকে, প্রাচ্যদেশে যেখানে ছোট একটি ভূমিখণ্ডের উপর একটি গোটা পরিবার বেঁচে থাকে—সেখানে প্রবর্তন করলে অর্থনৈতিক সর্বনাশকে ডেকে আনা হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রকৃতি তাঁর নিজ দেশের মানুষেরা অবলম্বন করুক—এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন কিন্তু ব্যাপারটা ঘটুক চিন্তাক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ চিন্তাপদ্ধতি সঞ্চারিত হোক ভারতে, কিন্তু পরিবেশের ওলট-পালট না ঘটে। পাশ্চাত্ত্যের বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রের মত করে তিনি বুঝেছিলেন (বিশেষজ্ঞেরাই জাতীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যার চরিত্র বোঝে—রাজনীতিকেরা নয়!)—ঊর্ধ্বশ্বাসে নূতনের পশ্চাদ্ধাবনের পরিবর্তে আজ এশিয়ার প্রধান দায়িত্ব যে-কোনো মূল্যে তার পুরাতন সামাজিক সংগঠনের সংরক্ষণ। মহত্তম দেশপ্রেমিক তিনি,—তিনি রাজনীতিক নন।

এই ভারতের মৃত্তিকা পর্যন্ত তাঁর কাছে অপরূপ—'শ্যামা জননী।' এ-দেশের সর্বপর্যায়ের শ্রম-সংগঠন, আদর্শের বিকাশ, চিন্তা ও কর্মের, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক

শক্তিসমূহের ফল-পরিণতি— এ সকলই তাঁর কাছে রত্নসমপ্রতুল্য; এর ভিতর থেকে তাঁর শ্রদ্ধাদীপ্ত বিশাল মনস্বিতা নিরন্তর নূতন ও গভীর ভাবরত্ন আহরণ করত —যা সাধারণের কাছে আদর্শ ও আলোকরূপে বিরাজিত। বিশাল বিশ্বের সামনে এই মহান আচার্য শুধু ধর্মে বা দর্শনে বা 'সমাধি'র মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেননি—তিনি ভারতী চেতনার সাক্ষীপুরুষ, ভারতের প্রচণ্ড নিজস্ব প্রতিভা-প্রবাহের নির্গমন-গুহাস্বরূপ। তাঁর বিরাট ক্ষত্রশক্তি নিযুক্ত ছিল আক্রমণে নয়, আত্মরক্ষায়। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে যা কিছু বলা যায় সে সবই তাঁর নখদর্পণে ছিল। বর্ণাশ্রমের পক্ষেও অন্যের অনায়ত্ত সর্বোত্তম যুক্তিও তাঁরই অধিকারে। কিন্তু এইসকল যুক্তিতর্কের বিবাদ যখন চলত, তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ থাকত অন্য ক্ষেত্রে—মৌল প্রয়োজনে :— আগে চাই শক্তি, যে-শক্তি নিজ প্রশ্নের সমাধান নিজেরা করবে, নিজ প্রয়োজনে নিজেদের 'জাতি' ভাঙবে বা গড়বে নিজেরাই।

ভারতীয় জনগণের নৈতিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাদের অবস্থার গুণগান করলে তাঁর কাছে ফল পাওয়া যেত না। তিনি তৎক্ষণাৎ বলতেন—শবদেহের চেয়ে সচ্চরিত্র কে? জীবন—জীবন চাই। তা শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা যাই আনুক। শক্তি চাই—তাতে যদি যন্ত্রণা আসে, বিক্ষোভ আসে—তবুও। 'জীবন' আর 'শক্তি'—এই ছিল তাঁর দেশপ্রেমের লক্ষ্য—তুচ্ছ কতকগুলো সমাজসংস্কারের কার্কৃতি নয়। আকাঙ্ক্ষিত 'জীবন' কিন্তু ঐতিহ্যপটে সংগঠিত জাতীয় জীবন হওয়া চাই। ভারত এশিয়ার সন্তান—তারই অঙ্কে তার স্থান; সে স্থান যেন নির্ধারিত না হয় অর্বাচীন 'জার্মানীতে নির্মিত' ইউরোপের কুক্ষিতে। ভবিষ্যৎ অবশ্যই অতীতের প্রতিচ্ছবি হবে না, কিন্তু অতীতের প্রতি সুগভীর সজীব শ্রদ্ধাতেই তার ভিত্তি দৃঢ় হতে পারবে।

এই কারণেই জাতীয় চৈতন্যের মূলোনুসন্ধানে স্বামীজীর নিরন্তর, নিরলস আপোষহীন প্রযত্ন। এই জন্যই সামান্যতম গাথা-কাহিনী, ব্যক্তিজীবন ও তার রীতি-নীতি সম্বন্ধে তুচ্ছতম সংবাদও তাঁর বুদ্ধিজালকে এড়াতে পারত না। এই কারণই রয়েছে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসন্ধানে তাঁর বিরাট প্রয়াসের মূলে। সুমহৎ অতীতের উপরে গড়ে উঠুক মহত্তর ভবিষ্যৎ। প্রতিটি মানুষ মহাভারতীয় চরিত্র হোক—হোক ভীষ্ম, হোক যুধিষ্ঠির। তাঁর দিগ্দিগন্তরব্যাপ্ত আহ্বানের আর্তনাদ : 'সম্মোহিত হয়ে আছি আমরা। আমরা ভাবছি আমরা দুর্বল—তাই আমরা দুর্বল। একবার যদি ভাবি আমরা শক্তিধর—কে আমাদের জয় করবে?' এই কথার ধর্মীয় ও জাতীয়—উভয় অর্থই আছে। কতকগুলি নির্বোধ প্রগল্‌ভ সমালোচকের বাচালতাকে যেমন তিনি সহ্য করতেন না, তেমনি অপরদিকে তাঁর দেশবাসীর পরাভবের চিন্তা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুরাতনী ভারতবর্ষ তাঁর কাছে সর্বদেহে নবীনা—কারণ তার প্রাচীন সভ্যতায় সঞ্চিত আছে ভাবী বহু যুগের নব সৃষ্টির প্রেরণা। সে ভারতে মানুষের ভাগ্য তার নিজের মাটিতে। আর সে মাটির ভাগ্য মানুষেরই হাতে।

নিবেদিতার রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি। নিবেদিতার ভারতে আসার ১২ বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্ত হয়। নিজ গুরু বিবেকানন্দের কাছ থেকে, সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তগণের কাছ থেকে নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বহু কথা শোনেন। একথা তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন, যে-সকল অগ্নিশিখা দেখছেন চতুর্দিকে, সে সবই সেই রামকৃষ্ণ-নামক কেন্দ্রীয় অগ্নি থেকে নির্গত। তাই নিজ গুরুর প্রতি অখণ্ড নিষ্ঠাপূর্ণ ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কেবল 'বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলতে পারেন নি, বলেছিলেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।'

নিবেদিতার অধিকাংশ লেখার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে। যেখানে তিনি জাতীয় জাগরণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পতাকাতলে সমবেত হতে বলা হয়েছে, কারণ ঐ দুই ব্যক্তিত্ব ভারতীয় সাধনার এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূস্বরূপ। সরলাবালা সরকার লিখেছেন, "তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধে এই কথাটি আমরা তাঁহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি, 'তাঁহার নাম বীরেশ্বর; তিনি বীরদিগের ঈশ্বর ছিলেন; পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিবে।'" আর শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি কোন্ চোখে দেখতেন তা একদিনের ঘটনায় বোঝা যায়—

"মেয়েদের পড়িবার ঘরে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। তাহার অপর দিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর মানচিত্র টাঙানো থাকিত। নিবেদিতা একদিন ঐ মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'রামকৃষ্ণদেব জগদ্‌গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকাই উচিত।'"

বর্তমান পর্যায়ে আমরা নিবেদিতার রচনা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত রচনাগুলিই উপস্থিত করছি।

প্রথমেই অনুবাদ করে দিচ্ছি একটি অ-নামা রচনা, যেটি 'সম্ভবতঃ' নিবেদিতা-লিখিত রামকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রথম মুদ্রিত রচনা। দুই কলমব্যাপী এই লেখাটি স্টেটসম্যান পত্রিকায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯। লেখাটিতে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সুপরিচিত গ্রন্থ *Ramakrishna: His Life and Sayings* -এর আলোচনা করা হয়।

লেখাটিতে রচয়িতার নাম ছিল না। না থাকায় কোনো ক্ষতি হয়নি বরং সুবিধা হয়েছিল, কারণ মিস্ মার্গারেট ই নোবল যে বিবেকানন্দের শিষ্যারূপে ভারতবর্ষে এসেছেন, একথা মোটামুটি সকল শিক্ষিত ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙালীর জানা হয়ে গেছে। বিবেকানন্দ-শিষ্যার পক্ষে রামকৃষ্ণ বিষয়ে অনুকূল প্রবন্ধ রচনা খুবই

স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে রচনাটি লেখক-নামহীন অবস্থায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত হওয়ায় রচনার বক্তব্যকে অনেকাংশে সংবাদপত্রের অনুমোদিত বক্তব্যরূপে ধরে নেওয়া হয়। এই ব্যাপারটিই নিবেদিতার অভিপ্রেত ছিল। তিনি কতখানি খুশী হয়েছিলেন তা বোঝা যায় ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯-তে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি থেকে :

'My review of Max Muller's book came out in the *Statesman* on Saturday—2 columns, leader page. I think that fine'.

এই রচনাটির পটভূমিকায় কিছু তথ্য আছে, যা সমসাময়িক ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাক্সমুলার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে ইংলণ্ডে বিখ্যাত *Nineteenth Century* পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে *The Real Mahatman* নামক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি দেশে-বিদেশে বহু চাঞ্চল্য ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। পরাধীন ও অশ্রদ্ধেয় ভারতবর্ষের অশিক্ষিত এই ঈশ্বরপ্রেমিকের জীবন যখন আন্ত-র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক মহাপণ্ডিতের আকর্ষণ ও পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ রচনার বিষয় হয়েছিল, তখন সর্বত্রই কৌতূহল,—ভক্তমহলে আনন্দ এবং বিরোধীদলে বিদ্বেষ। এই রচনাটিকে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের প্রথম প্রধান বৈদেশিক সমাদর বলা যায়। ম্যাক্সমুলার এখানেই থামেননি; শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণীকে অবলম্বন করে তিনি গ্রন্থরচনার পরিকল্পনা করেন এবং দু' বৎসরের মধ্যে সে গ্রন্থটি লিখিত ও প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের মত গ্রন্থও চাঞ্চল্য জাগায়। এই বইটিরই সমালোচনা নিবেদিতা করেছিলেন কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায়। স্মরণ রাখতে হবে কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী এবং স্টেটসম্যান ইংরাজ সম্প্রদায়ের প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র।

লেখাটির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয়, এটি কোনো ভারতভক্তের লেখা এমন চিহ্ন এর মধ্যে দেখা যাবে না। এমনভাবে এটি লেখা হয়েছে যাতে মনে হয়— শ্বেতাঙ্গ সমাজের পক্ষেই কেউ লিখেছেন, যিনি হয়ত সম্পূর্ণ ভারতবিদ্বেষী নন, কিন্তু না হলেও নিঃসংশয়ে শাসকসম্প্রদায়ের মানুষ। একজন বিবেচক ইংরাজ লিখলে যা লিখতে পারত, নিবেদিতা সেইভাবেই লিখেছেন। ১৮৯৯-এর স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অনামা রচনায় তিনি নিশ্চয় বিবেকানন্দ-শিষ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না—ঐ পত্রিকা তাঁকে সে সুযোগও দিত না। সে সুযোগও নিবেদিতা নেননি, নিতে চাননি, স্পষ্ট কারণেই। কোনো ভক্ত ইংরাজ নয়, একজন বিচারশীল প্রভু-ইংরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন বিষয়ে কিছু কৌতূহল ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন—অন্য কোথাও নয়—স্টেটসম্যানে!! বলাই বাহুল্য সেটা ইংরাজের পক্ষে যদি কিছু নাও হয়, ভারত-বাসীর পক্ষে অনেক কিছু!

অতিশয় সংযতভাবে লিখিত এই প্রবন্ধে নিবেদিতা সযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের শ্রেষ্ঠ বক্তব্যের সারসংকলন করেছেন এবং সূক্ষ্ম অথচ নির্মমভাবে ম্যাক্সমুলারের বক্তব্যের অসঙ্গতিকে উদ্ঘাটন করেছেন। দি রিয়েল মহাত্মন্ প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তির জন্য বহু মহলে তিরস্কৃত হয়ে ম্যাক্সমুলার এই গ্রন্থে প্রশংসার ব্যাপারে অতি সংযম দেখিয়েছেন এবং অলৌকিক প্রভৃতি ব্যাপারের বিরুদ্ধে কঠোর যুক্তিবাদের তরবারি চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে অপর দিকে আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-

চরিত্রের অলৌকিক দিব্য মহিমা অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বা অবতারশ্রেণীর পুরুষ বলে বিশ্বাস না করলে তিনি নিশ্চয় এই গ্রন্থ লিখতেন না (বিবেকানন্দের কাছে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলেই স্বীকার করেছেন); কিন্তু নানা কারণে (রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক) তা বাইরে ঘোষণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিবেদিতা অধ্যাপকের রচনায় অন্তর্নিহিত এই স্বতোবিরোধের অংশটুকু খুলে ধরে সুচারু কৌশলে নিজের অভিপ্রেত বক্তব্যের দিকে পাঠকের মনকে আকর্ষণ করেছেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে নিবেদিতাকে 'জন্ম-সাংবাদিক' বলেছেন, তার কিছু পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

এই লেখাটির পরে আমরা নিবেদিতার Kali the Mother বই থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা উপস্থিত করেছি। Kali the Mother প্রকাশিত হয় ১৯০০ খৃস্টাব্দে। এইটিই নিবেদিতার প্রথম প্রকাশিত বই। এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি রচনা— 'Two Saints of Kali'-এর মধ্যে রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের জীবন চিত্রিত। আমরা 'রামকৃষ্ণ' অংশটির অনুবাদ দিচ্ছি; এটি অনুবাদ করেছেন শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত।

রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী

(স্টেটসম্যান, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯)

সেন্ট ফ্রান্সিস ও সেইজাতীয় অন্যান্যদের প্রসঙ্গে সেদিন হ্যাভলক এলিস বলেছেন: 'প্রাচ্য দেশে ফুলের মতই সহজে ধর্ম ফুটে ওঠে।' যদি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সর্বশেষ বইটি নির্ভুল হয়, যা করতে তিনি স্পষ্টতঃ চেষ্টা করেছেন (তিনি বলেছেন, 'ভারতে কি ঘটছে তার নির্ভুল বিবরণ পাওয়া সর্ব সময়েই কঠিন'), তাহলে এক্ষেত্রে আমরা হ্যাভলক এলিসের বক্তব্যের সমর্থনে বিচিত্র অথচ নানাভাবে আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাব। প্রতিদিনই আমরা চৌরঙ্গীতে হলদে বা ছাই রঙের পোষাকপরা সন্ন্যাসী বা যোগীদের দেখি, যখন তারা দেশীয় লোকদের এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যায় চৌরঙ্গীর উপর দিয়ে। তারা যে-ধরনের মানুষই হোক না কেন, এইসব লোকের বিশেষ চেহারাই তপশ্চর্যার প্রতি হিন্দুর অনুরাগের সাক্ষ্য, এবং প্রত্যাশা করা যায়, বউবাজারের অপরদিকে যে রহস্যময় সমাজজীবন বর্তমান, তার মধ্যে নিঃস্বার্থ ও খাঁটি সাধু মিলবে যিনি ধর্মজীবনের সুগভীর অনুভূতির বিষয়ে কিছুটা বলবার অধিকারী। রামকৃষ্ণের মধ্যে যেন তেমনই এক মানুষকে দেখা যাচ্ছে। কলকাতার উত্তরে পাঁচ মাইল দূরে 'গঙ্গাতীরে, ভারতবর্ষের সুন্দরতম মন্দিরগুলির অন্যতম' দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে তিনি তেত্রিশ বছরের পূজারী, তপস্বী, যিনি অধিকন্তু আমাদের কাছে স্পষ্ট ও পরিচিত হবার কারণ রাখেন, যেহেতু তিনি অল্পবিস্তর পরিজ্ঞাত স্বামী বিবেকানন্দের গুরু। যাইহোক,

কাহিনী শুরু করার মুখে অধ্যাপক অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছেন; যে-কাহিনী তিনি পেয়েছেন, তার উপর কি কঠোর তদন্তকাজ চালিয়ে তিনি কেবল সেই অংশটুকুই প্রকাশ করবেন যার বিষয়ে তিনি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারেন, না কি, যেভাবে কাহিনী তাঁকে বলা হয়েছে সেইভাবেই বলে যাবেন তিনি, যার ফলে আমরা হিন্দুবিশ্বাসের যথার্থ কিছু অংশ দেখতে পাব, এবং সেইসঙ্গে জানব—মৃত্যুর তের বৎসরের মধ্যে (শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন) আলোচ্য বিবরণের বিষয়ী-চরিত্র ভারতবর্ষে ঈশ্বরপুরুষরূপে সত্যই অর্চিত হয়েছেন। সৌভাগ্যবশতঃ লেখক শেষোক্ত পথই নিয়েছেন, অতীব সাধু অভিপ্রায়ে।

"এই বিশেষ কারণের জন্যই (oral tradition-এর dialogic working-এর উদাহরণ দেবার জন্যই), এবং এই পদ্ধতির ক্রমবিকাশ সমসাময়িককালে খুব বিরল ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় বলে, ও সাধারণতঃ পরবর্তী ফল থেকেই এর রূপ দেখে নিতে হয় বলে—সত্যভাষণের সম্পূর্ণ অভিপ্রায়সহ রামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য গুরুর এই যে সংক্ষিপ্ত চরিতচিত্র দিয়েছেন, আমাদের কাছে এর কিছু আকর্ষণ আছে, নিজস্বভাবে এই কাহিনীর বিষয়বস্তুর জন্য, এবং তদুপরি, প্রত্যেক ধর্ম কোন্ পরিবেশে গড়ে ওঠে ও তার ইতিবৃত্ত কিভাবে লিখিত হয়—সে বিষয়ে আলোকপাত করবার জন্য।"

পুনশ্চ—"আমি বিবেকানন্দের কাছে সবিশেষ পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলুম—তাঁর গুরুর বিষয়ে এ-পর্যন্ত যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি ভক্ত ও শিষ্যগণের কাছে যতই শিক্ষাপ্রদ মনে হোক, জিজ্ঞাসু ইউরোপীয়ের কাছে সম্পূর্ণ উদ্ভট মনে হয়; যথা, তাঁর বাল্যকালের অলৌকিক ঘটনাসমূহ, দেবী কর্তৃক তাঁকে এমন এক ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানদান, বাস্তবজীবনে মোটেই যার বিষয়ে তিনি জানতেন না—এসব ঘটনা আমাদের মত দুর্ভাগা অবিশ্বাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং উক্ত মহাত্মা যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে তার সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হলেও শেষপর্যন্ত এগুলি অভিপ্রেত ফলের বিপরীত বস্তুই উৎপাদন করবে। বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকাকে ঘনিষ্ঠ জানেন; আমার কথার তাৎপর্য তিনি সম্পূর্ণ বুঝেছিলেন। তথাপি তাঁর আচার্যদেব সম্বন্ধে তাঁর রঙ-না-চড়ানো বর্ণনাতে পর্যন্ত যাকে dialogic process বলি, তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই; সেইসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের অনিবার্য অলৌকিকীকরণের প্রবণতা। এমন যে হয়েছে এতে আমি খুশী, কারণ এ ধরনের ঘটনা থেকে আমাদের এই শিক্ষা হয় যে, ঐতিহাসিকরা ব্যক্তি বা ঘটনা সম্বন্ধে যথার্থ সত্যকে নয়, নিজস্ব (বা পূর্বাচার্যপ্রাপ্ত) সত্যকেই প্রকাশ করেন।"

এই বিবৃতির দ্বারা ম্যাক্সমূলার যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাঁর নিম্নের কথাগুলিতে—

"প্রাচীন যোগীদের যেসব ক্ষমতার কথা বলা হয়, তার সবগুলি বিশ্বাস করা কঠিন। আধুনিক যোগীদের কার্যাবলীও প্রায়শঃ চমকপ্রদ শোনায়। কিন্তু স্বীকার করি, এসবগুলিতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে সমভাবে কঠিন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীদের মারফৎ শোনা গেছে—এইসব যোগীরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি মাসের পর মাসও অনাহারে থাকেন, যতক্ষণ ইচ্ছা একাসনে

নিশ্চল থাকতে পারেন, তাঁদের বেদনাবোধ নেই, দৃষ্টিশক্তিতে সম্মোহিত করতে পারেন, ও অন্যের মনের কথা বুঝতে পারেন। এসবই আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু যদি এরই ব্যক্তিরা বলতে চান, যোগীরা আকাশপথে ভ্রাম্যমাণ দেবদেবীদের দেখতে পান, কিংবা তাঁদের আরাধ্যদেবতা তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, তাঁরা আকাশবাণী শুনতে পান, দিব্যগন্ধ পান, কিংবা সর্বশেষে, বিনা অবলম্বনে তাঁদের শূন্যে অবস্থান করতে দেখা গেছে—তাহলে সেণ্ট টমাসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, যদিও আমি বলতে বাধ্য, শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমার কাছে যে-সাক্ষ্য উপস্থিত আছে, তা সত্যই চমকপ্রদ।"—এক্ষেত্রে আমাদের বলতে হয়, অধ্যাপক মহাশয় কর্তৃক মেনে-নেওয়া জিনিসগুলি না-মেনে-নেওয়া জিনিসগুলির মতই বিমূঢ়কর ঠেকে।

কিন্তু সে যাই হোক, শেষপর্যন্ত আমরা সকলে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সমান আগ্রহী নই; অধীনস্থ জাতিসমূহকে সহানুভূতির আলোকে ব্যাখ্যা করে এমন কোনো কিছু সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশের আগ্রহ আছে বা থাকা উচিত। এবং সে রকম কিছু পেলে আমরা আনন্দিত হই। আমাদের গ্রন্থকার বলেন,—'(ভারতীয় সন্ন্যাসীদের) একজনের প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপকতর জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে,—সে প্রয়োজন আছে রাজনীতিকের, ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে নিয়ে যাঁদের নাড়াচাড়া করতে হয়;—সে প্রয়োজন আছে মিশনারীদের, যাঁরা ঐ দেশের অধিবাসীদের জীবন বুঝতে ও তাদের প্রভাবিত করতে উৎসুক;—এবং শেষতঃ, সে প্রয়োজন আছে ধর্ম ও দর্শনের জিজ্ঞাসু ছাত্রদের, যাঁদের অবশ্যই জানা উচিত কিভাবে পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন বেদান্তকে একেবারে একালে ঈশ্বরভক্তরা শিক্ষা করে।'

আর ধর্মীয় কাহিনীগুলি (religious myth) জাতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে, বিক্ষিপ্ত ও বিবদমান মনুষ্যগণকে একীভূত করাকে চরম কাজ বলে গ্রহণ করেছে, প্রায়ই দেখা যায়। ল্যাটিন ও টিউটনিক জাতিগুলির উপরে খ্রীষ্টধর্মের দ্রুত প্রভাব, কিংবা সেমিটিক, আর্য বা তাতার জাতির উপর মুসলমান ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করলেই এই মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়; সেইসঙ্গে এও দেখব যে, ধর্মের এই ধরনের কার্যাবলী তার অন্তর্নিহিত সত্য বা অসত্যের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, এবং এমনকি যারা তাকে স্বীকার করে না, তাদেরও মনের উপর ক্রিয়াশীল থাকে। সম্রাট কনস্টানটাইনের কালে রোমের যেসব রাজনীতিকরা খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেছিল, তারা সবাই তা উৎসাহের সঙ্গে করেছিল—একথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কল্যাণকর্ম করেছিল সেইসব মানুষদের জন্য, ধ্যান ও মননই যাদের অবলম্বন ছিল। একই নিয়মে, আমাদের প্রতিবেশী দেশীয় প্রজাবৃন্দের ক্ষেত্রে যে আবরণকে আমরা দুর্ভেদ্য মনে করি, তা হয়ত সত্যই দুর্ভেদ্য নয়। হয়ত তা ক্ষণমধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে যদি আমরা তাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু, ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি দেখাই। এই-ক্ষেত্রে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এবং তাঁর সহযোগী পণ্ডিতগণ (ইংলণ্ডের) রাজকীয় স্বার্থের যে-পরোক্ষ সেবা করেছেন, তার বিষয়ে কোনো সাধুবাদই যথেষ্ট নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করা কঠিন। প্রভূত শক্তি ও সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি অধ্যায় থেকে তা উপলব্ধি করতে পারি—

'আন্তরিকতায় সদা পূর্ণ তিনি; প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা থেকে কোনো কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিংবা তিনি এমন কিছু করেন নি যাতে তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নেই। তিনি এখন কালী প্রতিমাকে নিজ মাতা এবং জগন্মাতারূপে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, তিনি যেন জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস সমন্বিত—তাঁর হাত থেকে খাদ্য গ্রহণ করছেন। নিয়মিত পূজার পরে মায়ের কাছে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন, গানে, কথায়, প্রার্থনায় পূর্ণ হয়ে, মায়ের কাছে ছেলে যেমন করে,—যে পর্যন্ত না তাঁর বাহ্যচৈতন্য লুপ্ত হয়ে যেত। কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত অশান্ত ক্রন্দন—মা কেন দেখা দিচ্ছেন না ইচ্ছামত—কেন? তাঁর বিষয়ে লোকজনের মধ্যে নানা ধারণার সৃষ্টি হল। তরুণ পুরোহিতকে কেউ ধরে নিল পাগল বলে, কারো কাছে তিনি অদ্ভুত ঈশ্বরপ্রেমিক, যার বহিরঙ্গ পাগলামিগুলি ঈশ্বরপ্রেমের অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়।"

এই কাহিনী সেই যুগের অদ্ভুত রমণীয় পরিবেশের কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়, যে-সময়ে, আমরা শুনি, এডমণ্ড রিচ নাকি 'গোপনে, সম্ভবত সন্ধ্যায়, যখন সেণ্ট মেরীর গির্জার উপরে ছায়া ঘনিয়েছে, শিক্ষক ও ছাত্রদল চলে গেছে 'আইল'* ত্যাগ করে,—তখন বালকটি কুমারী মাতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপরে তাঁর আঙুলে এক স্বর্ণাঙ্গুরীয় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে নিজ বধূ বলে ধরে নিল।' আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, লোকজন তরুণ পুরোহিতকে পাগল বিবেচনা করল না, যা ধর্মীয় প্রতিভাসমূহের সাধারণ ভাগ্য হয়ে থাকে,—বরং তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষেরা এইসব আচার-বৈলক্ষণ্যকে গভীর ঈশ্বরপ্রীতির লক্ষণ বলে গ্রহণ করল।

যথাসময়ে ভক্ত হয়ে উঠলেন আচার্য বা পরমহংস। দক্ষিণেশ্বর তখন কালীপূজার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হল, যে-কালীপূজা ক্রীশ্চান মিশনারীদের এবং অধিকাংশ ইউরোপীয়ের কাছে এত অরুচিকর মনে হয়। সিদ্ধপুরুষের জীবনের এই পর্যায়ের সঙ্গেই তাঁর 'বাণী'গুলির যোগ। আলোচ্য গ্রন্থের বড় অংশ 'বাণী'গুলি অধিকার করে আছে। ম্যাক্সমুলার বলেন—

"'গোলাপ ফুটলে চারিদিকে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তখন মৌমাছিরা নিজেরাই ছুটে আসে; মৌমাছিরাই গোলাপ খোঁজে, গোলাপ মৌমাছি খোঁজে না,'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির সার্থকতা তাঁর নিজ জীবনে বারবার দেখা গেছে। সকল মত ও সম্প্রদায়ের অজস্র লোক তাঁর কাছে এসেছে শিক্ষা নিতে, তাঁর জীবনের তীর্থবারি আহরণ করতে। প্রত্যুষ থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁর কোনো বিশ্রাম থাকত না, খাওয়ার সময় পর্যন্ত না,—এই সব হাজার হাজার তৃষার্ত আত্মার শিক্ষার, সেবায় ও উদ্দীপনাবিধানে তিনি এতই ব্যাপৃত থাকতেন। অপূর্ব যৌগিক শক্তি ও বিরাট পাণ্ডিত্যযুক্ত মানুষেরা—সবাই আসত দক্ষিণেশ্বরের এই নিরক্ষর পরমহংসের কাছে শিক্ষা নিতে; তারপর তারা তাঁকে আধ্যাত্মিক গুরু বলে স্বীকার

---

* স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা বিচ্ছিন্ন, গির্জার পার্শ্ববর্তী অংশ।

করত যখন দেখত অপূর্ব পবিত্রতা, শিশুর সরলতা, সম্পূর্ণ অহংশূন্যতা, এবং সহজতম ভাষায় ধর্ম ও দর্শনের গভীরতম সত্যের স্বরূপমোচন—তাঁর মধ্যে।"

জীবনের এই পর্যায় থেকেই 'বাণী'-গুলি যে সংগৃহীত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অনেক উক্তিই কাব্যসৌন্দর্যে, নিসর্গ-নিরীক্ষায় কিংবা চতুর বাস্তববোধে অসামান্য। অন্যান্য উক্তিগুলি আমাদের সেই অদ্ভুত জগতে আকর্ষণ করে যেখানে ঈশ্বরকে 'মা' বলা হয়। তেমন একটি অদ্ভুত উক্তির নমুনা : 'জীবের মৃত্যুশ্মশানে ঈশ্বরের আবির্ভাব। আবার ঈশ্বরের বিলয়ের পরে আনন্দময়ী জগন্মাতার আবির্ভাব। শবাকার ঈশ্বরের বুকের উপরেই নিত্যানন্দময়ী জননীর ভাবনৃত্য।'

পুনশ্চ : 'জগন্মাতাকে দেখতে পাই না কেন? মা বড়-ঘরের গৃহিণীর মত, পর্দার আড়ালে থেকে সব কাজ চালান; তিনি সকলকে দেখেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পায় না কেউ। শুধু ভক্ত ছেলেরা তাঁর দেখা পায়; তারা মায়ার পর্দা সরিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারে।'

পুনশ্চ : 'কী লজ্জা! মা কাছে রয়েছে—তবু মন্দ চিন্তা, মন্দ কাজ তাড়াতে পারো না?'

সরলতার জন্য আকর্ষণীয় : 'তৈলহীন প্রদীপ যেমন জ্বলে না, তেমনি মানুষও বাঁচতে পারে না ঈশ্বর ছাড়া,' এবং 'জলে ডোবানো কলসীর ভিতরে বাহিরে জল থাকে, তেমনিভাবে ঈশ্বরসায়রে নিমজ্জিত সত্তা ভিতরে বাহিরে ঈশ্বরকে দেখে।' কিন্তু রামকৃষ্ণ-পুরাণের প্রধান সত্যবাণী এই সংগ্রহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, যার বক্তব্য : 'ঈশ্বরের কত নাম, কত রূপ—যাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে জানা যায়। যে-নামে, যে-আকারেই তুমি তাঁকে ডাকো না কেন, তাতেই তিনি ধরা দেবেন।' 'বিভিন্ন ধর্ম সেই এক ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ।' কখনো কখনো এই সমন্বয়তত্ত্ব ঘরোয়া কথা গল্পের দ্বারা বোঝানো হয়েছে, যথা, 'একই চিনি থেকে যেমন নানা-রকম পশুপাখীর চেহারা বানানো হয়, সেইভাবে সেই একই মধুর বিশ্বজননী নানা কালে ও দেশে নানা নামে অর্চিত হন।' 'বাড়ির কর্তা যেমন কারো কাছে বাবা, কারো কাছে ভাই, কারো কাছে স্বামী,—বিভিন্ন লোক যেমন তাঁকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে, তেমনি একই ভগবানকে ভক্তরা নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে ডাকে।'

এই ধরনের মনোভাব অস্পষ্ট ভাবালুতায় ভর্তি হয়ে আজকাল সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু একজন অশিক্ষিত ভক্ত তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে ঐ কথাগুলিকে প্রবল সত্যে যেভাবে পরিণত করেছেন—সেইটাই আশ্চর্যের বিষয়। আমাদের কাছে 'নানা মত নানা পথ'—এই সিদ্ধান্ত সর্বমতের সমন্বয়ের চেষ্টায় অগ্রসর না হয়ে সাধারণতঃ কোনো একটি বিশেষ ধর্মের দুর্বলতার ক্লান্ত বিশ্লেষণে এবং অন্যান্য-গুলির বিষয়ে ঔদাসীন্যে পর্যবসিত হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত পথে যাত্রার সুস্পষ্ট সুর শোনা যাচ্ছে। পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরও এগিয়ে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত : 'ভক্তিসাধনার এক পর্যায়ে ভক্ত সাকার ভগবানকে নিয়ে তুষ্ট থাকে; নিরাকার ভগবানও তার সঙ্গেই আছেন; তিনিই সাকার হয়েছেন, আবার নিরাকার।' তার মানে কলকাতার নিকটবর্তী এক মন্দিরের অখ্যাত কালীপূজক কুড়ি কি তিরিশ বছর আগে এমন এক সর্বজনীন ধর্মীয় সত্যে উন্নীত হয়েছিলেন, যা

বর্তমান কালের সকল আগ্রহী ভাবুক-পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকের মনোযোগের বস্তু। লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সূত্রে আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন,—রামকৃষ্ণ কিভাবে বিভিন্ন ধর্মকে গ্রহণ করে, ঐসব ধর্মের আচার-বিচার অবলম্বন করে, তাদের মর্মসত্য উপলব্ধির সাধনা করতেন, যার পরিণতি ঘটত নিম্নোক্ত প্রকারে, লেখকের ভাষায়,—

'বিভিন্ন ধর্মের এইসকল দর্শন ও উপলব্ধির পরে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছলেন, সকল ধর্মই সত্য, যদিও সকল ধর্মই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের এক একটি দিককে ধরেই আছে। ধর্মগুলি সেই এক ঈশ্বরে পৌছবার নানা পথ বলেই তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল।'

'কালী দি মাদার' গ্রন্থে রামকৃষ্ণ-কথা

রামপ্রসাদের মত ঈশ্বরের জন্য মানুষের আকুতির কবিরূপে নয়, মানবসন্তানের জন্য স্বয়ং বিশ্বমাতার ভালবাসার অবতাররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব। তাঁর চরণে প্রণত হয়ে তাঁর কথা এবার শুরু করব।

এই মানুষটির তিরোভাব ঘটেছে মাত্র কিছুকাল আগে। কলকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে তাঁর শিক্ষাদান স্তব্ধ হবার পরে বিশ বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। তাঁর মধ্য দিয়ে দেবতা এত বেশী স্বপ্রকাশ হয়েছিলেন যে, যাঁরা তাঁকে জানতেন ও ভালবাসতেন, তাঁদের অনেকেই আজও তাঁর কথা বলতে গিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলেন, 'প্রভু আমাদের!'

রামকৃষ্ণের জীবন অসীম প্রার্থনা ও অশ্রুতপূর্ব কৃচ্ছ্রতার ফলে এমন এক গভীর উপলব্ধিতে এসে পরিণতি লাভ করেছিল যে, অহং-এর সামান্যতমও অবশিষ্ট ছিল না। শিষ্যদের সম্মুখে যে-মানুষটি ছিলেন এবং চলাফেরা করতেন, সেটি একটি খোল বই আর কিছু নয়, তাঁর হৃদয়াসীনা জগজ্জননীর ইচ্ছা ভিন্ন তাঁর পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব ছিল না। শোনা যায় তিনি কখনও 'আমি' বা 'আমার' শব্দ ব্যবহার করতেন না। (নিজের হৃদয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে) বলতেন 'এর মধ্যে যিনি আছেন, তাঁর,' কিম্বা সচরাচর 'আমার জগন্মাতার।'

প্রথম জীবনে তাঁর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ ভাল ছিল, কারণ যে-আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড় তাঁর মধ্যে প্রবলবেগে বয়ে গেছে পঞ্চাশ বৎসর ধরে, তার ধাক্কা তাঁকে সামলাতে হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশী আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর চরিত্রের জটিলতা, বহুমুখিতা ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি, যার ফলে তিনি প্রতি মানুষের মনের সমস্যার কথা বুঝতে পারতেন, যেন সেগুলি তাঁর নিজেরই সমস্যা। আধুনিককালে সম্ভবতঃ তিনিই যথার্থ বিশ্বমানব,—সর্বাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারী। তথাপি সব কিছুই সেখানে এমন এক ঐক্যে পরিণতি পেয়েছিল যে,

তার প্রশান্তি আজও সেই ছোট্ট ঘরটিকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, যে-ঘরটিতে একদা তিনি বাস করতেন, এবং সেই বিরাট ধ্যানতন্ময়ের নীচে আজও তা বিরাজ করছে এক পরাক্রান্ত উপস্থিতির মত। সেই ছোট ঘরটি শেষ যেদিন দেখে এসেছিলাম, কী নিঃস্বই না বোধ হয়েছিল—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।)

তখন রাত হয়েছে, একটি ক্ষুদ্র তেলের দীপের আলোয় বিছানার একান্ত পবিত্র আচ্ছাদনটি এবং প্রভুর প্রতিকৃতির সম্মুখে বিন্যস্ত হস্তে সজ্জিত নবীন পুষ্পরাজি উজ্জ্বল। প্রদীপটি তুলে ধরা হয়েছিল, অমনি দীর্ঘ ছায়াগুলি ছড়িয়ে পড়ল, মনে হল কোনো এক অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসে তারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছে। তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন সব কিছু সেইরকমই আছে—শয্যার পাশে বিশ্রামের সেই ছোট চৌকি, এক কোণে জলের একটি বড় জালা, দেয়ালে কয়েকটি ঠাকুর-দেবতার ছবি—আর কিছু নয়। বাইরে জুন মাসের প্রবল বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারা, চত্বরের নীচে গঙ্গার কলক্রন্দন ধ্বনি ও দ্রুত প্রবাহ। আবার অন্য পরিবেশেও এই স্থানকে আমি দেখেছি; দেখেছি যখন উদ্যানের করবীরা আন্দোলিত হয়ে গোলাপের কানে কানে কথা বলত, পিছনের আম্রকুঞ্জ সর্বাঙ্গে মুকুলিত হয়ে উঠত, যখন সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনিতে স্থানটির নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হয়ে প্রার্থনাকালীন প্রসন্ন হাসির মত প্রতিভাত হত। ভারতীয় নিদাঘ-মধ্যাহ্নের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও আমি একে দেখেছি—তখন এখানে অপার স্নিগ্ধ শীতলতা ও পুষ্পসুগন্ধে চারিদিক ভরপুর। কিন্তু গত জুন মাসের রাত্রির মত এই ঘরটিকে এত নিঃস্ব আর কখনও মনে হয়নি এবং অকিঞ্চনের এত সৌন্দর্যও আর কখনও দেখিনি।

বড় বড় পণ্ডিত ও প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এখানে এসে গৌরবান্বিত বোধ করতেন—'এবং প্রভুর কাছে তাঁদের মনে হত যেন শিশু',—সেখানে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন।

সম্পদ ও বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীতে যে কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি হতে পারে, একথা তিনি একেবারেই জানতেন না। জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে ভ্রূকুটি করে সম্মুখ থেকে বিদায় করে দিলেন, কেননা ধনসম্পদ ও নামযশের অহঙ্কার নিয়ে সে এসেছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করে হয়তো দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত সাধারণ নারীর ঘরের কথা মন দিয়ে শুনতেন, কিংবা কোনো অখ্যাত বালককে শিক্ষা দিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতেন। তাঁর স্পর্শ কোথাও গভীর দাগ না রেখে যায়নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সুপরিচিত একজন ধর্মপ্রচারক* তাঁর সংস্পর্শে আসার পরেই ঈশ্বরের মাতৃভাবকে সাধনার ও প্রচারের বিষয় করেন। বর্তমান ভারতের অনেক শক্তিমান ব্যক্তিই বাল্যকালে তাঁর পদপ্রান্তে বসেছেন। গ্রাম্য কৃষিজীবী ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে আগত, প্রায়-নিরক্ষর এই মানুষটি কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক অনুশীলনের হিসাবে বিরাট পণ্ডিত। কারণ তাঁর ছিল এক অসামান্য তীক্ষ্ম কান এবং স্মৃতিশক্তি, যার বলে তিনি অনুবাদসহ সংস্কৃত শব্দগুলিকে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারতেন এবং নানা সময়ে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ তাঁর

* কেশবচন্দ্র সেন

কাছে পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অসাধারণ বিরাট হয়ে উঠেছিল।

যে সময়কার কথা আমরা বলছি, জীবনের এই শেষ কুড়িটি বছর তিনি ছিলেন একটি মহান আলোকবর্তিকার মত; সারা বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি ও নেপালে সিদ্ধপুরুষরূপে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেসব জায়গা থেকে বহু লোক তাঁর সাক্ষাতে আসত, অনাড়ম্বর প্রাচ্য রীতিতে। তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকেরা অনুভব করত এমন এক শক্তি, যার কুলকিনারা তারা করতে পারত না; এমন জ্ঞানরাশি তাঁর থেকে সমুদ্ভূত হত, যার গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না তাদের। তিনি যেন একটি মহান সঙ্গীত; ঐ সঙ্গীত যার স্পর্শ বয়ে আনছে, তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তার আভাস যেন পেত সমাগত মানুষেরা, তারপর যখন আপন আপন দৈনন্দিন কাজে তারা ফিরে যেত তখন তারা আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও বলীয়ান হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই সমস্ত সময়টিতে তাঁর প্রকৃত জীবন কেটেছে একদল যুবকের মধ্যে, যাঁরা পৃথিবীর পরিচিত সুখ-সুযোগ ত্যাগ করে তাঁর শিষ্য বলে নিজেদের আখ্যাত করেছেন। তাঁদের দু'একজন সব সময়েই সঙ্গে থেকে তাঁর পরিচর্যা করতেন, অনেকে আবার সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমন কি মাসের পর মাস তাঁর কাছে কাটিয়ে যেতেন।

তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নেহাৎ-ই বালক। সুতরাং এই স্বাভাবিক যে, জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে সেখানে ছিল হাসি ও রঙ্গ। তাঁদের গুরু কখনও নিরানন্দ হয়ে থাকতেন না। তাঁর নিঃশ্বাসবায়ুতে যেন বিরাজ করত এক প্রশান্ত প্রফুল্লতা। সেই পরিবেশের পরিবর্তন ঘটত মুহুর্মুহু আনন্দ-উদ্বেল সমাধিতে এবং সমাধিভঙ্গের পর ভাবের এক অপূর্ব উদ্দীপনে। 'সকল প্রাণীর কাছে যা রাত্রি, আত্মসংযমীর কাছে তা দিন; আর যখন সকল প্রাণী জাগ্রত, জ্ঞানী সেখানে সুপ্ত'—এই বক্তব্যের সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তিনি সকলকে গভীর রাত্রে জাগিয়ে দিতেন, তারপর বাইরে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে ধ্যানে বসাতেন; তেমনি আবার কত দিন কেটে গেছে তাঁর নিজের হাতে লাগানো সুন্দর লতা গাছে দোলা খেয়ে, হাসি তামাশার মধ্যে, এবং বাগানে চড়াইভাতি করে। সময়ের স্রোত বয়ে গেছে, যেন কোন পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যই তার নেই,—অথচ এদিকে সকলের অলক্ষিতে কয়েকটি যুগান্তকারী ভাবধারা সঞ্চারিত হচ্ছিল। তাঁর সাধনজীবনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি,—পরম শান্তিপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী দারুণ সংগ্রামের রূপকে যা উদ্ঘাটিত করত,—সেই কাহিনীগুলি শিষ্যদের মনে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি রচনা করে দিচ্ছিল। পার্থিব বস্তু ও মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার তারা লক্ষ্য করেছিল, সর্বোপরি তারা সেই পরম সত্যের মহাসমুদ্রে অবগাহন করছিল, তাঁর মধ্য দিয়ে যেখানে নিত্য প্রবেশাধিকার পেত তারা। এইভাবে শিক্ষার্থীর মনে মূল সত্য জাগিয়ে বাকি কাজের ভারটুকু তার মনের উপর ছেড়ে দেওয়াই কি সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নয়—যেভাবে বীজ থেকে চারাগাছ বড় হয়ে ওঠে? একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি,—যে-নিয়ম আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটা বড় জোর 'জ্যামিতিক' হয়ে ওঠে, কিন্তু আমরা নিজেরা যে-নিয়মের সৃষ্টি করি,

তা অবশ্যই হয় আঙ্গিক। প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল, গুরুর সঙ্গে বনবাস করে তাঁরই ব্যক্তিত্বের স্পর্শে শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করা।

'জগন্মাতা'র উদ্দেশ্য ও আদর্শ (কারণ স্বপ্নেও তিনি সে সকলকে নিজের বলে ভাবতেন না) রামকৃষ্ণ পরমহংস যাঁদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন, তাঁরা প্রধানতঃ ছিলেন আশপাশের কলেজগুলির স্নাতক; এঁদের অনেকে আবার ছিলেন পাশ্চাত্ত্যের রঙে গভীরভাবে রঞ্জিত, কারণ যুগের হাওয়া ছিল সেদিকেই। তাঁরা আজকের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের অনেক নিকটবর্তী ছিলেন। ঐ ধর্মের পবিত্রতা ও মনুষ্যত্বের প্রতি সুবিচারের দৃষ্টান্তে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নিউ টেস্টামেন্টের প্রতি তাঁদের ছিল এক গভীর ও আন্তরিক অনুরক্তি। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব তাঁদের মধ্যে উপ্ত করেছিল দেশপ্রেমের বীজ, হিন্দুদের স্বভাবে যা প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। অধিকতর ইউরোপীয় রুচি ও জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করে তাঁরা একটা বড়-কিছু সম্পাদন করার আশা করেছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা এই ধারণা করে বসেছিলেন যে, পৌত্তলিকতা ভারতবর্ষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে, তাই তাঁদের নিজেদের মধ্যে যা কিছু ছিল তাই ভেঙেচুরে দেওয়াই ছিল তাঁদের একমাত্র করণীয় কাজ;—অন্ধ কুসংস্কারজাত প্রতিটি মূর্তি ও প্রতীক নির্মূল করে দেওয়া, জাতিভেদ প্রথা, জেনানা প্রথা, ও এহেন যাবতীয় কিছু থেকে দেশকে মুক্ত করা—যা আজ পর্যন্ত হিন্দুর বিশিষ্ট প্রথা বলে গণ্য হয়ে এসেছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সেকালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উজ্জ্বল রত্নই এরকম ভাবতেন এবং রামকৃষ্ণের এই যুবক শিষ্যেরা ছিলেন তাঁদেরই অনুগামী।

অকস্মাৎ তাঁরা প্রাচীন, রক্ষণশীল, হিন্দুধরনের এই তপস্বী সাধুর মুখোমুখি হলেন। ধীর, অনাড়ম্বর ও ভানশূন্য, হাস্যপরিহাসে পরিপূর্ণ, নগ্নপ্রায় হয়ে উদ্যানে যিনি দিনাতিপাত করেন, ইংরেজ সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র শোনা-কথা জানেন যে, তারা সমুদ্র পারের অদ্ভুত সব জীব,—এমন একটি বৃদ্ধ ঐসব যুবকদের উপর এহেন যাদুবিস্তার করেছিলেন, যাকে তাঁরা না পারতেন ব্যাখ্যা করতে, না পারতেন ভাঙতে।

তাঁর পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও অমোঘ পবিত্রতার স্পর্শ যুবকের দলও অনুভব না করে পারতেন না, কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে কেউ কেউ রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। বহুদিন পরে তাঁদেরই একজন বলেছিলেন, 'আমি সব সময়ই এমন কিছুর অন্বেষণে থাকতাম যা প্রমাণ করবে যে তিনি ছিলেন পবিত্র। ছয় বৎসর লেগেছিল আমার একথা বুঝতে যে, **তিনি পবিত্র ছিলেন না,—তিনি ছিলেন স্বয়ং পবিত্রতা!'**

এঁরা বাইবেল সম্বন্ধে যা কিছু বলতেন, তা শুনে তিনি আনন্দ পেতেন। সেকালে খ্রীষ্টধর্ম বাতাসের সঙ্গে মিশে ছিল, এবং যুবকের দল তাঁর কাছে আসার অনেক আগেই তিনি যীশুখ্রীষ্টকে ভালবেসে পূজা করেছেন, কিন্তু তাতে কালীর প্রতি ভক্তির কিছুমাত্র হানি হয়নি। 'চিনি দিয়ে যেমন নানারকম পশু-পাখীর মণ্ডা তৈরী হয়,' তিনি বলতেন, 'তেমনি একই প্রেমমধুর জগজ্জননী ভিন্ন

ভিন্ন জাতিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যুগে নানা নামে ও আকারে পূজিত হন। এক একটি ধর্ম সেই চরম সত্যে পেঁছাবার এক একটি পথ মাত্র।'

বর্তমান ভারতবর্ষে একমাত্র কালীপূজার অনুষ্ঠানরীতির মধ্যেই পশুবলির বিধান আছে। ইহুদীদের প্রায়শ্চিত্তকরণের ধারণা থেকে এ জিনিষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাপস্খালনের কোনো অভিপ্রায়ই এর মধ্যে নেই; এখানে মূলভাব হল, মাংসভোগ মাকে সব প্রথম নিবেদন করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করা। নিষ্ঠাচারী হিন্দুরা কখনো বলিদান না-দেওয়া মাংস গ্রহণ করেন না—তিনি কালী-উপাসক হোন বা না হোন। কিন্তু ইঙ্গভাবাপন্ন হিন্দুরা এ ধরনের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করে থাকেন, এবং তাঁদের সমস্ত নজর গিয়ে পড়েছে ধর্মের এই দিকটাতেই, পৌত্তলিকতা মানে যেন এই মহা আতঙ্ককর ব্যাপারটি!—যদিও তাঁদের রক্ষণশীল ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা অনেক বেশী মাংসাহার তাঁরা করে থাকেন! গুরুর 'জগন্মাতা' সম্বন্ধে এমনই বিরূপ ধারণা নিয়ে শিষ্যরা এসেছিলেন।

শুধু কালীমূর্তিই নয়, ভারতবর্ষের এমন কোনো প্রতীকই ছিল না যাকে তিনি ভালবাসেননি বা পূজার্পণ করেননি; এমন কোনো পূজো ছিল না, তা সে যে-প্রথারই হোক, যার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তিনি নিজ জীবনে অনুভব করেননি। সব পূজোকেই নিয়ে গিয়েছিলেন পরিপূর্ণ উপলব্ধি পর্যন্ত। এমন কোনো প্রার্থনা, আনন্দানুভূতি ও রূপাদি-দর্শন ছিল না যাকে তিনি শ্রদ্ধা করেননি বা যার তত্ত্ব উপলব্ধি করেননি—জ্ঞানলাভের পথে প্রত্যেকটির যে যথাযোগ্য স্থান আছে একথা তিনি বিশ্বাস করতেন।

ধর্মসংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে কল্পনা করা সম্ভব তিনি দিলেন তারই পূর্ণ সিদ্ধি। 'বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরের নিকটে পেঁছাবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র', এই মতবাদ সাধারণভাবে ভারতবর্ষে নূতন নয়; কিন্তু তিনি যেভাবে এই মত প্রচার করে গেছেন, তাঁর সেই দৃঢ় ধারণা—নিজের ধর্ম অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত কর্তব্য, কারণ বহু ভাবকেন্দ্র থাকলে পৃথিবীর মঙ্গল; তাঁর সুগভীর প্রত্যয়—'ঈশ্বরকে যে নামে বা যে আকারেই জানতে চাও না কেন, সেই নামে বা আকারেই তুমি তাঁর দর্শন পাবে;' তাঁর সেই আশ্বাস—ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, যেমন খোসার মধ্যে লুকিয়ে থাকে বীজ; সর্বোপরি, একান্ত প্রেমের সঙ্গে সর্ব ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ঘোষণা—'অন্যেরা যেখানে নতজানু হয়ে ভক্তি নিবেদন করছে সেখানে তুমিও নত হও, নমস্কার কর, কারণ যেখানে অনেকের উপাসনা মিলিত হয় সেখানে ঈশ্বর প্রকাশিত করেন নিজেকে'—পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা মেলে না।

ধর্মীয় অনুভূতির সত্যতা সম্বন্ধে যার সামান্য জ্ঞানও হয়েছে, বুদ্ধিযোগে তার পক্ষে এটা বোঝা কঠিন নয় যে, সমকালীন বিভিন্ন ভাষা যেমন একই বক্তব্যকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সেই এক চৈতন্যময় পুরুষকেই নানা ভাবে প্রকাশ করছে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বেশী কিছু দিলেন, তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার নিজের ভাষায় শিক্ষা দেবার এবং সিদ্ধিতে পেঁছাবার পথ দেখাবার মহান প্রেরণার পরম মূর্তি ছিলেন। এই মানুষটির ভালবাসায় কোথায়ও কোনো সীমারেখা ছিল না। কারুর যদি আন্তরিকতা থাকত,

তবে তার জাতি, পূর্ব ইতিহাস বা মানসিক স্তর তাকে সরিয়ে রাখতে পারত না তাঁর কাছ থেকে। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্থান ছিল, এবং তাঁরা তা রক্ষা করতেন। সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের আত্মার মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। যে-বিশ্ব থেকে একটি প্রাণীও বাদ যাবে, যতই অকিঞ্চন সে হোক না কেন, সেই বিশ্ব তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ বলে প্রতিভাত হত।

এই ভালবাসা শেষ পর্যন্ত সকলের হৃদয় জয় করে নেয়। একমাত্র এহেন ভালবাসাই 'মাতৃরূপিণী ঈশ্বর' নামের যোগ্য।

এই মহান ভালবাসার আবেগে তিনি ছিলেন আত্মহারা। অন্য কিছু ভাববার মত তাঁর অবস্থা ছিল না। আত্মসংযমের সাধনায় অতিবাহিত সেই সুদীর্ঘ দিনগুলিতে তিনি কতবার অতি দীনের কাছে নতজানু হয়ে পুজোর্পণ করেছেন, তাদের জন্য নিজের হাতে কত ছোট কাজ করেছেন, জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন গলার ক্যান্সারে তিনি প্রয়াণের পথে চলেছেন, কথা বলাই যখন যাতনাদায়ক, তখনও সমাগত উপদেশপ্রার্থীদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর ব্যস্ততার সীমা ছিল না।

এই সত্য-রহস্যটি তাঁর শিষ্যবৃন্দ ক্রমে ক্রমে বুঝতে শিখলেন। কিন্তু বাইরে তার সমারোহের কোনো চিহ্ন ছিল না।

বৃদ্ধ মানুষটি ছেলেদের সঙ্গে বসে শান্তভাবে খোসগল্প করতে থাকেন। এই ক্ষণে হয়তো চোখের ইসারায় তিনি একজনকে জাগতিক বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন—'ফোঁস করবে, কিন্তু কামড়াবে না!' অন্য কোনো গভীরতর মুহূর্তে আবার বলছেন—'বর্ণমালায় ছত্রিশটি অক্ষর আছে, তার মধ্যে তিনটি অক্ষরই (**শ ষ স**) বলছে 'সহ্য কর'।'

স্থানীয় লোকগাথা থেকে আরম্ভ করে অশিক্ষিতদের অদ্ভুত কুসংস্কার পর্যন্ত, সব কিছুর মধ্যেই শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে অবশ্য অধিকাংশ শিক্ষা পরশপাথরের কাহিনীতে গিয়ে পৌঁছেচে; মানুষ আগে ঈশ্বরপদের পরশপাথরকে স্পর্শ করুক, তারপর দেখবে, তার সব কিছু সোনা হয়ে গেছে। ছোটখাট যেসব ঘটনা ঘটত, সবই হয়ে উঠত তাঁর মন্তব্যের সূত্র, যার তাৎপর্য প্রায়ই হত সুগভীর। এমনকি একটি অর্ধসিদ্ধ সবজি পর্যন্ত তাঁর কাছে অলঙ্কারের বিষয় হয়ে উঠত—আধাসিদ্ধ সব্জি যেন সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মত, পূর্ণতায় উপনীত হতে না পেরে যে এখনও সম্পূর্ণ বিনীত ও নম্র হয়ে ওঠেনি। নিকটবর্তী মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি যখন ক্রমে অনুরণিত হতে হতে নির্বিশেষ স্পন্দনে মিলিয়ে যেত, তখন তাঁর মনে জাগত, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুইই এবং দুয়েরই ঊর্ধ্বে।

এর উপর হাসি ও রঙ্গও ছিল। সেই ব্যক্তির প্রতি পরিহাসে তিনি হয়তো মুখর হয়ে উঠতেন, যে জাগতিক বিষয়ের উপর এত উদাসীন যে স্ত্রীকে দান-ধ্যান কমাতে মোটেই বাধা দেয়নি! পৃথিবীর কোনো ঋষিভাবই এহেন হাস্য পরিহাস থেকে তাঁকে বিরত করতে পারত না।

তারপর তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আবার কিসের টানে চলে যেতেন গভীরতর এক রাজ্যে। তাঁর মুখমণ্ডলে নেমে আসত এক অপূর্ব জ্যোতি, তাঁরা ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টিতে বসে দেখতেন, তিনি চলে গিয়েছেন এক স্বর্গীয় আনন্দময় লোকে—জগন্মাতার আন্তর রূপদর্শনের অনুভূতিতে।

এভাবে দিনে দিনে এক অপূর্ব ভালবাসা এবং ত্যাগের জ্বলন্তভাব শিষ্যদের মানব-জমিনে বয়ন হয়ে চলেছিল। সে সম্বন্ধে একজন সোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন, যে কথা তিনি বলেছিলেন, তাই আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার তাঁর সঙ্গে আমরা যে জীবন যাপন করেছিলাম। সে জিনিষ কখনোই বর্ণনা করা যাবে না।'

অবশেষে এল শুক্লপক্ষের এক গ্রীষ্মকালীন রাত্রি, তাঁর চারপাশে শিষ্যেরা সমবেত, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন এবার সময় হয়েছে সেই পরম লোকে প্রস্থানের, যেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন ঘটবে না কোনোদিন।

এমনকি সেই মুহূর্তেও একজনের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তারই উত্তর দেবার জন্যে তিনি উচ্চকিত হয়ে উঠলেন। এবং তারপর—একজনের গান তাঁর বড় ভাল লাগত, সে ঈশ্বরের নামগান করতে লাগল—তিনি এ'দের ছেড়ে চলে গেলেন।

পরে রাত্রির অন্ধকারে এলেন একজন স্ত্রীলোক, তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁকে "মা" বলে ডেকে মৃদুস্বরে রোদন করতে লাগলেন। সেই শিষ্যা—তাঁরই স্ত্রী।

পরবর্তীকালে সেই সব ছেলের দল যখন বড় হয়ে উঠে মহান গুরুর বার্তা দূরদূরান্তে বহন করে নিয়ে যেতে শুরু করলেন, তখন তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল, তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনের সাধনার সংগ্রাম ও প্রাপ্তির কাহিনীর মত মূল্যবান আর কিছু নেই। তাঁর আত্মীয় ও গ্রাম্য প্রতিবেশীরা যখনই দক্ষিণেশ্বর দর্শনে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে তাঁর বাল্যজীবনের বাইরের ঘটনাবলী তাঁরা জেনে নিয়েছিলেন।

সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে একজন মানুষ শিশুকাল থেকেই কুসংস্কারের বোঝা না বয়েও জীবনের অর্থ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে পারে। কুসংস্কার অবশ্যই আছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারেই তা ঝরে যায়; রামকৃষ্ণের কথায় বলতে গেলে,—ফল যখন পাকে শুকনো পাপড়ি তখন আপনি ঝরে পড়ে।

জীবনের গভীর অর্থ সম্বন্ধে মনে হয় তিনি প্রথম থেকেই সজাগ ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি নিজ জাতির দীর্ঘকাল-সঞ্চিত এই জ্ঞানলাভ করেছিলেন যে, ধর্ম প্রচলিত বিশ্বাসের বস্তু নয়—ধর্ম অভিজ্ঞতার বস্তু। বিরাট সম্পদ-দেবতার পূজাতে তিনি ছিলেন একান্ত বীতশ্রদ্ধ; ছেলেবেলাতেই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের মাধুর্য উপভোগ করার অভিলাষ পোষণ করতেন। বর্ণাশ্রম রীতিকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে তিনি রক্ষা করতেন।

বিশ বৎসর বয়সে এই সবকিছু ডুবে গেল এক চরম আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। ঘটনাক্রমে তাঁকে কালীমন্দিরের 'ছোট পুরুতের' কাজ গ্রহণ করতে হল। একজন ঐকান্তিক আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষের পক্ষে ভগবৎ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার এই সুযোগ কতখানি কাজ করেছিল তা আমাদের অনুমান করে নিতে হবে। আমাদের এও স্মরণ রাখতে হবে যে, রামপ্রসাদ প্রমুখ শক্তিসাধকদের উক্তি ও রচনা এদেশের দৈনন্দিনের ভাষা। সুতরাং এবার যেন তাঁর নির্বাচিত পথ তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হল। এখন বাকি রইল শুধু পথ-পরিক্রমণ। তাঁর কাজ ছিল সন্ধ্যারতির সুন্দর অনুষ্ঠানে ধূপে-প্রদীপে প্রতিমাকে আরতি করা। প্রতিমা নয়—স্বয়ং জননীর জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠল তাঁর অন্তর। 'তিনি কি সত্য? তিনি কি

সত্য?'—নিরন্তর ধ্বনিত এই প্রশ্ন। ফলে আরতির সাধারণ কাজটিও তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতেন না। কখনও-বা সারাদিন ধরেই প্রদীপ নিয়ে আরতি করতেন, কখনও বা বেদনার্ত আকুতির পীড়নে একেবারেই ভুলে যেতেন সে সব ব্যাপার।

চারিদিকে রব উঠে গেল তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন, এবং সর্বত্র যেমন ঘটে থাকে, মানুষ জাগতিক বিষয়ের প্রয়োগ করে পরাজাগতিক বিষয় দূর করতে সচেষ্ট হয়—তাঁর আত্মীয়েরাও স্থির করেছিলেন যে, একমাত্র বিবাহের দ্বারা মনের মোড় ফিরিয়ে তাঁকে সুস্থ করা যাবে। এইভাবেই একটি ছোট্ট বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, বহুদিন পরে যিনি তাঁর কাছে এসে তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্যে পরিণত হন।

কিন্তু সেই দারুণ ও সর্বগ্রাসী, একান্ত বাস্তব সংগ্রামের কিছুমাত্র লাঘব হল না বিবাহানুষ্ঠানের দ্বারা। এবং পরিণামে, নির্দিষ্ট কাজ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিতে হল। মন্দির থেকেও তাঁর বিদায় স্বাভাবিক, কিন্তু মন্দিরের মালিকেরা তাঁর প্রতিভাকে চিনে তাঁকে সযত্নে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

তাঁর এই সময়কার স্মৃতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে একটি বিরাট বটগাছ এবং একটি কুঠিয়াকে কেন্দ্র করে। কুঠিয়াটি এখন নেই। উদ্যানের ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অংশে নদীতীরে অবস্থিত এই বটবৃক্ষমূল উদ্যান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পাঁচটি কাণ্ড একসঙ্গে নেমে গুঁড়িটিকে জড়িয়েছে—সেই গুঁড়িটিকে ঘিরে বসবার জন্য একটি বাঁধানো চাতাল। উত্তর পশ্চিম কোণে চাতালটির বরাবর ছিল বোধিবৃক্ষের মস্ত এক ডাল, প্রচলিত মতে এই ডালটি পরম উপলব্ধির আসল জায়গাটিকে ঢেকে রেখেছিল। সে যাই হোক স্থানটি ছিল বহু বছরের নিরন্তর উপাসনা ও কৃচ্ছ্রতার সাক্ষীস্বরূপ। এই তপঃ-কঠোরতা হিসেব করে আসেনি, তা গভীরতর আকৃতির অবশ্যম্ভাবী বাহ্যিক ফল। রামকৃষ্ণ ইচ্ছে করে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেননি, কোনোটাই করার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। জোর করে তিনি শরীরের প্রতি অবহেলা করেননি, তাঁর শরীরবোধই চলে গিয়েছিল।

নিজের স্বভাবে চালিত হয়ে, যেজন্য তাঁর শরীরধারণ, তারই অদম্য তাগিদে, বিনা বিশ্রামে, বিনা বিরতিতে তিনি নিরত ছিলেন সুদীর্ঘ ১২ বৎসর ধরে আত্মার সংগ্রামে। অবশেষে সিদ্ধি এল একদিন। মা উন্মোচিত করলেন নিজেকে। সেই ক্ষণ থেকে তিনি হয়ে গেলেন একেবারে শিশু—সর্বদা মা'র হাত ধরে আছেন।

একটি মহারহস্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। কোনো সংস্কার ভাঙতে হলে, নিজেকে সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নামিয়ে এনে তার সঙ্গে লড়াই করতেন। এইভাবেই মেথরের যে-কাজকে তাঁর ব্রাহ্মণবৃত্তি ঘৃণা করেছে—সেই কাজই তিনি করে গেছেন বহুরাত্রি ধরে।

শাশ্বত মিলনের আনন্দলোক থেকে ধীরে ধীরে তিনি নেমে এলেন, দেখলেন বিশ্বের অনুপরমাণু পরমেরই অঙ্গ;—তখনই তাঁর প্রখর অনুভূতিতে মানব-জীবনের বহু জিনিষ ধরা পড়ল, যার পথ-পরিক্রমণ তিনি করেননি। সুতরাং সেগুলি সহজ জিজ্ঞাসায় গ্রহণ করলেন। শুরু করলেন কৃষ্ণের উপাসনা থেকে (ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে প্রোটেস্টান্টদের যেরকম সম্বন্ধ, তাঁর নিজস্ব কালী-উপাসনার সঙ্গেও

কৃষ্ণ-উপাসনার তেমনি সম্পর্ক), এবং সকল রকমে সেই ভাবের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে নিলেন। আহারে, বেশভূষায় এবং কথাবার্তায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমিকা গোপী হয়ে গেলেন, যার পরিণতিতে কৃষ্ণভক্তি ও কালীভক্তিকে একই জিনিষ বলে অনুভব করলেন। এভাবে মুসলমান ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের সাধনার পথও তিনি অতিক্রম করলেন। এসব তিনি করেননি, করেছিল সেই মহাপ্রেম, যাকে বলতেন—"মা"। অর্থাৎ যাকে বলে নিরহঙ্কার, তিনি তাই ছিলেন? না, তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে রামকৃষ্ণ নামে কেউ কোনোকালে ছিল।

তারপর এল সবচেয়ে বিস্ময়কর অধ্যায়। তিনি ঈশ্বরকে জানবেন—নারী হয়ে!! নারীর সম্বন্ধে বরাবরই তিনি যে সুকোমল মনোভাব পোষণ করতেন, এটা ছিল তারই পূর্ণ প্রস্ফুটিত ক্ষণ; এরই ফলে তাঁর জীবন ভারতীয় নারীর প্রকৃত মর্যাদার কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বত্র তাঁর রীতি যেমন, এখানেও তাই, নিজের অতীতকে ভুলে যাওয়া, এবং ভুলে যাওয়ার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা। সুতরাং তিনি নারীজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে গ্রহণ করলেন, গ্রামে গেলেন স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, যাতে শুধু স্ত্রীর পরিচিত মহলের মধ্যেই সখী খুঁজে নিয়ে তাদের হৃদয়ের সুখদুঃখের অংশভাগী হতে পারেন। এর দ্বারা শেষে তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে, নারীত্বের সরল পথেও বিজয়রহস্য লাভ করা যেতে পারে।

এখানেই নিশ্চয় নিহিত আছে তাঁর জীবনের সার। মায়ের ভালবাসা যেমন সকল সন্তানের প্রতি ব্যাপ্ত, অন্যেরা তাদের প্রতি যত নির্দয় হোন বা অবিচার করুন না কেন, তেমনি বিশ্বমাতৃত্বের মূর্ত বিগ্রহ এই মানুষটি সমগ্র জীবলোককে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের পরিপূর্ণ ঐকতানের মধ্যে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এটি কি একটি সুমহান মতবাদ নয় যে, প্রতিটি মানুষের ক্ষুদ্র গৃহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে আছে অনন্তের রাজপথের দিকে? এই আহ্বান কি অপরিসীম সান্ত্বনার কারণ হয় না—যখন শোনা যায় : 'যে যেখানে আছ, সেখানে থেকেই, যা তোমার আছে তাই নিয়েই, তোমার প্রভু, তোমার ঈশ্বরে হৃদয় করো নিবিষ্ট, আর উন্মুক্ত রাখ দৃষ্টি সত্যের দিকে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার নির্দিষ্ট মুদ্রাঙ্কন হল—পরবর্তী কালে তাঁর কাছে যাঁরাই এসেছেন, ফিরে যাবার সময় অনুভব করেছেন এক গভীর সাহস, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের শক্তির উৎসকে জাগিয়ে দিতেন, যার ফলে স্পর্শপ্রাপ্ত মানুষটি সীমাবদ্ধতাকে ছিন্ন করে পাখা মেলে দিত ঊর্ধ্বাকাশে।

কোনো সামাজিক প্রথা বা সাধারণ রীতির ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যের মূলোৎপাটন করেননি। মানুষ যাতে অন্তরে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে সেজন্যে তিনি সবকিছু করেছেন। সংস্কারপন্থী নেতাদের তিনি বিনা দ্বিধায় সঙ্গদান করতেন এবং তেমনি আগ্রহে রঙ্গমঞ্চের ধিক্কৃত শিল্পীদেরও; অথচ তা সত্ত্বেও রক্ষণশীলেরা পর্যন্ত তাঁকে পূজা করতেন।

তথাপি যা কিছু তিনি করেছেন সবই যেন অসজ্ঞানে। দিব্য প্রেরণায় কাজ করতেন, শিশুর মতই, এবং শিশুর মতই তিনি অপূর্ব ও অভ্রান্ত। নিজ অস্তিত্বেই তিনি পরিতৃপ্ত, পূর্ণ,—সে অস্তিত্বের ব্যাখ্যার দায়িত্ব অন্যের। বহুদিন পূর্বে

প্রথম যৌবনে গুরু হবার ইচ্ছা তাঁর কিছুমাত্র ছিল না, সত্যকে জানবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে চালিত করে নিয়ে গেছে পরমের সন্ধানে। প্রতি মানুষের অবর্ণনীয় ব্যাকুলতার তৃপ্তিসন্ধানে তিনি ঈশ্বরলাভের প্রতিটি পথের সন্ধান করেছেন। একটি পথও পরিক্রমা বাকি থাকলে তাঁর আত্মা এগিয়ে যেত সন্ধানের পথে। কখনও তিনি কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাননি, পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেকে গুরুরূপে কল্পনা করতে পারতেন না, তাঁর জ্ঞানরাশি তিনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে যা পেরেছে কুড়িয়ে নিয়েছে।

তাঁর জীবন আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে,—মহত্ত্ব, সুসংগতি এবং সৌন্দর্য—সবই হল ফল-পরিণাম। এগুলি নিয়ে নয়,—সারল্য, আন্তরিকতা ও প্রাণঢালা ভক্তির মৌলিক উপাদানগুলি, যা আমাদের অত্যন্ত কাছেই পড়ে আছে,—তাই নিয়ে আমাদের সত্যিকারের কাজ।

প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা যে বৃথাবস্তু নয়, জগতের কাছে সেই সত্যের তিনি সাক্ষীস্বরূপ। একথা অবশ্য সত্য, আর কোনো দেশেই তাঁর জন্মগ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু একথাও ঠিক নয় যে, তিনি প্রধানত বা একমাত্র ভারতের আত্মাকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির অনুভূতি ও চিন্তা এসে মিলিত হয়েছিল এবং সেই কালীগতপ্রাণ রামকৃষ্ণ মানবতার প্রতিনিধি।

'দি মাস্টার' (আচার্যদেব) গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

[*The Master* গ্রন্থ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গগুলি সংকলন ও অনুবাদ করে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। নিবেদিতা এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, নিজ আচার্যেরই চরিতকথা বিবৃত করেছেন। তাই এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ তাঁর গুরুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই মূলতঃ কৃত। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিষয়ে যেসব তথ্য দিয়েছেন, সেগুলি প্রধানত স্বামীজীর কাছ থেকেই পাওয়া, তা সহজেই বোঝা যায়। এইজন্য এই অংশের উপযুক্ত নামকরণ হতে পারত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।'

পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন—নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে 'অখণ্ড ব্যক্তিত্ব' বলেই গ্রহণ করেছেন। তথাপি উভয়ের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, সে বিষয়টিকেও আলোচনার বিষয় না করে পারেননি। নিবেদিতা জানতেন—বিবেকানন্দ যে-পর্বতের সমুচ্চ গিরিশিখর, ভূগর্ভভিত্তিক সেই হিমালয়ের নাম রামকৃষ্ণ, তবু যে বিশেষ বহিরঙ্গ প্রকাশে বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবলের 'নিবেদিতা' রূপান্তরের কারণ হয়েছিলেন, সেই প্রকাশের উদ্দেশে নিজের বিশেষ নমস্কার নিবেদন না করে পারেন নি। এমন করা স্বাভাবিক, এমনকি সঙ্গতও বটে, কারণ, নিবেদিতার সাক্ষাৎ গুরু বিবেকানন্দ, এবং নিবেদিতা আর যাই হোন, প্রথমতঃ গুরুবাদী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভগিনীর মন্তব্যগুলি

পরবর্তীকালে মনীষী মোহিতলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং মৃদু সমালোচনার কারণও হয়েছিল। বিবেকানন্দের মানবপ্রেম যে শ্রীরামকৃষ্ণেরই একথা ব্যাখ্যা করার পরে মোহিতলাল লিখেছেন :

"মঃ রোলাঁ বিবেকানন্দকে তাঁহার গুরুর 'direct antithe... বলিয়াছেন তাহা সত্য। তাঁহার পূর্বে ভগিনী নিবেদিতাও এই ধরনের বলিয়াছেন। কিন্তু সেই ভেদের মধ্যে অভেদ-তত্ত্বের—'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'-... যুগ্মসত্তার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি না হইলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়... করিতে পারিব না। বিবেকানন্দের সেই বিপরীত প্রকৃতিকে উপাদানরূ... গ্রহণ করিয়া অবতারকল্প মহাপুরুষ 'আত্মানং সৃজাম্যহম্' সংকল্প করিয়া... ছিলেন। ধ্যানী মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রেমের যে-উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল তা... উপযুক্ত দেহ-মন তিনি পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দে। আবার যুগধর্মের ... প্রভাব যাহার প্রকৃতিগত জ্ঞানপিপাসা ও আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাকে ... করিয়া উদ্বুদ্ধ করিলেও, 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'-কে লাভ করিবার জন্যই ... অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, সেও সেই মহাপুরুষের মধ্যে তাহা প্রত্য... করিয়া তাঁহার সেবায় নিজের সকল শক্তি উৎসর্গ করিয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতি... যে-প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহার উল্লেখ ভগিনী নিবেদিতা ও মঃ ... উভয়েই একটু বিশেষভাবে করিয়াছেন—

(এর পরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি পুষ্পের মত......আধুনিক পৃথি... জিজ্ঞাসা ও উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধানের উপরে' অংশটি উদ্ধৃত। পাঠক এই অং... কিছু পরেই পাবেন।)

—অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই চিন্তাব্যাধিগ্রস্ত, শঙ্কাসংশয়াক্লিষ্ট আধুনি... সমাজে—নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত আনন্দের উৎসস্বরূপ ছিলেন—একটি ... মত তিনি এই কণ্টকারণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি ছিলেন আ... পুরুষ, বাহিরের অন্ধকার তাঁহার অন্তর্দহনের জ্যোতিঃশিখা ম্লান করি... পারে নাই। সেই আলোকে বিবেকানন্দও চক্ষু মেলিয়াছিলেন—কিন্তু ... চক্ষে আলো নয়, এ যুগের অনলকুণ্ড তাঁহার বক্ষে অহরহঃ জ্বলিয়াছিল— তাঁহার চক্ষের সেই আলোক জগতের সকল সমস্যা ও সংশয়-সংকটের ... প্রতিফলিত হইয়াছিল। মঃ রোলাঁর কথাগুলি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। উভয়ে... গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে... নাই যে, গুরু-শিষ্যে এখানে প্রভেদ নাই। একজন জীবনের ভিতর দিয়া... বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাবনা-বেদনা দিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝি... প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া কর্মপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন,— একজন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে উপ... আরও গূঢ়, আরও গভীর; এবং গভীর ও সীমাহীন বলিয়াই তাহা ... কর্মবিধিকে আশ্রয় করিতে পারে নাই; সেইজন্যই একটি নদীপ্রবাহে নি... সেই তটহীন প্রেমকে প্রবাহিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। নরে... উদ্ধত জ্ঞানাভিমান ও প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল

কিন্তু তিনি আপনার কথাটি তাহাকে বুঝাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'নরেন যেদিন জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য স্ব-চক্ষে দেখিবে সেইদিন উহার সব অভিমান চূর্ণ হইবে, সারা প্রাণ অসীম করুণায় গলিয়া যাইবে।' ......শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ ভবিষ্যৎ-বাণী এবং পরে তাহার সার্থকতা কি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না যে, বিবেকানন্দের জীবনে গুরুর অভিপ্রায়ই পূর্ণ হইয়াছিল। ......বিবেকানন্দরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা-গহনেই নিহিত ছিল। ভাবনা, চিন্তা, আবেগ ও কল্পনা, ভূয়োদর্শন ও মনীষা, এই সকলের সাহায্যে একজনের জীবনে যে-বাণীকে আমরা বীরবীর্য ও কর্মশক্তিতে মূর্ত হইতে দেখি, সেই বাণীর এক অলৌকিক অপৌরুষেয় অভিব্যক্তি আর একজনের মধ্যে পূর্বেই হইয়াছিল। বিবেকানন্দের পৌরুষ, প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার যে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই, তাহার মূল উৎস যিনি, তিনি পাণ্ডিত্য, প্রতিভা বা মনীষার কোনো পরিচয় দেন নাই; অথবা আমরা যাহাকে কর্মানুষ্ঠান বলি, তাহাও করেন নাই। তাই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটি ভেদ-রেখা টানিবেই। উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' একটি অখণ্ড অভিন্ন তত্ত্ব হইয়া আছে। মানুষের দৃষ্টি—সে যত বড় মানুষই হউক—পূর্ণ নহে; জ্ঞান ও ভক্তি দুইয়ের কোনোটাই শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়দৌর্বল্য হইতে মুক্ত নহে। তাই ভগিনী নিবেদিতার মত মহীয়সী মহিলাও তাঁহার নিজের গুরুর জন্য একটু পৃথক গৌরব দাবি করিয়াছেন—

> I see in him the heir to the spiritual discoveries and religious struggles of innumerable teachers and saints in the past of India and the world, and at the same time the pioneer and prophet of a new and future order of development.

—কে বলিবে এ গৌরব তাঁহার গুরু বিবেকানন্দের প্রাপ্য নয়, কিন্তু বিবেকানন্দ কি শ্রীরামকৃষ্ণের হইতে স্বতন্ত্র? তবে তাঁহাকে আড়ালে রাখিলেন কেন? বুঝি তাঁহারও দোষ নাই; গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধ সত্যই রহস্যময়, আরও রহস্য এই যে, সে সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেও বারবার ভুল হয়,—বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এত প্রবল যে, মানুষ আমরা এইরূপ প্রকট ব্যক্তিত্বের মহিমায় অভিভূত না হইয়া পারি না।"

একই বিষয়ে মোহিতলাল অন্যত্র লিখেছেন—

"বিবেকানন্দের সেই শৈব-শক্তির মূলে যে এক গভীরতর বৈষ্ণবীশক্তির প্রেরণা ছিল, একথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'স্থিতি'-রূপের মধ্যেই যে কী প্রচণ্ড 'গতি'-বেগ ছিল, এবং তাহাতে ঐ দুইয়ের যে কী সমন্বয় হইয়াছিল, সে তত্ত্ব আজিও আমাদের জ্ঞানগোচর হয়

নাই। ভগিনী নিবেদিতাও......তাঁহার গুরুর অন্তরালে এই মহামুহূর্ত সর্বদা দেখিতে পান নাই।......

......একজন (বিবেকানন্দ) চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, এবং দেখিলেও হয়ত তাহাকে আর এক রূপে দেখিত—কারণ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে জাগতিক ব্যাপারের মূল্যই অন্যরূপ; অপর পুরুষ (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেন জ্ঞানের উপরে প্রেমের দৃষ্টিকে জয়ী করিয়া সাক্ষাৎ-দর্শন ব্যতিরেকেই তাহাকে (মানব-জীবনের অসীম দুঃখকে) অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এবং আর একজনের জ্ঞানচক্ষুতে সেই প্রেমের অঞ্জন কবে কেমন করিয়া লাগিবে তাহা জানিতেন বলিয়াই জ্ঞান ও পৌরুষের বজ্র-বিদ্যুৎরূপী সেই মহাশক্তিমান শিষ্যকে এমন একটি সজল শ্যামল মেঘখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন যাহা অচিরে গগনব্যাপী হইয়া উঠিবে; এবং শেষে সেই অন্তর্গূঢ় বিদ্যুতের অসীম বেদনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া সেই মেঘ গলিয়া যাইবে—তাহারই অপর্যাপ্ত ধারাবর্ষণে তপ্তধরণী শীতল হইবে। ওই Eastern Wisdom -এর পূর্ণ ঘনীভূত বিগ্রহ যিনি—বিবেকানন্দ যাঁহার স্রোতোবেগোচ্ছ্বসিত নির্ঝর-রূপ, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রতীচ্য-সংস্কারবশে তাঁহার সেই স্থিরতাকে গতির তুলনায় সমান প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।"

ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির অংশবিশেষ সম্বন্ধে মোহিতলালের এই সমালোচনা উপস্থিত করার কারণ এই নয় যে, আমরা তাঁর মতকে গ্রহণ করি। আবার করি না, একথাও বলছি না। আমাদের মতামতের প্রশ্ন এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল কথা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্পর্ক প্রথম শ্রেণীর ভাব ও ভাবনাকে উদ্রিক্ত করেছে দীর্ঘদিন ধরে, এবং মতপার্থক্যের মধ্য দিয়ে, লেখকেরা একটি রহস্যময় বিরাট বিষয়কে নানাভাবে স্পর্শ করবার চেষ্টা করেছেন—আমরা এখানে তারই কিছু নমুনা পাঠককে উপহার দিলাম। অতঃপর 'আচার্যদেব' গ্রন্থ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ সংকলিত হচ্ছে—]

বৌদ্ধ প্রচারক-সন্ন্যাসীদের মতই স্বামীজীর ক্ষেত্রেও এক মহাজীবনের প্রচণ্ড শক্তি তাঁকে আকর্ষণ করে বিদেশভূমিতে নিক্ষেপ করেছিল। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের পাদমূলে উপবিষ্ট থেকে তাঁর লীলায় স্বামীজী অংশ নিয়েছিলেন বছরের পর বছর।

প্যারিসে একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন,......'প্রাচীন হিন্দুধর্ম যেখানে এককেই সৎ এবং বহুকে অসৎ বলেছে, সেখানে কি বুদ্ধ বহুকে সৎ এবং (তাতে অধিষ্ঠিত) অহং-কে অসৎ বলেন নি?' স্বামীজী উত্তরে বলেছিলেন, 'হাঁ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছি—বিভিন্ন সময়ে, মনের বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত এক ও বহু, সবই চিরন্তন সত্য।'

স্বামীজী তাঁর বৃদ্ধ গুরুদেবের প্রসঙ্গে প্রবেশ করলেন। তাঁর কথা সেই প্রথম (লণ্ডনে, ১৮৯৬) শুনলাম, এবং বালিকাটির কথা, যিনি এ'র সঙ্গে বিবাহিত হবার পরে যখন এ'র মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন, তখন বেদনাশ্রুর মধ্যেও স্বামীকে সাধনার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সে কথা বলতে বলতে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে একসময়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল যেন। ভাবের গোপন সঞ্চরণে অভিভূত চেতনাকে যেন নাড়া দিয়ে নিজেকে জাগ্রত করার চেষ্টায় সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলেছিলেন—'হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, এসব ব্যাপার একদা ঘটেছে, আবার ঘটবে। যাও বৎসে—শান্তি! শান্তি! তোমার বিশ্বাসই তোমাকে পূর্ণ করেছে।'

'বেদান্তের তত্ত্বকথা তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কিছুই জানতেন না—কিছু না। তিনি যাপন করেছিলেন তাঁর মহান জীবন। তাকেই দান করে গেছেন। অন্যেরা ব্যাখ্যা করুক তাকে,'—স্বামীজী তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রসঙ্গে একবার একথা বলেছিলেন। বিরাট জীবন যাঁরা যাপন করেন, তাঁদের কাছে স্বীয় জীবনের কোনো কোনো তাৎপর্য অজ্ঞাত থেকে যায়—এই সত্য স্বামীজীর কথায় ফুটে উঠেছিল, এবং এই কথাগুলি স্বয়ং স্বামীজীর জীবন আলোচনাকালে বারবার আমার মনে হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকার প্রতি আনুগত্য ঘোষণায় স্বামীজী সদাই সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিন্ন নিজস্ব কোনো ভাব বা বাণীর উচ্চারণ তাঁর কাছে অপরাধ বলে মনে হত। তাছাড়া তিনি মনে করতেন ভাবপ্রবণতায় শক্তির বৃথা ক্ষয় হয়, শক্তি সংহত হলেই তবে তা কর্মে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তিনি (স্বামীজী) নিজেই আবার সর্বস্ব দানের আবেগে অধীর হয়ে উঠতেন এবং সে বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবার আগেই তিনি নিজ দেশ ও জাতির জন্য আশা ও প্রেমের ভাবরাজি বিকীর্ণ করে দিতেন, যা প্রস্তুত ক্ষেত্রের উপর বীজরূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে বৃক্ষরূপে নির্গত হত—যা হয়েছে ভারতের দিকে দিকে—দূরতম প্রান্তে পর্যন্ত—যাতে জন্ম নিয়েছে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি সন্তানের হৃদয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কোনো শাস্ত্র না পড়েই বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ—বিবেকানন্দও সেইভাবে মূর্তিমান জাতীয় জীবন। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি অসচেতন ছিলেন। গুরুর বিষয়ে যে-কথা তিনি বলেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও তাই বলা চলে : 'তিনি শুধু মহাজীবন যাপন করেই তৃপ্ত ছিলেন—অন্যেরা খুঁজে নিক তার ব্যাখ্যা।'

হিন্দুধর্ম যে এইসকল আধুনিক পদ্ধতির (নগর ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত) প্রেরণা ও সারসংগ্রহের ক্ষমতা ধরে, তা প্রমাণিত হয়েছে রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ে, যাঁরা জাতীয়তা-চিন্তায় নিজস্ব বিশিষ্ট দান রেখে গেছেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় স্বামীজীর জীবনগঠনে তিনটি প্রভাব সক্রিয় : ইংরাজী ও সংস্কৃত জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ, গুরুর বিরাট চরিত্র, যা সকল ধর্মশাস্ত্রের ধ্রুবলক্ষ্যকে

প্রমাণিত ও দৃষ্টান্তযুক্ত করেছিল; তৃতীয়তঃ—আমার নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী—ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যার দ্বারা এ-দেশ ও জাতিকে তিনি সুবিশাল ধর্মশরীর বলে বুঝেছিলেন, সকল বিরাটত্ব সত্ত্বেও তাঁর গুরুদেব যার বাণী ও ব্যক্তিবিগ্রহ। এই তিন প্রভাবের লক্ষণ স্পষ্টভাবে স্বামীজীর উক্তিসমূহে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি বেদান্তবক্তা, বৃহত্তর পৃথিবীতে ভারতীয় দর্শনের প্রচারক, তখন তিনি মুখ্যতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল, যদিও তিনি যে-স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে তা উপস্থিত করেছিলেন, অপূর্ব এক জীবনের মধ্যে তাকে সংহত আকারে দর্শন না করলে কখনোই তা করতে পারতেন না। যখন তিনি বলেন, 'প্রেমেই ভক্তির উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিসমাপ্তি,' কিংবা যখন কর্মরহস্যের বিশ্লেষণ করেন,—তখন তাঁর গুরুদেবকেই আবির্ভূত দেখি সামনে। তখন অনুভব করি, শিষ্য গুরুর জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যের সত্যকেই প্রকাশ করতে ব্যাকুল, যাকে আবার ঐ গুরু পেয়েছিলেন অন্য এক চরণতলে (জগজ্জননীর) উপবিষ্ট থেকে। কিন্তু যখন আমরা চিকাগো সম্মেলনে প্রদত্ত স্বামীজীর ভাষণ পাঠ করি, কিংবা সমান চকমপ্রদ 'মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর' পড়ি, কিংবা ১৮৯৭-তে লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ পড়ি, যাতে তিনি হিন্দুধর্মের মূলগত সাধারণ সত্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন,—এসব ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু পাই যা তাঁর নিজ পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত। এইসকল ভাষণের প্রাণশক্তি তাঁর ভারতীয় পরিব্রাজক জীবনে সংগৃহীত হয়েছিল। এই পরিব্রাজক জীবনের কাহিনী কখনো সম্পূর্ণ সমাপ্ত হবে না। ভাসা-ভাসা আবেগ কিংবা ইচ্ছাকৃত অন্ধতা থেকে নয়, পরিব্রাজক জীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকেই নিজ জাতি ও দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসার উদয় হয়েছিল। বলিষ্ঠ ও বর্ধনশীল যুক্তি ও বুদ্ধিতে পরমাগ্রহে নূতন সত্যের সন্ধান করেছেন, বিচার করেছেন, এবং সর্বদাই বিরূপ সমালোচনার মুখে অদম্য ও নির্ভয় থেকেছেন।—'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ কি, তাই হবে আমার সমগ্র জীবনের অনুশীলনের বস্তু'—তিনি একদা বলেছিলেন। তদুপরি এই সর্বাঙ্গীণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তিনি যখন নিজ দেশ ও জাতির বিষয়ে ধারণা গঠন করতে গেলেন তখন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন ও সহজ উপাদানগুলি তাঁর চোখে বৃহৎ মহিমালাভ করতে পেরেছিল। নিজ দেশে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল বলে গণ্য হবার যোগ্য আধুনিক শিক্ষা তাঁর ছিল, তবু তিনি কোনো কোনো প্রগতিপন্থীর মত, সন্ন্যাসী বা কৃষক, মূর্তিপূজক বা জাতিভেদ-পীড়িত—কাউকেই বাদ দেননি ভারত নামক বিশাল সামগ্রিক সত্য থেকে। এই প্রতিজ্ঞাদৃঢ় স্বীকরণক্ষমতার উৎস তাঁর পরিব্রাজক জীবন—যে-জীবনে বৎসরের পর বৎসর তিনি সমগ্রের মধ্যে সমাহিত ছিলেন।

আমি শুনেছি যে, অতি শৈশব থেকেই বিবেকানন্দ নিজ গোপন সংস্কারে অনুভব করতেন যে, দেশের কল্যাণ করতে তাঁর জন্ম। আমেরিকা-জীবনের সূচনায় যখন অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে আছেন, জানতেন না যে, পরবর্তী আহার কোথায় জুটবে—তখনও ভারতের শিষ্যগণের কাছে পাঠানো চিঠিতে তাঁর ঐ অন্তর্নিহিত বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি দেখা যায়। স্বামীজী পরবর্তীকালে গর্বের

সঙ্গে একথা স্মরণ করতেন। এই পৃথিবীতে যাঁরা কোনো বিশেষ কার্যসাধনের জন্য আসেন, তাঁদের মধ্যে এমন অদম্য আশার অমোঘ প্রকাশ ঘটেই। গভীর অকথিত মহত্ত্বের এই চেতনা উদ্ঘাটিত হয় সমগ্র জীবনে। হিন্দুর ধারণায়, এই ধরনের মহত্ত্ব-চেতনার সঙ্গে আত্মাভিমানের আকাশপাতাল প্রভেদ।* স্বামীজী তা প্রকাশ করেছিলেন যখন প্রথম সাক্ষাতের পরে (আসলে দ্বিতীয়) তাঁর বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলিকে বৃদ্ধের অত্যুক্তি ও পাগলামি মনে করে তাঁর প্রতি আকর্ষণ তো দূরের কথা, অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ করেছিলেন।

আঠারো বছরের ছোকরা, একটা দলের সঙ্গে জুটে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। দলের একজন তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীতজ্ঞানের কথা ভেবে তাঁকে গান গাইতে বলেন। তিনি রামমোহনের একটি গান গাইতে শুরু করেন, যার শেষ ছত্রের অর্থ: চির অবলম্বনরূপে পবিত্রতাকে গোপনে হৃদয়ে রেখো।†

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেন সহসা আবির্ভাবের সংকেতবাদ্য হল।—'বাবা, তুই এতদিনে এলি! তোর জন্য যে এই তিন বছর অপেক্ষা করে আছি!'— তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছিলেন। সেইদিন থেকে বয়স্ক মানুষটির কাজ হল—বালকদের নিয়ে একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করা, যার মধ্যে 'নরেনে'র প্রতি আনুগত্য অটুট থাকবে চিরদিন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের ভাবী বিরাট খ্যাতির ঘোষণায় ক্লান্ত হননি, ক্ষান্ত হননি কখনো তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনে। যদি অন্য লোকের দুটো, তিনটে, দশটা, বারটা গুণ থাকে সেখানে নরেন্দ্রের সহস্র গুণ। 'নরেন্দ্র সহস্রদল পদ্ম।' উচ্চাধিকারীদের মধ্যেও যেখানে হয়ত দুই কি তিনটি শিবের শক্তি রয়েছে, সেখানে নরেন্দ্রের শক্তি অন্ততঃ আঠারোটি।

কপটতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের মন এতই স্পর্শকাতর ছিল যে, তিনি যেন তার সংস্পর্শে শারীরিক যন্ত্রণা পেতেন; একবার এক ব্যক্তিকে তিনি কিছুতে সাধুস্বভাব বলে স্বীকার করলেন না, যদিও অন্যদের কাছে তার সাধুত্ব অবিসংবাদিত। তিনি বললেন, 'বাইরের ভড়ং সত্ত্বেও লোকটি আসলে চুনকামকরা কবর, রাতদিন নিজেকে ধোয়া-মোছা করছে তবু ও কাছে এলে নোংরা লাগে, আর নরেন যদি বিলিতী হোটেল থেকে গোরু খেয়েও আসে তবু সে পবিত্রই থাকবে, এমন পবিত্র যে, তার স্পর্শে অপরে পবিত্র হয়ে যাবে।' এই সমস্ত উক্তির মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর

---

* বিবেকানন্দের তথাকথিত 'অহমিকা' যা অনেক সময়ে সমালোচনার কারণ হয়েছে, সে-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হিন্দু যোগী শ্রীঅরবিন্দের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য :

"মাদ্রাজী পণ্ডিতের প্রতি বিবেকানন্দের প্রসিদ্ধ উক্তিটিই ধরো। তাঁর কী একটা কথায় সংশয় প্রকাশ করে পণ্ডিত বলেছিলেন, 'কিন্তু শঙ্কর তো তা বলেন না!' তাতে বিবেকানন্দের জবাব,—'না, আমি বিবেকানন্দ, তা বলছি।'

'আমি বিবেকানন্দ'—তাঁর এই কথা সাধারণের কাছে হিমালয়প্রমাণ অহমিকার মত শোনাবে। কিন্তু বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় কিছু ভূয়ো বা ঝুটো ছিল না। আর ও তাঁর অহমিকা নয়, এ একটি অতি-মহতের বোধ; যে-জন্য তাঁর জীবন, যাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর সংগ্রাম—তাঁকে কেউ খর্ব বা তুচ্ছ করবে, তা তাঁর সহ্য হত না।"

† নিবেদিতা কোন্ দর্শনকালে কোন্ সঙ্গীতের কথা বলেছেন বলা শক্ত। তবে যত-দূর মনে হয়, নিবেদিতা যে দর্শনের উল্লেখ করেছেন, সেইকালে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী রচিত 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি স্বামীজী গেয়েছিলেন। অন্তত স্বামী মাধবানন্দের তাই মত।

এই শিষ্য ও অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে সম্পর্ককে মৌল উপাদানের উপর দৃঢ়তাবে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন,—কেননা শিষ্যটি নেতৃত্ব দেবে এবং অন্যান্য শিষ্যরা তাঁকে আনুগত্য দেবে, সমর্থন করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের রীতি ছিল, যখন নূতন কোনো শিষ্য আসত, তাকে তিনি মানসিক ও শারীরিক সর্বদিক থেকে সর্বপ্রকারে যাচাই করে নিতেন। দক্ষ বৈজ্ঞানিক-পর্যবেক্ষকের চোখে কোনো যন্ত্রের মডেলের প্রতিটি অংগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সুশিক্ষিত চোখে মানবদেহের প্রতিটি অংগপ্রত্যংগ তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব পরীক্ষার মধ্যে নবাগতকে ঘুম পাড়িয়ে তার অবচেতন মনের মধ্যে প্রবেশের পর্যন্তও ছিল। আমি শুনেছি যে বিশেষাধিকারীরা এই অবস্থায় নিজ কাহিনী নিজেই বলে যাওয়ার সুযোগ পেত, অল্পাধিকারীদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে তা জেনে নেওয়া হত। এমনই এক পরীক্ষার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ 'নরেন' সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন: নরেন যখন জানতে পারবে সে কে, কোথা থেকে এসেছে, তখন আর দেহবন্ধন এক মুহূর্তও সহ্য করবে না,—সংকীর্ণ জীবনের শিকল ছিঁড়ে উধাও হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি শিষ্যদের সর্বদা স্মরণে ছিল; তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বর্তমান চৈতন্যের পশ্চাদ্বর্তী অতীত জীবনের বোধ এই বালকটির মনে সদা জাগরূক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই বিশেষ শিষ্যটির হাত থেকে কোনো সেবা নিতে চাইতেন না। *তামাক সাজা, বাতাস করা জাতীয় যে-সব ছোটখাট কাজ নিয়তই* গুরুর জন্য শিষ্যরা করে থাকে, সে-সব কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য শিষ্যদের দ্বারা করিয়ে নিতেন।

প্রাচ্যের বহু অদ্ভুত আচারের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় প্রোথিত হল পতিত লোকের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য ভোজনের বিরুদ্ধে সংস্কার। আর এই ব্যাপারে স্বামীজীর গুরুদেব নারীর মতই স্পর্শকাতর ছিলেন। কিন্তু যা তিনি নিজে খেতেন না, তা স্বচ্ছন্দে দিতেন প্রিয় শিষ্যটিকে, কারণ তিনি বলতেন, 'নরেন জ্বলন্ত আগুন',—সমস্ত মলিনতা দগ্ধ করে ফেলবে। আবার বলতেন, ঐ বালকের ঈশ্বরীয় সত্তা পুরুষের, তাঁর নিজের—নারীর। এইভাবে যথার্থ শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রশস্তির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ এই বালকটির মহান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন,—তাঁর অবর্তমানে এঁর কার্যের সমর্থনে ও তার প্রামাণিকতা স্বীকারে যা প্রভূত সাহায্য করেছিল, কেননা স্বামীজী ছিলেন সর্ববিধ বন্ধন-অসহিষ্ণু। *এক্ষেত্রে* তাঁর চারিপাশের মানুষগুলির পক্ষে জানা দরকার ছিল—স্বামীজীর লোকাচার-লঙ্ঘনের সঙ্গে নিছক সুবিধাবাদীর আচার-লঙ্ঘনের মধ্যে কী আকাশপাতাল প্রভেদ! সংঘের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁদের উপর ন্যস্ত এই বিশেষ দায়িত্ব যে-অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন, সেই জিনিসটি আমার ভারতবাসের প্রথম দিকে আমার মনে সবচেয়ে দাগ কেটেছিল। যে-সব ব্যক্তির জীবন হিন্দুরক্ষণশীলতার কঠোরতম আচারের মধ্যে, ততোধিক তপশ্চর্যার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তাঁরাও তাঁদের নেতা যে-সব ইউরোপীয়কে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আহারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। জনৈক ইংরাজ দম্পতির সঙ্গে স্বামীজী নাকি মাদ্রাজে একত্রে আহার করেছিলেন, তিনি নাকি পাশ্চাত্ত্যে গোমাংস ও মদ্য স্পর্শ করেছিলেন—এসব কথায় গুরুভাইদের মুখে সামান্যতম কুঞ্চনরেখাও দেখা যায়নি। এসকলের বিষয়ে প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা

করা, বা সমর্থনের ওজর আবিষ্কার করা—কোনো কিছুই তাঁদের কাজ নয়। যা তিনি করেছেন, যেখানে তিনি নিয়ে গেছেন, নিয়ে যাবেন,—তাঁদের কাজ অবিচলিত আনুগত্যে তাঁর পাশে স্থান নেওয়া। এই মহান দৃশ্যের সম্মুখীন যিনি হবেন, তাঁর মনে একথা না উঠে পারবে না যে, যেমন বিবেকানন্দ ভিন্ন রামকৃষ্ণ সংঘ অর্থহীন, তেমনি রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের পিছনে না পেলে বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনা অসার্থক হয়ে দাঁড়াত। প্রাচীনতর গুরুভাইদের একজন সম্প্রতি আমাকে বলেছেন, 'বিবেকানন্দের নির্মাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারণ করেছিলেন।' কথাটি কি এইভাবে সত্য? না, বলা উচিত, জগন্মাতার হৃদয়োদ্ভূত অখণ্ড বিশাল ঐ উচ্চারণের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অংশ ভাগ করা সম্ভব নয়? এইসব জীবন অনুধ্যানের সময়ে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, আমাদের মধ্যে একটিই আত্মা বিরাজমান, যার নাম —'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ',—এবং সেই অস্তিত্বের রহস্যান্ধকার থেকে নানা মূর্তি আবির্ভূত হয়েছে, যার কোনো কোনোটি এখনো আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, এবং একথা কখনোই কারো সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যাবে না যে, এখানে তার প্রকাশ শেষ হয়ে গেল এবং শুরু হল অন্যের প্রকাশ।

স্বামীজী একদা বলেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি পুষ্পের মত',—মন্দির-উদ্যানের একান্তে প্রস্ফুটিত, সরল, অর্ধনগ্ন, প্রাচীনপন্থী, পুরনো ভারতের আদর্শ জীবন,—অকস্মাৎ তিনি যেন ফুটে উঠেছেন এমন এক পৃথিবীতে, যে-পৃথিবী ঐ জীবনের স্মৃতিকে পর্যন্ত মুছে ফেলতে ব্যস্ত। অপরপক্ষে আমার আচার্যদেবের জীবনের মহিমা ও দুর্ভাগ্য এই—তিনি ঐ ধরনের ছিলেন না। তাঁর ছিল সর্বাত্মক আধুনিক মন। যে-ভাবাবেশে মানুষ ঈশ্বরের মুখোমুখি হত অতীতে, তার আলোকে নিশ্চয়ই জ্যোতির্ময় ছিল তাঁর চৈতন্য, কিন্তু সে চৈতন্যের আলোক একই সঙ্গে প্রসারিত ছিল আধুনিক পৃথিবীর জিজ্ঞাসা ও উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধানের উপরে। তাঁর আশা-বিশ্বাস উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের আশা-বিশ্বাসকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারত কিন্তু তাকে বিনা মনোযোগে লঙ্ঘন করতে পারত না। ভৌম জ্ঞানের অর্জন, সংকলন ও সর্বসমক্ষে উপস্থাপনের প্রথম ফলস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির যাতনা ও সংগ্রামের সহসা যে-উদ্‌ঘাটন ঘটেছিল এই যুগে—তা ইউরোপীয় মানসের মত তাঁর মনেও প্রবিষ্ট হয়েছিল। এ বিষয়ে ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের কথা আমরা জানি। ইউরোপের সুকুমার কলা, বিজ্ঞান, কাব্য গত ৬০ বছর কিংবা তারো বেশী সময় ধরে শুধু হতাশার ক্রন্দনে পূর্ণ। এ পৃথিবী কী হয়ে দাঁড়িয়েছে! একদিকে অধিকার-ভোগীর স্থূল ভোগতৃপ্তির স্ফীতি, অন্যদিকে সেই পাপনাশের ব্যাপারে মহাপ্রাণের স্বচ্ছ আশা অথচ ক্ষীণ দুর্বল প্রয়াস!—এই তো পৃথিবীর ছবি যা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কেরা দেখছেন। যদিও অনিচ্ছুক, যদিও অনুতাপের মর্মযাতনায় অধীর, তবু উপায়ান্তরহীন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বিদীর্ণ চীৎকার: 'যার আছে—সেই পাবে; যার নেই—কেড়ে নিতে হবে তার শেষ সম্বলটুকুও; সাবধান! সাবধান! পরাজিত হলেই সর্বনাশ!'

প্রাচ্যপ্রজ্ঞার সিদ্ধান্তও কি একই? যদি তাই হয়, মানবের আশা কোথায়? আমার আচার্যদেবের জীবনে এর এক উত্তর খুঁজে পেয়েছি আমি। তাঁর মধ্যে

অতীত ভারত ও পৃথিবীর অগণিত গুরু ও ঋষির অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারকে আমি দর্শন করেছি একদিকে, অন্যদিকে একই সঙ্গে তিনি ভাবী নূতন অভ্যুন্নতির প্রবর্তক ও ঋষি।

স্বামীজী একদিন তাঁর মহাপুরুষ-দর্শন বিষয়ে বলেছিলেন। বিষয়টির সূচনা হয়েছিল নাগমহাশয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে।......তিনি পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন, 'নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম।' নাগ মহাশয়ের জ্বলন্ত ভক্তি, যে-শরীরে ঈশ্বরপ্রেম জাগল না সেই হতভাগা শরীরকে আর কি আহার দেব বলে অন্ন-জল ত্যাগ প্রভৃতির কথা বলেছিলেন। একবার অতিথির জন্য রাঁধায় কাঠের অভাব হওয়ায় কুটীরের খুঁটি পর্যন্ত উনুনে দিয়েছিলেন, সে কথাও।

তারপর সেই বালকটির কথায় চলে গিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পাবার পরে যে 'প্রিয়ং' এই কথাটি ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনি,—যে-দশ বছর এর পরে সে বেঁচেছিল সেইকালে এই শব্দটি ছাড়া আর কিছু তার মুখে শোনা যায়নি।

শ্রীগুরুর জীবনকালে দক্ষিণেশ্বরে আগত কত মানুষ কিভাবে তাঁর স্পর্শে তখনি সমাধিলাভ করেছিল, তার বিষয়ে সাধুদের জানা নানা কাহিনী শুনলাম। অনেক ক্ষেত্রেই আগন্তুকদের বিষয়ে ঐ ঘটনাটি ছাড়া বেশী কিছু জানা যায়নি। একথা জনৈকা মহিলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, যিনি গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন এবং যাঁকে দেখা মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'এ যে জগন্মাতার অংশ!' জগন্মাতার নামে ঐ নারীকে নমস্কার করে শ্রীরামকৃষ্ণ ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন, মহিলাটিও ব্যাপারটি যেন অদ্ভুত কিছু নয় এইভাবে তৎক্ষণাৎ গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সে সমাধিভঙ্গ করা যখন কঠিন হল তখন সকলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দু'তিন ঘণ্টা কাটার পরে যখন তিনি সমাধি থেকে উত্থিত হলেন তখন তাঁর সমস্ত চেহারা বদলে গেছে—একেবারে পাগলের ভাবভঙ্গি। যা হোক সমাধি যে ভেঙেছে এতেই সকলে খুশী, কারণ ভয় হয়েছিল যে, তা আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষে (তাঁরা যেখানেই থাকুন) দুশ্চিন্তার কারণ হবে। সকলেই তৎপর হয়ে তাঁকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু তাঁর নাম কি, নিবাস কোথায়, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসার চিন্তা কারও মাথায় জাগল না। মহিলাটি আর কখনো আসেন নি। তাঁর স্মৃতি একটি মনোহর কাহিনীর আকারে সংঘের চিন্তাভাণ্ডারে সুরক্ষিত হয়ে রইল, যা কল্যাণসুন্দর পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের নমস্কারের স্মারক। শ্রীরামকৃষ্ণ কি এই মহিলাটির বিষয়ে বলেন নি—'ইনি নিত্য মাতৃত্বের অংশ?'

ধর্মীয় ব্যাপারাদি সম্বন্ধে আমার সাধারণ অজ্ঞতার জন্য আমার মন বারবার ফিরে যেত আদ্যাশক্তির এইসব নামহীন অজ্ঞাত সন্তানগণের দিকে, যাঁরা নক্ষত্রের মত নিজ কক্ষে সুন্দর দীপ্তিতে আবর্তিত কিন্তু আর কখনো আমাদের মধ্যে আপতিত হলেন না;—তাঁদের জীবন অপরূপ, সত্য, তবু আমি জানতে চাইতাম, বহু বর্ষ পূর্বেকার ঐ মহতী অনুভূতি কি তাঁদের জীবন থেকে মুছে যেতে পারে না? আচার্যবরিষ্ঠের স্পর্শস্মৃতি কি তাঁদের কাছে একটি বহুদূরের ঘটনা, স্বপ্নদৃষ্ট

কাহিনীর মত অস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না, যেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঐসব ঘটনার স্মৃতি আজ প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে। আসলে আমি নানা জিনিসের আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় করতে চাইছিলাম এবং সেই প্রয়াসে সেইকালে আমার দৃষ্টির অগোচর থেকে গিয়েছিল একটি জিনিস (যা আমার বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি তখনো),—এই ধরনের ব্যাপারকে সহজে স্বীকার করবার মত মানসিক প্রস্তুতি হিন্দুর মধ্যে তার স্বজাতি-স্বভাবে স্বতঃই আছে। আমার মনের সংস্কারের প্রকৃতি স্বামীজী সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন নি। তিনি বললেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস কাউকে স্পর্শ করেছেন, একি তামাসার কথা নাকি? নিশ্চয় তিনি নতুন মানুষ সৃষ্টি করেছেন এইসব ক্ষণিকের স্পর্শেও।' এর পরেই তিনি বিভিন্ন শিষ্যের জীবনের কাহিনী বলে যেতে আরম্ভ করলেন। একজন বারবার আসত, উপলব্ধির জন্য অধীর হত, সহসা একদিন তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আগে কিছু টাকা কর, তারপর এসো।' সেই লোকটি আজ পার্থিব ব্যাপারে সাফল্য পেয়েছে কিন্তু তাঁর প্রতি স্বামীজীর পুরনো ভালবাসা এখনো উজ্জ্বল। স্বামীজী এঁদের বা অন্যদের দোষের বিষয়ে কিছু বললেন না। তাঁর কথা শুনতে মানুষের সংগ্রামের গরিমা ও মহত্ত্বের অনুভূতিই আমরা পেতাম। সব মানুষকে জোর করে সন্ন্যাসী হতে হবে কেন? তা সে পারবেই বা কেন জীবনের অন্য কাজ মিটিয়ে না এলে? কিন্তু শেষে ভুল হবে না; শেষে সব কিছুই তাঁর হয়ে যাবে।

(স্বামীজীর উক্তি—) সুতরাং আমি উপনিষদ শিক্ষা দিই। খেয়াল করলে দেখবে, আমি উপনিষদ ভিন্ন অন্য কিছু উদ্ধৃত করি না। আর উপনিষদের মধ্যেও সেই ভাবটি, যা শক্তির কথা বলে। বেদ-বেদান্তের সার কথা ঐ একটি শব্দে। বুদ্ধ অপ্রতিরোধ ও অহিংসা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সেই একই শিক্ষা দেবার উচ্চতর উপায় এখানে আছে। অহিংসার মধ্যে একটি দারুণ দুর্বলতা আছে, আর দুর্বলতা থেকেই প্রতিরোধের ইচ্ছা জাগে। এক ফোঁটা সাগর-জলের আঘাতের ভয়ে পালিয়ে যাবার বা তাকে শাস্তি দেবার কথা আমরা ভাবি না, ওটা আমাদের কাছে গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়, কিন্তু একটা মশার কাছে জলের ঐ সামান্য ছিটেই মারাত্মক। সকল আঘাতকে অমন তুচ্ছই করতে হবে। শক্তি ও অভীঃ। আমার নিজের কাছে আদর্শ হলেন সেই সাধুটি, যিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বুকে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে দেহ-ত্যাগের সময়ে মাত্র মৌনভঙ্গ করে বলেছিলেন,—'তুমিও তিনি!'

'জিজ্ঞাসা করতে পারো, এই কাঠামোয় শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়!

'তিনি যেন একটি প্রণালী—অপূর্ব অসচেতন প্রণালী। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বুঝতেন না। ইংরেজ বা ইংলন্ড সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানতেন যে, তারা সমুদ্রপারের বিচিত্র লোক। কিন্তু তিনি ঐ বিরাট জীবনযাপন করে গেলেন, যার তাৎপর্য আমি অনুধাবন করে যাচ্ছি। তাঁর মুখে কখনো কারো বিরুদ্ধে নিন্দার একটি শব্দও নয়! একবার বীভৎস আচারের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমি উগ্র সমালোচনা করছিলাম, তিন ঘণ্টা ধরে,—তিনি চুপ করে শুনছিলেন। আমার কথা শেষ হলে 'বুড়ো লোকটি' বললেন—হাঁ, সব বাড়িতেই মেথর ঢোকার পিছনের দরজা থাকে—এও সেইরকম আর কি!'

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে হতবাক হয়ে যেতেন, সেই সঙ্গে বিশেষ অস্বস্তিও বোধ করতেন যখন দেখতেন, তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুগভীর গবেষণার সিম্ধান্তগুলিকে জীবন্ত সত্যের মত দর্শন করে স্বামীজী অনর্গল বলে যাচ্ছেন ধর্মব্যাখ্যাতার ওজস্বিতার সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের কিছু করারও ছিল না, কেননা তাঁরা যে-ভাবেই যাচাই করার চেষ্টা করুন না কেন, এই ধর্মপ্রচারকের পাণ্ডিত্য হেলায় সবকিছু অতিক্রম করে চলে যেত। দর্শনের ধরাবাঁধা তত্ত্বালোচনা কিংবা বিশুদ্ধ ইতিহাস বা ভাষাতত্ত্বের মধ্যে আবন্ধ ছিল না তাঁর মতবাদ,—একটি প্রাণবান জাতি আড়াই হাজার বছর ধরে জীবনে মরণে ক্রমাগত যে-সত্যকে লাভ করার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে—তারই বিশ্বাসের ঘোষণা তাঁর মধ্যে। ধর্মগ্রন্থসমূহকে জ্ঞানের আধার বা উৎস হিসাবে তিনি দেখতেন না, এক মহাজীবনের টীকা-ভাষ্যরূপেই তাদের মূল্যকে তিনি স্বীকার করতেন,—যাদের সহায়তা ভিন্ন ঐ জীবনের অত্যুজ্জ্বল ছটা তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে বিশ্লেষণশক্তি নষ্ট করে ফেলতে পারত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই মহাজীবনই শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতকে তাঁর কাছে চরম সত্য বলে প্রতিপন্ন করে তুলেছিল। এবং ঐ মহাজীবনই—অবশ্য তার সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভূতিও যুক্ত হয়েছিল—তাঁর এই বিশ্বাসকে অমোঘ করে তোলে : দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদগুলি আপাততঃ অদ্বৈতবাদে না পৌঁছলেও ঐ চরম সত্যের পথে সেগুলি বিভিন্ন স্তরবিশেষ।

ঐ চরম লক্ষ্যের জন্য উদ্দিষ্ট প্রত্যেকটি আন্তরিক বিশ্বাসই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যে-কোনো পূজাস্থানে প্রণাম করবে, কারণ মানুষ যে-রূপে তাঁকে চায়, তিনি সেইরূপেই আবির্ভূত হন।' সূর্যের দিকে যাওয়ার পথে আমরা ক্রমাগত ফটো তুলে গেলে কোনো ছবিই একেবারে একরকম হবে না, কিন্তু কোন্ ছবিকেই বা ভুল বলতে পারা যাবে?—এই উক্তির দ্বারা স্বামীজী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধী মতসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের আচার্যদেব যখন নারীর পক্ষে সর্বোচ্চ সত্যলাভের সম্ভাব্যতা প্রমাণীকৃত করার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন, তখন আসলে তিনি যে-সব বিষয়কে আমরা নিতান্ত সামাজিক ও ঐহিক বলে সাধারণতঃ জানি, তাদের অন্তর্লীন পবিত্রতার মহিমা সম্বন্ধে নূতন ধারণাসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রতীকে পূর্ণ জগৎ—এই জগতে ঈশ্বরলাভের পক্ষে সংসারের সেবাজীবনকে পূজামন্দিরের সাধকজীবনের মতই সত্যসাধনার পথ বলে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। মন্দিরে ভোগ নিবেদন করেন পুরোহিত, গৃহে আহার্য পরিবেশন করেন মাতা ও পত্নী—ঈশ্বরের কৃপা উভয়ক্ষেত্রেই সমভাবে বর্ষিত। 'সবই মায়া, ভগবানের নাম পর্যন্ত',—শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন,—'কিন্তু কোনো কোনো মায়া আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, আবার কেউ কেউ আরও জড়িয়ে বাঁধে।' যে-সাধ্বী নারীর কাছে গৃহ মন্দিরস্বরূপ, শিষ্টাচার ও অতিথিদের প্রতি কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে যিনি প্রতিদিনের জীবনকে প্রতি মুহূর্তের পূজায় পরিণত করেন—তাঁর জীবনের পবিত্র অধ্যাত্মমহিমা দেখিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মহান শিষ্যের এক মুখ্য চিন্তার ভিত্তি ও প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী কয়েক বৎসর ভারত ভ্রমণকালে অসংখ্য সামাজিক

গোষ্ঠী ও তাদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান। নিজ আচার্যের জীবনে যার পূর্ণ জ্যোতি দর্শন করেছিলেন, ঐসব সম্প্রদায়ের মধ্যে তারই খণ্ড কিরণ। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতবহির্ভূত পাশ্চাত্য দেশসমূহের পর্যবেক্ষণ শুরু হল, তখন সেখানকার জনসমষ্টিকে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে ঐক্যবন্ধরূপে দর্শন করলেন। এই দর্শন এবং তাঁর নিজ দেশ-দর্শন—সব ক্ষেত্রেই তিনি দেখতে লাগলেন ঈশ্বরলীলা মানবশরীরে। অনেক বৎসর ধরেই তাঁর মধ্যে অজ্ঞাতে এই ব্যাপারটি ঘটছিল, তথাপি তাঁর সান্নিধ্যের মানুষেরা সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলি অনুধাবনে তাঁর ব্যাকুলতায় অভিভূত না হয়ে পারেনি।

একদিন যখন তিনি পরমানন্দে তুর্কীদের শিষ্টাচার ও নৌবিদ্যায় পারদর্শিতার গুণগান করছিলেন, তখন আমি তাঁর বিস্ময়কর উৎসাহের বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। জাহাজের খালাসীদের শিশুতুল্য আন্তরিক ভালবাসায় ও ভক্তিতে তিনি মুগ্ধ ছিলেন—তখন আমার বিস্ময় তাঁকে সচকিত করে তোলে এবং অনেকটা দোষীর মত ভঙ্গিতে বলেন,—'কি জানো, আমি মুসলমানদের ভালবাসি।' 'জানি,' আমি বললাম, 'কিন্তু আসলে আমি জানতে চাইছিলাম, প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলি দেখবার এই মনোভাব আপনি কোথা থেকে পেলেন—কোনো বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে এ জিনিস দেখেছেন কিংবা পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে?'

বিমূঢ় বিস্ময়ের ভাব ধীরে ধীরে তাঁর মুখ থেকে সরে গেল : 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে শিক্ষাকালে, নিশ্চয়ই,' তিনি বললেন, 'আমরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে তাঁর পথে চলেছি; অবশ্য তিনি যেভাবে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাতে আমাদের পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন হয়নি; যে-জাতির মানুষদের তিনি বুঝতে চাইতেন, তাদের মত করে তিনি খেতেন, পরতেন, তাদের ধর্মদীক্ষা নিতেন, তাদের ভাষায় কথা বলতে চাইতেন; তিনি বলতেন, 'অন্য মানুষের একেবারে আত্মায় প্রবেশ করতে শিখতে হবে।' এটা তাঁরই নিজস্ব! তাঁর আগে ভারতে কেউ ক্রমান্বয়ে খ্রীশ্চান, মুসলমান ও বৈষ্ণব হয়নি।'

বুদ্ধজীবনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাই কেবল তাঁকে বিমোহিত করে রাখেনি, এক্ষেত্রে সমান জোরালো আর একটি ব্যাপার ছিল—তিনি তাঁর গুরুর যে-জীবনকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তার সঙ্গে আড়াই হাজার বছর আগেকার জগতের দ্বারা স্বীকৃত জীবনের সাদৃশ্য না দেখে পারেননি। বুদ্ধের মধ্যে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখতেন, রামকৃষ্ণের মধ্যে বুদ্ধকে।

এক ঝলকে একদা তাঁর এই মনোভাব আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল যখন তিনি বুদ্ধের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করছিলেন। বুদ্ধের জন্য বৃক্ষতলে কম্বল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল; পুণ্যপুরুষ তার উপরে 'শয়ন করেছিলেন দক্ষিণপার্শ্বে, সিংহের মত' মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, তখন হঠাৎ একজন ছুটে এল তাঁর কাছে,—সে উপদেশ চায়। শিষ্যরা সেই লোকটির ইচ্ছাকে অনুচিত বোধে তাকে সরিয়ে দিতে চাইল; মৃত্যুশয়নে আচার্য, তাঁর শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। কিন্তু পুণ্যপুরুষ তাদের কথাবার্তা শুনতে পেলেন · 'না না, আসতে দাও, তথাগত সদা

প্রস্তুত!'—বুদ্ধ বললেন। তারপর কনুয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঠে তাকে শিক্ষা দিলেন। এমন ঘটল পরপর চারবার, তারপরেই মাত্র বুদ্ধ নিজেকে মুক্ত ভাবলেন—নির্বাণের জন্য। 'কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে আনন্দকে ক্রন্দনের জন্য তিরস্কার করলেন। বুদ্ধ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, অবস্থাবিশেষের নাম; যে-কেউ সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন—তখনো কাউকে পূজা করতে নিষেধ করে গেলেন।'

স্বামীজীর কণ্ঠে অমর কাহিনী শেষ হল অবশেষে। যারা শুনছিল তাদের কাছে সবচেয়ে অর্থ-গভীর হয়েছিল সেই ক্ষণটি যখন 'কনুইয়ের উপরে ভর করে উঠে শিক্ষা দিলেন'—এই কথা বলার কালে একটু থেমে স্বামীজী সংক্ষিপ্তভাবে যোগ করেছিলেন—'এ জিনিস আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনেও দেখেছি!'—তখন অনিবার্যভাবেই মনে পড়েছিল ঘটনাটি,—বহুশত মাইল দূর থেকে আচার্যবরিষ্ঠের কাছে শিক্ষা দেবার জন্য কাশীপুরে আগত মানুষটির কথা; এক্ষেত্রেও আচার্য মৃত্যুশয্যায় এবং শিষ্যরা আগন্তুককে নিকটে যেতে দিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে আসতে দিতে বললেন—তাকে শিক্ষা দিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কৈবর্ত (মাহিষ্য) কুলোদ্ভবা ধনশালিনী রাণী রাসমণি কর্তৃক নির্মিত হয় এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরের অন্যতম পূজারী ব্রাহ্মণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনাটি বিবেকানন্দের মনে প্রভাব বিস্তার করে, সে প্রভাবের গভীরতা হয়তো তিনি নিজেও জানতেন না। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উদ্ভূতা জনৈকা নারী কার্যতঃ একটি সমগ্র আন্দোলনের জননীস্বরূপা হলেন—গুরুভ্রাতাগণসহ বিবেকানন্দ যে-আন্দোলনের অংশ। বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির না থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণকে পাওয়া যেত না, রামকৃষ্ণ ছাড়া বিবেকানন্দকে, এবং বিবেকানন্দ ছাড়া তাঁর পাশ্চাত্ত্য প্রচারকে। সমস্ত ব্যাপারটিই কলকাতার কয়েক মাইলের মধ্যে গঙ্গাতীরে উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে নির্মিত একটি মন্দির-সৌধের উপর নির্ভরশীল। আর সে মন্দির নিম্নশ্রেণীভুক্ত একজন ধনী মহিলার ভক্তির সৃষ্টি। এ জিনিস কিন্তু ব্রহ্মণ্য প্রাধান্যরক্ষায় দায়বদ্ধ খাঁটি হিন্দুরাজত্বে ঘটা সম্ভবপর ছিল না—স্বামীজী সত্বর জানিয়ে দিয়েছিলেন তা। এবং এরপর থেকে স্বামীজী সিদ্ধান্ত করেন—ভারতে একচ্ছত্র শাসনের বিভিন্ন সময়ে জাতিভেদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি।......

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনের ইতিহাসে বড় হয়ে আছে। যখন সকলে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্ম-খ্যাপা বলে ধরে নিয়েছিল, তখন তিনি এই মহাসাধককে রক্ষা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মন্দিরের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ, তখন ইনিই তাঁর বাসস্থান ও বৃত্তি বজায় রাখেন। এইসব কাজে মথুরবাবু তাঁর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ধারা বজায় রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় প্রতিভা প্রথম থেকেই রাণী রাসমণি বুঝেছিলেন, এবং অতঃপর অব্যাহত নিষ্ঠায় তার পরিপোষণ করে যান।

কামারপুকুরের তরুণ ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যখন প্রথম এসেছিলেন, তখন

কিন্তু তিনি এতই প্রাচীনপন্থী ছিলেন যে, নিম্নশ্রেণীর এক নারী মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ-উদ্দেশ্যে সম্পত্তিদান করেছেন—এ জিনিস তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠাদিবসের পূজার্চনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহায্য করতে হয়েছিল। কিন্তু পূজার কোনো প্রসাদ তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। কাজকর্ম চুকে যাবার পরে, সকলে চলে গেলে গভীররাত্রে বাজার থেকে একমুঠো ছোলাভাজা কিনে নিয়ে এসে তিনি উপবাসভঙ্গ করেন।

এই ঘটনাটির পটভূমিকায় পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তিনি যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার তাৎপর্য গভীরতর হয়ে ওঠে। কার্যগতিকেই তিনি পরবর্তীকালে কৈবর্তবংশীয়া রাণীর সম্মানিত অতিথি ও প্রতিপাল্য হয়ে ওঠেন নি। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যখন তিনি তাঁর জীবনোদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারেন তখন দেখেন যে, শৈশবের গ্রাম-জীবনে অভ্যস্ত কঠোর রক্ষণশীলতা তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের পক্ষে সহায়ক নয়, বরং প্রতিবন্ধক। তাঁর জীবন, একথা আমরা বলতে পারি, সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর নারী ও পুরুষের ধর্মব্যাপারে সমানাধিকার ঘোষণা করেছে।

আমার আচার্যদেব অন্ততঃ, তিনি যে-সংঘভুক্ত সেই সংঘকে নারী ও সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য চিরদিনের দায়বদ্ধ মনে করতেন। খেতড়ির রাজাকে ফনোগ্রামে নিজ বাণী পাঠাবার কালে এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কণ্ঠে স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যে যখনই তাঁর মনে হয়েছে মৃত্যু হয়তো সন্নিকট, তখনই শিষ্যদের কাছে ডেকে বলেছেন—'মনে রেখো—ঐ কথাটি—নারী ও জনগণ!'

শাস্ত্রে চিত্তৈকাগ্রতার সর্বোচ্চ প্রকাশ বলে যাকে নির্দেশ করা হয়েছে, তার অজস্র অভিব্যক্তির রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর বাসকালে বছরের পর বছর ধরে শিষ্যগণ দেখেছিলেন। তাঁর চেতনা এতই উদ্দীপ্ত-উন্মুখ ছিল যে, তিনি এগিয়ে গিয়ে দ্বারদেশে বিনা জিজ্ঞাসায় শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন—যে-প্রশ্নগুলি শিষ্যদের পকেটে লেখা থাকত। এতই সূক্ষ্ম ছিল তাঁর অনুভূতি যে, স্পর্শমাত্র তিনি কিরূপ চরিত্রের লোকের দ্বারা তাঁর খাদ্য, বস্ত্র বা বিছানা স্পৃষ্ট হয়েছে, তা বলে দিতে পারতেন। কখনো হয়ত কলুষিত স্পর্শে তাঁর শরীর সংকুচিত হয়ে গেল যন্ত্রণায়, তা 'পুড়িয়ে দিল' তাঁকে। অন্যসময়ে তিনি হয়ত বললেন, 'এই দেশ—এসব জিনিস খেতে পারি কারণ যে-পাঠিয়েছে সে ভাল লোক।' তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ ভাবসংস্কার এতই দৃঢ় ছিল যে, নিদ্রাতেও ধাতুস্পর্শে শিউরে উঠতেন; কিংবা জাগ্রত অবস্থায় ফলমূল বা বইপত্র যদি মালিককে ফিরিয়ে দেবেন বলে থাকেন, পরে তা ভুলে গেলে নিদ্রার মধ্যেও উঠে পড়তেন সেই জিনিস ফেরৎ দিয়ে আসার জন্য।

জগতের ঋষি-পদবীভুক্ত মহাপুরুষদের কারো বিষয়ে কোনো ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদই বলবেন না যে, তিনি দেবতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন; তাঁরা শুধু বলবেন—তিনি এমন একটি মানসিক অবস্থায় উপনীত হতে পারতেন যেখানে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হত যে তিনি দেবতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন (অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিকেরা যাকে স্ব-সংবেদ্য ব্যাপার বলে থাকেন)। এই অবস্থায় অজস্র দৃষ্টান্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা এখনো বলেন, কী অদ্ভুত অনুভূতি হত যখন তাঁরা কথোপকথনের এক দিকের কথনই শুনে যেতেন, যা হয়ত চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁদের গুরুদেব সেইকালে অন্য সকলের কাছে অদৃশ্য দেবদেবী-গণের সঙ্গে সংযোগরক্ষা করে চলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে অজস্র দর্শনাদি সকলকে এক মহাজীবনে গ্রথিত করে তুলেছিল—এর পিছনে ছিল মানবজাতিকে সেবা করার তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ তাঁর বিষয়ে বলেছেন : অন্ধকারে যন্ত্রণায় মাটিতে মুখ ঘষতে ঘষতে তিনি প্রার্থনা করতেন—আবার যেন পৃথিবীতে আসতে পারি, কুকুরজন্ম নিয়েও, যদি তাতে একটি জীবেরও উপকার হয়। অন্য সময়ে, যখন তাঁর পক্ষে নিজের মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব হত, তখন শিষ্যদের উচ্চতর উপলব্ধির প্রলোভনের কথা বলতেন, যা সেবা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর সঙ্গে তাঁর শিষ্যগণ যুক্ত করে দিতেন গভীর সমাধিভঙ্গের পরে জগন্মাতার সঙ্গে গুরুদেবের আবদার অভিমানের কথাগুলিকে : তোর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে খেলা করব; আর একটিমাত্র সেবার কাজ করব—মাত্র একটি, তার বেশী নয়; ছোটখাট জিনিস একটু ভোগের ইচ্ছে—যাতে মনটা নেমে থাকে ইত্যাদি। সমাধি থেকে এই 'নেমে আসার' সময়ে তাঁর সঙ্গে আসত ঈশ্বর-নিমজ্জিতের অনন্ত প্রেম ও অন্তর্দৃষ্টি। হারভার্ড বক্তৃতাকালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন মৃগী রোগের বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার সঙ্গে সমাধির বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার পার্থক্য নির্দেশ করছিলেন, তখন তাঁর উক্তির প্রতিটি বর্ণে যে প্রত্যয়ের উচ্চারণ ছিল তা যে স্বীয় আচার্যদেবের সমাধি ও সমাধি থেকে ব্যুত্থানের নিত্য-সাক্ষী হবার অভিজ্ঞতা থেকে জাত, সেকথা সহজেই বলা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর তাঁর চরম আধিপত্য ছিল। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, শেষ অসুখের সময়ে কণ্ঠে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে তিনি সেখান থেকে সমস্ত মন সরিয়ে নিয়ে জায়গাটিকে অসাড় করে দিয়েছিলেন—যে-কাজ অস্ত্রোপচারের পূর্বে ঔষধযোগে করা হয়। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তিও অসাধারণ। দেহগঠনের খুঁটিনাটিও তাঁর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ,—কোনো না কোনোভাবে তা আভ্যন্তর স্বভাবের প্রকাশক। নবাগত শিষ্যকে তিনি যোগ-নিদ্রাভিভূত করে কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মগ্নচৈতন্যের ভিতর থেকে অতীত সংস্কারের কথা জেনে নিতে পারতেন। ছোটখাট কাজ বা কথা, অন্যের কাছে যার কোনো মূল্যই নেই হয়ত, সেগুলি তাঁর কাছে মানবচরিত্র-প্রবাহিণীর গতিনির্দেশক তৃণখণ্ডের মত বোধ হত। এক এক সময়ে মানুষকে কাঁচের মত স্বচ্ছ দেখতেন—তার স্বভাবের শেষ প্রান্ত অবধি তাঁর দৃষ্টি চলে যেত অবাধে।

সর্বোপরি স্পর্শমাত্রে মানুষের মধ্যে দিব্যজ্ঞানের ঝলক প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন—যা তাদের পরবর্তী জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করত। তাঁর স্পর্শে সমাধিলাভের কথা সকলেরই জানা আছে। দক্ষিণেশ্বরে আগত নারীদের ক্ষেত্রে এ জিনিস বিশেষভাবে ঘটত। এসব ছাড়াও, একটি ঘটনার কথা জনৈক সরল-প্রকৃতির মানুষ আমাকে বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের মাত্র কয়েক সপ্তাহ

পূর্বে যা ঘটেছিল। কাশীপুরের বাগানবাটীতে তিনি একদিন রোগশয্যা থেকে নেমে আসেন; সেখানে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মাথায় হাত দিয়ে কয়েক ক্ষেত্রে বলেন, 'আজ থাক!' আবার কখনো—'চৈতন্য হোক!' এই ঘটনার পরে আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রত্যেকের জীবনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটে। অনন্ত বেদনার জাগরণ হয় একজনের ক্ষেত্রে; সবকিছুই প্রতীকতুল্য ও ভাবসংকেতপূর্ণ বলে মনে হতে থাকে অন্য একজনের ক্ষেত্রে; তৃতীয় ব্যক্তির কাছে সবই অপার আনন্দ—উপ্‌চে-ওঠা আনন্দ-ধারা। এঁদের একজন এক মহাজ্যোতি দেখেছিলেন, যা পরবর্তী জীবনে কখনো তাঁকে ত্যাগ করেনি, যেখানে যেতেন সেখানেই সাথী হয়ে থাকত তা; ফলে যখনই কোনো মন্দির বা পথিপার্শ্বের পূজাগৃহ দেখতেন, তখন তার অভ্যন্তরে জ্যোতির্মণ্ডলবর্তী এক মূর্তি দেখতেনই—সে মূর্তি তাঁর তাৎকালিক সুখ বা দুঃখের অনুভূতি অনুযায়ী কখনো সহাস্য, কখনো বিষণ্ণ। ঐ মূর্তিকে তিনি বিগ্রহাধিষ্ঠাতা চৈতন্যরূপে জানতেন ও বলতেন।

মানুষকে তার সামর্থ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠভাবে জাগরিত করে, কিংবা তার পক্ষে এককালে যতখানি অনুভূতি ধারণ করা সম্ভবপর তাই দান করে শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর ন্যায়পরতা এবং দৃঢ় বিচারবোধের মানদণ্ড স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যগণও এই বিচারের ধারা অনুসরণ করে গেছেন। শিষ্যদের অন্যতম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলেন—'বিনা বিচারে আমরা কোনো কিছুই বিশ্বাস করি না; আমাদের সেইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।' ঠিক কিভাবে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, সে-বিষয়ে প্রশ্ন করায় অন্য আর এক শিষ্য গভীর চিন্তার পরে বলেছিলেন—'নিত্যবস্তু সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ঘটিয়ে দিতেন, তার থেকে যে-জ্ঞানোদয় হত, তা কখনো প্রতারিত হবার নয়।' স্বামীজী তাঁর গোড়ার দিককার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—'আমাদের নিজ চেষ্টায় কিংবা কোনো পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিরাট ব্যক্তির কৃপায় আমরা নিত্যবস্তুর ধারণালাভ করি।'

এই গুরুর জীবন ছিল শিষ্যের করায়ত্ত সম্পদ। মানবীয় বৃত্তিসমূহের কতদূর ব্যাপ্তি সম্ভবপর তা শিষ্য গুরুর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিলেন; গুরুর মারফৎ নিজেও লাভ করেছিলেন। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবিলম্বে বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন বলে স্বামীজীর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পরে জ্ঞানকে 'মগ্নচৈতন্যভূমি' (subconscious), 'চৈতন্যভূমি' (conscious) এবং 'অতিচৈতন্যভূমি' (superconscious) —এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা সহজেই সম্ভব হয়েছিল। প্রথম দুটি শব্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রচলিত; তৃতীয় শব্দটি অসাধারণ প্রাতিভ অন্তর্দৃষ্টিবলে, নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রামাণ্যে তিনি মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে যোগ করে দেন। 'মগ্নচৈন্য ও অতিচৈতন্য—এই দুই সমুদ্রের মধ্যে ব্যক্ত-চৈতন্য পাতলা পর্দার ব্যবধান মাত্র'—তিনি বলেছিলেন। আর একবার তিনি বিস্ময়-প্রখর কণ্ঠে বলে ওঠেন: 'ব্যক্ত-চৈতন্য! পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা যখন অবিরত ব্যক্ত-চেতনার কথা বলে, আমি নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। ব্যক্ত-চেতনার কী মূল্য! মগ্নচৈতন্যের সীমাহীন নিম্নরাজ্য—এবং অতি-চৈতন্যের অত্যুচ্চ ঊর্ধ্বলোকের তুলনায় ব্যক্ত-চেতনার পরিধি অতি সামান্য! এসব ব্যাপারে আমি বিভ্রান্ত হতে পারি না কখনোই, কারণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি

রামকৃষ্ণ পরমহংসে দশ মিনিটের মধ্যে মানুষের মগ্ন-চৈতন্য থেকে তার সমগ্র অতীতের কথা জেনে নিয়ে তার ভিতরের শক্তি এবং ভবিষ্যতের আকার নির্ণয় করে দিতেন।

রাজযোগ গ্রন্থে স্বামীজী যে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে নির্দেশ করেছিলেন, 'প্রকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কখনোই যুক্তিবিরোধী নয়,'—এর পিছনেও অবশ্যই তাঁর একই ধরনের ব্যাপক ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণেশ্বরের সাধক অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন সত্য, কিন্তু যেসব জিনিসের সত্যনির্ণয় সাধারণ উপায়েই করা যেতে পারে, সেখানে অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার মত বৃথা অভিমান তাঁর ছিল না। একদা যখন এক অদ্ভুত সাধু দক্ষিণেশ্বরে এসে বলেন, তিনি বিনা আহারে বেঁচে থাকতে পারেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য কোনো অলৌকিক উপায় নেন নি, শুধু সাধুর পিছনে কয়েকটি চতুর চর লাগিয়ে বলে দেন—ঐ ব্যক্তি কখন কোথায় কিভাবে খায়, তার খবর যেন তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয়।

পরীক্ষা না করে কোনো জিনিসকেই স্বামীজী মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং সাধারণ লোকে স্বপ্ন, ভাবী ঘটনার পূর্বজ্ঞান, ভবিষ্যৎবাণী প্রভৃতির দ্বারা অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, সে সব বিষয়ে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর গভীর আতঙ্ক ছিল। অনিবার্যভাবে এসব জিনিস তাঁর কাছে প্রচুর হাজির হত, আর তিনি সেগুলিকে নির্ঘাত অগ্রাহ্য করে বলতেন—ওসব যদি সত্য হয় তো হবেই, তাঁর মানা, না-মানায় কিছু এসে যায় না। তাঁর বক্তব্য; কোনো বিশেষ একটি ভাগ্যগণনা পরে সত্য হবে কি না হবে তা বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তিনি একটি জিনিস বলতে পারেন—যদি একবার ও-গুলিকে মান্য করেন তাহলে কোনোদিন মুক্ত হতে পারবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অলৌকিক দর্শনাদি সদাসর্বদা পারমার্থিক বিষয়েই ঘটত। বেদেদের মত হাত গণনার কাজ তাঁর নয়। তাঁর শিষ্যগণের মতে, এই ধরনের ভবিষ্যৎ-বলার চেষ্টা শক্তির কম-বেশী অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়।—'এ সবই অবান্তর ব্যাপার; আসল যোগের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই'—স্বামীজী বলেছিলেন—'এসব ক্ষমতার যদি কিছু সার্থকতা থাকে তা হল, এর দ্বারা আমাদের বক্তব্যের সত্যতা পরোক্ষভাবে কিছু প্রমাণিত হয়; স্থূলে বস্তুসত্যের বাইরে আরও কিছু আছে তার ক্ষণিক আভাস হয়ত এসবের দ্বারা পাওয়া যায়, কিন্তু যারা এদের মধ্যে ডুবে থাকে তারা দারুণ বিপদকে ডেকে আনে।'—'এসব সীমান্ত-সমস্যা'—তিনি অধীর চীৎকারে অন্যত্র বলেছিলেন—'আমি কি বলিনি যে, সীমান্তরেখা সদাই পরিবর্তনশীল। ওসবের দ্বারা কখনই নিশ্চিত ও স্থায়ী জ্ঞানরাজ্যের অভ্যন্তরে পৌঁছান যায় না।

আর একটি ঘটনা স্বামীজী কখনই ভুলতে পারেন নি—রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরের সপ্তাহে তাঁর চকিতে দর্শনলাভ। কাশীপুর-বাটীর বাইরে বসে যে-বিষয়ে তাঁদের মনপ্রাণ পূর্ণ—কয়েকদিন আগে গুরুদেবের সেই মহাপ্রয়াণের বিষয় নিয়ে তিনি ও তাঁর একজন গুরুভাই রাত্রে কথা বলছিলেন,—সহসা স্বামীজী দেখলেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বাগানে প্রবেশ করে তাঁদের দিকে আসছেন। কয়েক মিনিট পরে

বন্ধুর অবরুদ্ধ গোঙানি—'ও কে—! ও কে—!' দুই ব্যক্তি একই সংগে একই ছায়ামূর্তি দেখেছে—এ তেমনই এক বিরল ক্ষেত্র।

এই ধরনের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্য দিয়ে যিনি গেছেন, তাঁর মনে কতকগুলি বিশ্বাস না জেগে পারে না। থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক থেকে ১৮৯৫-এর অগস্টে স্বামীজী তাঁর বিশ্বাসের কথা এক পত্রে লেখেন: 'বয়স যত বাড়ছে, ততই হিন্দুদের ধারণার সত্যতা অনুভব করছি—মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। পরলোক-বাসিগণই তথাকথিত উচ্চতর জীব—কিন্তু তাঁরা অন্য রূপধারী মানুষ ছাড়া কিছু নন। তাঁদের সূক্ষ্মতর দেহ, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা হস্তপদাদিসমেত মানবদেহ। তাঁরা এই পৃথিবীতেই, তবে অন্য আকাশে, বাস করেন, এবং তাঁরা সম্পূর্ণ অদৃশ্যও নন। আমার বিশ্বাস, তাঁদের চেতনা প্রভৃতি সবকিছু আছে—আমাদেরই মত। তাঁরা মানুষই। দেবতারাও তাই। কিন্তু মানুষই কেবল ঈশ্বর হতে পারে, তাই ঈশ্বর হবার জন্য দেবতাদের মানুষ হতে হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রথম দর্শনেই বালক নরেনকে 'আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে চিনেছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার যেমন নদীস্রোতের গতিবেগ নির্ণয় করেন, তেমনিভাবে তিনি বালকের তৎকালীন মানসিক উচ্চাবস্থাও নির্ণয় করেছিলেন। বৃথা সাগ্রহে শুধিয়েছিলেন, 'বল দিকি শোয়ার সময়ে তোমার জ্যোতির্দর্শন হয় নাকি?' 'কেন, সকলেরই তো হয় না?'—বালক সবিস্ময়ে প্রতিপ্রশ্ন করেছিল। পরবর্তীকালে এই বিষয়টি তিনি প্রায়ই উল্লেখ করতেন আমাদের কাছে এবং কি ধরনের জ্যোতি দেখতেন তার বর্ণনা করতেন। কখনো তা বলের আকার, এক বালক সেটা পায়ে মেরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাঁর দিকে; সেটা ছুটে এসে তাঁর মধ্যে ঢুকে যেত, তারপরে আর কিছু মনে থাকত না। কখনো তা অগ্নিরাশি—যার ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে যেতেন। তাঁর এই যে নিদ্রা—একি সত্যই সাধারণতঃ যাকে নিদ্রা বলা হয়—তাই?—সবিস্ময়ে আমাদের ভাবতে হয়। যাই হোক, বিবেকানন্দের বয়ঃকনিষ্ঠরা বলেন, তিনি নিদ্রাগত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের রূপ লক্ষ্য করে প্রায়ই অন্যদের ডেকে বলতেন, বাইরে ঘুমের মত মনে হলেও তা আসলে ধ্যান,—এবং ধ্যানের কোন্ অবস্থায় তিনি আছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে পীড়িত অবস্থায় আছেন, সেই সময়ে একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে শুয়ে আছেন; বাইরে থেকে মনে হয়েছিল নরেন্দ্র বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘুমোচ্ছেন, এমন সময়ে প্রায় মধ্যরাত্রিতে তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—'আমার শরীর গেল কোথায়?' গোপালদাদা ছুটে এলেন; তারপর গা-হাত-পা টিপে নানাভাবে যে-দেহসংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সফল হলেন না; বালকের যন্ত্রণা ও আতঙ্ক যখন কিছুতে প্রশমিত হল না, তখন গোপালদাদা গুরুদেবের কাছে ছুটে গিয়ে নরেন্দ্রের অবস্থার কথা জানালেন; গুরু সেকথা শুনে হেসে বললেন, 'বেশ হয়েছে। ঐ অবস্থায় থাক, কোনো ক্ষতি নেই। আমাকে চেয়ে চেয়ে বড় জ্বালাচ্ছিল।' পরে তিনি অন্যদের বলেন, 'নরেনের নির্বিকল্প সমাধির ব্যাপার এখন চুকে গেছে, এরপর সে কাজ করবে।' স্বামীজী স্বয়ং গুরুভাই সারদানন্দের কাছে এই নির্বিকল্প সমাধির প্রথমাবস্থা বর্ণনা করেছিলেন

—মাথার মধ্যে একটা আলো জ্বলে উঠেছিল; তা এতই তীব্র যে, তাঁর মনে হয়েছিল কে যেন সত্যি সত্যি একটা দারুণ জোরালো আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে মাথার পিছনে। তারপর, আমরা ধরেই নিতে পারি, বাইরের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং স্বামীজী এমন এক জগতে পৌঁছান যা অবাঙ্‌মনসোগোচরম্।......

আমার আচার্যদেবের মত উচ্চাধিকারীর ক্ষেত্রে দেহবোধের উপরে ওঠাই ভাবোন্নতির একমাত্র লক্ষণ নয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, নিত্যশক্তির চরম বিকাশের জন্য প্রথমে অতি তীব্র অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার পরে তাকে সম্পূর্ণ সংযত রাখার প্রয়োজন হয়। এই জিনিসটি এমন এক অভিজ্ঞতা পরম্পরার কথা বলে, যা আমাদের অধিকাংশের কল্পনাবহির্ভূত; তবে শিষ্য নরেনের জীবনের একটি ঘটনা ঐ ব্যাপারটির কিঞ্চিৎ আভাস আমাদের দেয়। তখনো নরেন্দ্র অল্পবয়সী যুবকমাত্র; এমন সময়ে সহসা পিতার মৃত্যুতে পরিবারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটল। জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে দিনের পর দিন পরিবারের অন্নের চিন্তায় তাঁকে অস্থির হতে হয়েছে; প্রিয়জনদের কষ্টে তাঁর হৃদয়তন্ত্রী যেন ছিঁড়ে গেছে—ঐশ্বর্য থেকে চরম দারিদ্র্যে পতন বিভ্রান্ত করেছে তাঁকে। সর্বনাশের পরিমাণ যেন তাঁর ধারণাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মর্মবেদনা সহ্যাতীত হওয়ায় একদিন গুরুদেবের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করতে লাগলেন। বৃদ্ধ শান্তভাবে তাঁর কথা শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'যাও বাবা যাও, মন্দিরে মায়ের কাছে প্রার্থনা কর গিয়ে; তুমি যাই চাওনা কেন, সবই তিনি তোমাকে দেবেন।'

বাইরের দিক থেকে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে দারুণ কিছু বাড়াবাড়ি ছিল না। কারণ তাঁর অনেক ধনী মাড়োয়ারী ভক্ত ছিল, যারা তাঁর কথায় যে-কোনো খরচ করতে প্রস্তুত ছিল। বালক তাঁর প্রশান্তি ও প্রতিশ্রুতিতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে তাঁর নির্দেশমত কালীপ্রতিমার কাছে প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেলেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেন, কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরলেন তখন তাঁর বিহ্বল আকার এবং যেন চেষ্টা করে কথা বলতে হচ্ছে তাঁকে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধোলেন—'প্রার্থনা করেছিলি?'

'হাঁ'—শিষ্য উত্তর দিলেন।

'মার কাছে কি চাইলি?'

'সর্বোচ্চ জ্ঞান-ও ভক্তি,'—নরেন্দ্রের উত্তর।

'আবার যাও',—শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষেপে বললেন।

নরেন্দ্র আবার গেলেন। কিন্তু ঘটনা পূর্ববৎ। তিনবার যথেচ্ছ প্রার্থনা করবার জন্য প্রেরিত হলেন, তিনবারই একই কথা বলে চলে এলেন। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে সব ভুল হয়ে গেল। কিসের জন্য এসেছেন, তা কিছুতে মনে পড়ল না। আমাদের মধ্যে কেউ কি ঐ উচ্চ অবস্থায় উঠতে পেরেছি, যেখানে আমাদের প্রিয়তমের জন্য প্রার্থনার সময়ে আমাদের অহং সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়? যদি সে অবস্থায় পৌঁছে থাকি, তবেই এই সাধারণ ভেদবৈচিত্র্যময়, আপেক্ষিক জগতের সঙ্গে ঐ অনুভূতির অনন্ত দূরবর্তিতা কিছু পরিমাণে আভাসে উপলব্ধি করতে পারব।......

কাজ শেষ হলেই নির্বিকল্প সমাধির আমটি আবার খেতে পাবে—নরেন সম্বন্ধে

গুরুদেবের এই ভবিষ্যৎবাণী নরেন্দ্রের বাল্যসঙ্গীরা কখনোই ভুলে যাননি। কখন সেই কাজ-শেষের ক্ষণটি আসবে কেউই ঠিকভাবে জানত না, যদিও চরম অনুভূতির দিকে অগ্রগতি কেউ কেউ কিছুটা হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন। শেষ বছরে কয়েকজন বাল্যসঙ্গী একদিন অতীত দিনের পর্যালোচনা করছিলেন, 'নরেন যেদিন জানবে সে কে এবং কী, তখনই আর শরীর রাখবে না'—এই ভবিষ্যৎবাণীও উল্লিখিত হয়েছিল; এমন সময়ে একজন কিছুটা হাস্যচ্ছলে স্বামীজীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে ছিলে, এখন কি জানতে পেরেছ?' তখনই সহসা অপ্রত্যাশিত উত্তর, 'হাঁ, এখন জেনেছি'—স্তব্ধ করে দিল সকলকে, নিবিড় গাম্ভীর্যে, আর প্রশ্ন করতে সাহস রইল না কারো।

শেষের দিন যতই ঘনাতে লাগল—অধিকাংশ সময় ছেয়ে রইল ধ্যানে ও তপস্যায়। যে-সব জিনিস অতিশয় প্রিয় ছিল, তাদের বিষয়ে উদাসীন হয়ে গেল মন। চরম অনুভূতির শেষ পর্ব এল যখন, তখন ঐ বিরাট অতীন্দ্রিয়শক্তির দু' একটি কিরণ-রেখা নিকট ও দূরের অনেক প্রিয়জনকে স্পর্শ করে গেল। একজন স্বপ্ন দেখলেন —শ্রীরামকৃষ্ণ আবার সেইরাত্রে দেহত্যাগ করেছেন—প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে শুনলেন সংবাদ নিয়ে এসেছে দ্বারে সংবাদদাতা। অন্যজন, বাল্যের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, 'দর্শন' পেলেন : বিস্ময়োল্লাসে তিনি বলে গেলেন—'শশী! শশী!* শরীরটাকে থু থু করে ফেলে দিয়েছি।' আর একজনকে সন্ধ্যায় কে যেন জোর করে মন্দিরে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে তাঁর আত্মা যেন অসীম জ্যোতির সম্মুখীন হয়েছিল, লুটিয়ে পড়েছিল তার সামনে—'শিব গুরু! শিব গুরু!'

[*The Master* থেকে এই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ অনুবাদ করার সময়ে উক্ত গ্রন্থের স্বামী মাধবানন্দকৃত বঙ্গানুবাদ 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' —কে সহায়করূপে গ্রহণ করেছি।]

---

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ডাক নাম।

শ্রীমা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী এবং তাঁর প্রধান শিষ্যা সারদাদেবীর জীবনকথা মোটামুটি পরিচিত বলে সে সম্বন্ধে অধিক তথ্য দেবার দরকার নেই। লোকলোচনের সামনে আসতে সারদাদেবী কখনই চাননি, রক্ষণশীল হিন্দু রমণীর মতই জীবন কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের পক্ষে তাঁকে 'জননী' ও 'বিশ্বজননী' না বলে উপায় থাকেনি। মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাই 'সম্ভবতঃ' প্রথম ইউরোপীয় মনুষ্য যাঁদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন।[১] কিন্তু প্রাচীন সংস্কারে লালিত এই নারী প্রথম সাক্ষাতেই যে অসাধারণ উদারতা ও চরিত্রমহিমা দেখিয়েছিলেন, তা নিত্য স্মরণীয়। ওলি বুল, ম্যাকলাউড বা নিবেদিতা সারদাদেবীর চরিত্রে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা তাঁদের বিবেকানন্দ-ভক্তির জন্য নয়—সারদাদেবীর বিচ্ছুরিত চারিত্রশক্তির জন্যই। এখানে মনে রাখতে হবে, এই তিনজন বিদেশী মহিলার প্রত্যেকেই অতি বিদগ্ধ, শিক্ষিত, এবং ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অগ্রণী বহু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।[২] এঁদের দুজন আবার আমেরিকার অভিজাতমণ্ডলীভুক্তা। সারদাদেবীর সাক্ষাৎ-দর্শনের পরে মিসেস বুল তাঁর অভিজ্ঞতার কিছু কথা অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লৌকিকভাবে সারদাদেবীকে পত্নীভাবে গ্রহণ না করায় ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ যখন সারদাদেবীর কষ্ট কল্পনায় বেদনার্ত, তখন ম্যাক্সমুলার এই অহেতুক সমবেদনার যোগ্য সান্ত্বনারূপে মিসেস বুলের পত্রটিকে উপস্থিত করেছিলেন। মিসেস ওলি বুল ১৮৯৮-এর ১১ জুলাই, শ্রীনগর থেকে ম্যাক্সমুলারকে লেখেন :

> "আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদাদেবীকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছি। তিনি 'আমার মেয়েরা' বলে আমাদের গ্রহণ করলেন। বললেন যে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। আমাদের একেবারেই অপরিচিতভাবে দেখলেন না। গুরুর কাছে আনুগত্য বলতে কি বোঝায়, একথা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল,—তাঁর ক্ষেত্রে আবার নিজ স্বামীই গুরু—তিনি জানালেন : কাউকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক বিষয়ে নিজের সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কাজ করলেই—সে কাজ যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরুর অননুমোদিত হয় তবুও—গুরুকে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।

---

১ এই তিনজনের ভারতে আসার বছরখানেক আগেই মিস মুলার ও মিসেস সেভিয়ার স্বামীজীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। তাঁরা সারদাদেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। সম্ভবতঃ পাননি।

২ মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের বিস্তৃত পরিচয় এই খণ্ডের অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

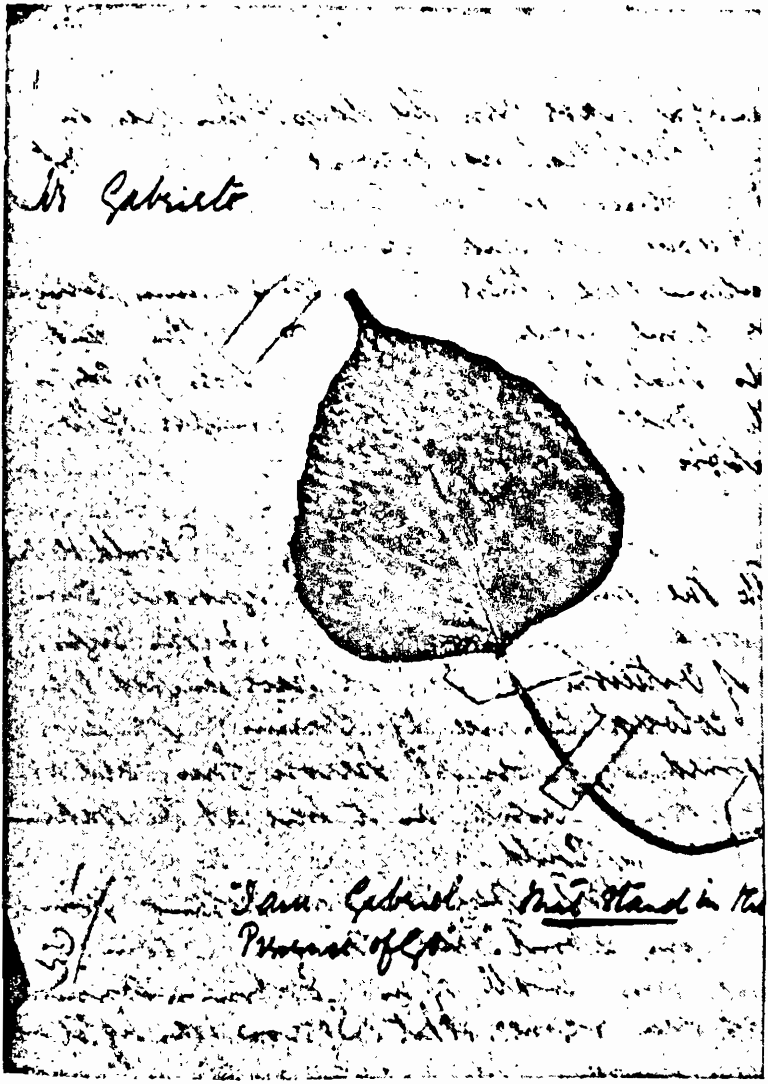


শ্রীমা সারদাদেবী ও নিবেদিতা। ছবিটির বিষয়ে তথ্যের জন্য গ্রন্থের ১৮০-৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য





উপরে বামদিকে (কাশ্মীরে) : মিস ম্যাকলাউড, মিসেস ওলি বুল, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা। নীচে : কাশ্মীরে স্বামীজীর হাউসবোট।



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত নিবেদিতার 'নোটস্ অব সাম ওয়ান্ডারিঙস্ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ের পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবনা -পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এতে অশ্বত্থ পাতার যে-ছবি দেখা যাচ্ছে, তা আঁকা পাতার ছবি নয়, নিবেদিতা সত্যিই একটি অশ্বত্থ পাতা

[পরপৃষ্ঠায়]

ওখানে লাগিয়ে রেখেছিলেন। ঐ পাতাটি নিশ্চয় কোনো বিশেষ স্মৃতিবাহী, সম্ভবত স্বামীজীর সঙ্গে ভারতভ্রমণকালে সংগৃহীত। চিত্রের উপরে লেখা আছে "De Gabriete"; তলায় লেখা—"I am Gabriel *that stand* in the Presence of God."
এটি বাইবেলের নিম্নোক্ত কথার সূত্রে লিখিত—

"And the angel answering said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew these glad tidings".

নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে ১৯ জুলাই, ১৮৯৯-র চিঠিতে জানিয়েছিলেন, স্বামীজীকে তিনি 'গ্যাব্রিয়েল' মনে করেছেন, যিনি ঈশ্বরসান্নিধ্যে নিত্য অবস্থিত। গ্যাব্রিয়েল যেভাবে ঈশ্বরের বার্তা জ্যাকেরিয়াস, মেরী প্রভৃতির কাছে ঘোষণা করেছিলেন, স্বামীজীও সেইভাবে ঈশ্বর-বার্তা নিবেদিতাদির কাছে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন,

"I have called it (the Diary) "De Gabriete"—"of Gabriel"—referring to—"I Gabriel *that stand* (even now, as someone writes, while I speak) in the Presence of God".

Gabriel would seem to me a beautiful name for our Master—the Angel of strength and vision who brings to Humanity the grand white lilies of Purity".

(গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)



শ্রীমা সারদাদেবী



লক্ষ্মীমণি দেবী
(লক্ষ্মী দি)



JOGIN MA

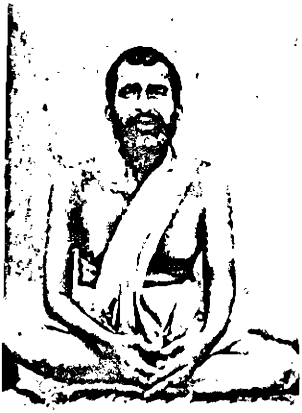
যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস
(যোগীন মা)



গোলাপসুন্দরী দেবী
(গোলাপ মা)



গোপালের মা-র পাদতলে নিবেদিতা



শ্রীরামকৃষ্ণ



স্বামী ব্রহ্মানন্দ



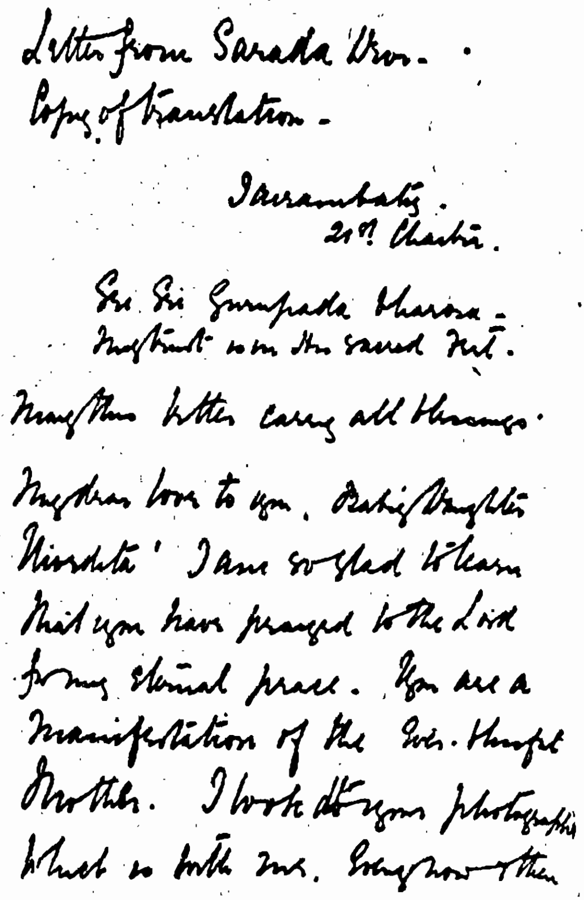
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ



স্বামী সারদানন্দ



স্বামী স্বরূপানন্দ


Letter from Sarada Devi.
Copy of translation.

Jairambati.
21st Chaitra.

Sri Sri Gurupada bharosa.
My trust is in the sacred feet.

May this letter carry all blessings.

My dear love to you, Baby Daughter Nivedita! I am so glad to learn that you have prayed to the Lord for my eternal peace. You are a manifestation of the Ever-blissful Mother. I look at your photographs which is with me, every now & then

Letter from Sarada Devi—
Copy of translation—

Jairambati
21st Chaitra.

Sri Sri *Gurupada bharosa.*
My trust is in His sacred feet.

May this letter carry all blessings. My dear love to you, baby daughter Nivedita! I am so glad to learn that you have prayed to the Lord for my eternal peace. You are manifestation of the ever blissful Mother. I look at your photograph which is with me, every now and then. . . .

নিবেদিতাকে সারদাদেবী একটি চিঠি লেখেন, যার ইংরাজী অনুবাদ করে (সম্ভবতঃ মূলে বাংলা চিঠিসমেত) স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতার কাছে পাঠিয়ে দেন। শ্রীমার কাছ থেকে চিঠি পাবার সৌভাগ্যে নিবেদিতা এতই উল্লসিত হয়েছিলেন যে, ঐ চিঠির নকল করে অন্তরঙ্গমহলে পাঠিয়ে দেন। তারই এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত হল।—২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১১ নভেম্বর, ১৮৯৯-এর এই চিঠি থেকে দেখা যায়, স্বামীজী কিভাবে নিবেদিতা ও মিসেস ওলি বুলের উপর তাঁর দায়ভার অর্পণ করেছেন। এই পত্র দেখিয়ে দেয়, নিবেদিতা, স্বামীজীর সাধারণ একজন শিষ্যা নন, কর্মভার বহনের মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত শিষ্যা।—গ্রন্থের ৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[On Sunday afternoon Swami insisted on my coming and packing] with him, and as I worked he took out a couple of silk turbans to give the girls. Then two pieces of cotton cloth—gerrua colour—for Mrs. Bull. He called me to my room, where Mrs. Bull sat writing, to give these, and left the *turbans on one side.*

First he shut the door—then he arranged the cloth as a skirt and chudder round her waist—then he called her a sannyasini and putting one hand on her head and one on mine he said: "I give you *all* that Ramakrishna P. gave to me. What came to us from a woman I give to you two women. Do what you can with it. I cannot trust myself. I do not know what I might do tomorrow and ruin the work. Women's hands will be the best anyway to hold what came from a woman—from Mother. Who and what She is, I do not know, I have never seen Her, but Ramakrishna P. saw Her and touched Her, like this (touching my sleeve). She may be a great disembodied spirit for all I know. Anyway I cast the load on you. I am going away to be at peace. I felt nearly mad this morning, and I was thinking and thinking what I could do, when I went to my room to sleep before lunch. And then I thought of this and I am so glad. It is like a release. I have borne it all this time, and now I have given it up. . . . . .

Were these exactly the words he used? I think they were. It seems to me *that it must have been about 3 O'clock or shortly after, for* I think it was daylight still, and then I went back with him to the packing and long long after, as it seems now, he seemed surprised when I told him to go downstairs to the fire—I could do the rest of the work alone—and went like a relieved child. Just before he called me to "the Robing" he had said: "Oh! I feel so gay!"

[We both thought of you at that moment Darling—and I for one was glad that you were away—for your life is his personality—and you are still to be the good star which could not be if you were entangled in all that has been so hard on him.]

And so Yum—happened "the event of my life"—the great turning point—and the dear St. Sara's.

Next morning he came over to Ridgely and Mrs. Leggette managed to throw Mrs. R. Smith with him, knowing that [she was hungry for a word. It seems that she asked him what his message was. And he answered: "I have no message. I used to think I had, but now I know that I have nothing for the world. Only for myself, I must break this dream". It sounds so *limp and forceless, when I repeat it!* And *it* was so *great and stern* as he told us of it.]

[এই বিষয়বস্তুর প্রতিলিপি পরের পৃষ্ঠায়—]

with him. & as I worked he took out a length of silk turban to give the girls. Then two pieces of cotton cloth – Gerua color – for Mrs Bull. He called me to dining room, where Mrs Bull sat writing to give these. & kept the kitten to one side.

First he shut the door. then he arranged the cloth as a skirt & shoulder round her waist. Then he called her a Sannyasini. Putting one hand on her head & one on mine he said "I give you all that Ramakrishna P. Gave to me. What came to me from a woman I give to you two women. Do what you can with it. I cannot trust myself. I do not know what I might do tomorrow & ruin the work. Woman's hands will be the best anyway. Behold what came from a woman – from Mother. Who & what She is, I do not know. I have never seen Her. but Ramakrishna saw Her & touched Her – like this (touching my dress). She may be a great disembodied Spirit for all I know. Anyway I cast the load on you – I am going away to be at peace.

I felt nearly mad this morning, & was thinking & thinking what I could do. When I went to my room to sleep before lunch – And then thought of this.

& I was so glad. It is like a dream. I have borne it all this time - then I have given it up. . . . . .

Were these exactly the words he used? I think they were. It seems to me that it must have been about 3 o'clock in the afternoon - for I think it was daylight still. & then I went back with him & the parting came long after and it seems now that he seemed surprised to see I told him to go down into the fire - I could see the rest of the world alone.? Just like a tired child - and after he called me to "the Rotary" he had said "Oh I feel so gay!" -

[We both thought of you at that moment Darling - & for me I was glad that you were away - for your life is his personally. & you are still like the good star. which could not be if you were entangled in all that has been so hard to him.]

And so Agnes - happened the event of my life - the great turning-point. And the dear St. Sarai.

That morning he came over to Ridge & Violet with managed to throw Miss R Smith with him - knowing that

স্বামীজীর 'বিশ্বস্ত' জে জে গুডউইনের একটি চিঠির দুই পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা গোটা চিঠিটি এইসঙ্গে মুদ্রিত করা হল। প্রতিলিপি থেকে পাঠক দেখবেন—স্বামীজীকে গুডউইন কী চোখে দেখতেন ("স্বামীজী আমার কাছে খ্রীস্টের রূপ নিয়ে বর্তমান")। গুডউইন কেন বিবেকানন্দের সেবায় জীবনদান করেছিলেন, এর থেকেই বোঝা যায়।—গ্রন্থের ২১-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Sharon, Mass
Sunday

Dear Miss McLeod,

I thought perhaps you would like to know that it is decided that I go to England by the Teutonic on Wednesday. Mrs. Bull cannot go. It was hardly possible, but she wants the Swami and Mr. Sturdy to come over here. I don't think I shall be in New York until Wednesday morning, by the [. . . . .] between the Swami and myself, but, at the same time, I should be laid (bow?) down indeed if it were not an inspiration for good to me. Shall I shock you very much if I tell you that the Swami takes the place of Christ to me? I think not, for you will understand what I mean.

If it will be convenient—or rather not too inconvenient—I will call upon you at 9 O'clock on Wednesday morning.

Mrs. Bull wishes me to send her kind regards with my own. She intends to write you herself, I believe.

Very truly yours

J. J. Goodwin.

The enclosed reference to the Swami and *Prof. Deussen is very Good* news—from Deussen.

আর একটি পৃষ্ঠায় লেখা—

This is from a letter from Swami Vivekananda to Fox—"I will be very glad to see you, and am really anxious to see you before you start for U. S. To-morrow Prof. Deussen, myself, Miss Muller and some of her friends are going to have a little picnic at Hampton Court Castle Hotel at 12-30. You are very welcome. There you will meet us all. Deussen and we have become great friends; we travelled together from Germany to London."

[এই বিষয়বস্তুর প্রতিলিপি পরের পৃষ্ঠায়—]

-ation the Swami to myself, but at the same time, it should be lain down indeed if someone not an inspiration for good to me. Shall I shock you very much if I tell you that the Swami takes the place of Christ to me? I think not, for you will understand what I mean.

If it will be convenient — or rather not too call upon you at 9 o'clock on Wednesday morning.

Mrs Bull wishes me to send her kind regards with my own. She intends to write you herself, I believe.

Very truly yours,

J. J. Goodwin.

The enclosed reference to the Swami & Prof Denne — is very good news — for Dennen.

স্বামীজীর শেষ সপ্তাহ সম্বন্ধে নিবেদিতার দিনলিপি

স্বামীজীর দেহত্যাগের পূর্ববর্তী কয়েকটি দিনের বর্ণনা নিবেদিতা তাঁর প্রকাশিত লেখায় নানাভাবে করেছেন দেখতে পাই। গ্রন্থমধ্যে (১০২-১১০ পৃষ্ঠায়) পাঠক দেখবেন, মিস ম্যাকলাউডকে ও মিসেস হ্যামন্ডকে লেখা অনেকগুলি পত্রে নানা সংবাদ দিয়েছেন। ৭ অগস্ট, ১৯০২ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা যে-পত্রে সর্বাধিক সংবাদ আছে, সেটিকে গ্রন্থের ধারাবাহিক বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত না করে পৃথকভাবে এখানে প্রতিলিপিসূত্রে উপস্থিত করলাম, কারণ আমাদের বিশ্বাস, বিবেকানন্দ-জীবনীর পক্ষে পত্রটি বিশেষ মূল্যবান। পত্রমধ্যে লিখিত সংবাদের অনেকগুলি পরবর্তীকালে স্বামীজীর জীবনীর অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে লিখিত বলে এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য সমধিক। পত্রমধ্যে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের চাপা ইঙ্গিত আছে, যা পরে, নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে আমরা ব্যাখ্যা করব।

দু'একটি ক্ষেত্রে আমরা পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইনি।

পত্রমধ্যে 'Caste' এর উপরে একটি পুরস্কার-প্রাপ্তির কথা আছে। এর পশ্চাৎপট হল—যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু যদুনাথ মজুমদার, এম এ, বি এল—যিনি 'হিন্দু পত্রিকা' ও 'ব্রহ্মচারিণে'র সম্পাদকও ছিলেন—'জাতি' সম্বন্ধে একটি সর্বভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। 'জাতি'র পক্ষে এবং বিপক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনি একশত টাকা করে দুটি পুরস্কার দেবেন বলেন। সারা ভারত থেকে বহু ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। বিচারক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 'মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম এ', 'বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এটর্নী-অ্যাট-ল' এবং বাবু যদুনাথ মজুমদার। 'জাতি'র পক্ষে নিবেদিতার প্রবন্ধ সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়, কিন্তু 'জাতি'র বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখে রাজসাহীর 'বাবু রাজেন্দ্রলাল আচার্য, বি এ', পুরস্কার পেলেও তাঁর ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়নি; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত নির্মলানন্দ ভারতীর রচনাকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে তথ্যগুলি Vivekananda in India Newspapers নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। সেখানে এ বিষয়ে আরও কিছু সংবাদ আছে।

How small the questions you ask. Tho' most of them must be already answered in other letters. Still, I cannot tell.

1. To go out in the world is held to be the triumphant way. The same death the whole country has thrilled to it. It was on the Dark Night of Italia too, all men

and the body is not necessarily tarnished, unless He will. He had risen beyond it. Even while in it.

2. I think He certainly knew — but the minute, the hour, the day — Oh I think on Wednesday morning He knew that I would never see Him again. Remember Jesus washed the feet of the disciples & a pained young smile He gave me without a single word, when I told Him it would be 8 or 10 days before I could have the honour & strength for them & the Godfather to meet.

3. He left everything in order. On Sunday he told me that the lawsuit with the family that had been hanging over him for 3 years was compromised by them voluntarily in his favour. He was satisfied at last! It was the same with everything. Here I am in my place. He blessed the house & the wattle-tree. Everything. No loose ends of Karma. No Karma at all. Three wishes. Japan.

oh he suspended the very day he went. "I want to do something for Japan." A wider worship of the Mother. Who was carried out by the river last Saturday. And Mr Watt. Who will surely bring them together somewhere in the universe.

And now let me give you a thing of that last week. First telling you that it is my infinite joy that when my things came [illegible] I sent it straight to him with a little note & I think that was the assurance that I was the same "little Margot" as ever. "Dear little Margot" he called me that Sunday

June 26.
Thursday night late. Reached Calcutta.
Sw. Sarad.? brought me in & gave me a little
meal as a gift from the Math. the large
[illegible] meal from Swamiji (it is a
Institution day ()). "Is He then glad I am
come?" I asked in English. "He is!"
said S.

June 28.
Saturday morning. I was going to the Math
but a note came early, saying he was
coming to town. He came at 4.
Went over the whole house. Explaining
everything. Examined everything.
Sat down on his own rug here.
Pleased with some Lucknow figures
I had brought. Expressed delight
with the microscope & magic lantern

3.

& camera. Told me to bring them
the microscope next day.
Asked me what I planned. I
said University Settlement work
rather than School. He said
"Right." As he went. I said
"Swami you must come back
& bless the work". And he said
"I have always blessing you!"
As the door closed, I said to
[illegible] "all the old sweetness.
But!"

June 29.
Sunday. Went early. reached Math
4 or 4.30. Stayed till [illegible]

things out a good deal. Esp. about
Kiya. He said He loved that
dog! Such greatness & goodness He
had never seen! – That was the
blessing. In the afternoon
He grew very calm, being tired, &
I cried bitterly. Then He gave
me a beautiful blessing, holding
my head, & blessing me twice – in
that caressing way. I only asked
Him to tell me when He doubted
or disapproved, not to make up
His mind apart from me.
Oh I am sure He will!

That day, I think I must have told
you, He said a great change was
coming over Him. Had I not been
there, at near noon He would still
have been in the Chapel. He felt
that Death was drawing near. Sat
those words. The Greeks cried. And
you remember? "That's true" –
But still I never dreamt of the
then 3 or 4 years. He was terribly
interested in experiments on the making
of bread [illegible]
I brought the microscope away.

July 23
Wednesday morning. I went again. The
Boat was ill. I told you about
that.

July 24
Thursday. Swami S. brought me a whole

loking of brown bread that He sent me. & I ate every crumb of it finishing it on Friday evening.

July 4th.

Friday evening. At ½ past 6 or so I cd not resist the longing to go to the roof & be alone. I slept there for an hour. In the roof I fd a corner where, quite invisible I cd always meditate. I planned to do it so much always. & sat down there. for the strange sweetness that [illegible] was irresistible

Then my mind went to Dona Geo... though I had taken another subject.. I know now that that last meditation Samadhi must have held a benediction for me the left. He called me to meditate. Everything about Him did that at the side And He faced the North West as He sat.

And so came the end. He went out. as one drops a worn garment without a struggle. "Conqueror of Wrath" - But He has not left me for my part. He has been

with me far far more since that
night than for a year before.
& I trust & pray that this may not
last tho. For oh Gunn I have
truly one desire really, & that is to
act so that, were He back again
in the toils of human ignorance
He wd have no right to feel
anxiety or distress. But I do not
know. I feel so much power
inside. But I do nothing.
When one thinks He may indeed
be pleased with us all! One
must so live that one justifies Him

5

in singing "A great man has to make
his brothers & then leave them. If he stays
in the same place with them, he
cramps them!"

As for you dear Gunn. I feel
sure that peace will come to
you in the thought that you
have indeed accomplished that
for which you were born. I trust
you will stay with us to bloom &
gather the harvest. for a little
while. But if not, if you go to
Him, one must be ready to give
you up. Only till then that

Now for all the questions you ask, tho' most of them must be already answered in other letters. Still, I cannot tell.

1. To go just as He went is held to be *the* triumphant way—the Sannyasi death. The whole country has thrilled to it. It was on the Dark Night of Kali too, wh. means

that the body is not necessarily resumed unless He will. He had risen beyond it, even while in it.

2. I think He certainly knew, not the minute, the hour, the day—but I think on Wednesday morning He knew that I wd never see Him again. Remember His "JESUS washed the *feet* of *His* disciples!" and a pained sorry smile He gave me without a single word, when I told Him it wd be 8 or 10 days before I cd have the house neat enough for Him and the god father (Ramesh Ch. Dutt) to meet.

3. He left every thing in order. On Sunday He told me that the lawsuit with the family that had been hanging over Him for 3 years, was compromised by them voluntarily in His favour—and He was satisfied at last! It was the same with everything. Here I am, on my feet. He blessed the house and the work and me. Everything. No loose ends of Karma. No Karma at all. Three wishes—Japan,

wh. he expressed the very day He went—"I want to do something for Japan". A night's worship of the Mother—wh. was carried out by the men last Saturday. And Mr. Dutt, wh. will surely bring them together somewhere in the Universe.

And now let me give you a diary of that last week, first telling you that it is my infinite joy that when my prize came for 'Caste', I sent it straight to Him with a little note, and I think that was His assurance that I was the same "little Margot" as ever. "Our little Margot" He called me that Sunday.

June 26.
Thursday night late. Reached Calcutta. Sw. Sarada. brought us in and gave me a little mat as a gift from the Math and a large deerskin mat from Swamiji (it is a meditation. . rug .)! "Is He then glad I am come?" I asked in surprise. "Oh *Yes*!" said S.

June 28.
Saturday morning. I was going to the Math, but a note came early, to say He was coming to Town. He came at 9. Went over the *whole* house explained everything, examined everything. Sat down on His

own rug here, played with some Lucknow figures I had brought. Expressed *delight* with the microscope and magic lantern

and camera and told me to bring Him the microscope next day, asked me what I planned. I said University settlement work rather than school. He said "right", as He went. I said, "Swami, you must come back, and bless the work", and He said "I am *always* blessing you!" As the door closed, I said to Bet, "all the old sweetness Bet!"

June 29.

Sunday. Went early. Reached Math 8 or 8.30, stayed till 5. We talked

things out a good deal, esp, about Nigu (Okakura). *He said He "loved that boy! Such greatness and goodness He had never seen!" That* was the blessing. In the afternoon, He grew very cross, being tired, and I cried bitterly. Then He gave me a beautiful blessing—holding my head and blessing me twice—in that caressing way. I only asked Him to tell *me* when He doubted or disapproved, not to make up His mind apart from me. Oh I am *sure* He will!

That day, I think I must have told you, He said a great tapasya was coming over Him. Had I not been at near room He wd still have been in the Chapel. He felt that Death was drawing near and at these words, the greko cried, don't you remember? "That's true!" But still I never dreamt of less than 3 or 4 years. He was wildly interested in experiments, on the making of bread.

I brought the microscope away.

July 2nd

Wednesday morning. I went again, tho' Bet was ill. I told you about that.

July 3rd

Thursday. Swami Sa. brought me a whole

baking of brown bread that He sent me, and I ate every crumb of it, finishing it on Friday evening.

July 4th

Friday evening. At ½ past 6 or so I cd not resist the longing to go to the roof and be alone. I left Bet for an hour. On the roof I fd a corner where, quite invisible I cd always meditate. I planned to do it so much always and sat down then for the strange sweetness that drew one was irresistible.

Then my mind *wd* fly to "Siva Guru", though I had taken another subject. I *know now* that that last *meditation and* Samadhi must have held a

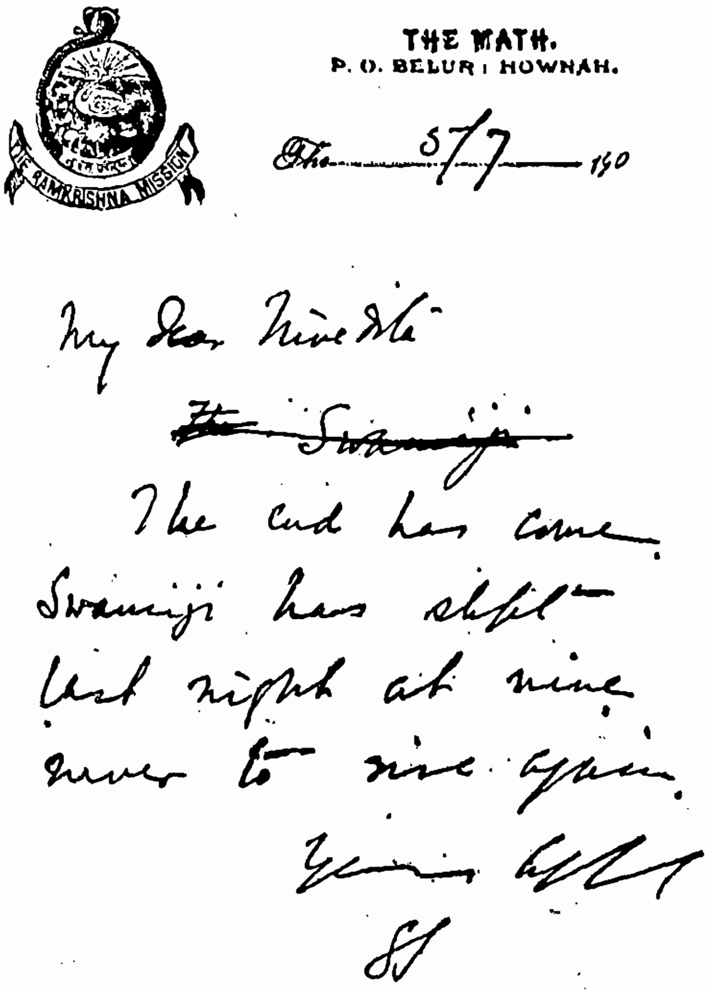
benediction for us He left. He called us to meditate. Everything about Him did that at the end. And He faced the North West as He sat.

And so came the end. He went out, as one drops a loose garment Without a struggle. "Conqueror of Death." But He has *not* left us. For my part, He has been

with me far far more since that night than for 2 years before and I trust and pray that this may not cease to be, for oh Yum I have only one desire really and that is to act so that, were He back again in the toils of human ignorance He wd have no right to feel anxiety or distress. But I do not know—I feel so much power inside—But I *do* nothing. Bless me that He may indeed be pleased with us all! One *must* so live that one justifies Him

in saying "a great man has to make his workers and then leave them. If he stays in the same place with them, he cramps them!"

As for you dear Yum—I feel sure that peace will come to you in the thought that you have indeed accomplished that for which you were born. I trust *you* will stay with us to bless and gather the harvest, for a little while. But if not, if you go to Him, one must be ready to give you up, only tell Him that [His blessing is needed still—that one is faithful]


THE MATH.
P. O. BELUR, HOWRAH.

The 5/7 190

My dear Nivedita

~~The Swamiji~~

The end has come

Swamiji has slept

last night at nine

never to rise again.

Yours affly

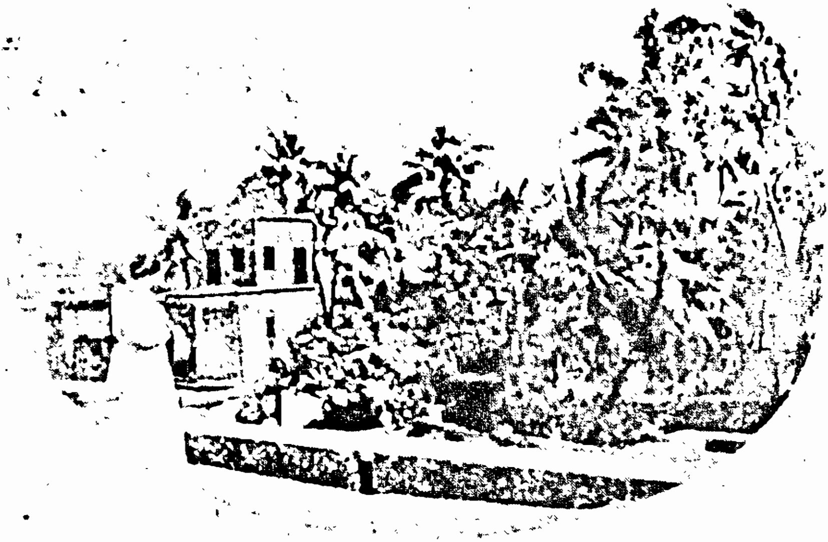
SS

নিবেদিতার জীবনে 'যুগান্তকারী' এই পত্রটি। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ এই চিঠিতে স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতাকে জানিয়েছিলেন। চিঠি পাবার পরে নিবেদিতার অনুভূতির রূপ বর্ণনাতীত তো নিশ্চয়ই, আমাদের পক্ষে কল্পনাতীতও। সারদানন্দ লিখেছিলেন—

My dear Nivedita,

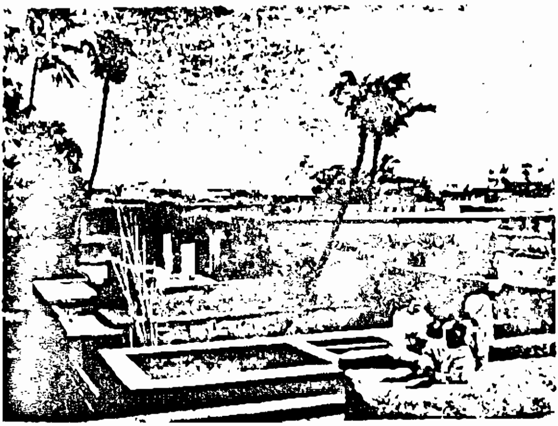
The end has come, Swamiji has slept last night at nine, never to rise again.

Yours affy.
S.S.



LIFE IN THE NATIVE QUARTER.

ভারতে আসার অব্যবহিত পরেই নিবেদিতা An English woman এই ছদ্মনামে মার্চ, ১৮৯৮-এ কলকাতার বিখ্যাত সচিত্র অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাময়িক পত্রিকা 'এমপ্রেস'-এ Life in the Native Quarter নামে প্রবন্ধ লেখেন। এইসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, পূর্ব থেকেই সাংবাদিকতা তিনি করছেন। প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি ছবি ছিল, তার তিনটি ঐ পত্রিকা থেকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। নিবেদিতার কলকাতায় আদি বাসস্থান এবং একেবারে প্রথম দিকের ছাত্রীদের ছবি এখানে পাচ্ছি, যা অন্য কোথাও আমরা পাইনি।



"AWAY IN ALL DIRECTIONS STRETCH SUCH HOUSETOPS."

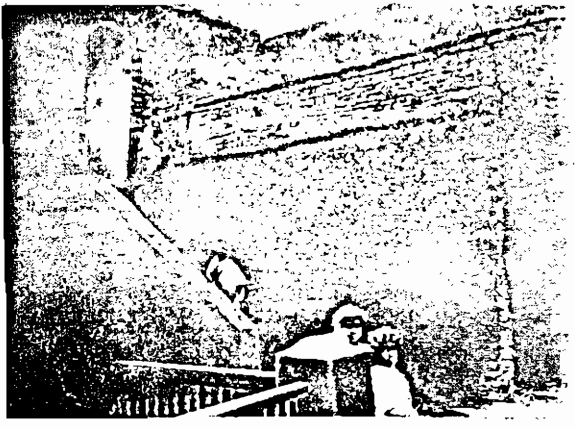
let us not forget the radiant purity of this upper air and the strange lonesomeness of moon and stars.

To the Hindu woman, cooped up for the most part in her zenana, how much it means to possess such a roof-top! Here is her whole outlook on life—life in the abstract, life on the impersonal scale. Here is the neighbourhood of other women, for the roof of one zenana is often accessible to another; here are coolness and merry talk in the long hours of summer nights, when all the girls of the family steal away to sleep where it is also possible to breathe, and here, also, is that glimpse of the things that is the lightener of toil and brings refreshment as of worship.

Beautiful Ganges! How she is loved of her children, and how quaintly delicate is that salutation to the river when, ere stepping into her and so soiling her with their feet, they stoop and place a little of her water on their heads.

"But hark, hark! the dogs do bark! The beggars are coming to town." A very practical question to the Indian house-mother is that of beggars. In a perfect troupe they come down the lane, but fortunately not everyday. Here, if one stands at one's window on a Sunday morning about nine, or on a Wednesday, one sees them. Numbers of well-dressed good-humoured looking men and women, clad in white for the most part, with large rosaries, tramping along, staff in one hand and begging bowl in the other. Such complete social recognition do they receive, that the city is actually mapped out into wards for their peregrinations, according to the day of the week! It is the solitary mendicant, however, who interests me most. Theoretically, in the great majority of cases, he is a barefooted friar, so to speak, wearing the yellow robe that Buddha wore, and appealing for alms in the strength of the Sacred Name. Perhaps he was already within the doors when one heard it first, and there he stands, repeating the sonorous "Hari bol!" or the "Sita Ram" that constitutes a prayer. This Indian feeling about the Name of God is very striking. To repeat it is the whole of supplication, and they argue that, [illegible] the hand into a fire burns, whether we feel it or not, shall not the cry to Almighty do good whether we know it or not? But maybe our friend remains to sing a song, and this is worth more, for a whole literary form of great [illegible]ness and power is devoted to the [illegible] of these beggars, and not many years [illegible] all that now remains of the [illegible] ballad sonnets of Ram Prasad, the [illegible] Burns of Bengal, had to be collected [illegible] just such sources as this. The [illegible] is always supposed to include his [illegible] name in the last couplet, and it will be seen at once how useful this quaint custom would prove to the collector of the [illegible] of a particular song-maker. Very [illegible] a tiny pinch of rice or a few fruits, the smallest of coin, will content [illegible] friend, but more could hardly be given when the claims are so many. There is no stigma in the mind of the giver, [illegible] ever, attaching to the man who had to cry "Mother, give me food." The dictum "the starving man has a natural right to his neighbour's bread," would rouse no responsive thrill of daring in India, where something very like it is taken as a fundamental social axiom.

Many a strange custom clings to these mendicants, but this is [illegible] more true of the night beggars. Some of these gentlemen decide on a small sum at the beginning of the night—say, six and a half annas, which they are good enough to think will supply their modest wants, and then vow to go on begging till the amount is collected. As the hours wear on, they wander about, shouting at every few steps the present state of the deficit, and it is no uncommon thing for charitable persons to leave orders with their servants that if the night is advanced their demands are to be satisfied, or, possibly, for those watching by the sick to buy their peace. But even of these people all are [illegible] during this; a few repeat words of sincere devotion, and as one [illegible] wakes to listen for a moment, it is good to think that in the sleeping city, there are some who keep up the Perpetual Adoration, calling the Name of God beneath the quiet stars.



ON THE SECOND STOREY.



"স্বামীর সঙ্গে বাল্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ তিনি। স্বামীকে যখন সানন্দে সন্ন্যাসীর জীবন যাপনে অনুমতি দিলেন, তখন স্বামীর গভীর বন্ধুতা পেলেন ও তাঁর শিষ্যারূপে গৃহীত হলেন। স্বামী তাঁকে দিন দিন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুললেন। অপরপক্ষে পতি-সান্নিধ্যে অতিবাহিত বৎসরগুলিতে ইনি স্বামীর পরামর্শদাতা ছিলেন। ইনি নিরন্তর প্রার্থনা করেছেন, আমার বাসনাকে শুদ্ধ ক'রে তোলো, যাতে চিরদিন তোমার যোগ্য হতে পারি। দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ, কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।"[০]

সেই 'বহু সন্তানের' এক শ্রেষ্ঠ সন্তান ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সুগভীর স্নেহসম্পর্কের রূপ বর্ণনায় অসাধ্য। বিদেশিনী 'খুকী'টির জন্য সারদাদেবীর মাতৃহৃদয় সদাই উচ্ছলিত থাকত। অপরদিকে নিবেদিতার কাছে তিনি চিরজননী মেরী-মাতার দেহধারিণী প্রতিনিধি। শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে শান্তিসায়রে অবগাহন করে নিবেদিতার জ্বালাময় সংঘর্ষ-ক্ষুব্ধ জীবন পরমের আনন্দস্পর্শ পেত। নিবেদিতা তাঁর ধাবমান জীবনের নানা পর্যায় থেকে বারবার ফিরে আসতেন শ্রীমায়ের কাছে—আলোকের, আনন্দের ও শান্তির সন্ধানে। নিবেদিতার নানা রচনায় ও বহু চিঠিতে সেই প্রাপ্তি-সঙ্গীত বিকীর্ণ হয়ে আছে।

শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ ১৭ মার্চ, ১৮৯৮। 'ঐ বৎসর শ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আগমন করিয়া বাগবাজার ১০।২ নং বোসপাড়া লেনে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাগণকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।'

শ্রীমায়ের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রভাব পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাগণের জীবনে সুগভীর হয়। ভারতীয় নারীদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যবাসীরূপে নিন্দা ও কুৎসা তাঁরা শুনে এসেছেন, এই একটি সাক্ষাৎকার বহু দিনের সেই অন্ধকারের উপর বিপুল আলোকবর্ষণের তুল্য। মিসেস বুলের মানসিক প্রতিক্রিয়া ম্যাক্সমুলারকে লেখা চিঠি থেকে আগেই দেখা গেছে। কিছু পরেই নিবেদিতার লেখা চিঠি থেকে তাঁর প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখব।

নিবেদিতার জীবনীকার মুক্তিপ্রাণা জানিয়েছেন, এই দিনটি সম্বন্ধে মার্গারেট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 'Day of days ।' "বাস্তবিক শ্রীমায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতের এই দিনটি প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করিত।"

শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার শেষ সাক্ষাৎ ১২ মে, ১৯১১। প্রথম সাক্ষাৎ ও এই শেষ সাক্ষাতের মধ্যে ১৩ বৎসরের অল্পকিছু বেশী সময়ের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে শ্রীমায়ের সঙ্গে একত্র বাস ও অগণিত সাক্ষাৎকার ঘটেছে নিবেদিতার। নিবেদিতার পত্রাবলীর মধ্যে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব উল্লেখ পাই সেগুলি তুলে

---

[০] ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে পাই—স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে মিসেস বুল শ্রীমার সেবার নিয়মিত অর্থসাহায্য করেছেন। তিনি মাসে ৬০৲ টাকা করে দিতেন।

ধরেছি। এখানে বলা দরকার, শ্রীমায়ের আরও বহু উল্লেখ নিবেদিতার পত্রাবলীতে আছে, যার সবগুলি চয়ন করা সম্ভব নয়।

নিবেদিতার পত্রাবলীতে শ্রীমা সারদাদেবীর কথা

[*নিবেদিতার যেসব চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে ১৮৯৮-এর ২২ মে তারিখে নেল হ্যামণ্ডকে লেখা চিঠিতেই শ্রীমায়ের প্রথম উল্লেখ পাই। এই চিঠি লেখার আগে শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতাদির প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী আর একটি সাক্ষাতের সংবাদ পাই। বর্তমান বেলুড় মঠের নির্মাণকাজ শুরু হলে শ্রীমাকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠে নিয়ে আসা হয় নৌকা করে, ১৮৯৮-এর ১ই এপ্রিল। বিকালে ফিরে যাবার আগে তিনি সেখান থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে বর্তমান মঠের জমিতে পদার্পণ করলে 'নিবেদিতা, ধীরামাতা ও জয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং সঙ্গে করিয়া সমস্ত জমি দেখাইয়া দেন।'*]

২২ মে, ১৮৯৮, নেল হ্যামণ্ডকে

অনেকবার ভেবেছি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা নাম্নী মহিলাটির বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখব। শুরুতে বলি, তিনি *পঞ্চাশ-পেরোয়নি এমন হিন্দু বিধবার* মত সাদা কাপড় পরেন।[৪] পরার ধরন : কাপড় প্রথমত কোমরে স্কার্টের আকারে জড়ানো থাকে, তারপরে শরীরের উপর দিয়ে গিয়ে মাথা ঢেকে রাখে—অনেকটা nun-দের অবগুণ্ঠনের মত। পুরুষ মানুষ কথা বলতে এলে তাঁকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; তিনি সাদা কাপড়ের ঘোমটা সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে নামিয়ে দেন; সরাসরি কথা বলেন না; বেশী বয়সী কোনো মহিলাকে মৃদু স্বরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কিছু বলে দেন, সেই মহিলাটি তাঁর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন জোরে। এই জন্য মনে হয় আচার্যদেব (স্বামীজী) কখনো এঁর মুখ দেখেননি। এই সঙ্গে কল্পনায় দেখে নাও, ইনি সব সময়ে মেঝেয় ছোট একটি মাদুরে বসে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা খুব বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হচ্ছে না নিশ্চয়; কিন্তু এঁকে একটু ভালভাবে জানলেই

---

৪ এখানে নিবেদিতা সম্ভবতঃ শ্রীমায়ের সরু লাল-পাড় সাদা শাড়ির কথা বলতে চেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে সারদাদেবী যখন আয়তিচিহ্ন হাতের বালা খুলতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে তাঁকে বলেন, তিনি সতত সান্নিধ্যেই রয়েছেন, দেহের মৃত্যু কোনো ব্যবধানই সৃষ্টি করেনি। এই দর্শনের জন্য সারদাদেবী হাতের বালা বর্জন করেননি এবং সরু লাল-পাড়ের শাদা থান পরতেন। বৈধব্যের সম্পূর্ণ শুভ্রবাস গ্রহণ না করার জন্য কিছু লোকনিন্দা হয় এবং কয়েকবার তিনি প্রচলিত বৈধব্য-বাস গ্রহণ করতে চান কিন্তু প্রতিবারই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান ও নিষেধ শোনেন। *নিবেদিতা যখন শ্রীমায়ের কাপড় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন,* তখন বোধ হয় তাঁকে ঐসব দর্শনাদির কথা না বলে সহজবোধ্য একটি কারণ বলে দেওয়া হয়; বাংলা দেশে অল্পবয়সী বিধবারা অনেক সময় সরু পাড় থান পরে থাকেন, শ্রীমাও তেমনই কিছু করেছেন, এই রকম বোঝানো হয়।

দেখা যাবে, সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধ এ'র চূড়ান্ত, প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করবার আগে এ'র পরামর্শ সর্বদা নিতেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা এ'র উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন। অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি। কি স্নিগ্ধ ভালবাসা এ'র! অথচ বালিকার মতই হাসি-খুশী। সেদিন যখন আমি জোর করে বললুম, স্বামীজীকে এখনি এখানে আমাদের মধ্যে আসতে হবে, নইলে আমরা চলে যাব—সেই শুনে তাঁর কী হাসি—তুমি যদি দেখতে! আচার্যদেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন,—এই খবর নিয়ে যে-সন্ন্যাসীটি এসেছিলেন, তিনি আমাকে সত্যই চলে যাবার জন্য জুতো পরতে উঠতে দেখে রীতিমত ভড়কে গেলেন, এবং দ্রুত স্বামীজীকে ডেকে আনতে ছুটলেন—তখন সারদার উচ্ছ্বসিত হাসির রূপ যদি দেখতে! আর কি যে মিষ্টি তিনি!—আমাকে বলেন, 'আমার খুকী।' আচারবিচারে বরাবরই রক্ষণশীল—সব কিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি বিদেশী মেয়ে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁর কাছে এলেন। এ'দের সঙ্গে তিনি খেলেন পর্যন্ত! আমরা গেলেই ফল খেতে দেওয়া হয়; তাঁকেও দেওয়া হল—সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ফল তিনি একসঙ্গে গ্রহণ করলেন!! এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।[৬] খুব মজার, না! তাঁর মহিমার একটা উত্তম দৃষ্টান্ত দিই—কলকাতায় তিনি যখন থাকেন, তখন সদাসর্বদা ১৪-১৫টি উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা তাঁকে ঘিরে থাকেন, যাঁরা রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি করে সকলকে অস্থির করে মারতেন, যদিনা তিনি তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং প্রফুল্লতার দ্বারা এ'দের মধ্যে স্থায়ী শান্তি রক্ষা করে চলতেন! তাই বলে সত্যই আমি ঐসব মহিলার স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনো কটাক্ষ করছি না, আমি নারীজাতির সাধারণ স্বভাব অনুমান করে এই কথা বলছি।

তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের বীরোচিত সম্ভ্রম দেখবার মতো। তাঁকে সর্বদা 'মা' বলে ডাকা হয়,—তাঁর বিষয়ে উল্লেখের সময়ে বলা হয় "শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী"; প্রতি-ব্যাপারে তাঁকে স্মরণে রাখা হয়, সব সময়ে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে দু'একজন হাজির থাকেন; তাঁর ইচ্ছাকে স্থায়ী আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়। এ এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক। তুমি যদি তাঁকে কিছু লেখো, আমি আনন্দ করে সেকথা তাঁকে জানাবো। একজন সন্ন্যাসী একদিন আমার হয়ে বাংলা করে তাঁকে Magnificat (যীশুজননী মেরীর গান) পড়ে শোনালেন—তিনি কী ভাবে না তা উপভোগ করলেন—দেখবার মতো! সত্যি করে বলতে গেলে, তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।

২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, নেল হ্যামণ্ডকে

......কলকাতায় ফিরে গেলে সারদার কাছে থাকতে হবে, যতদিন না বাড়ি পাই।...

---

[৬] এই ঘটনায় উল্লসিত স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮, মার্চে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন : "শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন!...ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?"

[নিবেদিতা স্বামীজীর দলবলের সঙ্গে হিমালয়ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন ১৮৯৮-এর মে মাসে; কলকাতায় ফিরে আসেন ১লা নভেম্বর। সারদাদেবী তখন ১০/২ নং বোসপাড়া লেনে বাস করছিলেন। ঐ বাড়ির 'প্রবেশপথে দুইদিকে দুইটি ঘর ছিল; একটি ঘরে অসুস্থ অবস্থায় স্বামী যোগানন্দ বাস করিতেন; অপরটিতে নিবেদিতার থাকিবার ব্যবস্থা হইল।'

নিবেদিতা সারদাদেবীর নিকট থাকার ইচ্ছা করেছিলেন এবং শ্রীমা সাদরে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি তখন সমাজ-দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত বলে বোধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণকন্যার ঘরে ম্লেচ্ছ বিদেশিনীর স্থান!! তখনকার দৃষ্টিতে 'শ্রীমা বস্তুতঃ সমাজবিরোধী কাজ' করেছিলেন যার ফল 'সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মীয়স্বজনের উপর পর্যন্ত' বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা ছিল, কিছুকালের মধ্যেই নিবেদিতা তা অনুভব করেন। তাছাড়া নিবেদিতার বিদ্যালয়ের জন্যও স্বতন্ত্র বাড়ির দরকার ছিল। বাগবাজারের মত গোঁড়া জায়গাতে বাড়ি পাওয়া সহজ ছিল না। অনেক চেষ্টায় 'বোসপাড়া লেনেই শ্রীমার বাড়ির অপরদিকে, অতি নিকটে ১৬ নম্বর বাড়িটি পাওয়া গেল।' শ্রীমার বাড়িতে আট-দশ দিন কাটাবার পরে নিবেদিতা ঐ বাড়িতে চলে যান।

নিবেদিতা ক্রমে নিজগুণে ঐ রক্ষণশীল বাগবাজার পল্লীতে কন্যাবৎ গৃহীত হয়েছিলেন, সেবিষয়ে বিবরণ নিবেদিতার জীবনীসমূহে এবং অবলা বসুর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়।]

৪ জানুয়ারী, ১৮৯৯, নেল হ্যামন্ডকে

তাঁরা (ওলি বুল ও ম্যাকলাউড) শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর ফটো তোমাকে দেখাবেন। ইনি আমাদের 'নিজের মেয়ে' বলে দেখেন আর সদাসর্বদা আশীর্বাদ করেন। তাঁর ফটো কিন্তু সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য নয়।

[শ্রীমায়ের যেসব ফটোর উল্লেখ এখানে নিবেদিতা করেছেন, তার একটি অন্ততঃ ঐতিহাসিক ফটো, যেটি এখন সর্বত্র পূজিত হয়। এর আগে শ্রীমার কোন ছবি তোলা হয়নি, যদিও পরে তোলা অনেকগুলি ছবি পাওয়া যায়। মিসেস ওলি বুল প্রভৃতিরা প্রথম ইউরোপীয় যাঁরা শ্রীমার দর্শন পান, একথা আগেই বলা হয়েছে, আবার মিসেস ওলি বুলই প্রথম শ্রীমার ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন, যেটি দেশ-বিদেশে প্রচারিত ও অর্চিত। এক্ষেত্রে মিসেস বুলের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ-যোগ্য। অতীব বিস্ময়ের কথা এই ছবি তোলার সময়ে শ্রীমার বয়স পঁয়তাল্লিশ—শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত 'পূজিত' ছবিটিও পঁয়তাল্লিশ বৎসরে তোলা। 'মায়ের কথা' (২য়) থেকে পাই শ্রীমা তাঁর এই ফটোটিকে 'ঠিক' বলে অনুমোদন করেছিলেন:

"(২৫-৯-১৯১০) জিজ্ঞাসা করিলাম—'মা এ ফটো কি ঠিক?'

"মা—হাঁ, এটি ঠিক। তবে পূর্বে আরও মোটা ছিলুম, যখন ছবি ওঠায়, তখন যোগীনের (স্বামী যোগানন্দ) খুব অসুখ। তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিছল। মন ভাল নয়। যোগীনের অসুখ বাড়ছে তো কাঁদছি, আবার যোগীন ভাল থাকছে

তো ভাল থাকছি। সারা মেম (মিসেস ওলি বুল) এসে এইটি ওঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজো করব।' তাই শেষে এই ছবি ওঠায়।"

শ্রীমার এইকালীন ফটোর বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের মার্চ, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের (আমেরিকান সন্ন্যাসী; পূর্বাশ্রমে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জন ইয়েল) একটি প্রবন্ধে আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায়:

"ঈশারউড তাঁর গ্রন্থে (রামকৃষ্ণ-জীবনীতে) স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমায়ের একটি প্রতিকৃতি দিতে চেয়েছেন। স্থির হয় যে ঠাকুরের ৪৫ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে তোলা 'পূজিত' ছবির সমজাতীয় মাতাঠাকুরাণীর একটি ছবি দেওয়া হবে। শ্রীমায়ের ঐ ধরনের ছবিটির পরিচয় সন্ধানকালে কতকগুলি আকর্ষণীয় তথ্য পেলাম। এই চাঁদার ছবিটি কলকাতায় সিস্টার নিবেদিতার আবাসে ১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে অন্য দুটি ছবির সঙ্গে একই সময়ে একই অবস্থানে তোলা হয়। ঠাকুরের দেহান্তের ১২ বৎসর পরে শ্রীমায়ের এই ছবি তোলা হয় এবং এইটি তাঁর প্রথম ছবি। শ্রীমার প্রতিকৃতি আমেরিকায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে মিসেস ওলি বুল ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন। শোনা যায় যে, একজন ইংরাজ ফটোগ্রাফারকে নিয়োগ করা হয়েছিল। পশুচর্মের আসন বিছিয়ে, সামনে কয়েকটি টব বসিয়ে দেওয়ার পরে শ্রীমা আসন গ্রহণ করেন। নিবেদিতা ও মিসেস বুল তাঁর শাড়ি ঠিকঠাক গুছিয়ে দিতে সাহায্য করেন। শ্রীমা ফটোগ্রাফারের সামনে বসতে খুবই লজ্জাবোধ করেন, কিছুতেই ক্যামেরার দিকে তাকাতে চান না, নতদৃষ্টিতে বসে থাকেন এবং ভাবস্থ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট না হলেও ক্যামেরাম্যান প্রথম ছবিটি তোলেন, যেটি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের 'নতদৃষ্টি চিত্র'। এরপর শ্রীমা সপ্রশ্ন আঁখি তোলেন—'শেষ হয়েছে কি?' ফটোগ্রাফার তখন দ্বিতীয় ছবি তোলেন—সেইটিই সুপরিচিত 'পূজিত' ফটো।...

ঐ সময়ে গৃহীত তৃতীয় ফটোটির বিষয়ে আমার কিছু ব্যক্তিগত বক্তব্য আছে। এইটি হল শ্রীমা ও নিবেদিতার মুখোমুখি বসে থাকার ছবি। ভারতে থাকাকালে আমি কয়েকবার শুনেছি, এটি খাঁটি ছবি নয়, সাজানো ছবি; শ্রীমা ও নিবেদিতার ঐরকম একত্রে ফটো নাকি কখনো তোলা হয়নি; দুজনের দুটি ছবিকে কেটে মুখোমুখি জুড়ে কেউ হয়ত আবার নেগেটিভ তৈরী করে এই ছবি বানিয়েছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। এই তৃতীয় ছবিটির অস্তিত্ব ১২ বছর আগেও অজ্ঞাত ছিল। ১৯৫২ সালে ভারতে আসার পথে আমি ইংলন্ড ঘুরে আসি; সেখানে আমি আর্ল অব স্যান্ডউইচের বাড়িতে ছিলাম। এঁর প্রথম পত্নী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান বন্ধু লেগেটদের আত্মীয়। লর্ড স্যান্ডউইচের বাড়িতে দ্বিতীয় লেডী স্যান্ডউইচ শ্রীমা-নিবেদিতার এই ছবিটির পুরাতন একটি মূল প্রিন্ট দেখতে পান। ছবিটি তিনি আমাকে দেন ভারতে নিয়ে যাবার জন্য, এবং বলেন 'তিনি অন্ততঃ আগে এই ছবিটি দেখেননি, সম্ভবতঃ এটি সুপরিচিত ছবি নয়।'—'সুপরিচিত নয়'—বললে অল্পই বলা হয়। বেলুড় মঠে পৌঁছে ছবিটি স্বামী শঙ্করানন্দকে দিলে তিনি রীতিমত অবাক এবং অতীব উল্লসিত। সহর্ষে বললেন, 'এ ছবি আগে কখনো

দেখিনি তো! এমন কোনো ফটো আছে জানতামই না!' বর্তমানে এই ছবিটির যেসব প্রিন্ট দেখা যায়, সে সবগুলিই লর্ড স্যান্ডউইচের বাড়ি থেকে পাওয়া ঐ ছবির পুনর্মুদ্রণ।"

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে পাই—ঐ ফটোগ্রাফারের নাম হ্যারিংটন। "ফটো তুলিবার সময়ে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি কাপড়ে ঢাকা ছিল। পদাঙ্গুলি বাহিরে রাখিয়া একখানি ফটো তোলার প্রয়োজন মিসেস বুল অনুভব করেন, দেশে নিয়া পূজা করিবেন বলিয়া। মাকে সেইকথা জানাইয়া, অনেক বলিয়া কহিয়া দ্বিতীয়বার ফটো তুলাইতে সম্মত করানো হয়। গোলাপ মা-র মুখে এই ঘটনা অনেকেই শুনিয়াছেন—তিনি মার সঙ্গে ছিলেন।"

ফটো তিনটি সম্বন্ধে নিবেদিতার চিঠি থেকে পাই (মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডকে লেখা, ৫ই জানুয়ারী, ১৮৯৯)—

'By next week's post I send to London 10 photographs of her (mother). The two negatives are to be 40 Rupees and expenses 3·4—total 43·4 and my proof and negative cost nothing. So unless you write to the contrary we shall keep the 3 negatives here.'

এখানে দেখা যাচ্ছে, শ্রীমার সঙ্গে নিবেদিতার ছবি বাড়তি তোলা হয়েছিল এবং তুলতে কোনো খরচ হয়নি।]

১৫ জানুয়ারী, ১৮৯৯, ওলি বুল ও ম্যাকলাউডকে

মাতাঠাকুরাণী জানালেন, স্বামীজীর কাছে বৈদ্যনাথে তাঁর এক সম্পর্কের মাসী আছেন। স্বামীজী যে পরে আবার পাশ্চাত্ত্যে যাবেন, এ বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীর সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, স্বামীজীর আরও অনেক কিছু করার আছে। গত কাল মা'র জন্মদিন গেছে, তোমরা মনে হয় তা আমাদের টেলিগ্রাম থেকে জেনেছো।

মা হঠাৎ আমাকে গত রাত্রে বললেন, আমি যদি এলাহাবাদে যাই, তিনিও সঙ্গে যাবেন। তিনি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকতে চান! আমি জানতাম না যে, তিনি এলাহাবাদের ব্যাপারটা জানেন। ব্যাপারটা তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর কথার পিছনে মিসেস বুল আছেন কি—কি জানি! তুমিই বলতে পারবে। যাই হোক জিনিসটি সুন্দর। পরের সপ্তাহের ডাকে লন্ডনে তাঁর দশটি ফটোগ্রাফ পাঠাবো।....

৩ মার্চ, ১৮৯৯, নেল হ্যামন্ডকে

ভালো কথা, মাতাঠাকুরাণীর কাছে তোমার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি এক সন্ধ্যায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে বসেছিলেন, সেখানে তোমার চিঠি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলাম। তাঁরা প্রায়ই তৃপ্তিতে 'আহা!'—বলে উঠছিলেন, আর আনন্দ প্রকাশ করে নিজেদের ডানদিকের কাঁধে চুমু খাচ্ছিলেন। (অর্থাৎ আনন্দে ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে, কাঁধ একটু উঁচু করে কাঁধে মুখ ঠেকাচ্ছিলেন, যা নিবেদিতার কাছে নিজ কাঁধে

ঘুম খাওয়ার মত মনে হচ্ছিল)। শুধু অমন একটি চিঠি লিখে তুমি তাঁদের মন কত গভীরভাবে স্পর্শ করেছ তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।......

শ্রীমাকে তোমার জন্য কিছু বলতে বললাম। তিনি তাঁর স্নেহ আর আশীর্বাদ জানালেন—তোমাকে নিজের সত্যিকারের মেয়ের মত তিনি দেখেন। এর বেশী তুমি কিছু আশা করো না যেন। কারণ অভিজ্ঞতা ও বাস্তববোধের বাইরে, চিন্তারাজ্যে, এই মহিলাদের পরিধি ব্যাপ্ত নয়। অনুভূতিরাজ্যেই এ'দের যত শক্তি। বুঝতেই পারছ, এ'রা এমন কোনো শিক্ষা পাননি যার দ্বারা নিজেদের চিন্তাকে অপরিচিতের কাছে আবেদনযোগ্য করে তুলবার মত করে গঠন করতে পারেন।

কিন্তু অনুভূতিতে শ্রীমা অনবদ্য। জেনে রেখো, তাঁর ঐ ফটো তোলার অর্থ —এক্ষেত্রে তিনি জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের বাইরে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিকে সরাসরি তাকালেন, বা তেমন কেউ তাঁর মুখ দেখলেন। তাই বলে এর জন্য কোনো আত্মসচেতনতা তাঁর ছিল না—এক বিন্দুও নয়। স্বামীজী কিংবা এমনকি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে তাঁর বিবাহের পরে (বিবাহকালে বয়স মাত্র পাঁচ।) অবগুণ্ঠনহীন দেখেন নি।* পুরুষেরা তাঁকে পূজা করবার জন্য অন্তঃপুরের দরজা পর্যন্ত, কিংবা কখনো তার ভিতর পর্যন্ত এলেই অবিলম্বে তাঁর মুখের উপর লম্বা ঘোমটা নেমে আসে, যদিও কখনো কখনো প্রান্তে একটু ফাঁক থাকে, যাতে নিম্নচোখে তাকানো যায়। এই নিয়ে আমি এত মজা করেছি যে, পুরুষেরা বাইরে অপেক্ষা করার কালে সারাক্ষণ তিনি হেসে লুটোপুটি কিন্তু কোনো চাকর কিংবা সন্ন্যাসী যেমনি সিঁড়ির উপরে উঠে এসে চেঁচিয়ে জানালেন—অমুকচন্দ্র অমুক শ্রীমাকে প্রণাম জানাতে আসছেন—অমনি সমস্ত ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে ঘনীভূত, সমস্ত কথা স্তব্ধ, হাত-পাখার নাড়াচাড়াও বন্ধ, ঘোমটা মুখে নেমে আসে নিঃশব্দে, সারা গা কাপড়ে ঢেকে যায়, ঘরের মাঝখানে বসে থাকলে আধখানা শরীর দরজার দিকে ঘুরে যায়—সব কিছু ঘটে যায় নীরবে। তারপর আগন্তুক বাইরে এসে দাঁড়ায়, চৌকাঠে মাথা ঠেকায়, কিংবা ভিতরে এসে শ্রীমার চরণ স্পর্শ করে এবং বলে: সে এই এই কাজ করতে যাচ্ছে। লোকটি হয়ত সদ্য কলকাতায় এসেছে, মায়ের জন্য কিছু প্রণামী এনেছে, কিংবা সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে, তাই মায়ের আশীর্বাদ চায়। শ্রীমা তখন পার্শ্ববর্তিনীর কাছে অতি মৃদুস্বরে সস্নেহে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন, সেগুলি উচ্চতর স্বরে লোকটির কাছে শোনানো হয়।

---

* বালক নরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত সারদাদেবীকে অবগুণ্ঠনমুক্ত দেখেননি কেন, এ বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা ও মিস্ ম্যাকলাউডের এক কথোপকথন তুলে দেওয়া হয়েছে নিবেদিতা গার্লস স্কুল প্রকাশিত Sister Nivedita's Works-এর প্রথম খণ্ডে, *Notes of Some Wanderings*-এর সংযোজনীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালীর অবতার, স্বামীজী এই কথা বলেন। তারপর বলেন—

"এই সব অবতারের সঙ্গে একদল মানুষ আসেন, যাঁদের বলা হয় ঈশ্বরকোটী, যাঁদের প্রধান লক্ষণ—তাঁরা কখনো নিজেদের স্বার্থে কোনো কাজ করতে পারেন না—অপরকে সেবা ও সাহায্যই তাঁরা করে যান, তাঁরা সহায়তা করেন ভাবপ্রচারে।

"এক্ষেত্রে আমার ভূমিকা? হাঁ, রামকৃষ্ণ সর্বদা বলতেন, ঐ অবতারের 'নর' আমি।

"'সেই জন্যই কি আপনি কখনো সারদার মুখ দেখেন নি, তিনিও দেখেন নি আপনার?'—জয়া (ম্যাকলাউড) জিজ্ঞাসা করলেন।

"আচার্যদেব সমর্থনে মাথা নাড়লেন।"

সব শেষে লোকটি আবার প্রণত হয়, শ্রীমা হাত জোড় করেন, যার দ্বারা বোঝা যায় তিনি আশীর্বাদ করলেন। তখন লোকটি চলে যায়। এতক্ষণে আবহাওয়ার ভার কমে। আগেকার ভাবভঙ্গি ফিরে আসে, কথা শুরু হয়, পাখা নড়তে থাকে, ঘোমটা খসে পড়ে— ।

তাঁর মত স্বামীকে পূজা করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি—এমন কাউকে ভাবতে পারো! মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনো কখনো উদিত হবেন—এই লোভ তো থাকতে পারত! না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয় —ইনি তাও চান নি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি!

১২ মার্চ ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

আগামী সোমবার সকালে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মোৎসবের (অর্থাৎ জন্মতিথির) জন্য মঠে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি 'না' বলায় স্বামীজী খুশী হলেন। তখন ভাবলাম, যদি মাকে দিয়ে [প্রিয়তমা য়ুম (ম্যাকলাউড), তুমিই এঁকে মা ডাকতে শিখিয়েছ—আমার ছেড়ে-আসা বাড়ির ছোট্ট মায়ের দাবির সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের একটা টানাটানি ছিলই] খোকাদের জন্য (জগদীশ বসুদের জন্য) বিশেষ পূজা করিয়ে নিতে পারি, সেটাই আমার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের চেয়ে অনেক বড় কিছু হবে।......

আগামীকাল সেণ্ট প্যাট্রিক দিবস।...এক বছর আগে ঐ দিনটিতে আমরা সকলে মাকে দর্শন করেছি, তুমিই আমাকে ঐ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলে।......

সোমবার ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মদিন। শ্রীমা এসে পূজাঘরে তাঁর প্রতিকৃতির কাছে বিশেষ পূজা করেছিলেন। তারপরে তাঁর সঙ্গিনীরা ফলমূল আনলে তিরিশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি বসে প্রসাদ পেলাম। খাবার আগে বাচ্চাদের লম্বা হয়ে প্রণাম করার মধুর দৃশ্য যদি দেখতে— আর তাদের কলকাকলি! সুন্দর, ছোটখাট Holy Eucharist-এর (যীশুর নৈশভোজ) তুল্য ব্যাপারটা, সেই সঙ্গে বড়দিনের ভোজ। বিকালে শ্রীমা, তাঁর সঙ্গিনীরা, বাচ্চারা আর আমি—সকলে মিলে সাতটা গাড়ি করে চ্যাটার্জি নার্সারির অর্কিড দেখতে গেলাম,—নার্সারিতে মেয়েদের দিন ঐটি। কদাপি মনে করো না, এর দ্বারা বাড়াবাড়ি খরচ হয়েছে কিছু। দুবার চল্লিশ জন করে লোক নিয়ে গেল—কিন্তু গাড়িভাড়া ১২ টাকারও কম!......

চুপিচুপি য়ুম তোমাকে বলি, শ্রীমা বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক সেই কথাই বলেছিলেন স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীমায়ের কাছে। কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকব আমি।

১৬ মার্চ, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমা বললেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করতে ভালবাসি, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কথাই তাঁকে বলেছিলেন : স্বামীজী জাতীয় দেবতার সাক্ষাৎ অবতার; আর

তিনি কালীর অবতার।'[৭] বুঝতে পারছ!......সুতরাং কোনো এক দিক থেকে স্বামীজী উপরে আছেন! তোমাকে চমৎকার কিছু দিলুম, কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকতে হবে।

১৬ এপ্রিল, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

যোগানন্দের মৃত্যু শ্রীমা ও যোগীনমার কাছে দারুণ বেজেছে। মৃত্যু কথাটি শ্রীমা যেন সইতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা।—'জানি জানি সে আমার প্রভুর হয়ে গেছে—সে কথা জানি আমি—কিন্তু সে যে আমার যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন!'

২ মে, ১৮৯৯, নেল হ্যামণ্ডকে

চারিদিকে ঘণ্টা বাজছে, সুর ভেসে আসছে, এখন যে সন্ধ্যারতির কাল। ছাতের উপরে উঠে যাব এখন, চুপ করে শুয়ে দেখব তারকাদের ফুটে ওঠা আকাশ-প্রাঙ্গণে।......একে আমি বলি শান্তি-লগ্ন।......সন্ধ্যাদীপ জ্বলতে শুরু হয়েছে...... অন্তঃপুরের মহিলারা প্রণত হয়েছে বিগ্রহের সামনে; এই সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকেই সারদাদেবীর গৃহে, ঠিকভাবে বলতে গেলে আশ্রমে, মহিলাদের অনেকে নিঃশব্দে জপমালা ঘুরিয়ে চলেছে, আর মা উপস্থিত কারো সঙ্গে আলাপ করে যাচ্ছেন।[৮]

১৮ জুন, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

মধুময় রামকৃষ্ণ!—আজ সকালেই তোমার ডাক এসে পৌঁছল। আমি একাদশী করছি—মজা করে। সাদা শাড়ি পরেছি—আর সারাদিন মায়ের কাছাকাছি আছি।

মা যে কী—সবে বুঝতে পারছি। সেদিন সদানন্দ সম্বন্ধে বিকট মিথ্যা দুর্নামের বিরুদ্ধে সদানন্দকে সমর্থন করতে যদি তাঁকে দেখতে! আর আমার 'জেনানা' প্রবন্ধ বেরুবার পরে তিনি যখন শান্তভাবে বললেন, সন্তোষিণীর মা (প্রবন্ধের জন্য) তার ছবি তুলতে দিয়ে আসলে তাঁকেই সাহায্য করেছেন—তখন এর মূল্য আমার পক্ষে কতখানি ছিল—নিশ্চয় বুঝবে।

[নিবেদিতা কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজ-পরিচালিত বিখ্যাত সচিত্র পত্রিকা 'এম্‌প্রেস'-এ ভারতীয় অন্তঃপুরজীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের জন্য

---

[৭] The Mother says the Sri R. K. told her that Swami was even as I have loved to think him, a direct incarnation of the National God, and He Himself of Kali..............

[৮] শ্রীমায়ের কক্ষখানি নিবেদিতার চিরদিনের শান্তিমন্দির। শিল্পী শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর কাছে লেখা এক চিঠিতে আচার্য নন্দলাল জানিয়েছিলেন, রামচন্দ্রের বনগমনের শোকে দশরথের মৃত্যুদৃশ্য এঁকে তিনি নিবেদিতাকে দেখিয়েছিলেন; নিবেদিতা ছবিটির অংশবিশেষের বিরূপ সমালোচনা করলেও শেষে বলেছিলেন—'তবে ছবিটিতে শান্ত নির্জন পরিবেশ আছে; ঠিক শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়; তাই আমার বড় ভাল লাগছে।'

সদানন্দ ও সন্তোষিণীর মা নিজেদের ছবি তুলতে দেন। এ বিষয়ে ১৬ই মার্চের পত্রে নিবেদিতা লেখেন—

"Yesterday morning Mr. and Mrs. Parkar came to photograph the house and children for the Empress. They also photographed Sadananda, got up as a typical beggar."

পত্রিকা থেকে কয়েকটি ছবি সংগ্রহ করে আমরা পুনর্মুদ্রিত করেছি।।

৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে

[মেরী হেল ও সারদাদেবী একই ধারার নারী, এই কথা বলার পরে—]

দুজাতীয় নারী আছে। এক ধরনের নারীতে অপ্রতিরোধী সহন, যেমন সারদাদেবী, যেমন (মনে হয় ঠিকই বলছি) পুণ্যবতী মেরী। মেরী হেলও এই ধারায়।......

২৫ ডিসেম্বর, ১৯০০, ম্যাকলাউডকে

[নিবেদিতা এই সময়ে পাশ্চাত্ত্যে ছিলেন।]

তুমি যথাসময়ে (কলকাতা গিয়ে) মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে পারবে, আর মাতাঠাকুরাণীর কাছে যেতে পারবে—আমার কী যে ভাল লাগছে!......

উঃ! তুমি সদানন্দকে দেখবে, স্বরূপানন্দকে দেখবে, আর সেই সঙ্গে মাতাঠাকুরাণীকে !!! প্রায় বিশ্বাসই হচ্ছে না!

৪ জানুয়ারী, ১৯০১ ম্যাকলাউডকে

কী কাণ্ড! তুমি ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে মাতাঠাকুরাণীকে দেখবে! ভাবতেও অপূর্ব লাগে!

১১ জানুয়ারী, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

অনেক দিন ধরে মাতাঠাকুরাণীর জন্য উদ্বিগ্ন। গত মেলে পাওয়া চিঠিগুলিতে উদ্বেগের সমর্থন আছে। তাঁর কাছে ফিরে যেতে খুবই ব্যস্ত।

১৭ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

তোমার গতবারের চিঠি পড়লাম; শ্রীমা জোর দিয়ে বলেছেন—আমাকে ফিরে যেতেই হবে;—পড়ে খুবই আনন্দ হল। সারা (মিসেস বুল) যদিও উল্টো কথা বলছেন তবু ধরে নেওয়া যায় আমি বেরিয়ে পড়েছি।

২২ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মন-প্রাণ ব্যাকুল।

২৯ মার্চ, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে প্যারলে খুশী হব। তোমার মতই আমিও অনুভব করি, শ্রীমায়ের ইচ্ছা সব সময়েই ধ্রুব।

৩ মে, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

বিশেষ করে আমি শ্রীমায়ের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। শুনেছি তিনি বড় রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছেন।

১৩ জুন, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

সারদাদেবীর আবাসে ফিরে যেতে কী যে ব্যাকুল, কি করে বোঝাব? যত সব বাজেবাজে কাজ নিয়ে আছি।

৩ অক্টোবর, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে

[অ্যাংলিক্যান সিস্টারহুডের এক আশ্রমে নিবেদিতা কিছু সময় ছিলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা বিষয়ে—]

এটি অ্যাংলিক্যান ভগিনী-আশ্রম, রোমান নয়, সুতরাং সব কিছু ইংরাজীতে, ল্যাটিনে নয়। আবেগ সম্বন্ধে এখানে সংযম আছে, আমার কাছে যা সুন্দর মনে হয়। তবু এদের সমস্ত জীবনটি যেন প্রার্থনামন্দির—দেওয়ালের প্রতিটি পাথর যেন ঈশ্বরভক্তি ও শান্তির পবিত্র প্রভাবে পূর্ণ।

'গেস্ট মিসট্রেস' আমাকে বললেন, এই সম্প্রদায় ভক্তিসাধনার ব্যাপারে কঠোর নিয়মব্রতী। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমায়ের পূজা-অর্চনার পরিমাণের চেয়ে বেশী কিছু নয় দেখে গভীর তৃপ্তি পেলাম। এদের আরাধনা শুরু হয় সকাল ৬টায়, দিনের শেষ অনুষ্ঠান ৯॥ টায়। সব জুড়িয়ে প্রতিদিন সাধারণ উপাসনা ৪॥ ঘণ্টার। অবশ্য ব্যক্তিগত উপাসনাও সেই সঙ্গে আছে।

আহারাদির ব্যাপারে এদের আরও বাস্তববাদী দেখলাম। এঁরা বলেন, অনাহারে কাজ ও ধ্যান চলে না, এবং আমি কোনো খাওয়াই বাদ দিতে সাহস করিনি, কারণ যথেষ্ট না খেলেই জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয়। এ ব্যাপারে প্রাচ্যরীতির চেয়ে এঁদের বেশী প্রাজ্ঞ বলে মনে হয়নি। অবশ্য ব্যাপারটি আকর্ষণীয়। আমি এর থেকে সাহস পেয়েছি—যেহেতু স্কুলের কাজের জীবনের সঙ্গে ধ্যানের জীবনকে মেলাবার উপায় দেখা গেছে শারীরিক সামর্থ্যকে না কমিয়ে......

অপরপক্ষে স্বামীজী ও শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে চাই—আমার আকাঙ্ক্ষা তাতে কেন্দ্রীভূত।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯০১, মিসেস র‍্যাটক্লিফকে

[র‍্যাটক্লিফদের সন্তান-সম্ভাবনা হলে নিবেদিতা লেখেন—]

খুকী যখন জন্মাবে, আমি প্রথম তাকে নিয়ে যাব সারদাদেবীর কাছে আশীর্বাদের জন্য। সারদাদেবীকে আমরা 'হোলি মাদার' বলি; খুব সাদাসিধে হিন্দু রমণী তিনি, কিন্তু তবু আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।

[নিবেদিতার প্রত্যাশামত র‍্যাটক্লিফদের মেয়ে হয়নি, ছেলে হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য মিঃ র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন।]

২১ জানুয়ারী, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

সপ্তাহখানেকের মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর কলকাতায় আসার কথা। স্বামী সারদানন্দের বিশ্বাস, তিনি আর কখনও আমাদের কাছ থেকে সরে যাবেন না। একথা সত্য হবে—তাই বিশ্বাস করি।

২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

মাতাঠাকুরাণী এখন এখানে আছেন। কী ছোট্ট, রোগা আর কালো হয়ে গেছেন—গাঁয়ে থাকার কষ্টে শরীর যেন একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বের মতই সেই স্বচ্ছ বুদ্ধি, উন্নত মর্যাদা, নারীত্বের মহিমা—অবিকল। তাঁকে কত রকমের আরামে রাখতে যে সাধ আমার হচ্ছে! একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কম্বল, আরও কত কি দরকার। সব সময়ে ভিড়—লোকজন ঘিরে আছেই।...... তাঁকে একটি সুন্দর রঙিন ছবি দেবার ইচ্ছা। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি। ক্রিস্টিন তাঁকে তেমন বুঝতে পারে না। এতে আমি মজা পাই, কারণ ক্রিস্টিন আন্তরিকভাবেই সেকথা বলে। তবে ক্রিস্টিনের এ মনোভাব স্থায়ী হবে না। একদিন নিশ্চয় সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

কথায় কথায় জানাই, একটা কথা শুনে তুমি খুব খুশী হবে, যথার্থ মহত্ত্বের চেহারা আমি ক্রমেই বেশী করে ধরতে পারছি।

৩ মার্চ, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

মা-ঠাকরুণ এসে গেছেন। তেমনি আছেন আমাদের মা। যখন তিনি এখানে থাকেন—আমাদের আশ্রয় থাকে।

১৭ মার্চ, ১৯০৪, ওলি বুলকে

জানো, আজ থেকে ঠিক ৬ বছর আগে আমি মা-ঠাকরুনের চরণদর্শনে গিয়েছিলাম।

২৪ মার্চ, ১৯০৪

তোমার কথা মা-ঠাকরুণ সব সময়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে নিরন্তর ভালবাসা ও আশীর্বাদ পাঠান। মা-ঠাকরুন, আমাদের সেই চিরকালের মা-ই আছেন—সেই অবর্ণনীয় মহিমা আর মাধুর্যের নির্ঝর।

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁর একটি সদ্য-দর্শনের কথা বললেন; তিনি আমাকে গেরুয়া বস্ত্রে দেখেছেন। মনে হয়, যে কোনো সময়ে তিনি আমাকে গেরুয়া দিতে

পারেন। কিন্তু আমি তো নিতে পারব না। স্বামীজী আমাকে একটি জিনিস দিয়ে গেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত যা রক্ষা করতে হবে—ব্রহ্মচর্য।

১০ নভেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমাকে বললাম, তুমি এখনো তাঁর 'গণ্ডার কন্যা' রয়ে গেছ; তারপর এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের সুমহৎ উক্তিও শোনালাম। শ্রীমা আমার—মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি—কী যে মিষ্টি! সব সময়ে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

[বুদ্ধের মহাশক্তিপূর্ণ বাণী যে, স্বামীজী প্রায়ই উচ্চারণ করতেন, এবং বুদ্ধ-কথিত 'গণ্ডারবৎ' নিঃসঙ্গ বিচরণের কথা স্বামীজীর একান্ত মণ্ডলীমধ্যে যে সুপরিচিত কথা ছিল, তা 'আচার্যদেব' গ্রন্থ থেকে বুঝতে পারা যায়। বুদ্ধের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনাকালে স্বামীজী বলেছিলেন, 'মহর্ষি কপিলও এই দর্শনই প্রচার করেছিলেন কিন্তু তাঁর মহান শিষ্য (বুদ্ধ) ঐ দর্শনের মধ্যে হৃদয় সঞ্চারিত করে তাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।' বুদ্ধের মহাবাণীতে আলোড়িত-হৃদয় স্বামীজী ক্ষণকাল নীরব থেকে ধর্মপদের মধ্যে মানবাত্মার প্রতি যে অমর আদেশ ঘোষিত, আবৃত্তি করেছিলেন সেই কথাগুলি—

পথহীন পথে অগ্রসর হও!
নির্ভয়ে, বিনা ভ্রূক্ষেপে
একাকী বিচরণ করো গণ্ডারের মতো।
শব্দে ভীত নয় সিংহ,
জালে বদ্ধ নয় বায়ু,
জলে লিপ্ত নয় পদ্মপত্র—
নিঃসঙ্গ এদেরি মতো, বিচরণ করো গণ্ডারের মতো।]

৮ ডিসেম্বর, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে

শ্রীমায়ের চরণদর্শনে সদ্য গিয়েছিলাম। সেই ধ্রুব মন্দির থেকে তাঁর আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি তোমাকে।

৫ মার্চ, ১৯০৫, ওলি বুলকে

শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু—শিশু ভগবান। শিশুর কাছে কেউ কিছু চায়! দিতে হয় সব কিছু তাকে। আকাশ বাতাস তাই পূজায় পূজায় পূর্ণ। সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজছে, মধু! মধু! জীবন কর্মহীন, অর্থহীন—আঃ ভাবতেও অসীম শান্তি! সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর—এ সব কিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মত। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতই তাঁর সঙ্গ—বিশেষতঃ যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ!

[পূজার আসনে শ্রীমায়ের মূর্তি নিবেদিতাকে এমনই অভিভূত করত যে এ বিষয়ে তিনি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন—"১৯০৫ সালে মা বাগবাজারে ছিলেন। ঐ বৎসর ৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে নিবেদিতা সকালে

উঠিয়াই মঠে গিয়াছিলেন। মঠ হইতে ফিরিয়া শ্রীমার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পূজায় বসিয়াছেন। সেই পূজারতা মূর্তির দিকে চাহিয়া নিবেদিতার অন্তর এক প্রশান্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, 'শ্রীমা যখন পূজা করিতে বসেন, তাঁহাকে কী সুন্দর দেখায়! সেই মুহূর্তে আমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসি।'"]

৫ এপ্রিল, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকে

[নিবেদিতা এই সময়ে মারাত্মক অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের পথে—]

গতকাল শ্রীমা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমার বিপদমুক্তিতে কত না খুশী। এমন ভালবাসায় ভরা মুখ আমি কোথাও দেখিনি।

৪ মে, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকে

প্লেগের গতিক মন্দ, শ্রীমা শীঘ্রই কলকাতা ছেড়ে যাবেন শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু শুনছি খুব শীঘ্র যাবার সম্ভাবনা কম। এটা বুদ্ধির কাজ নয়। মাকে ঘিরে থাকে নানা মানুষ, যারা তাঁর ভালোত্বের সুযোগ নেয়, আর সারাক্ষণ সেইসব তাঁকে সইতে হয়।

[মুক্তিপ্রাণার জীবনীতে পাই, "১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'উদ্বোধন'-বাটীতে শ্রীমার শুভ পদার্পণ হয়। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে নিজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া নিবেদিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ম্যাকলাউডকে লিখিলেন, 'বহুদিন পরে নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া ও শ্রীমার সান্নিধ্যলাভ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত।'"]

১১ ডিসেম্বর, ১৯০৯, সারদাদেবীকে

[মিসেস ওলি বুলের (সারা সি বুল) অসুখে মরণাপন্ন অবস্থার কথা শুনে নিবেদিতা দ্রুত আমেরিকা যান। সেখান থেকে শ্রীমাকে নিম্নের পত্রটি লেখা—]

আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গীর্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই মেরীর কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা; সব কিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম, অভাগী সারার রোগের ঘরটিকে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ। আর মাগো, জানো কি, ভাবলাম—সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময়ে তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা করে কি বোকামিই করতাম! কেন বুঝিনে যে, তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাটাই সব—সব কিছু! মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই; তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা। সেই যে রবিবারটি—কয়েক মাস আগে, পুণ্যভরা সেই দিনটিতে গঙ্গাস্নান সেরে

হয়ে তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য, তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে, আর কি যে শান্তি আর মুক্তি বোধ করেছিলাম তোমার বাঞ্ছিত আবাসে! প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে! সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়। আমরা তোমার কাছে খুব শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করবার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বৈকি! সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।

বেচারা সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিও। রাগদ্বেষের অতীত সমুচ্চ শান্তিতে সমাহিত থাকে না কি তোমার ভাবনা! তা কি পদ্মপাতার শিশিরবিন্দুর মত ভগবানের বুকের শিহরিত ভালবাসা নয়—যা পৃথিবীকে স্পর্শ করে না কখনো!

প্রিয়তমা মা আমার, তোমার চিরকালের বোকা খুকী, নিবেদিতা।

[একটি অখণ্ড গীতিকবিতার মত এই চিঠিটি লিখবার আশু কারণ,—"১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর বস্টনে নিবেদিতা মিসেস বুলের জন্য গীর্জায় প্রার্থনা করিতে যান। প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজের ডায়েরীতে লেখেন, 'গীর্জায় গিয়াছিলাম। সারদাদেবীকে আমাদের মেরীমাতা বলিয়া মনে হইল। তাঁহার সান্নিধ্য শুদ্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়, আমরা সকলেই তাঁহার (শ্রীমার)মত হই।'"]

[শ্রীমা ও নিবেদিতার শেষ পর্যায়ের সংযোগ সম্বন্ধে নিবেদিতার জীবনী থেকে অল্প কিছু উদ্ধৃত করছি :

"৭ই এপ্রিল (১৯১১)......ধীরে ধীরে জাহাজ বোম্বাই আসিয়া থামিল। শেষ বারের মত নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন।......৯ই এপ্রিল তিনি অতি পরিচিত বোসপাড়া লেনের বাড়িতে পদার্পণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।......১১ই এপ্রিল শ্রীমা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর পুরী হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐ দিনই নিবেদিতা উদ্বোধনে গিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। শোকার্ত হৃদয় শ্রীমার স্নেহকরস্পর্শে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিল। মিসেস বুলের দেহত্যাগে শ্রীমা, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখ করিয়া শ্রীমা অনেক কথা বলিলেন।

শ্রীমার এবার কলিকাতায় বাস অল্পদিনের জন্য; মাসখানেক পরে, ১৭ই মে তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। শেষ বারের মত তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভের সুযোগ নিবেদিতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত কাজ ফেলিয়া তিনি ছুটিয়া যাইতেন শ্রীমার নিকট। তাঁহার অন্তরে কে যেন সর্বদা বলিতেছে, 'আর সময় নাই, যাহা করিবার সত্বর করিয়া লও।'......এবার গ্রীষ্মাবকাশে পুনরায় মায়াবতী। ১২ই

যে মায়াবতী রওনা হইলেন। সঙ্গে সস্ত্রীক ডক্টর বসু ও অরবিন্দ বসু। হয়ত দিন তিনি উদ্বোধন-বাড়িতে গিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীমার সহিত ইহাই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ।"

নিবেদিতার রচনায় সারদাদেবী

['আচার্যদেব' (*The Master*) গ্রন্থে নিবেদিতা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে শ্রীমা সম্বন্ধে তাঁর মোট বক্তব্য তুলে ধরেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি এখানে সংকলিত ও অনূদিত—]

(ভারতীয় নারীদের শিক্ষার) এই পরিকল্পনা কার্যকর করবার জন্য আমি নভেম্বরের (১৮৯৮) শুরুতে একলা কলকাতায় ফিরে এলাম। স্টেশন থেকে শহরের উত্তরপ্রান্তে তখনি পোঁছে যেতে আমার অসুবিধা হয়নি। সেখানকার মেয়েদের মধ্যে বাস করবই, এমন একটা কঠোর জেদ ধরে বসলাম। ঘটনাক্রমে স্বামীজী তখন কলকাতায় সন্ন্যাসীদের স্থানীয় আস্তানারূপ এক ভক্তগৃহে বাস করছিলেন। তাঁর মারফৎ আমার থাকার বিষয়ে কথাবার্তা চলতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদাদেবী, যাঁকে নিজেদের মধ্যে আমরা মাতাঠাকুরাণী ('হোলি মাদার') বলি—সঙ্গিনীগণসহ নিকটেই বাস করছিলেন। তাঁর বাড়ির একটি খালি ঘরে সেইদিনই আমার ঠাঁই হল।

জীবনের কোনো কোনো ঘটনার দিকে ফিরে তাকিয়ে আমরা অনুভব করি যে, ঐসব ক্ষেত্রে আমাদের সাহস আমাদের অজ্ঞতারই সৃষ্টি। আর তা বিধাতারই দান! নচেৎ সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধানই বা হত কি করে! কিন্তু তবু—যদি আমি সত্যই তখন অনুভব করতে পারতাম, আমার ঐ হঠকারিতার দ্বারা আমার নিরপরাধ আশ্রয়দাত্রী শুধু নন, তাঁর আত্মীয়গণও দূর গ্রামে কি রকম সামাজিক গণ্ডগোলের সম্মুখীন হবেন—তাহলে তখন যা করেছিলাম, কদাপি তা করতাম না।* যেভাবেই হোক, আমি সেখান থেকে সরে যেতাম। উল্টোপক্ষে তখন কিন্তু আমার ধারণা ছিল, জাতিভেদ নির্বোধ ব্যক্তিগত কুসংস্কারমাত্র, জ্ঞানের দ্বারা তাকে দূর করা কর্তব্য, বিদেশীদের মধ্যে অপরিচ্ছন্ন আচরণের সম্ভাবনা কল্পনা করে নিয়ে এ-ধরনের কুসংস্কার গড়ে উঠেছে। এমনি বর্জনযোগ্য কুসংস্কারের অস্তিত্ব উক্ত ভারতীয় মহিলার মধ্যে রয়েছে—একথা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে তাঁর আতিথ্য আদায় করে নিলাম।

---

* শ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী গ্রামে 'সমাজের খুব বাঁধাবাঁধি' থাকায় ব্যক্তিগত শত উদারতা সত্ত্বেও জয়রামবাটী যাওয়ার জন্য নিবেদিতার ইচ্ছায় শ্রীমার পক্ষে সম্মতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে 'মায়ের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে পাই—

'একবার ভগিনী নিবেদিতা মার দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'না মা, আমি বেঁচে থাকতে তোমরা সেখানে যেও না; তাহলে আমায় তারা ঠেকো (একঘরে) করবে।'

সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব সর্বজয়ী হল। আমি সমাজে গৃহীত হলাম। সপ্তাহখানেক, কি দিন দশেকের মধ্যে কাছাকাছি একটি বাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল আমার জন্য। তাহলেও আমি শ্রীমার ঘরে সারা দুপুর কাটাতাম। তারপর গ্রীষ্ম এলে তাঁর স্পষ্ট আদেশে তাঁর বাড়িতেই শুতে হল আমাকে, যেহেতু সেখানে কিছু ভাল বন্দোবস্ত ছিল। অন্য কোনো ঘরে নয়, সকলের সঙ্গেই এক ঘরে শুতাম;—সাদাসিধে ঘরটি ঠাণ্ডা, লাল রঙের মেঝে তার, মেঝেয় সার সার মাদুর ও বালিশ পাতা, এবং মশারি টাঙানো।

অদ্ভুত এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলাম। নীচের তলায় সদর দরজার পাশের এক ঘরে এক সন্ন্যাসী থাকেন (স্বামী যোগানন্দ), আবাল্য কঠোর তপশ্চর্যার ফলে পরিণত যৌবনে যিনি ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে উপনীত। তাঁর ঘরেই আমি বাংলা শিক্ষার জন্য যেতাম। পিছনের রান্নাঘরে তাঁর এক শিষ্য, ও একজন ব্রাহ্মণ পাচক কাজকর্ম করতেন। ছাত ও বারান্দাসমেত সমস্ত উপরতলাটা, আর নিকটের গঙ্গার দৃশ্য—মেয়েদেরই দখলে ছিল।

আমাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যিনি কর্ত্রী—তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তাঁর জীবনের ইতিহাস সর্ববিদিত। পাঁচ বৎসর বয়সে পরিণয়, আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁকে স্বামীর বিস্মরণ, তারপরে মায়ের অনুমতি নিয়ে গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামী সমীপে গমন, বিবাহবন্ধনের কথা স্বামীর স্মরণে আসা, কিন্তু যে-জীবন বরণ করেছেন তারই আদর্শের কথা পত্নীকে শোনানো, উত্তরে, ঐ জীবনপথের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনা করে স্বামীকে গুরুরূপে বরণ করে পত্নী কর্তৃক শিক্ষাপ্রার্থনা,—এ সমস্ত কথাই বহু কথিত। তারপর থেকে তিনি বহু বছর পরম আনুগত্যের সঙ্গে স্বামীর কাছে বাস করেছেন, দক্ষিণেশ্বরের বাগানেরই একটি কক্ষে থাকতেন,—একই সঙ্গে সহধর্মিণী ও সন্ন্যাসিনী এবং শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিষ্যা। তরুণ বয়সেই শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। সে বিষয়ে শান্তভাবে জানাতেন, কতদিকে তাঁর শিক্ষা প্রসারিত ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিখুঁতভাবে কাজ করা পছন্দ করতেন; প্রদীপের সরঞ্জাম পর্যন্ত দিনের বেলায় কোথায় গুছিয়ে রাখতে হয় তাও শিক্ষা দিতেন। দুখ-চেটে ভাব ঠাকুরের সইত না; কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা সত্ত্বেও তিনি জীবনের লাবণ্য ও সৌন্দর্য ভালবাসতেন, আচরণের শান্ত মর্যাদার পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময়ের একটি কাহিনী: পত্নী একদিন উৎফুল্ল শিশুর মত গর্বভরে স্বামীর কাছে এক ঝুড়ি ফল ও শাকসব্জী এনে হাজির করেন; তাতে স্বামী গম্ভীর হয়ে বলেন, 'এত বাড়াবাড়ি খরচ কেন?' 'অন্ততঃ আমার জন্য নয়', বলে নীরব অশ্রুতে নয়ন ভরে তরুণী পত্নী চলে গেলেন —তাঁর মুখের উজ্জ্বলতা লুপ্ত হয়েছে সহসা আঘাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থির হয়ে পড়লেন। কাছের ছেলেদের ডেকে বললেন ব্যাকুলভাবে, 'ওরে, তোদের মধ্যে কেউ গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আন। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তিও উড়ে যাবে।'

শ্রীমা এমনই প্রিয় ছিলেন ঠাকুরের কাছে। অথচ মায়ের চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, আরাধ্য স্বামীর বিষয়ে কথা বলবার সময়ে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাস কখনো ফোটে না। স্বামীর প্রতিটি কথাকে সফল করবার জন্য তিনি

সর্বাবস্থায়, বিপদে বা সম্পদে সুমেরুবৎ অটল,—কিন্তু সেই স্বামীকে তিনি 'ঠাকুর' বা 'গুরুদেব' ছাড়া কিছু বলেন না, কখনো স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে আত্মগরিমাযুক্ত একটি কথাও তাঁকে বলতে শোনা যায়নি। তাঁকে জানে না এমন কারো পক্ষে তাঁর কথাবার্তা থেকে কোনোমতে অনুমান করা সম্ভব নয় যে, চারপাশের অন্য কারো থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে তাঁর দাবি অধিকতর বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর! শিষ্যার মধ্যে পত্নী হারিয়ে গেছে দীর্ঘদিন আগে, যদিও পত্নীর পরম বিশ্বস্ততাটুকু রয়ে গেছে। তথাপি তাঁর প্রতি সকলের ভক্তির সীমা নেই, প্রতি ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়, যেমন দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, তাঁর সঙ্গে ট্রেন-ভ্রমণকালে তিনি তলার বেঞ্চে থাকলে উপরের বাঙ্কে উঠবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। তাঁর উপস্থিতিই যে একটা দিব্য ব্যাপার।

সারদাদেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী,—এই কথাই সর্বসময় আমার মনে হয়েছে। কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, না, নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ? প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সমন্বয় সরলতম নারীজীবনেও কিভাবে করা সম্ভবপর, তাঁকে দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আমার কাছে তাঁর অধ্যাত্মমহিমার মতই অপূর্ব ঠেকেছিল তাঁর সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য, তাঁর উদার মুক্ত মনের মহিমা। যত নূতন বা জটিল সমস্যাই তাঁর কাছে উপস্থিত করা হোক, আমি কখনো তাঁকে উদার ও মহৎ সিদ্ধান্তজ্ঞাপনে কুণ্ঠিত দেখিনি। এক দীর্ঘ নীরব প্রার্থনার মত তাঁর সমগ্র জীবন। ব্রহ্মণ্যশাসিত সমাজের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হলেও তিনি প্রতি ক্ষেত্রে নিজেকে পরিবেশের উপরে উন্নীত করতে পারেন। অপকৃষ্ট আচরণে যদি কেউ পীড়িত করে থাকে তাঁকে—আর কিছু না করে এক সঘন বিচিত্র নীরবতায় নিজেকে গুটিয়ে নেন। যদি কেউ তাঁর অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী সামাজিক সমস্যার যন্ত্রণার কথা জানায়, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিতে ঘটনার মর্মে প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে সমাধানের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। আর যখন কঠোরতার প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে কোনোরকম বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হন না। যে-ব্রহ্মচারীকে আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শাস্তি দিয়েছেন, তাকে তদ্দণ্ডেই স্থানত্যাগ করে চলে যেতে হবে—তাঁর আদেশ। তাঁর দৃষ্টিতে সাধুর আচরণ যে লঙ্ঘন করেছে, সে কখনই তাঁর সাক্ষাতে আসতে অনুমতি পাবে না। এই ধরনের দোষী এক ব্যক্তিকে একদা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'দেখছ না, ওর ভিতরের নারীমহিমাকে আঘাত করেছ তুমি —সর্বনাশ!'

কিন্তু তবু তিনি 'সুরে সঙ্গীতে নিত্য পূর্ণ'—তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার আক্ষরিক পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর অধ্যাত্মসন্তানদের একজন বলেছিলেন, 'আর পূর্ণ মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়।' যে-ঘরে তিনি পূজাদি করেন, তা ভরপুর থাকে পরম স্নিগ্ধতায়।

শ্রীমা পড়তে পারেন। রামায়ণ পাঠে অনেক সময় কাটে। কিন্তু লিখতে পারেন না। তবু মনে করার কারণ নেই তিনি অশিক্ষিত নারী। সাংসারিক অথবা ধর্মীয় বিষয় পরিচালনায় দীর্ঘ কঠিন অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই শুধু, অধিকন্তু ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি দর্শনের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে।

সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে মানবের পক্ষে সর্বোচ্চ-সম্ভব আত্ম-বিকাশের সৌভাগ্য তিনি পেয়েছেন। বিরাটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে অসচেতনে বহন করেছেন। তার গরিমাকে পূর্ণোচ্চারিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, যখন তিনি যে-কোনো নূতন ভাব বা অনুভূতির মর্মভেদ করেন অবিলম্বে, যথার্থভাবে।

মাতাঠাকুরাণীর এই ক্ষমতার পরিচয় প্রথম ভালভাবে উপলব্ধি করি কিছুদিন আগে এক ইস্টার-দিবসে যখন তিনি আমাদের আবাসে এসে দর্শন দেন। এর আগে তাঁর সঙ্গ করার সময়ে তাঁর ভাবধারা অনুধাবনে আমি এত বেশী মগ্ন থাকতাম যে, বিপরীত ভূমিকায় তাঁকে লক্ষ্য করার কথা মনেই হয়নি। শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীরা সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখার পরে ঠাকুরঘরে বসে খৃস্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আমাদের ছোট ফরাসী অর্গানযোগে ইস্টারের গীতবাদ্য করা হল। খৃস্টের পুনরুত্থান-স্তোত্র শ্রীমার কাছে অজ্ঞাত ও বিদেশীয় হলেও যে-রকম দ্রুত তার মর্মানুভব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে উন্মোচিত হল—সারদাদেবীর ধর্মসংস্কৃতির মহিমা কি বিরাট! এই একই ক্ষমতা শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ-পূত শ্রীমার সঙ্গিনীদের মধ্যে অল্পাধিক দেখা যায়। কিন্তু সারদাদেবীর মধ্যে তার প্রভার ও শক্তি অসীম—সে এক সমৃদ্ধ শিক্ষার অভ্রান্ত ফলশ্রুতি।

এই গুণেরই বিকাশ লক্ষ্য করেছিলাম এক সন্ধ্যাকালে, যখন নিজ ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে আসীন মাতাঠাকুরাণী আমাকে ও আমার গুরুভগিনীকে ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি বর্ণনা করতে বললেন। প্রচুর হাসিখুশীর মধ্যে আমরা বর, কনে, 'খৃস্টান পুরুত' প্রভৃতির বর্ণনাসহ ব্যাপারটা কি বললাম। কিন্তু বিবাহ-প্রতিজ্ঞাটি শুনে তাঁর মনে যে ভাবোদয় হল, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। 'সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শান্তিতে অশান্তিতে যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে,'—কথাগুলি শোনামাত্র সকলেই 'আহা—হা!' করে উঠলেন আনন্দে, কিন্তু শ্রীমার পরিতৃপ্তিই সর্বাধিক। বারবার কথাগুলি তিনি শুনতে চাইলেন; বারবার বললেন, 'কী অপূর্ব ধর্মকথা! কী অপূর্ব ধর্মকথা!'

শ্রীমায়ের আবাসে দিনগুলি শান্তি ও মাধুর্যে ভরা। প্রত্যুষের অনেক আগেই সকলে একে একে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে, বিছানার মাদুরের উপর থেকে চাদর ও বালিশ সরিয়ে, তার উপরে স্থির হয়ে বসেন, মুখ ফেরানো থাকে দেওয়ালের দিকে, হাতে ঘুরতে থাকে জপের মালা। তারপরে ঘর পরিষ্কারের ও স্নানাদির সময় আসে। পর্বের দিনে শ্রীমা এক সঙ্গিনীর সঙ্গে পালকীতে গঙ্গাস্নানে যান। তার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণ পড়েন। তারপরে নিজের ঘরে মা পূজায় বসেন। অল্প-বয়সীরা প্রদীপ জ্বালায়, ধূপ-ধুনা দেয়, গঙ্গাজল, ফুল ও পূজার জোগাড় করে। এই সময়ে গোপালের মা-ও এসে নৈবেদ্য তৈরীতে সাহায্য করেন। তারপর দুপুরের আহার ও বিকালের বিশ্রাম; সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঝি লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের কথালাপের মধ্যে; সকলে উঠে পড়ে; পট বা বিগ্রহের সামনে আমরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করি, গোপালের মা ও শ্রীমায়ের পদধূলি নিই, কিংবা

বাধ্য মেয়ের মত মায়ের সঙ্গে ছাতে উঠি গিয়ে, তুলসীতলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসি; বহুভাগ্য তার, যে মায়ের পাশে তাঁর সন্ধ্যা ধ্যানের সময়ে বসবার অনুমতি পায়,—মায়ের সব পুজোর শুরু ও শেষ যে গুরু-প্রণামে, সেই প্রণাম করতে শেখে স্বয়ং মায়ের কাছ থেকে।

নিবেদিতা প্রসঙ্গে সারদাদেবী

আমরা আগেই দেখেছি শ্রীমা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন—ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টিগুলি নীরব শান্ত, যেমন শ্রীমা। শ্রীমার অপার্থিব স্নেহ তাই কখনই 'শব্দমুখর' নয়। এবং নিবেদিতা সম্বন্ধে তাঁর মুখ থেকে বেশী কথা আশা করতেও পারি না। তবু 'মায়ের কথা' গ্রন্থে অল্প যা-কিছু সংগৃহীত হয়ে আছে তার স্নেহগভীরতার তুলনা নেই। শুধু স্নেহ নয়, মাতা তাঁর এই কন্যাকে শ্রদ্ধাও করেছেন। সারদাদেবী নিবেদিতা সম্বন্ধে বলেছেন 'যেন দেবী!'—এর থেকে বড় ভাগ্য অপেই হওয়া সম্ভব!

'মায়ের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীমা ও নিবেদিতার এক সাক্ষাতের বর্ণনা আছে—

"সিস্টার নিবেদিতা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। মা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি ছোট পশমের তৈয়ারী পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, 'আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।' সিস্টার উহা পাইয়া আনন্দে একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, আর বলেন, 'কি সুন্দর, কি চমৎকার!' আবার আমাদের দেখান এবং বলেন, 'কি সুন্দর মা করেছেন দেখ!' মা বলিলেন, 'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী! নরেনকে কী ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!'

সিস্টার দার্জিলিঙ যাইবেন সেইকথা মাকে বলিতেছেন। রাধু আসিলে মা তাহাকে বলিলেন, 'দিদিদের প্রণাম কর, রাধু!' সুধীরা দিদি বলিলেন, 'না, না, থাক্। ও আবার আমাদের নমস্কার করবে কি?' মা বলিলেন, 'তোমরা দিদি, তোমাদের নমস্কার করবে না?' "......

এর পরে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর সারদাদেবীর বিদ্যালয়-দর্শনের একটি বিবরণ পাই :

"একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, 'মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর।' সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মার গাড়ি আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ি হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুর-দালানে বসাইলেন। মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি

দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ পদ্যটি।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ ত শিখেছে মেয়েরা!' পরে সিস্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।"

সরলাবালা সরকার ঐ ঘটনাটি এবং শ্রীমার সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের রূপ তাঁর নিবেদিতা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

"বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী (সারদাদেবী) কখনো কখনো আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্ততঃ তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ঐ সময়ে সেইরূপ-ভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটনেই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ-হাস্যে চাহিতেন, তখন মায়ের আদরে বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে-আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন সেদিন তাঁহার যে-আনন্দ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐ সময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন।

"মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল; ঐ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্র-পুষ্প আনাইয়া গৃহদ্বারে টাঙাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সংবর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মত অকারণ কেবলই

হাসিতেছেন, আবার কখনও-বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনও দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।"

'মায়ের কথা' গ্রন্থে পাই—

মা—......নিবেদিতা বলেছিল, 'মা, আমরাও বাঙালী, কর্মের ফেরে খ্রীষ্টান হয়ে জন্মেছি।' ওদেরও এই শেষ জন্ম। (২৪-৪-১৯১২)

মুক্তিপ্রাণার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি :

"শ্রীমাকে নানা জিনিস উপহার দিবার প্রবল বাসনা নিবেদিতার হৃদয়ে জাগিত, কিন্তু উহা পূর্ণ হইবার পথে বাধা ছিল অর্থাভাব। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে (১৯০৯) তিনি শ্রীমা ও রাধুর জন্য নানা দ্রব্য কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি যে সামান্য জিনিস উপহার দিতেন, শ্রীমা তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতেন। একবার তিনি একটি জার্মান সিলভারের কৌটা দিয়াছিলেন। শ্রীমা উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখিতেন। বলিতেন, 'পূজোর সময় কৌটাটি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে।' নিবেদিতাপ্রদত্ত একখানি এণ্ডির চাদর জীর্ণ হইয়া গেলেও মা ফেলিয়া দিতে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন, 'ওখানি নিবেদিতা কত আদর করে আমায় দিয়েছিল; ওখানি থাক।' তিনি সেই ছেঁড়া এণ্ডির ভাঁজে ভাঁজে কালজিরা দিয়া তুলিয়া রাখিলেন; বলিলেন, 'কাপড়খানিকে দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কি মেয়েই ছিল, বাবা! আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম কথা কইতে পারত না। ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাংলা শিখে নিলে।"

ভগিনী নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে (সম্পাদক, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ) প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে; নিবেদিতার মূর্তিটি তাতে সুন্দর ফুটেছে। তার মধ্যে পাই—

"শ্রীশ্রীমাকে দেখেই ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এত উচ্চ হয়েছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বুঝি তাঁকে বলেছেন, 'আমাদের মেয়েরা তো ignorant— অজ্ঞ—' কথার মাঝখানে মহা উত্তেজিত নিবেদিতা প্রতিবাদ করলেন, 'ভারতবর্ষের মেয়েরা অজ্ঞ কখনই নয়—ওদেশের (তিনি নিজের জন্মভূমিকে ওদেশ বলতেন) মেয়েদের মুখে এমন সব জ্ঞানের কথা কখনও শোনা গেছে কি?'"

নিবেদিতার অকালে দেহত্যাগ শ্রীমার মাতৃহৃদয়কে কতখানি আঘাত করেছিল, তা অনুমেয়, কিংবা ঠিক ভাবে বলতে গেলে, আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। তাঁর বেদনাকাতর হৃদয়ের যে অল্পকিছু প্রকাশ আমরা পেয়েছি, তাই উপস্থিত করছি। নিবেদিতার দেহান্তের অব্যবহিত পরেই সরলাবালা সরকার লিখিত 'নিবেদিতা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটি থেকে কিছু অংশ বিশেষতঃ শ্রীমায়ের প্রতি নিবেদিতার অসীম ভক্তির বর্ণনাটুকু শ্রীমার কাছে পাঠ করা হলে মাতা-

ঠাকুরাণী স্নেহে ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। এ সম্বন্ধে 'মায়ের কথা'র প্রথম খণ্ডে পাই—

"(১লা আষাঢ় ১৩১৯) বেলা প্রায় চারটা, শ্রীশ্রীমা অনেক স্ত্রী-ভক্তসঙ্গে বসে আছেন।......আমি গৌরীমাকে দিয়ে নীচে অফিস ঘর হতে 'নিবেদিতা' ও 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই দুখানি আনালুম। আমার ইচ্ছা, মা 'নিবেদিতা' বইখানির কিছু শুনেন। মাও বই দেখে বলছেন, 'ওখানি কি বই গা?' আমি বললুম—'নিবেদিতা।' মা বললেন, 'পড়ত মা, একটু শুনি সেদিন আমাকেও একখানি ঐ বই দিয়ে গিয়েছে, এখনও শোনা হয় নি।' যদিও অত লোকের মধ্যে পড়তে লজ্জা করতে লাগল তথাপি নিবেদিতার সম্বন্ধে সরলাবালা কেমন সুন্দর লিখেছেন, তা মাকে শোনাবার আগ্রহে ও মায়ের আদেশে পড়তে আরম্ভ করলুম। শ্রীশ্রীমা ও সমবেত স্ত্রী-ভক্তেরা সাগ্রহে শুনতে লাগলেন। নিবেদিতার ভক্তির কথা পড়তে সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। দেখলুম, মায়ের চোখ দিয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ঐ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, 'আহা, নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল! আমার জন্য যে কি করবে ভেবে পেত না! রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে, একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধুলো নিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিতেও সংকুচিত হচ্ছে।' কথাগুলি বলেই মা নিবেদিতার কথা ভেবে স্থির হয়ে রইলেন। তখন উপস্থিত সকলেও নিবেদিতার কথা যা জানতেন বলতে লাগলেন। দুর্গাদিদি বললেন, 'ভারতের দুর্ভাগ্য যে তিনি এত অল্পদিনে চলে গেলেন।' অপর একজন বললেন, 'তিনি যেন ভারতেরই ছিলেন। নিজেও তাই বলতেন। সরস্বতীপূজার দিন খালি পায়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে বেড়াতেন।' পুস্তকপড়া শেষ হল। শ্রীশ্রীমা তখনও মাঝে মাঝে নিবেদিতার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান, মা?'

অনুরূপ আর একটি বর্ণনা ('মায়ের কথা' দ্বিতীয় খণ্ডে)—

"যেবার সিস্টার নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়, সেবার সুধীরা দিদির খুব অসুখ হয়। তাহার জন্য মার কি ভাবনা!...সুধীরা দিদি আরোগ্যলাভ করিলে, তিনি, আমি ও সিস্টার ক্রিস্টিন একদিন সন্ধ্যার সময় মার বাড়িতে যাইলাম। আরতির পর আমরা প্রণাম করিয়া বসিতেই মা সুধীরা দিদিকে বলিলেন, 'সেরেছ মা?' সুধীরা দিদি বলিলেন যে, অনেকটা সারিয়াছেন, তবে সাবধানে আছেন। মা বলিলেন, 'তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল।......এই নিবেদিতাটি গেল, আবার তোমার অসুখ—শুনে ভাবি, সুধীরা গেলে স্কুল চালাবে কে? (সিস্টার ক্রিস্টিনকে লক্ষ্য করিয়া) আহা, দুটিতে একসঙ্গে ছিলে, এখন একলা থাকতে কত কষ্ট হবে। আমাদেরই তার জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার ত আরও বেশী হবে মা। কি লোকই ছিল! তার জন্য আজ কত লোক কাঁদছে!' বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন।"

লিজেল রেম'কে স্বামী অসিতানন্দ যেসব তথ্য পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে শ্রীমা ও নিবেদিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে সংবাদ আছে। অসিতানন্দ লেখেন—

"ভগিনী সম্বন্ধে আমার কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। আমার ধারণা গড়ে উঠেছে স্বয়ং শ্রীমা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, এবং স্বামী সারদানন্দের কাছ থেকে শোনা কথার উপরে। ভগিনী এঁদের সঙ্গে বহু সময় কাটাতেন, সুতরাং আমি যে তথ্য দেব, তার প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত।

আপনি হয়ত জানেন, হিন্দু মেয়েরা সিন্দুর ব্যবহার করে। একদিন শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী নিবেদিতার কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়েছিলেন। নিবেদিতাকে তাতে ভারী সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শ্রীমা খুব খুশী হলেন। পাঁচ বছরের মেয়েকে যেমন চুমু খায়, তেমনি চুমু খেয়ে আদর করলেন। শ্রীমা নিবেদিতাকে গভীর, অতি গভীরভাবে ভালবাসতেন। 'আমার প্রাণের সরস্বতী' বলে প্রায়ই ডাকতেন। নিবেদিতাও মায়ের আদরে গলে যেতেন।

প্রায় প্রতি বিকালে নিবেদিতা শ্রীমার কাছে এসে পদধূলি নিতেন। প্রতি রবিবার অবশ্যই আসতেন শ্রীমার ঘর পরিষ্কারের জন্য। বিছানা ঝাড়া, মেঝে পরিষ্কার করা, সাবান জলে দরজা জানালার কাঁচ ধোওয়া—এইসব করে চারদিক ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে তুলতেন। এ-কাজকে নিবেদিতা পরম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিতান্ত অনুগত সন্তানের মত তিনি সেবা করতেন। শ্রীমার সামান্যতম সুখসুবিধার জন্যও ব্যস্ত থাকতেন।

নিবেদিতা বাংলা জানতেন না বলে শ্রীমার সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার পক্ষে গোড়ায় গোড়ায় অসুবিধা হত। তখন আভাসে ইঙ্গিতে কথা চালাতে হত। দুজনেই অসীম বুদ্ধিমতী বলে তাঁরা চালিয়ে যেতে পারতেন। এইসব অসুবিধা কাটাবার জন্য, ভালভাবে শ্রীমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ চেষ্টায় নিবেদিতা বাংলা শিখে নেন। এর পর শ্রীমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিতা ধর্মোপদেশ নিতেন, যোগীন-মা বা গোলাপ-মার কাছ থেকেও, যাঁরা নিবেদিতাকে হিন্দু পুরাণ-কাহিনী শোনাতেন।

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কালে নিবেদিতা অবশ্যই স্বামী সারদানন্দের কাছ থেকে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছিলেন। দারুণ অসুবিধার সম্মুখীনও তাঁকে হতে হয়েছিল। তখনকার হিন্দু সমাজ বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোয় উৎসাহী ছিল না, বিশেষ করে স্কুল বা কলেজের শিক্ষায়। নিবেদিতা খালিপায়ে পথ হেঁটে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের ধরতেন, যাতে তাঁরা বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠান। সেলাই শেখবার জন্য তিনি মেয়েদের বিনামূল্যে কাপড় দিতেন—কাপড়ের উপরে শিল্পকর্ম করতে হত; শিল্প ও উপযোগিতা. দুইই যাতে সম্পন্ন হয়, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। কাটবার সময়ে বা কাজ করবার সময়ে কাপড় যদি নষ্ট হয়ে যেত, তিনি বিন্দুমাত্র রাগ না করে নতুন কাপড় দিতেন। ছুঁচ সুতোও তিনিই দিতেন। অর্থাৎ মেয়েদের সূচীশিল্পে দক্ষ করবার জন্য তিনি যৎপরোনাস্তি করতেন। ওদিকে রক্ষণশীল পরিবারের লোকেরা ম্লেচ্ছ অহিন্দুর সঙ্গে এই মেলামেশা

পছন্দ করত না। কিন্তু নিবেদিতার অপূর্ব ভালবাসায় এইসব বাধা ক্রমে দূর হয়ে গেল। তিনি মোটামুটি সব বাড়িতেই আদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন।

একবার নিবেদিতা ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমার কাজের কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন, 'নিবেদিতা আমার মেয়ে; ঠাকুরকে ভোগ রেঁধে নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোনো দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।'"

নিবেদিতার উদ্দেশ্যে লিখিত শ্রীমায়ের একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। স্বামী সারদানন্দ ১১ই এপ্রিল, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের এক পত্রে নিবেদিতাকে লেখেন, শ্রীশ্রীমা কুশলে আছেন। তোমাকে এক সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন। আমি মূল পত্রের সহিত উহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতেছি। মনে হয় পত্রের ইংরাজী অনুবাদ পাইলে তুমি আনন্দিত হইবে।*

মূল বাংলা চিঠিখানি পাওয়া যায়নি, সারদানন্দকৃত ইংরাজী অনুবাদই পাওয়া গিয়েছে। মুক্তিপ্রাণা ঐ ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ করেছেন দু'এক লাইন বাদ দিয়ে। আমরা বর্জিত অংশ যুক্ত করে অনূদিত পত্রটি তুলে দিচ্ছি :

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

জয়রামবাটী
২১শে চৈত্র

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু,

স্নেহের খুকী নিবেদিতা, তুমি আমার ভালবাসা জানিও। তুমি আমার নিত্য শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি। আমার কাছে তোমার যে ফটোটি রহিয়াছে, তাহার দিকে অনেক সময় চাহিয়া থাকি; তখন মনে হয়, তুমি যেন আমাদের মধ্যেই রহিয়াছ। তুমি কবে, কোন্ বৎসরে ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি। ব্রহ্মচর্যপূত হৃদয়ে আমার জন্য যে প্রার্থনা জাগিয়াছে তাহা যেন পূরণ হয়। আমার শারীরিক কুশল। আমি আনন্দে আছি। ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন, এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন। তুমি সত্বর ভালয় ভালয় ফিরিয়া এস, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম সম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূরণ করুন; ভাবী আশ্রমটি যেন সকলকে যথার্থ ধর্ম শিক্ষা দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করে।

---

* শ্রীমায়ের চিঠি যেমন স্বামী সারদানন্দ বাংলা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করে নিবেদিতার কাছে পাঠিয়েছেন, তেমনি নিবেদিতার ইংরাজী চিঠিও তিনি বাংলায় অনুবাদ করে শ্রীমাকে শোনাতেন। ২৭শে জুন, ১৮৯৯-তে সারদানন্দ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—'মার্গটের চিঠি নিয়ে সারদাদেবীর কাছে গিয়েছিলুম, অনুবাদ করে পড়ে শোনাবার জন্য।'

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণবায়ুস্বরূপ—তিনি নিজের বন্দনামন্ত্র নিজেই গান করিতেছেন, তুমি সেই নশ্বর সকল বস্তুর মধ্যেই সেই নিত্যসংগীত শুনিতেছ। বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত সকলই প্রভুর স্তোত্র গাহিতেছে। দক্ষিণেশ্বরে বটবৃক্ষ মা কালীর গান করিতেছে নিশ্চয় জানিও, যার কান আছে সে শুনিতে পায়।

শ্রীমতী ওয়াটারম্যানের গভীর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া খুশী হইলাম। যে অনুভব করে দেহ গত হইলেও তাহার প্রিয়তম হারাইয়া যায় নাই—সেই যথার্থ আলোক পাইয়াছে। আমার কথা শুনিয়া সে বল পাইয়াছে, একথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সে যেন তোমার কাজের সহায় হয়। শ্রীমতী মে রাইট সীওয়েলকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিবে।

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ কর, ইহাই প্রার্থনা। বাস্তবিক তুমি অতি চমৎকার কাজ করিতেছ। কিন্তু বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা যখন তুমি ফিরিয়া আসিবে, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিব না। ধ্রুব, সাবিত্রী, সীতা-রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র জীবনকাহিনী সাংসারিক সকল বৃথা বাক্যালাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রভুর নাম ও লীলা উভয়ই কত সুন্দর!

তোমার
মাতাঠাকুরাণী

নিবেদিতা লিখেছেন, যখন তিনি শ্রীমায়ের চিঠিটি মিসেস ওয়াটারম্যানের কাছে পড়ে শুনিয়েছিলেন, তখন তিনি গভীর আনন্দে বলে ওঠেন—'আহা! কি মধুময় প্রাণ!' মিসেস ওয়াটারম্যানের এই উক্তিকে নিবেদিতা মনে করেন, পত্রের গদ্য সম্বন্ধে সুন্দরতম উক্তি।

নিবেদিতা শ্রীমায়ের চিঠি পেয়ে এতই উল্লসিত হন যে, চিঠিটির নকল মিসেস ওলি বুলকে পাঠিয়ে লেখেন (১৩-৫-১৯০০)—'মাতাঠাকুরাণীর চিঠির এই নকল পেয়ে তুমি নিশ্চয় খুশী হবে।' এই চিঠি আমাদের বিশ্বাস মিস ম্যাকলাউড প্রমুখ অন্তরঙ্গদেরও নিবেদিতা পাঠিয়েছিলেন, কারণ গভীর তৃপ্তিকর কোনো প্রাপ্তি ঘটলে তার অংশ তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুমণ্ডলীকে না দিয়ে পারতেন না।

এই চিঠির নিবেদিতাকৃত নকলের একটি রেম-সংগ্রহে রয়েছে।

গোপালের মা ও নিবেদিতা

গোপালের মা'র সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর শেষজীবনে তাঁকে সেবা করতে পাওয়াকে নিবেদিতা পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করেছিলেন। গোপালের মা সিদ্ধ-তাপসী, বালগোপালের দর্শনে ও লীলায় তিনি মগ্ন থাকতেন, সে গোপালকে ও শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি অভেদ দেখেছিলেন। বাৎসল্যরসমধুর তাঁর কাহিনী একালের ধর্ম-সাহিত্যের মহাসম্পদ, শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক রচনার তুল্য, অথচ সমস্ত ব্যাপারটিই বাস্তব। 'গোপালের মা' নামক ক্ষুদ্র জীবনী-পুস্তিকাটি নিবেদন করতে গিয়ে ভূমিকায় এর বাস্তবতার পক্ষে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন—

"আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত গোপালের মা'র অদ্ভুত দর্শনাদির কথা পাঠককে এখানে উপহার দিতেছি। যাঁহারা মনে করিবেন, আমরা উহা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা ইহাতে মুন্সীয়ানা কিছুমাত্র ফলাই নাই।...... উহা সংগ্রহ করিয়াছি এমন সব লোকের নিকট হইতে, যাঁহারা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ যথাযথ বলিবার প্রয়াস পান, না পারিলে অনুতপ্তা হন, এবং 'কামারহাটির বামনীর' স্তাবক হওয়া দূরে যাউক কখনও কখনও তদনুষ্ঠিত কোনো কোনো আচরণের তীব্র সমালোচনাও আমাদের নিকট করিয়াছেন।"

নিবেদিতার সঙ্গে গোপালের মা'র সংযোগের কথা বলবার আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করছি। এক্ষেত্রে স্বামী সারদানন্দকে অনুসরণ করব।

গোপালের মা'র আসল নাম অঘোরমণি দেবী, বাল্যবিধবা হওয়ার জন্য ভাই নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামারহাটির বাড়িতে বাস করতেন। নীলমাধব কলকাতার পটলডাঙার সম্পন্ন মুৎসুদ্দি গোবিন্দচন্দ্র দত্তের বাড়ির পুরোহিত, সেইসূত্রে উক্ত দত্ত মহাশয়ের বিধবা গৃহিণীর সঙ্গে অঘোরমণির পরিচয় ঘটে, এবং তিনি কামারহাটিতে গঙ্গাতীরে গোবিন্দচন্দ্র দত্তের যে বৃহৎ ঠাকুরবাড়ি ছিল, তার একান্তে আশ্রয় নেন, ধর্মজীবন যাপনের সুবিধার জন্য।

অঘোরমণি অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্তা, এবং অতীব নিষ্ঠাবতী। দিবারাত্র জপে ও পূজায় রত। তিরিশ বছরের উপর কঠোর তপশ্চর্যার পরে, তাঁর বয়স যখন ষাট, তখন তাঁর জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ এল ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের হেমন্তকালে, কয়েকজন সঙ্গিনীর সঙ্গে যখন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে। প্রথম সাক্ষাতের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাবভক্তির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। অপরদিকে গোপালের মাও অব্যক্ত টান বোধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। তারপর—

"প্রথম দর্শনের অল্পদিন পরে জপ করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিবার ইচ্ছা হইবামাত্র দুই-তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'এসেছ, আমার জন্য কি এনেছ দাও।' গোপালের মা বলেন, 'আমি তো

একেবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন করে সে 'রোঘো' (খারাপ) সন্দেশ বার করি —একে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিস খাওয়াচ্ছে—আবার ছাই ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!' ভয়ে লজ্জায় কিছু না বলিতে পারিয়া সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুর উহা মহা আনন্দ করিয়া খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আনো কেন? নারকেল-নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারী—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।' গোপালের মা বলেন, 'ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, এইরূপে কেবল খাবার কথাই হতে লাগল, আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেছি,—কেবল খাইখাই; আমি গরীব কাঙ্গাল লোক—কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক, আর আসব না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েছি, অমনি যেন পেছন থেকে তিনি টানতে লাগলেন! কোনমতে এগুতে আর পারি না! কত করে মনকে বুঝিয়ে টেনে-হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি।' ইহার কয়েকদিন পরেই আবার 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' চচ্চড়ি হাতে করিয়া তিন মাইল হাঁটিয়া পরমহংসদেবের দর্শনে উপস্থিত। ঠাকুরও পূর্বের ন্যায় আসিবামাত্র উহা চাহিয়া খাইয়া 'আহা! কি রান্না, যেন সুধা, সুধা!' বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গোপালের মা'র সে আনন্দ দেখিয়া চোখে জল আসিল। ভাবিলেন —তিনি গরীব কাঙ্গাল বলিয়া তাঁহার এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন।

এইরূপে দুই-চারি মাস ঘনঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত হইতে লাগিল। যেদিন যা রাঁধেন, ভাল লাগিলেই তাহা পরের বারে ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার সময় ব্রাহ্মণী কামারহাটি হইতে লইয়া আসেন। ঠাকুরও তাহা কত আনন্দ করিয়া খান, আবার কখনো-বা কোনো সামান্য জিনিস, যেমন সুষনি শাকচচ্চড়ি, কলমী শাকচচ্চড়ি ইত্যাদি আনিবার জন্য অনুরোধ করেন। কেবল 'এটা এনো, ওটা এনো', আর 'খাই খাই'-র জ্বালায় বিরক্ত হইয়া গোপালের মা কখনো কখনো ভাবেন, 'গোপাল, তোমায় ডেকে এই হলো? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল খেতে চায়! আর আসবো না। কিন্তু সে যে কী এক বিষম টান! দূরে গেলেই আবার কবে যাব, কতক্ষণে যাব, এই মনে হয়।'......

এইভাবে কিছুকাল কাটার পরে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে এমন একটি ব্যাপার ঘটল, যা গোপালের মা'র ব্যক্তিজীবনকে অধ্যাত্মরসপিপাসু সর্বমানবের আকর্ষণের বস্তু করে তুলল (এবং শিল্পীর আকর্ষণের বস্তুও; আমরা নন্দলালের আঁকা কয়েকটি স্কেচ এইসঙ্গে দিয়েছি) :

"'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময়ে জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে

আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার নিকটে বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুঠো করার মত দেখা যাইতেছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন, এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট, জীবন্ত! ভাবিলেন, 'একি! এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে, কেমন করে হেথায় এলেন!' গোপালের মা বলেন, 'আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐকথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'গোপাল' বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসছে! তারপর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশমাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এতবড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখ পানে চেয়ে (সে কী রূপ! আর কী চাউনি!) বললে, 'মা, ননী দাও।' আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা! চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়—বাড়িতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হত! কেঁদে বললুম, 'বাবা, আমি দুখিনী কাঙালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা।'

কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল 'খেতে দাও' বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে শিকে থেকে শুকনো নারকেল-নাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বললুম, 'বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।'

'তারপর জপ সেদিন আর কে করে! গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমনি সকাল হল, অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চললো—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর দুলছে।'

অঘোরমণি যে-দিন ঐরূপ সহসা নিজ উপাস্যদেবতার দর্শনলাভে ভাবে-প্রেমে উন্মত্তা হইয়া কামারহাটির বাগান হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট প্রত্যুষে আসিয়া উপস্থিত হন, সেদিন সেখানে আমাদের পরিচিতা অন্য একটি স্ত্রীভক্তও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিব। তিনি বলেন—

'আমি তখন ঠাকুরের ঘরটি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করছি—বেলা সাতটা কি সাড়ে-সাতটা হবে। এমন সময় শুনতে পেলুম বাহিরে কে 'গোপাল গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে ঠাকুরের ঘরের দিকে আসছে। গলার আওয়াজটা পরিচিত—ক্রমেই নিকট হতে লাগল। চেয়ে দেখি গোপালের মা!—এলো-খেলো পাগলের মত, দুই চক্ষু যেন কপালে উঠেছে, আঁচলটা ভুঁয়ে লুটোচ্ছে, কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নেই—এমনি ভাবে ঠাকুরের ঘরে পূব দিক্‌কার দরজাটি দিয়ে ঢুকছে। ঠাকুর তখন ঘরের ভেতর ছোট তক্তপোশখানির উপর বসেছিলেন।

'গোপালের মাকে ঐরূপ দেখে আমি তো একেবারে হাঁ হয়ে গেছি—এমন সময়ে তাঁকে দেখে ঠাকুরেরও ভাব হয়ে গেল। ইতিমধ্যে গোপালের মা এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়লো এবং ঠাকুরও ছেলের মত তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন। গোপালের মা'র দুই চক্ষে তখন দর দর করে জল পড়ছে, আর যে ক্ষীর সর ননী এনেছিল, তাই ঠাকুরের মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছে। আমি তো দেখে অবাক আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, কারণ ইহার পূর্বে কখনও যে ঠাকুরকে ভাব হয়ে কোনো স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতে দেখিনি। শুনেছিলুম বটে, ঠাকুরের গুরু বামনীর কখনও কখনও যশোদার ভাব হত, আর ঠাকুরও তখন গোপালভাবে তার কোলে উঠে বসতেন। যা হোক্, গোপালের মা'র ঐ অবস্থা আর ঠাকুরের ভাব দেখে আমি তো একেবারে আড়ষ্ট। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে ভাব থামলো, এবং তিনি আপনার চৌকিতে উঠে বসলেন। গোপালের মার কিন্তু সে ভাব আর থামে না। আনন্দে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে' ইত্যাদি পাগলের মত বলে, আর ঘরময় নেচে নেচে বেড়ায়। ঠাকুর তাই দেখে হেসে আমাকে বললেন—'দেখ, দেখ, আনন্দে ভরে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে।'......

অঘোরমণি ঐরূপভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ভাবের আধিক্যে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেদিন কত কথাই না বলিলেন। 'এই যে গোপাল আমার কোলে'; 'ঐ তোমার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ভেতর ঢুকে গেল'; 'ঐ আবার বেরিয়ে এল—আয় বাবা দুঃখিনী মা'র কাছে আয়'—ইত্যাদি বলিতে বলিতে দেখিলেন চপল গোপাল কখনো-বা ঠাকুরের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, আবার কখনো-বা উজ্জ্বল বালক-মূর্তিতে তাঁহার নিকট আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব বাল্যলীলাতরঙ্গ-তুফান তুলিয়া তাহাকে বাহ্য জগতের কঠোর শাসন, নিয়ম প্রভৃতি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল।

অদ্য হইতে অঘোরমণি বাস্তবিকই 'গোপালের মা' হইলেন, এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে থাকিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মা'র ঐরূপ অপরূপ অবস্থা দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, শান্ত করিবার জন্য তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন, এবং ঘরে যতকিছু ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী ছিল, সে-সব আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। খাইতে খাইতেও ভাবের ঘোরে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল, 'বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে, পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েছে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করছো!' ইত্যাদি।

সমস্ত দিন কাছে রাখিয়া, স্নানাহার করাইয়া, কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে কামারহাটি পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিবার সময় ভাবদৃষ্ট বালক গোপালও পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণীর কোলে চাপিয়া চলিল। ঘরে ফিরিয়া গোপালের মা পূর্বাভ্যাসে জপ করিতে বসিলেন; কিন্তু সেদিন আর কি জপ করা যায়! যাঁহার জন্য জপ, যাঁহাকে এতকাল ধরিয়া ভাবা,—সে যে সম্মুখে নানা রঙ্গ, নানা আবদার করিতেছে!

ব্রাহ্মণী শেষে উঠিয়া গোপালকে কাছে লইয়া তক্তপোশের উপর বিছানায় শয়ন করিল। ব্রাহ্মণীর যাহাতে-তাহাতে শয়ন—মাথায় দিবার একটি বালিশও ছিল না। এখন শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই—গোপাল শুধু-মাথায় শুইয়া খুঁত খুঁত করে! অগত্যা ব্রাহ্মণী আপনার বাম বাহুপরি গোপালের মাথা রাখিয়া তাহাকে কোলের গোড়ায় শোয়াইয়া কত কি বলিয়া ভুলাইতে লাগিল—'বাবা, আজ এই রকমে শো; রাত পোয়ালেই কাল কলকেতা গিয়ে ভূতোকে (দত্ত গৃহিণীর বড় মেয়ে) বলে তোমায় বিচি ঝেড়ে বেছে নরম বালিশ করিয়ে দেব' ইত্যাদি।

পূর্বেই বলিয়াছি গোপালের মা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া গোপালকে উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন, সকাল-সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে। এইরূপে মায়ে-পোয়ে কাঠকুড়ানো হইল—তাহার পর রান্না। রান্নার সময়ও দুরন্ত গোপাল কখনো কাছে বসিয়া, কখনো পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল, কত কি বলিতে লাগিল, কত কি আবদার করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণীও কখনো মিষ্টকথায় তাহাকে ঠান্ডা করিতে লাগিলেন, কখনো বকিতে লাগিলেন।"

গোপালের মার অপূর্ব কাহিনী আরও বলেছেন সারদানন্দ। আমি আর একটু মাত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করব, যেখানে সংশয়ী ও যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথের সামনে ভাবের ও বিশ্বাসের এই প্রতিমাকে দাঁড় করিয়ে দিব্য কৌতুক বোধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

"এই সময়ে একদিন গোপালের মা ও শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ, উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথের তখনও ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদে বেশ ঝোঁক; ঠাকুরদেবতা, পৌত্তলিকতায় বিশেষ বিদ্বেষ; তবে এটা ধারণা হইয়াছে যে, পুতুল, মূর্তি-টুর্তি অবলম্বন করিয়াও লোক নিরাকার সর্বভূতস্থ ভগবানের কাছে পৌঁছায়। ঠাকুরের রহস্যবোধটা খুব ছিল। একদিকে এই সর্বগুণান্বিত সুপণ্ডিত, মেধাবী, বিচারপ্রিয়, ভগদ্ভক্ত নরেন্দ্রনাথ, এবং অপরদিকে গরীব কাঙ্গালী, নামমাত্রাবলম্বনে শ্রীভগবানের দর্শন ও কৃপা-প্রয়াসী সরলবিশ্বাসী গোপালের মা, যিনি কখনও লেখাপড়া জ্ঞানবিচারের ধার দিয়াও যান নাই—উভয়কে একত্র পাইয়া এক মজা বাধাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী যেরূপে বালগোপালরূপী ভগবানের দর্শন পান এবং তদবধি গোপাল যেভাবে তাঁহার সহিত লীলাবিলাস করিতেছেন, সে সমস্ত কথা শ্রীযুত নরেন্দ্রের নিকট গোপালের মাকে বলিতে বলিলেন। গোপালের মা ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তাতে কিছু দোষ হবে না তো, গোপাল?' পরে ঐ বিষয়ে ঠাকুরের আশ্বাস পাইয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে গদ্‌গদস্বরে গোপালরূপী শ্রীভগবানের প্রথম দর্শনের পর হইতে দুইমাস কাল পর্যন্ত যত লীলাবিলাসের কথা আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন—কেমন

করিয়া গোপাল তাঁহার কোলে উঠিয়া, কাঁধে মাথা রাখিয়া কামারহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সারাপথ আসিয়াছিল, আর তাঁহার লাল টুকটুকে পা দুখানি তাঁহার বুকের উপর ঝুলিতেছিল, তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন; ঠাকুরের অঙ্গে কেমন মাঝে-মাঝে প্রবেশ করিয়া আবার নির্গত হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়াছিল; শুইবার সময় বালিশ না পাইয়া বারবার খুঁতখুঁত করিয়াছিল; রাঁধিবার কাঠ কুড়াইয়াছিল এবং খাইবার জন্য দৌরাত্ম্য করিয়াছিল—সমস্ত কথা সবিস্তার বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে বুড়ী ভাবে বিভোর হইয়া গোপালরূপী শ্রীভগবানকে পুনরায় দর্শন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের বাহিরে কঠোর জ্ঞান-বিচারের আবরণ থাকিলেও ভিতরটা চিরকালই ভক্তিপ্রেমে ভরা ছিল—তিনি বুড়ীর ঐরূপ ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির কথা শুনিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। আবার বলিতে বলিতে বুড়ী বারবার নরেন্দ্রনাথকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙ্গালী, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—তোমরা বল, আমার এসব তো মিথ্যা নয়?' নরেন্দ্রনাথও বারবার বুড়ীকে আশ্বাস দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, 'না মা, তুমি যা দেখেছ সে সব সত্য।' "[১]

গোপালের মা'র সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের তারিখ নিবেদিতার জীবনীকার আত্মপ্রাণা ও মুক্তিপ্রাণার মতে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়িতে, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে। মিস্ মুলার ও জনৈক রাখালবাবুর সঙ্গে মিস্ নোবল দক্ষিণেশ্বর পরিদর্শনের পরে পূর্বোক্ত স্থলে যান। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, "ঘাটে অবতরণের পূর্বেই উৎসবের কোলাহল শোনা গেল।......শত শত বাঙালী যুবক অপেক্ষা করিতেছে কখন স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিবেন।...... মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি পূর্বেই আসিয়াছিলেন।......এখানেই সঞ্চরণশীল জনতার মধ্যে তাঁহারা জীর্ণ বস্ত্র-পরিহিতা, জপে মগ্ন গোপালের মা'র প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। গোপালের মা'র কথা ইঁহারা পূর্বেই অবগত ছিলেন। ......গোপালের মা চিবুক স্পর্শ করিয়া বিদেশিনীগণকে সস্নেহ চুম্বন করিলেন। কেহ কাহারও ভাষা বোঝেন না, সুতরাং আলাপের প্রশ্ন ওঠে না, প্রয়োজনও ছিল না। গোপালের মা'র স্পর্শে তাঁহারা এক আন্তরিকতা অনুভব করিলেন। কোন কথা না বলিয়া গোপালের মা তাঁহাদের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরিকাগণের নিকট

---

১ এই ঘটনাটি নিবেদিতা স্বয়ং স্বামীজীর মুখেও শুনেছেন। Sister Nivedita's Works-এর প্রথম খণ্ডে (পৃ ৩৬৫-৬৬) পাই—

"And he told us of old Gopaler-Ma,—of how she came with her stories of visions and images, and Sri Ramakrishna sent her to 'that youngman who has had an English education and taken a degree. He is a university man—you can trust his decision'—And she came, with tears, saying 'O Sir, tell me if they are true or not!' And what could he say? From that moment his opposition was broken down, and he knew, as he put it to us later, that 'Kali and Shivas are not mere imagination. They are the forms that the Bhaktas have seen."

লইয়া গেলেন। এখানেও বিস্ময়ের সহিত সাদর অভ্যর্থনা। মার্গারেটের মনে হইল, এইরূপেই ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত মনীষার পরিমাপ করা যাইতে পারে।"[২]

মুক্তিপ্রাণা গোপালের মা'র বাড়িতে নিবেদিতা, ওলি বুল ও ম্যাকলাউডের এক যাত্রা-বিবরণ দিয়েছেন :

"স্বামীজীর নিকট গোপালের মা'র কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিবেদিতা, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, একরাত্রে (১৮৯৮) তাঁহারা তিনজনে বাগবাজার হইতে নৌকা করিয়া কামারহাটি যাত্রা করেন।......পাশ্চাত্ত্য মহিলারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—গোপালের মার আনন্দের সীমা রহিল না।"

এখানে লেখার ভঙ্গিতে যদিও মনে হয়, এই রাত্রেই গোপালের মা'র সঙ্গে উক্ত তিন পাশ্চাত্ত্য মহিলার প্রথম সাক্ষাৎ, তথাপি লেখিকা-প্রদত্ত পূর্বোদ্ধৃত তথ্য অনুযায়ী একে পরবর্তী এক সাক্ষাৎ বলেই ধরে নেব। এখানে এই সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে চাই—গোপালের মা'র বাড়িতে এই নৈশ অভিযানে 'সম্ভবত' নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন না, মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডই গিয়েছিলেন, এবং প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁদের অপূর্ব অভিযানের কথা নিবেদিতাকে বলেন। সে বর্ণনা নিবেদিতার মনে এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে পরেও অনেক সময়ে চিঠিপত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"দক্ষিণেশ্বরে বড়দিনের রাত্রির কথা মনে পড়ে—কিংবা গোপালের মা'র বাড়িতে তোমার অভিযানের কথা, যাতে আমি না থাকলেও ছিলাম বলেই অনুভব করি।" (ম্যাকলাউডকে—১৮ মে, ১৯০০)

"তোমার কি মনে পড়ে—তুমি এবং ধীরা মাতা চাঁদনি রাতে গোপালের মাকে তাঁর গঙ্গাতীরের আবাসে দর্শন করতে গিয়েছিলে।" (ম্যাকলাউডকে—১৮ জুলাই, ১৯০৬)

নিবেদিতা The Master গ্রন্থে চাঁদনি রাতে এই ভ্রমণ এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মনে হয়, তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তা ঠিক নয়; এখানে ধরে নিতে হবে, ম্যাকলাউড প্রভৃতির মুখ থেকে শুনে ব্যাপারটিকে তিনি কল্পনায় বাস্তববৎ দর্শন করেন, এবং তদনুযায়ী বর্ণনা করেন, যা করতে তাঁর কোনই

---

২ স্বামী জগদীশ্বরানন্দের 'সাধিকামালায়' প্রথম সাক্ষাতের ভিন্ন বিবরণ পাই—"গোপালের মা নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম দেখেন, সেদিন স্বামী সদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাগবাজারের রাস্তায় উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। গোপালের মা সদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও গুপ্ত, এটা কে রে? এ কি নরেনের মেয়ে যে তার সঙ্গে এসেছে?' তখন ব্রাহ্মণী নিবেদিতাকে সস্নেহে দু'একটি কথা বলিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার ডান হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। নিবেদিতা পরে বলিতেন—'যখন গোপালের মা আমার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন, আমার দেহ আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, রোমাঞ্চ হইল, প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দের প্রবাহ বহিল, নূতন প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিলাম।'" কোন্ সূত্রে জগদীশ্বরানন্দ এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা জানান নি, আমাদেরও জানা নেই।

অসুবিধা হয়নি যেহেতু পরবর্তীকালে গোপালের মা'র বাড়িতে তিনি অনেকবারই গিয়েছেন।[৩]

নিবেদিতা, মিসেস বুল ও ম্যাকলাউডের একত্রে একবার গোপালের মার দর্শনে যাত্রার কথা স্বামী সারদানন্দও জানিয়েছেন, কিন্তু সেটি ঠিক কবে ঘটেছিল তা আমরা জানি না—

"*শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর* সারা (মিসেস বুল), জয়া (ম্যাকলাউড) ও নিবেদিতা যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁহারা একদিন গোপালের মাকে কামারহাটিতে দর্শন করিতে যান এবং তাঁহার কথায় ও আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হন। তমাদের মনে আছে, গোপালের মা সেদিন তাঁহার গোপালকে তাঁহাদের ভিতরেও অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করেন, আপনার বিছানায় সাদরে বসাইয়া মুড়ি, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি যাহা ঘরে ছিল তাহা খাইতে দেন, ও জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার দর্শনাদির কথা তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বলেন। তাঁহারাও উহা সানন্দে ভক্ষণ ও তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং ঐ মুড়ির কিছু আমেরিকায় লইয়া যাইবেন বলিয়া চাহিয়া লন।"

বর্ণনা-ভঙ্গিতে মনে হয়, এই সাক্ষাৎকারকালে স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি দোভাষীর কাজ করেন।

গোপালের মা'র বিষয়ে নিজের সমগ্র মনোভাবকে নিবেদিতা সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন 'আচার্যদেব' গ্রন্থের মধ্যে :

"গোপালের মা অতি বৃদ্ধা রমণী। পনের কি কুড়ি বছর আগে, যখনই তিনি যথেষ্ট প্রাচীনা, সেই সময়ে একদিন দুপুরে তাঁর কামারহাটির গঙ্গাতীরের ছোট ঘরটি থেকে পায়ে হেঁটে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন।[৪] শোনা যায়, ঠাকুর যেন তাঁরই প্রত্যাশায় দ্বারে অপেক্ষা করছিলেন।

---

৩ এখানে মুক্তিপ্রাণা-প্রদত্ত আর একটি তথ্যের সম্পূর্ণ সত্যতা স্বীকারে বাধা আছে। তিনি লিখেছেন—"যে মালায় জপ করিয়া গোপালের মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেটি নিবেদিতা অতি যত্নে নিজের কাছে রাখিয়া দেন।" কিন্তু স্বামী সারদানন্দ বলেন, গোপালের মা'র গোপাল-সিদ্ধির পরে তাঁর অতিরিক্ত জপের প্রয়োজনীয়তা নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলায় গোপালের মা 'থলি মালা সব' গঙ্গার জলে ফেলে দেন; পরে পুনশ্চ ঘরে একটি *জপের মালা নেন*, কারণ 'একটা কিছু তো করতে হবে! চব্বিশ ঘণ্টা করি কি? তাই গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।' এখানে মুক্তিপ্রাণার পক্ষে জানানো দরকার, জপের মালার ব্যাপারে তিনি স্বয়ং নিবেদিতাকে অনুসরণ করেছেন, এবং নিবেদিতার উক্তির সঙ্গে সারদানন্দের উক্তির পূর্বোক্ত প্রকারের পার্থক্য আছে।

৪ নিবেদিতার এই বিবরণের সঙ্গে সারদানন্দের বিবরণের পার্থক্য আছে। সারদানন্দ জানিয়েছেন, গোপালের মা কামারহাটির *গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুরবাড়ি* থেকে বিধবা দত্ত গৃহিণী ও কামিনী নাম্নী দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ার সঙ্গে নৌকাযোগে (পায়ে হেঁটে নয়) দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। এখানে আমরা নিবেদিতার চেয়ে সারদানন্দের বিবরণকেই নির্ভরযোগ্য মনে করি। প্রথম দর্শনের পরে অবশ্য গোপালের মা একলা পায়ে হেঁটেই শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে যেতেন।

অপরদিকে এই ব্রাহ্মণীও—গোপালকৃষ্ণের আরাধনা যিনি এতদিন করে এসেছেন—ঠাকুরের মধ্যে সেই বালগোপালকে দর্শন করে অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হন।[৫] ঠাকুরের প্রতি তাঁর এই গোপালভাব এতই গভীর সত্য হয়ে উঠেছিল যে অতঃপর আর কখনো তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন নি—কেননা ঠাকুর তাঁকে মা বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি মাতাঠাকুরাণীকে কখনো 'বৌমা' ভিন্ন বলেছেন, এমন শুনিনি।

"শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে থাকাকালে আমি গোপালের মাকে কলকাতায় কখনো শ্রীমায়ের কাছে থাকতে, বা কয়েক সপ্তাহ একাদিক্রমে কামারহাটিতে কাটাতে দেখেছি। সেখানে, কামারহাটিতে, তাঁর দর্শনে আমাদের মধ্যে কয়েকজন গিয়েছিলেন এক পূর্ণিমা রজনীতে। অপরূপ সুন্দর গঙ্গার মধ্য দিয়ে নৌকা ধীরে ধীরে বয়ে গিয়েছিল। নদীজল থেকে উঁচু চত্বরের দিকে উঠে-যাওয়া দীর্ঘ সার সার সিঁড়িগুলি—তাও কত অপূর্ব!—সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে, ঘাসে-ঢাকা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে, দক্ষিণে আবৃত অবরোধতুল্য বারান্দায় ছোট্ট একটি ঘর, হয়তো সেটি বৃহৎ অট্টালিকাপ্রান্তে ভৃত্যদের জন্যই নির্মিত হয়েছিল—সেই ঘরেই গোপালের মা'র ঠাঁই, সেই ঘরেই বছরের পর বছর ধরে জপ। অট্টালিকা এখন শূন্য। তাঁর ছোট ঘরটিতেও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্য ব্যবস্থা নেই। পাথরের মেঝে, সেই মেঝেতেই শয়ন। অতিথিদের বসবার জন্য যে মাদুর পেতে দিলেন, তা তাকে তোলা ছিল—সেখান থেকে পেড়ে এনে মেঝেয় বিছিয়ে দিলেন। তাঁর সঞ্চয়ের মধ্যে দুটি মুড়ি আর কিছু বাতাসা, একটি মাটির হাঁড়িতে করে শিকেয় ঝোলানো ছিল, শুধু তাই দিয়েই হল অতিথি সৎকার। জায়গাটি কিন্তু ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। গঙ্গাজল কষ্ট করে তুলে এনে অবিরত ধোয়া-মোছা করেন। কাছের এক কুলুঙ্গীতে এক খণ্ড রামায়ণ, ভাঙাচোরা বড় চশমাখানি, জপের মালার সাদা ছোট ঝোলাটি। এই মালা জপ করেই গোপালের মা সিদ্ধ হয়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—কত বছর!—দিবারাত্র এই মালা হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে কাটিয়েছেন।

"সিত উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মাথা নাড়িয়ে কানাকানি করছে কৃষ্ণচ্ছায়াবৎ বৃক্ষ লতা গুল্মাদি—সে যেন কোন্ মর্মরশুভ্র স্বপ্নলোকে। কিন্তু সুগভীর শান্তির চিরমন্দিরের মত গোপালের মা'র ক্ষুদ্র কক্ষটির চেয়ে বড় স্বপ্নলোক আর কী হতে পারে আমাদের দ্রুত ধাবমান জীবনের কাছে! 'আ—হা!—এই হল পুরাতনী ভারতবর্ষ—তোমরা যা দেখে এলে!' স্বামীজী এই স্থানদর্শনের কথা শুনে বলেছিলেন,—'এই হল বেদনা ও প্রার্থনার ভারতবর্ষ! উপবাস ও নিষ্ঠার ভারতবর্ষ! এ ভারত চলে যাচ্ছে—আর ফিরবে না কোনোদিন!'

"কলকাতায় এসে জনৈক ইউরোপীয়ের সঙ্গে একই বাড়িতে অবস্থানের ব্যাপারে গোপালের মা'র আশী বছরের সংস্কার হয়তো কিছু বেশীই আহত হয়েছিল। কিন্তু একবার তা কাটিয়ে ওঠার পরে তিনি উদারতার প্রতিমূর্তি। অবশ্যই তিনি রক্ষণশীল, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বদ্ধমূল গোঁড়া কদাপি নন। দৈনন্দিন

[৫] এই দর্শন ও অনুভূতি প্রথম সাক্ষাৎকালে হয়নি, পরে হয়েছিল।

জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে শ্রীমায়ের বাড়ির পূজার্চনারীতির সঙ্গে তাঁর গঙ্গাতীরে তপস্যাকুটীরের কোনো পার্থক্যই তাঁর মনে ওঠেনি।"[৬]

গোপালের মা'র তপস্যায় বাঁধা কঠোর নিষ্ঠার জীবনে বহু তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে,—তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। 'ভাতের হাঁড়ির' ব্যাপারে একদা যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শকে পর্যন্ত ডরিয়েছেন,[৭] তিনিই পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের বাড়িতে ম্লেচ্ছ বিদেশীর সঙ্গে একত্র থেকেছেন এবং আরও পরে উক্ত ম্লেচ্ছ মহিলার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছেন জীবনসন্ধ্যায়।[৮]

মুক্তিপ্রাণার জীবনীতে পাই—গোপালের মা অসুস্থ ও বার্ধক্যে অশক্ত হয়ে পড়লে স্বামী সারদানন্দ তাঁকে ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। তখন পর্যন্ত কলকাতায় শ্রীমায়ের নির্দিষ্ট বাসস্থান ঠিক না হওয়ায় নিবেদিতা প্রস্তাব করেন, তাঁর বাড়ির একটি পৃথক ঘরে গোপালের মা বাস করতে পারেন। তদনুযায়ী ১৯০৩ ডিসেম্বরের গোড়ায় ('মাঝামাঝি' নয়, মুক্তিপ্রাণা যা লিখেছেন) গোপালের মা নিবেদিতার বাড়িতে আসেন, পৃথক একটি কক্ষে বাস করতে থাকেন এবং কুসুম নামক এক ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর পরিচর্যার ভার নেন।[৯]

---

[৬] স্বামী নির্লেপানন্দ লিখিত 'দেবী অঘোরমণি' পুস্তিকায় পাই—"স্বামীজী একবার বলেন, 'আমার সব সাহেব-মেম চেলারা আছে, তাদের তুমি কাছে আসতে দেবে কি—না তোমার জাত যাবে?' তাহাতে অঘোরমণি উত্তর করেন, 'সে কি বাবা, তারা তোমার সন্তান; তাদের আমি আদর করে নাতি-নাতনী বলে কোলে নেবো গো।'" (কুসুম দেবী কথিত)

[৭] "অঘোরমণি কড়ে রাঁড়ী—স্বামীর সুখ কোন দিনই জীবনে জানেন নাই। মেয়েরা বলে, 'ওরা সব যম্মী রাঁড়ী, নুনটুকু পর্যন্ত ধুয়ে খায়।'...বেজায় আচার-বিচার! আমরা জানি, একদিন তিনি রন্ধন করিয়া বোক্‌নো হইতে ভাত তুলিয়া পরমহংসদেবের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন প্রকারে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সে ভাত আর খাওয়া হইল না এবং ভাতের কাঠিটিও গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন, ইহা সেই সময়ের কথা।"—সারদানন্দ রচিত 'গোপালের মা'।

[৮] লেডী অবলা বসু লিখেছেন, নিবেদিতার চরিত্রগুণে অতি রক্ষণশীল সিন্ধ তাপসীও তাঁর আতিথ্য নিয়ে খুশী হয়েছিলেন। এখানে শ্রীমতী বসু গোপালের মা'র কথাই বলেছেন।

[৯] গোপালের মা'র সেবিকা কুসুম দেবীর কাছ থেকে স্বামী নির্লেপানন্দ যে স্মৃতি-কথা সংগ্রহ করে দিয়েছেন তাঁর 'দেবী অঘোরমণি' পুস্তিকায়, তাতে গোপালের মা ও নিবেদিতার সম্পর্ক বিষয়ে কিছু মূল্যবান তথ্য পাই—

"কামারহাটী বাগানে থাকাকালে (স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে) গোপালের মার একবার কঠিন আমাশয় পীড়া হইল। এই সময় সেবিকা (কুসুম) তিনমাস একাদিক্রমে সেবা করেন। পূজাপাদ সারদানন্দ মহারাজ, নিবেদিতা ও আর একটি মেমকে (নিবেদিতার পরিচারিকা বেট?) লইয়া প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। হোমিওপ্যাথি ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গণেন ব্রহ্মচারী ঔষধ দিয়া আসিতেন। একটি ঝি ছিল্। রাত্রে ঘরের কোলে চওড়া দালানে একটি লণ্ঠন জ্বলিত। যে-ঘরে তিনি শয়ন করিতেন, সে ঘরে কাহাকেও শয়ন করিতে দিতেন না।"

পরবর্তীকালে শেষ অসুখের সময়ে যখন নিবেদিতার বাড়িতে ছিলেন, তখন—"ভাত, জলখাবার ইত্যাদির জন্য মাসিক দশ টাকা ব্যয়ভার নিবেদিতা বহন করিতেন। মাথার চুল বড় হইলে মেনীর মা আসিয়া ছাঁটিয়া দিতেন। নিবেদিতা অঘোরমণিকে দুই তলার উপরই রাখিতেন। ক্রমশঃ যখন অথর্ব হইয়া পড়িলেন তখন নাওয়ানো খোয়ানো, শিশুর

নিবেদিতার কাছে গোপালের মা 'শ্রীমায়ের মতই আর একটি আশ্চর্য আত্মা'রূপে প্রতীয়মান—সুতরাং তাঁকে কাছে পেয়ে নিবেদিতার আনন্দের সীমা থাকার কথা নয়। সে আবেগ তিনি অনেকবারই চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। ৯ই ডিসেম্বর ১৯০৩, বান্ধবীকে লিখেছেন,—"গোপালের মার কাছে থাকলে অন্তরে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে। সেন্ট এলিজাবেথের কথাগুলো কানে বাজে : 'কী এমন আমি যে আমার ঠাকুরের মা আমায় দেখতে আসবেন!' গোপালের মা'র যে পরমহংস অবস্থা, এ আমি বিশ্বাস করি। মনে হয়, যদি শুধু ওঁকেই পূজা করতে পারি, তাহলেই যাদের ভালবাসি, তাদের 'পরে বিধাতার আশীর্বাদ অজস্র হয়ে ঝরে পড়বে। এর বেশী আর কী বলব!" (নারায়ণী দেবী অনূদিত রেমঁ'র নিবেদিতা জীবনী)। ১৭ ডিসেম্বর মিসেস বুলকে—"গতবার তোমায় লিখে উঠতে পারিনি কারণ গোপালের মা এসে হাজির হয়েছিলেন; তিনি এক সপ্তাহ এখানে আছেন। কী অসাধারণ লাগছে—অনুভব করতে পারো!" ম্যাকলাউডকে—"গোপালের মা এখানে আছেন। আমার কী যে আনন্দ! স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, তিনি আমাদের কাছেই বরাবর থাকবেন—আমাদের আদরের ছোট্ট ঠাকুরমা!"

গোপালের মার নিকট-সান্নিধ্যের সৌভাগ্যে নিবেদিতা নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। সেবায় শুশ্রূষায় নিজের নিত্য প্রণাম নিবেদন করেছেন এই সিদ্ধ নারীর প্রতি। উভয়ের সম্পর্কের একটি অনবদ্য ছবি এঁকেছেন লিজেল রেমঁ—

"ভোরবেলায় নিবেদিতা তাঁর দোরগোড়ায় গিয়ে বসে থাকেন, কখন বুড়ি ইশারায় ঘরে ঢুকতে বলবেন, এই প্রতীক্ষায়। এমনি প্রতিদিন। গোপালের মা হয়তো স্তব পড়ছেন কি জপ করছেন। নিবেদিতাকে দেখলেই তাঁর বলিকুঞ্চিত মুখ খুশির হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে। নিবেদিতাকে কাছে টেনে এনে একটু ফল-মিষ্টি মুখে তুলে দেওয়া চাই-ই রোজ।

"গোপালের মা'র ঘরে ঠাকুরদের আনাগোনা চলে, কিন্তু তাঁদের কথা বুড়ি মুখেও আনবেন না। কথা কইলেই তাঁরা নাকি ভয় পান। ঘরের বাতাস ভরে আছে গোপালের বাঁশির সুরে, সে-সুরও যায় থেমে। এ খবর নিবেদিতার অজানা নয়, তাই তিনি চুপ করে থাকেন।

"রাতে যখন গোপালের মা কষ্ট পান, নিবেদিতা গা-হাত-পা টিপে দেন। মা

মত সব কিছুই একজন ঝি করিয়া দিত। ইহার জন্য স্বতন্ত্র আট টাকা নিবেদিতার মাসিক খরচ হইত।

তাঁহার শরীর যাইবার পর তাঁহার প্রিয় জপমালাটি পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ সেবিকা কুসুমকে দেন। নিবেদিতার কিন্তু সেটির উপর ভারী ঝোঁক। সেটি লইবার জন্য চমৎকার-ভাবে নিবেদিতা বলিলেন—'ওঁকে (কুসুমকে) যা দেবার, তা তো পূর্ণ করে দিয়েছেন, যথেষ্ট,—আমার জপমালাটি চাই!'...

নিবেদিতার ছবিতে তাঁহার কণ্ঠে যে জপমালা দেখা যায়, তাহা সম্ভবতঃ ইহাই।"

গোপালের মার পাদমূলে উপবিষ্টা নিবেদিতার যে ছবি দেখা যায়, তাহা নিবেদিতার ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তোলা, গোপালের মার শেষ অসুখের সময়ে, সময় আনুমানিক জুন, ১৯০৬। গোপালের মার মাথার দিকে পাখা হাতে মহিলাই কুসুম। ছবিটি তাঁর কাছ থেকেই সংগৃহীত। ছবির বিষয়ে কুসুম দেবী বলেন—"চোখ বুজেই শুয়ে থাকতেন। ছবি তোলার সময় নিবেদিতা বারবার চোখ চাইতে বললেন। তিন-চারবার 'মা, চোখ খুলুন' বলা হল। কিছুতেই চোখ চাইলেন না।"

যেমন রুগ্ন মেয়ের যত্ন করে তেমনি যত্ন করেন তাঁর। জগদীশ্বরী যেন স্বয়ং দুর্বল সেজে সেবা নিতে এসেছেন, এমনি মনে হয় নিবেদিতার। নিজের মায়ের কোনো সেবাতেই তো লাগেননি, গোপালের মা যেন নিবেদিতার সেই মা-জননী।"

নিবেদিতার বাড়িতে গোপালের মা'র আড়াই বছর কাটে। নিবেদিতার চোখের উপর দিয়েই তাঁর জীবনদীপ ক্রমে নিভে আসে। ১৬ জুলাই, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"গোপালের মা'র স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ছেলেমানুষ হয়ে উঠছেন।" প্রায় এক বছর পরে ৪ মে, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকেই—"গোপালের মা আমাদের সঙ্গে আছেন, জানো তো। ভারী মিষ্টি—আবার কখনো-কখনো খুব ঝঞ্ঝাট বাধান। কিন্তু তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়া নিত্য আনন্দের কারণ।" ২৯ জুন, ১৯০৬, এই মহিলাকে—"আমাদের বাড়ির পিছন দিকে নিজের ঘরে শুয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গোপালের মা মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন।" এবং ১২ জুলাই মৃত্যুসংবাদ—"গোপালের মা'র দেহ গেছে। গত রবিবার উষাকালে গঙ্গাতীরে তাঁর নির্বাণ হয়েছে—অতি পবিত্র এবং শান্ত প্রয়াণ। এখন মুক্ত আত্মা।"

এর পরে ১৮ জুলাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সংবাদ—"গোপালের মা রবিবার উষাকালে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেছেন, আজ তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। সকাল দশটায় কোনো কোনো আমন্ত্রিত এসেছেন, যাঁরা রাত আটটায় ফিরবেন বলে গাড়িকে বলে দিয়েছেন!......এখন কীর্তনসম্রাজ্ঞী যন্ত্রবাদ্যাদিসহ তলায় অপেক্ষমাণা। হাসিম খাঁ ও তার দলবলকে তোমার মনে আছে?"[১০]

৮ জুলাই, ১৯০৬ গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মমুহূর্তে গোপালের মা'র প্রয়াণ ঘটে। এর দু'দিন আগে তাঁকে 'গঙ্গাযাত্রা' করানো হয়। যাত্রাকালে নিবেদিতা পুষ্প-চন্দন-মাল্যাদি দিয়ে নিজে তাঁর শয্যা সাজিয়ে দেন, ও স্বয়ং অনাবৃতপদে সাশ্রুনয়নে তাঁর সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়ে মৃত্যু অবধি দুইরাত্রি কাটান। গোপালের মা'র যথাবিহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও কীর্তনাদির ব্যবস্থাও নিবেদিতা করেছিলেন।

---

[১০] উদ্বোধন পত্রিকায় ১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৩-তে গোপালের মা'র মৃত্যু উপলক্ষে লেখা হয়—

"বিগত ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, রবিবার 'গোপালের মা' নামে পরিচিতা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক পরম ভক্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেহত্যাগের সময় তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বর্ষ হইয়াছিল। ইনি পূর্বে কামারহাটিতে কলুটোলার গোবিন্দ দত্তর ঠাকুরবাড়িতে থাকিতেন। ইনি পরমহংসদেবকে আপন পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, এবং তাঁহাকে গোপাল বলিতেন। এই কারণেই তাঁহার নাম 'গোপালের মা' হইয়াছিল। ইঁহার সাধননিষ্ঠা অদ্ভুত ছিল। শুনা যায়, কলিকাতায় যে-সময় প্রবল ভূকম্প হয়, সেবার ইনি কামারহাটির নিজ গৃহ দোদুল্যমান হইতে থাকিলেও একমনে জপে নিমগ্ন ছিলেন। ইদানীং শরীর অতিশয় রুগ্ন হওয়ায় কলিকাতা বোসপাড়ায় সিস্টার নিবেদিতার নিকট থাকিতেন। নিবেদিতাও প্রাণপণে ইঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। বিগত ২রা শ্রাবণ ইঁহার স্মরণার্থ সিস্টার নিবেদিতা নিজ গৃহে এক মহোৎসব করেন। প্রায় দেড়শত দুইশত মহিলার সমাগম হয়। সিস্টারের যত্নে ও আতিথ্যে সকলেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ ব্রোমাইড ফটো নানাবিধ ফলফুলে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং নিকটে গোপালের মারও একখানি ফটো রাখা হয়। সুমধুর কীর্তন শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরিত হয়।"

গোপালের মা'র প্রসঙ্গ শেষ করছি তাঁর দেহান্তের পরে লিখিত নিবেদিতার একটি রচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করে।[১১] ঐ রচনার গোড়ার দিকে নিবেদিতা ভারতীয় ভাষার নানা শব্দকে ভাষান্তরিত করা যে অসম্ভব, তার আলোচনাপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে 'গোপাল' শব্দটির উল্লেখ করেন। 'গোপাল'-এর আক্ষরিক অর্থ গো-পালক, কিন্তু আসল অর্থ শিশু কৃষ্ণ—ইউরোপের ক্ষেত্রে যা হল Christ-Child. গোপালের মা ভারতবর্ষের Christ-Child-এর মাতা। এর পরে নিবেদিতা গোপালের মা'র মহাপ্রয়াণের ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা করেছেন। তারই অনুবাদ—

"সারারাত্রি ধরে আমরা মুমূর্ষুর ধীর গভীর শ্বাসের ওঠা-পড়া লক্ষ্য করছিলাম। গভীরে, আরো গভীরে, আরো আরো গভীরে—স্ফীত, পরিস্ফীত শ্বাস প্রবেশ করে যায়, মনে হয় ঐ অতি প্রাচীন দেহ বুঝি সব স্পন্দন হারিয়ে ফেলল—তারপরেই শ্বাসমুক্তি, পরপর কয়েকটি দ্রুত অন্তঃশ্বাস। এরকম শ্বাসগতি নাকি কদাচিৎ দেখা যায়—বহু বৎসরের প্রাণায়ামের ফলেই এ জিনিস হওয়া সম্ভব। জপমালা হাতে এই বৃদ্ধা 'গোপালমন্ত্র' জপ করে গেছেন দিবারাত্র; মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে, সেই সময়ে অসচেতনেই নিরন্তর ঘটে গেছে প্রাণায়াম।

কেন না—ইনি যে গোপালের মা। যাঁর পাশে বসে ছিলাম আমরা—যাঁকে দেখছিলাম—ইনি সেই সিদ্ধা তাপসী, যাঁকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মায়ের মত দেখতেন।

শায়িত তপস্বিনী—অণুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নেই তাঁর, কোনোদিনই ছিল না তা। একটি ভাবে শুধু মন স্থির—যা তাঁর জীবনসর্বস্ব। সেই ভাবেরই আনন্দে ও পরমা শান্তির শেষ কিরণে উদ্‌ভাসিত আনন। এই ভাবেই গঙ্গাতীরে শুয়ে আছেন পূর্ণ এক রাত্রি ও এক দিন। পূর্ণিমার চাঁদ যখন আকাশে উঠেছিল, তখন আমরা তাঁকে দুয়ারের বাইরে এনেছিলাম। পার্থিব বন্ধনের প্রথম বেষ্টনী—গৃহবন্ধনকে যখন তিনি পেরিয়ে গেলেন জয়হর্ষের সঙ্গে—আমরা অনুভব করেছিলাম তাঁর আত্মার নীরব ধীর ঊর্ধ্বপ্রয়াণ। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে যখন এলেন, স্নিগ্ধ শীতল বাতাস যখন বয়ে গেল তাঁর দেহের উপর দিয়ে, তারই মধ্যে, উজ্জ্বল পূর্ণিমালোকের মধ্যে যখন তিনি রইলেন কিছুক্ষণ—তখন আত্মার পুনঃ প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ যেন দেখা গেল তাঁর মধ্যে, মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে যা সচরাচর দেখা যায় না। তারপরে, পূর্ণ নির্বাপণের পূর্বে, আরও অনেক ঘণ্টা ধরে জীবনদীপ জ্বলতে লাগল জীর্ণ আধারে।

এইকালে সম্পূর্ণ চৈতন্যহারা কিন্তু হননি। তাঁর চাহনি যাদের উপর পড়েছে, তাদের মনে হয়েছে, তিনি যেন তাদের চিনেছেন। আর শেষ সকালে, পুরোহিত এসে যখন উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই সাড়া দিয়েছিলেন, যেন বিশেষ আবেগের সঙ্গেই। সারা জীবন তিনি গোপালভাবের সাধনা করেছেন, তাই নব্বই-উত্তীর্ণ তাঁর প্রাচীন জীর্ণ দেহ যখন বিদায় নিচ্ছে, সেই শেষ ক্ষণে

---

[১১] রচনাটি প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, পরে Studies from an Eastern Home-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিশুর নির্ভরতায় ভরে থাকবে, এই তো স্বাভাবিক। শুধু দেহের কাঁপন, কি মাথার একটু নড়াচড়ায় ইচ্ছাশক্তির সামান্য প্রকাশ হয়তো ছিল!

কিন্তু সে অবস্থাও এখন অতীত। আবার রাত্রি ঘনিয়েছে। বহু ঘণ্টা হয়ে শায়িত, স্থির—সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ। শান্তি! পৃথিবীতে যাঁর কোনো কামনাই নেই তাঁরই যোগ্য শান্তি!

প্রতীক্ষা করে আছি আমরা মেয়ের দল, কানে আসছে ঘাটের তলায় সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গার ছল্ ছল্ ছলাৎ শব্দ, কিংবা বর্ষার ঝড়ো হাওয়ার চাপা দীর্ঘশ্বাস, যখন তা নদীতরঙ্গের উপর দিয়ে ঝাপট দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। তারই মধ্যে একবার—তখন মধ্যরাত্রি—মধ্যরাত্রির ঘণ্টাখানেক পরে কি?—হঠাৎ নীরবতাকে মথিত করে মেঘাবৃত পূর্ণিমাকাশের তলবর্তী নদীতরঙ্গ পাক খেয়ে ছুটল প্রচণ্ড বেগে, নোঙর করা নৌকাগুলি গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে লাগল, রব উঠল—'বান আসছে! বান আসছে!' সেই দেখে বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল কয়েকজনের—এই বিদায়ী আত্মা যাদের কাছে সুহৃদ্ ও গুরু। তারা ভাবল—এই বন্যাই তো সংকেত—ঘনিয়ে আসছে বিদায়-ক্ষণ—স্বজন, স্বভূমি ছেড়ে এবার তিনি প্রস্থান করবেন অজানালোকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলেও এখনো একই প্রকার। বিশ্রাম ছেড়ে কেউ হয়ত উঠে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে শ্রদ্ধাকোমল হাতে কিছু পরিচর্যা করলেন, অন্য কেউ কিছু বিশ্রামের প্রয়োজনে শুয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ কিছু চাঞ্চল্য, নিদ্রিতকে কার ছোট একটি হাত স্পর্শ করে জাগাল : 'বাহকদের ডাক! শেষ হয়ে আসছে!' তারা বসেছিল ঘাটের উপরের চত্বরে, সারারাত্রি বসে তারা পুরনো কথা বলছিল, এই বিদায়ী জীবনের সঙ্গে নানাজনের সম্পর্কের কথা আলোচনা করছিল সারাক্ষণ —সুতরাং ডাকা মাত্র তারা উঠে আসতে পারল, অবিলম্বে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মুমূর্ষুকে খাটিয়ায় তুলে গেরুয়া ও সাদা কাপড়-পরা ঐ সব বাহকেরা কাঁধে করে উত্তরের ঘর থেকে দ্রুত বাইরে নিয়ে এল—কয়েক পা নীচেই গঙ্গাতট, সেখানে পবিত্র বারিতে পাদস্পর্শ করে শায়িত হবেন গোপালের মা—তারপর চলে যাবেন।

শুয়ে আছেন সেখানে—শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে, এখন তার সহজ উত্থান পতন। আবাল্য গোপালের মাকে জানেন, এমন এক সন্ন্যাসী তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসানির সুরে মৃত্যুকালে হিন্দুর একান্ত ইচ্ছার মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন : 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ! ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম!' তারপরে—শুধু এক মুহূর্ত—তারপরেই সমবেত কণ্ঠে—'হরিবোল!'—নির্গত হয়ে গেছে প্রাণবায়ু! গোপালের মা'র আত্মা ঊর্ধ্বপথে—পড়ে আছে দেহযন্ত্র।

'এখন কি ঊষাক্ষণ!'—মেঘের পিছনে স্বচ্ছতার আভাস দেখে খাটিয়ার মাথার দিকের একজন জিজ্ঞাসা করলেন। পায়ের দিক থেকে উত্তর এল—'হাঁ, তাই বটে—ঊষা!' আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে দেখলাম, যে-বারিধারা মুমূর্ষুর চরণ স্পর্শ করে বয়ে যাচ্ছিল, তা সরে গেছে, নেমে গেছে কয়েক ইঞ্চি ইতিমধ্যেই। গোপালের মা সত্যই ব্রাহ্ম মুহূর্তে দেহত্যাগ করেছেন—নদীর স্রোত ফেরার ঠিক মুখে।

মাতৃমণ্ডলী মধ্যে

শ্রীমার আবাসে বহু সময় নিবেদিতা কাটাতেন বলে শ্রীমার সঙ্গিনীদের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী গভীর পরিচয় হয়েছিল। গোপালের মার প্রসঙ্গ ইতিমধ্যেই বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করেছি। বাকিদের বিষয়ে নিবেদিতা 'আচার্যদেব' গ্রন্থে অল্প কিছু লিখেছেন।—

"এইকালে সারদাদেবীর আবাসে যে-সব মহিলা সর্বসময়ে থাকতেন তাঁরা হলেন—গোপালের মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, লক্ষ্মীদিদি, এবং আরও অনেকে। এ'রা সকলেই বিধবা—প্রথম ও শেষ জন বালবিধবা—সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যা, তাঁদের দীক্ষা হয়েছিল যখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকতেন। লক্ষ্মীদিদি আবার তাঁর ভাইঝি, এবং অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী।"

যোগীন মা অর্থাৎ যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। শ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গিনী ইনি, উচ্চ বংশের কন্যা ও বধূ। স্বামী অতীব ধনী কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল, তাই এ'র সংসার-জীবন বেদনাময়। সান্ত্বনা পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় এবং শ্রীমার আশ্রয়ে ও সান্নিধ্যে। মেধা ও মনস্বিতা ছিল অসাধারণ। নিজ চেষ্টায় সুবিশাল পুরাণসাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ও সমগ্র রামকৃষ্ণ-সাহিত্য আয়ত্ত করেছিলেন, যার অনেকখানি অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।*

ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমায়ের আবাসে থাকাকালে ভারতীয় পুরাণকথা সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা যোগীন মা'র কাছ থেকেই লাভ করেন, সেকথা তিনি তাঁর Cradle Tales of Hinduism নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

"এই গ্রন্থের প্রস্তুতিকালে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যোগীন মাতা নামক হিন্দু মহিলাকে—যে-সহৃদয়া প্রতিবেশীর ধর্মগ্রন্থাদি বিষয়ে গভীর ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একমাত্র তুলনা তরুণতর এক জিজ্ঞাসুকে সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর সদা-প্রস্তুত ও অব্যাহত চেষ্টা।"

দার্জিলিঙ-এ শেষ যাত্রার আগে নিবেদিতা বিদায় নেবার জন্য উদ্বোধনে গিয়েছিলেন। সেখানে—"যোগীন-মাকে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন, 'যোগীন-মা. আমি বোধহয় আর ফিরব না।' যোগীন-মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'একি নিবেদিতা, তুমি একথা বলছ কেন?' নিবেদিতা বলিলেন, 'কি জানি যোগীন-মা, আমার কি রকম মনে হচ্ছে, এই বোধহয় শেষ।' যোগীন-মা তাঁহাকে ঐসব কথা বলিতে বা

---

* স্বামী নির্লেপানন্দের রচনা থেকে নেওয়া।

চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু তাঁহার মন নিবেদিতার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল।" (মুক্তিপ্রাণা)

'আচার্যদেব' গ্রন্থে লক্ষ্মীদিদির প্রতি নিবেদিতা বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। লক্ষ্মীদিদির আকর্ষণী ব্যক্তিত্বে নিবেদিতা মুগ্ধ ছিলেন। "লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রী।...বিবাহের অব্যবহিতকাল পরেই স্বামী লোকান্তরিত। তদবধি তাঁহার খুড়ীমাতা পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর (সারদাদেবীর) সহিত কামারপুকুরে, ও তৎপরে উভয়েই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উত্তরে নহবতে বহু বৎসর কাটান। পরমহংসদেবকে সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর খুব ঘনিষ্ঠ ও আপনজন-রূপে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"*

'আচার্যদেব' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন—

"লক্ষ্মীদিদির কাছে অনেকেই দীক্ষা ও ধর্মোপদেশ নিতে খুবই ব্যগ্র। ইনি অতীব গুণশালিনী মহিলা; এঁ'র সান্নিধ্য পরম আনন্দদায়ক। যাত্রা-গানের ধর্মভাব-মূলক সংলাপাদি তিনি কখনো ক্রমান্বয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করে যেতেন, কখনো-বা শান্ত নীরব ঘরটিকে ভরিয়ে তুলতেন স্নিগ্ধ আমোদে, যখন সকলকে নিয়ে পুরাণ-পালার সাজসজ্জা করাতেন,—কালী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী বা কদমতলার কৃষ্ণ,—এইসব সাজের ব্যবস্থা এমনভাবে করাতেন যে, নাটকীয় উপাদান অল্প থাকলেও ফল হত অপরূপ।

শোনা যায়, এই ধরনের মজার ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের খুবই সায় ছিল। মহিলারা বলেন, ঠাকুর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মীয় নাটক আবৃত্তি করে যেতেন, এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন চরিত্র নিজেই অভিনয় করতেন,—তার দ্বারা উপস্থিত সকলকে ঐ সব স্তব-পূজার মর্ম অনুভব করিয়ে দিতেন।"

লক্ষ্মীমণির দেবী-সজ্জার বিষয়ে নিবেদিতা যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে একটি চমৎকার চিত্রাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর 'দেবী অঘোরমণি' নামক পুস্তিকায়। অঘোরমণির (গোপালের মা) সেবিকা কুসুমের কাছ থেকে স্বামী নির্লেপানন্দ তথ্য সংগ্রহ করেছেন।—

"২/১ বাগবাজার স্ট্রীটের উপর শ্রীমার ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতি বৈকালে এক বিরাট আনন্দের হাট ঠাকুরঘরেই বসিত। মা স্বয়ং উপস্থিত। চতুর্দিক হইতে বাবুরাম মহারাজের মা, বলরাম-গৃহিণী, যোগীন মা ও তাঁহার মা, গোলাপ মা, অসীমের মা, মেনীর মা, মাস্টার-গৃহিণী, গৌর মা প্রভৃতি আরও অনেক মহিলা ভক্তবৃন্দ পরস্পর মিলিতেন। অঘোরমণিকেও মধ্যে মধ্যে ইহার ভিতর একজন প্রধানারূপে দেখা যাইত।...নিবেদিতাও তাঁহার নিকটস্থ স্কুলবাটী হইতে এই আসরে যোগদান করিতেন।

* স্বামী নির্লেপানন্দ লিখিত—'শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি' পুস্তিকা।

এক সময় কয়েকদিন উপরি উপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরম পবিত্রাত্মা লক্ষ্মীমণি দেবী সকলকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিলেন।...গোলাপ মা তাঁহার জামাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী হইতে নানারূপ পিতলের গহনা—বালা, হার, অনন্ত, বাজু, রূপার পাইজোর প্রভৃতি জোগাড় করিয়া সুন্দর নববস্ত্রে লক্ষ্মীমণিকে বৃন্দের ভূমিকায় সুসজ্জিতা করিতেন। লক্ষ্মীদেবী বালবিধবা, তাঁহাকে এমনই দেখিতে সোনার গৌরীর মত, কোনো অলঙ্কার আভরণের প্রয়োজন ছিল না, তবু বৃন্দের ভাবটি স্পষ্ট ও চাক্ষুষ করিবার জন্য ঐ সজ্জা। তিনি চমৎকার নকল করিতে পারিতেন। গলাও মিষ্ট। অসম্ভব রকমের স্মরণশক্তি ছিল। পালাকে পালা এক একদিন দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া লক্ষ্মীদেবী গাহিতেন।...

নিবেদিতা রামপ্রসাদের গান শুনিতে বিশেষ ভালবাসিতেন। বাংলা কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। রামপ্রসাদী শুনিবার জন্য তাঁহাকে পালার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। কীর্তন শেষ হইয়া গেলে লক্ষ্মীদেবী ফরমাসমাফিক প্রসাদী সুর ধরিতেন।

নিবেদিতা বালিকার ন্যায় আমোদ ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি নিজে থাবা গাড়িয়া মেঝেতে চতুষ্পদ সিংহ হইয়া গেলেন, এবং পিঠের উপরে লক্ষ্মীদেবীকে চাপাইয়া জগদ্ধাত্রী বানাইলেন। মুখে ঠিক সিংহের মত তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য সকলে হাসিয়া লুটোপুটি।

ইহা ছাড়া মালকোঁচা বাঁধিয়া বলরামের নৃত্যানুকরণেও লক্ষ্মীদেবীকে চমৎকার মানাইত।"

এই আনন্দময়ীকে নিবেদিতা ভালবাসতেন, আর পূজা করতেন অধ্যাত্মময়ীকে। লক্ষ্মীদিদি জীবন্মুক্ত—স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন। মিস ম্যাকল্যাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন (৪. ২. ১৯০৫)—

"সেদিন রাত্রে লক্ষ্মীদিদি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিষয়ে (লক্ষ্মীদিদির বিষয়ে) কী কথা বলেছিলেন জানালেন—'তুই এখনই অপরপারে—জীবন্মুক্ত।' লক্ষ্মীদিদি সুখদুঃখের অতীত। এসবই খেলা। কিছুই স্পর্শ করে না তাঁকে। এ সমস্ত কথাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য—কিন্তু কী অদ্ভুত লাগল তাঁর নিজ মুখ থেকে শুনতে—অথচ একেবারে অহংশূন্য।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দ বিদায় নেবার আগে নিজের জায়গায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিংবা বলা যায়, নিজেকে দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষেত্রে অন্তত—ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের মধ্যে। নিবেদিতা এই চিঠিতে (ম্যাকলাউডকে লেখা—১৯. ২. ১৯০৩) তাই লিখেছেন—

"যদি জাপানে কয়েক মাস কাটাবার পরে স্বামী সারদানন্দের পথ আমেরিকার জন্য পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, খুবই খুশী হব। সারদানন্দ আমেরিকায় ক্রিশ্চিনের কাজের জন্য (শিক্ষা-কাজ) টাকা তুলতে চান। আমার মতে তাঁর সর্বত্র ঘোরা উচিত, কেননা ভবিষ্যতে পৃথিবীর চারিদিকে তরুণবয়স্কদের স্থাপন করবার দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তাবে। আমি তাঁকে খুঁটিনাটি কাজের মানুষ অপেক্ষা মূল সংগঠক ও দায়িত্ববাহকরূপে দেখি।

আর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখি অধ্যাত্মকেন্দ্র-রূপে এবং কর্তা-রূপে।"

এই চিঠি নিবেদিতা লিখেছেন—রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কয়েক মাস পরেই। গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে এই বিচ্ছেদ হয়েছিল। যে-সংঘের সঙ্গে গুরু যুক্ত করে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ নিবেদিতাকে মর্মান্তিক বেজেছিল।* অপরপক্ষে সংঘের পক্ষেও এই ক্ষতি দারুণ, এবং যাঁরা নিবেদিতাকে স্নেহ করতেন, তাঁদের কাছে দুঃখদায়ক। সংঘের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই এই বিচ্ছেদের অন্যতম প্রকাশ্য অংশীদার হতে হয়। স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব অপসৃত, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের গোটা দায়িত্ব মাথার উপরে, তদুপরি যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভরূপে জনসমাজে পরিচিত, তাঁদেরই একজন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন—এমন ইন্দ্রপাত এবং বজ্রপাত কোনো প্রতিষ্ঠানের জীবনে একসঙ্গে হয়েছে কি না সন্দেহ! অনুরাগীদের কী গভীর বেদনা, এবং বিরোধীদের কী দারুণ উল্লাস! এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, তখন বিরোধীরা অনুরাগীদের তুলনায় অন্ততঃ সংখ্যালঘু নন।

দ্রুত পরিবর্তমান ঘটনাধারার চেহারা এইরকম :

৪ঠা জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ।

অধিকাংশ সংবাদপত্রে সে সংবাদ প্রকাশিত হল ৬ই জুলাই।

৮ই জুলাই নিবেদিতা মঠে গেলেন। সঙ্গে ওকাকুরা। ইতিমধ্যে মঠের কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে তাঁর রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে বলেছেন। নিবেদিতা রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু

---

* কতখানি যাতনা নিবেদিতাকে পেতে হয়েছিল, তার কিছু পরিচয় সিস্টার দেবমাতা তাঁর স্মৃতিকথায় দিয়েছেন। স্মৃতিকথাটি অল্প পরেই আমরা দিয়েছি।

রামকৃষ্ণ মিশন নীতিগতভাবে রাজনীতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত। বিষয়টি নিয়ে বোঝাপড়া করার অভিপ্রায় ছিল নিবেদিতার, কিন্তু ওকাকুরা সঙ্গে থাকায় ৮ই জুলাই তা করা সম্ভব হল না।

১০ই জুলাই নিবেদিতা পুনশ্চ মঠে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হল। নিবেদিতা সম্পূর্ণ মনস্থির করতে পারলেন না, কিন্তু রাজনৈতিক সম্পর্ক বা অভিপ্রায় ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে বোঝা গেল।*

কয়েকদিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতার অভিপ্রায় জানতে চেয়ে পত্র লিখলেন। ১৮ই জুলাই নিবেদিতার উত্তর এল।—

প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

আজ সন্ধ্যায় আপনার যে চিঠি পাইলাম, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি, আপনি সংঘের ও আমার পক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করুন। ব্যাপারটি বেদনাদায়ক। তথাপি আমার পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহাতে আমার সম্মতি আছে।

যাহা হউক, বিশ্বাস আছে, আপনি এবং সংঘের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আমার শ্রীগুরুর ভস্মাবশেষের বেদীমূলে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধানিবেদন করিতে ভুলিবেন না।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে লিখিয়া যথাসম্ভব সহজভাবে তাহাদিগকে আমার নূতন পরিস্থিতির বিষয় জানাইয়া দিব।

কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততাসহ
রামকৃষ্ণের নিবেদিতা†

আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে নিবেদিতা একটি বাক্যকে অমর করে রেখেছেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা। উদ্ধৃত পত্রে তার অর্ধাংশের জন্ম : রামকৃষ্ণের নিবেদিতা; আগে লিখতেন : রামকৃষ্ণ-সংঘের নিবেদিতা। কিছুদিনের মধ্যে বিবেকানন্দ নামটি যুক্ত হয়ে দাঁড়াবে : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

১৯শে জুলাই অমৃতবাজারে প্রকাশিত হল :

"জনসাধারণকে এই কথা অবগত করাইবার জন্য আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের শোকদিবস সমাপনান্তে বেলুড় মঠের সদস্যগণ ও ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে স্থির হইয়াছে, অতঃপর ভগিনী নিবেদিতার কার্যাবলী সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, মঠ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।"

* এই বিষয়টি 'শিবময়ী নিবেদিতা' অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।
† প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা অনূদিত।

একটা আলোড়ন ঘটে গেল। স্বামী বিবেকানন্দের পরেই রামকৃষ্ণ সংঘেতৃর যাঁকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত ভারতবাসীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা—তিনি স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেই সংঘত্যাগী! স্বামীজীর উপর শোকপ্রবন্ধগুলির অধিকাংশের মধ্যে নিবেদিতার নামোল্লেখ ছিল, এবং স্বামীজীর ত্যক্ত দায়িত্ব যে তিনিই বহন করবেন, এমন কথাও লেখা ছিল।* সেই নিবেদিতা যখন সংঘের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, তখন বেলুড় মঠের সর্বনাশের কল্পনায় আনন্দে শিহরিত হলেন বহু জনই! কী বীভৎস উল্লাস ফুটেছিল সরলা দেবীর 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনায়, তার পূর্ণরূপ আমরা সরলা দেবী প্রসঙ্গে উপস্থিত করব। সেই সঙ্গে তৎকালীন আরও কিছু আমোদের রচনা। নিবেদিতার প্রতি সহানুভূতি উথলে উঠল নানা স্থানে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে। অযাচিত সহানুভূতিতে নিবেদিতা এমনই বিব্রত হলেন যে, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সেই স্নেহপ্রবাহ রোধ করার চেষ্টা করতে হল তাঁকে। সে বিবৃতি নিবেদিতার ব্যক্তিগত মহত্ত্ব এবং স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রতি শ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিবৃতিটি ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ৩১শে জুলাই, ১৯০২।† নিবেদিতা লেখেন—

"গভীরতম বেদনার সঙ্গে শুনেছি, কোনো কোনো মহলে বলা হচ্ছে—আমি নাকি আমার মহান গুরু স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ হয়েছি! আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে যেন আমার নিম্নের বিবৃতিটিকে সর্বাধিকভাবে প্রচার করেন।

১। রামকৃষ্ণ সংঘের কেন্দ্র বেলুড় মঠ, হাওড়া। এই সংঘের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের উপর ন্যস্ত—যাঁদের তুল্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অল্পই দেখা যায়।

২। এই সংঘ তার গুরু ও প্রতিষ্ঠাতার (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ) নিকট থেকে ধর্মদর্শন এবং ধর্মীয় উপলব্ধির সুনির্দিষ্ট ভান্ডার লাভ করেছে, অতঃপর যার সংরক্ষণ এবং বিস্তারসাধন করা এই সংঘের কর্তব্য হবে।

৩। এই ধর্মীয় সম্পদভান্ডারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক—দীন শিক্ষার্থিনীর, ব্রহ্মচারিণীর, পূর্ণব্রতী সন্ন্যাসিনীর নয়; আমি সংস্কৃতজ্ঞ এমন কোনো অভিমান আমার নেই; ধর্মব্যাপারে আমার ঊর্ধ্বস্থ কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাঁদের নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণের বহির্বর্তী সামাজিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাগত কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। বাস্তবিক-পক্ষে, আমার গুরুর দেহত্যাগের পরে গুরু-ভগিনী ভিন্ন গুরু-ভাইদের সঙ্গে অধিক যোগাযোগ না রাখাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

* যেমন অমৃতবাজার পত্রিকায়।
† *Vivekananda in Indian Newspapers* দ্রষ্টব্য।

৪। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুর জন্য ইউরোপীয় নেতৃত্ব প্রয়োজন—এর থেকে বেদনাদায়ক ভ্রান্তি, আমার মতে, সম্ভবপর নয়। উল্টোটাই হওয়া উচিত—আমার তাই ধারণা।

ভরসা করি আমার এই পত্র অনেক সংবাদপত্র লেখকেরই দৃষ্টিগোচর হবে,—এই পত্রটিকে তাঁরা তাঁদের রচনাপাঠের স্বীকৃতি এবং উত্তররূপেই ধরবেন।"

পত্রটির বিষয়ে মিরার-সম্পাদক লেখেন—

"সিস্টার নিবেদিতা সহযোগী হিন্দু কর্মীদের সম্বন্ধে আদর্শ ব্যবহার করেছেন। এ আচরণ তাঁরই যোগ্য—যদিও এ পত্রের প্রয়োজন ছিল কি না সন্দেহ। আমাদের এই উচ্চাশয়া ভগিনী বহু গুণান্বিত, প্রতিভাময়ী—যদিও তিনি নিজের বিষয়ে নম্রভাবে 'অতি দীন শিক্ষার্থিনী' লিখেই তৃপ্ত। মর্মস্পর্শী এই দীনতাবোধ ও অহংশূন্যতা—জনসেবায় ব্রতী কর্মীদের কাছে আদর্শ হোক এ জিনিস!"

নিবেদিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের যে দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশনকে একদিন অহেতুক নিতে হয়েছিল, সে দায়িত্ব এবং তদনুযায়ী গঞ্জনা, অতীব দুঃখের বিষয়, এখন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিতে হচ্ছে, কারণ নিবেদিতার জীবনীসমূহ থেকে বাঙালী জনসাধারণ জেনে গিয়েছেন যে, ব্রহ্মানন্দই মিশনের সঙ্গে বিচ্ছেদের নিমিত্ত এবং বাঙালীরা রাজনৈতিক সত্যকেই একমাত্র সত্য বলে মানেন! একথা সত্য, স্বামীজীর সম্পূর্ণ ভাবধারাকে রামকৃষ্ণ মিশন বহন করতে পারবে কি না, এ সন্দেহ নিবেদিতার ছিল—কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন কি কখনোই দাবি করেছে—স্বামীজীর সমস্ত ভাবকে রূপায়িত করতে সে ব্রতী? রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, স্বামীজী মিশনের জন্য যেটুকু দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, কালোপযোগী করে সেটুকু পালন করা। সাধারণ সামাজিক মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর বহু উক্তি আছে—গৃহীর সেসব দায়িত্ব কি সন্ন্যাসী-সংঘ পালন করতে পারে? যে সংঘকে স্বামীজী রাজনীতির বাইরে স্থাপন করেছিলেন—সেই সংঘ নীতিত্যাগ না করে কিভাবে রাজনৈতিক কর্মের অভিলাষী নিবেদিতাকে ঠাঁই দিতে পারত?

যাই হোক, কোনো কোনো বাংলা জীবনীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্ক যেরকম তিক্ত ও সংঘর্ষময় করে দেখানো হয়েছে—সত্যই যে তা ছিল না, তার একটি প্রমাণ আমরা সূচনাতেই দিয়েছি—যেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার পত্রাংশ উধৃত আছে। এখন আরও কিছু সংবাদ দেওয়া যাক। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কী চোখে নিবেদিতা দেখতেন, তার যথেষ্ট পরিচয় এইসব স্থান থেকে পাওয়া যাবে।

স্টেটসম্যানের র‍্যাটক্লিফদের যখন সন্তান-সম্ভাবনা হল, তখন নিবেদিতা মিসেস র‍্যাটক্লিফকে ১৯০৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর লিখলেন—

"সারা ও আমার পক্ষ থেকে আগামীকাল যে ছোট উপহারটি তোমার কাছে নিয়ে যাব, সেটি একটি ভারতীয় কবচ। তার মধ্যে শিশুর জন্য প্রার্থনা রয়েছে—সে প্রার্থনা স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন। ব্যাপারটি তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

"আমার বিশ্বাস, এই ছোট অলংকারটি তুমি পছন্দ করবে—এটি এমন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়; আর, ভাবী প্রাণটিকে আবাহন ও রক্ষণের উদ্দেশ্যে যে পবিত্র ভাবনা এর মধ্য দিয়ে প্রেরিত হল—তার প্রভাব ও শক্তিও তুমি অনুভব করবে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন চাইলেন নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী জীবনী রচনা করুন, তখন তাঁর সেই ইচ্ছাকে আদেশতুল্য জ্ঞান করে গভীর আনন্দ ও আবেগ নিবেদিতা বোধ করেছিলেন। নিশ্চয় ব্রহ্মানন্দের এই ইচ্ছাকে তাঁর প্রতি গভীর আস্থার নিদর্শন বলে নিবেদিতা ধরেছিলেন। ১৯০৪ খৃস্টাব্দের ৭ জানুয়ারী নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখলেন—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ চান, আমি স্বামীজীর ইংরাজী জীবনী লিখি। সুতরাং যত শীঘ্র পার, এর জন্য উপাদান 'প্রার্থনা, ভিক্ষা ও হরণ' কর।"

বুদ্ধগয়ার পরিচালনার অধিকার নিয়ে এই সময়ে, পূর্ব থেকেও, পরিচালক হিন্দু মোহন্তের সঙ্গে নতুন দাবিদার ধর্মপাল প্রভৃতির সংঘর্ষ চলছিল। নিবেদিতা এই সংঘর্ষে অংশ নেন, এবং ধর্মপালের অবুঝ অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করেন। এই ব্যাপারে ১৯০৪ খৃস্টাব্দে নিবেদিতা দুবার বুদ্ধগয়া যান। ১৯০৪-এর ২১ জানুয়ারী চিঠিতে তিনি লিখছেন—"এই যাত্রায় যেভাবে আশীর্বাদ পেয়েছি বলবার নয়—গোপালের মা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও আর একজনের (স্বামীজী যাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে)।"

নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় একটি ইতিহাস-বিদ্যালয় খুলুন—ব্রহ্মানন্দের এই অভিপ্রায়ে নিবেদিতার পরম উৎসাহের রূপ—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ এখন আমাকে একদল ছেলে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় এক ইতিহাস-বিদ্যালয় খুলেবার ভার দিচ্ছেন। এটা মনে হয় পরে বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষার এক কলেজ হয়ে দাঁড়াবে। এখানে আমি নিজের চিন্তাকে কার্যকর করবার আশা করছি। অন্যত্র আমি পরিকল্পনাকে সফল করবার চেষ্টা করি।"

(৩ মার্চ, ১৯০৪)

"শোনো, স্বামী ব্রহ্মানন্দ চান, আমি জন ছয়েককে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় ইতিহাস-স্কুল খুলি; সেখানে মাসে এক সপ্তাহ কাটাব—বাকি সময়ে আমার অনুপস্থিতিতে তাদের কাজ করতে হবে। আইডিয়াটা দারুণ। এখনই কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করব।" (২০ মার্চ, ১৯০৪)

ঐ বছরেরই ৬ নভেম্বরে নিবেদিতার মনোভাব—

"প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কখনোই তাঁর হৃদয়কে আমার থেকে সরিয়ে নেননি।

কিন্তু অন্যদের কাছে, একেবারে সোজা ভাষায় বলতে গেলে, আমার নিজের স্থান সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় নই।"

পরের সপ্তাহেই, ১৩ই নভেম্বর লিখছেন—

"আমরা গতকাল মঠে গিয়েছিলাম। ফিরলাম নবীন চাঁদকে মাথায় নিয়ে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুতর পীড়িত হয়েছিলেন। এখন ভালো হয়ে গেছেন, যদিও তিনি তা চয়েন না। আসল ব্রহ্মানন্দের সহসা আবির্ভাব দেখলাম—যখন গতকাল বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম। তাঁকে মনে হল—স্বামীজী। ও'রা বললেন, এখন পাঁচ বছরের শিশুর মত স্বভাব তাঁর! অপরূপ! এর পরে সারা রাত ধরে স্বামীজীর স্বপ্ন দেখলাম: আমি পাশে বসে আছি; তাঁকে বললাম—আশীর্বাদ করুন। তিনি হাসলেন। আমার মাথায় হাতের চাপ দিলেন।—ব্রিটানীর দিনগুলির স্বপ্ন কী!—অনুপম সেই সপ্তাহ, যখন তাঁকে পেয়েছিলাম মানবের স্বর্গপ্রাপ্তির মত করে।"

ব্রহ্মানন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে যিনি সর্বাধিক তথ্য জানেন, সেই লিজেল রেম' কিন্তু উত্তেজনাপ্রিয় বাঙালী লেখক বা বক্তাদের বিপরীত কথাই লিখেছেন। মিশনের সঙ্গে বিচ্ছেদকালে, যখন সম্পর্ক সবচেয়ে সংঘর্ষময় হওয়ার কথা,—রেম' সেই সময়কার কথা লিখেছেন—

"নিবেদিতার ধরনধারনে সায় না থাকলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। এই মন-কষাকষি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য নিবেদিতা আচমকা একদিন তাঁকে ধরে বসলেন। কিন্তু আলোচনাটা তলিয়ে গেল ধ্যানতন্ময়তায়। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে ব্রহ্মানন্দ চোখ মেলে চাইলেন। নিবেদিতা তখনো নিস্পন্দ, অকূল শান্তির পারাবারে তাঁর মন ডুবে গিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় ঐক্যবোধ।"

এই বিবরণের উৎস নিবেদিতা-ভগিনীর স্মৃতিকথা। অনুরূপ আর একটি বর্ণনা—

"নিজের কার্যকলাপের কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জানানোতে তিনি সস্নেহে হাসলেন একটু। বেশী কথা বলেন না ব্রহ্মানন্দ। আলাপ আলোচনার ধার দিয়ে না গিয়ে বললেন, 'বেশ করেছ মা, খুব ভাল কাজ করেছ।' নিবেদিতা আর-কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একা-একা যেভাবে নিবেদিতা কাজ করে চলেছেন, দেখে সন্ন্যাসীর চমক লাগে। এ-রুদ্রবীর্য কি চিরদিনই সমান থাকবে?

"নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে নিবেদিতাকে উৎসাহ দেন ব্রহ্মানন্দ, তাঁর অগ্রাভিযান যেন অব্যাহত থাকে। বলেন, 'তোমার সহযাত্রী অনেকেই তোমার মন ভেঙে দিতে চাইবে। বলবে, তোমার একাজ শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের কাজ নয়। তাদের কথায় কান দিও না। সমস্ত জগৎ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও যা ঠিক বলে বুঝেছ, তা ছেড় না......'

"নিবেদিতা কথা বলেন তাড়াতাড়ি, আর তারই তোড়ে নিজের বক্তব্যকে ছবির মত ফুটিয়ে তোলেন। ব্রহ্মানন্দ আর তাঁর মধ্যে বোঝাপড়া হওয়ার পক্ষে এই এক অন্তরায়। কারণ সন্ন্যাসী ইংরাজী ভাল জানতেন না, সব কথা যে বুঝছেন না,

তাও বলতেন না। এদিকে কথার তোড় ক্রমেই বাড়তে থাকে, শেষকালে ব্রহ্মানন্দ ধ্যানে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। প্রথমটা নিবেদিতা ধাক্কা খেয়ে ... হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর তন্ময়তার ছোঁয়া লেগে তিনিও ধীরে ধীরে অন্তর্মুখ হয়ে পড়েন। হঠাৎ-ঘনিয়ে-আসা এক স্তব্ধতায় কথা হারিয়ে যায়। ব্রহ্মানন্দের নীরব আশীর্বাদে প্রীতিরসে গলে পড়ে নিবেদিতার মন।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য, অধুনা বিখ্যাত স্বামী প্রভবানন্দ এই বিষয়ে লিখেছেন—

"আর মহারাজের (ব্রহ্মানন্দের) মুখে শুনেছি নিবেদিতার প্রশংসা। নিবেদিতা মহারাজের কাছে আসতেন, কথা বলতে বা শুনতে নয়—মহারাজের সান্নিধ্যে ... করতে। আর মহারাজ বলেছিলেন—নিবেদিতা কাছে এলে মহারাজের মনও দ্রুত করে উচ্চ স্তরে উঠে যেত।"*

সবশেষে উদ্ধৃত করছি স্বামীজীর পত্রের কিছু অংশ; পত্রটি ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ কাশী থেকে লেখা। এইটিই সম্ভবতঃ নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর শেষ চিঠি।† এতে নিবেদিতার বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ ... স্বামীজী লিখেছিলেন—

"তোমার চিঠি পেয়ে অতীব উল্লসিত। উল্লাসের অধিক কারণ, তুমি অখণ্ড ইচ্ছা এবং পুনঃপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসহ ফিরে এসেছ।......"মা" যেভাবে চালান, তিনি সেইভাবেই চলো; যদি সম্ভব হয়, তোমাকে সাহায্য করব, কিন্তু আমি ... কম্বলবন্ত বই আর কিছু নই, তদুপরি এক-চক্ষু (এই সময়ে স্বামীজীর ... চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে যায়)। কিন্তু তোমাকে আমার পূর্ণ, ... আশীর্বাদ—যদি আরও বেশী থাকে, তাও।

"আমার কোনো অভিযোগ নেই। যেভাবেই হোক, আমাকে বলি হতে হবে—স্বেচ্ছাবলি—কোনো সন্দেহ নেই।...তুমি ইস্পাতের মত খাঁটি এবং বিশ্বস্ত—নিজ ছায়ার মতই বিশ্বস্ত। ধনী বন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া মাত্র তুমি বেশী এগিয়ে পড়নি, বা বিদ্রোহী হওনি। তোমার জন্য আমার সর্বশেষ আশীর্বাদ রইল।"

---

* এই অংশটি শ্রীব্রহ্মগোপাল দত্তকে লিখিত একটি পত্রের অংশ, নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (সম্পাদক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ) প্রকাশিত। স্বামী প্রভবানন্দ ঐ পত্রে আরও লিখেছিলেন—

"যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। গুপ্ত মহারাজের ... বাগবাজারে বসেছিলাম, নিবেদিতা এলেন গুপ্ত মহারাজের কাছে বিদায় নিতে, দার্জিলিং যাবেন। ঐবারেই দেহত্যাগ হয়।

"আমার মাথায় ছিল টেরী কাটা, আর পকেটে ছিল ঘড়ি চেন। এই দেখে নিবেদিতা চোট—
'Swamiji wanted boys who are strong, muscular, brave, not sissies' আরও অনেক উপদেশ দিলেন, সে সব মনে নেই। কিন্তু স্মরণে আছে তাঁর cult... voice, diction ইত্যাদি—ইংরাজীতে যখন কথা বলছেন—যেন কবিতার মত সুন্দর।"

† এই পত্রটি পূর্বে আংশিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। বাণী ও রচনার মধ্যে এটি খণ্ডিত ভাবে প্রকাশিত। পরে স্বামী নির্লেপানন্দের কাছ থেকে গোটা চিঠির নকল পেয়েছি।

এই চিঠিতেই স্বামীজী সর্বাধিক জোর দিয়ে লিখেছিলেন—

"আগে এক চিঠিতে আমার সামান্য যা অনুরোধ করার আছে তা লিখেছিলাম,—আমি আর কারো উপর নির্ভর করতে বলি না—আর কেউ নয়—একমাত্র ব্রহ্মানন্দ। সেই 'বুড়ো লোকটি'র বিচারে কখনো ভুল হয় না*—আমার সর্বদাই হয়। যদি কোনো বিষয়ে তোমার পরামর্শের প্রয়োজন হয়, কিংবা কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নিতে চাও—তাহলে শুধু ব্রহ্মানন্দেরই নাম করব—অন্য কেউ নয়, কেউ নয়। এ বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার।"

I recommend you none—not one—except Brahmananda. That 'old man's judgement never failed—mine always do. If you have to ask any advice or to get anybody to do your business Brahmananda is the only one I recommend, none else, none else. With this my conscience is clear.

* 'That old man' কি ব্রহ্মানন্দ না শ্রীরামকৃষ্ণ? বলা শক্ত। পত্রের রচনা মনে হয় ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু স্বামীজী 'old man' শ্রীরামকৃষ্ণকেই সাধারণতঃ বলতেন 'failed' শব্দের প্রয়োগে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণও হতে পারেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত শক্ত। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ হন, তাহলেও কার্যতঃ অর্থ একই দাঁড়ায়—ব্রহ্মানন্দের বি[illegible] সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা নির্ভুল, ইত্যাদি।

স্বামী সারদানন্দ—ভগিনী নিবেদিতা

'যাঁদের তুল্য আধ্যাত্মিক চরিত্র অল্পই দেখা যায়'—সেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের মধ্যে দ্বিতীয় জনের সঙ্গেই বাইরের কর্মজগতে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর ছিল। ধ্যানের মানুষ ব্রহ্মানন্দের তুলনায় সারদানন্দ অধিকতর কর্মের মানুষ। সারদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক রূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন—শেষও করেছিলেন একই পদে অধিষ্ঠিত থেকে। মধ্যে ৩০ বৎসর কেটে গিয়েছিল, মঠ ও মিশনের সভাপতি হবার অনুরোধ তাঁর কাছে এসেছিল, কিন্তু যেহেতু বিবেকানন্দ তাঁকে মঠের সেক্রেটারী করে গেছেন, সেহেতু বিবেকানন্দের বন্ধু ও একান্ত অনুগত এই মানুষটি—ভাবুক, লেখক ও আধ্যাত্মিক এই মানুষটি—অন্য কর্মস্বীকার করতে পারেননি।

এমন যাঁর চরিত্র, তিনি যে নিবেদিতা ম্যাকলাউড প্রভৃতি বিবেকানন্দে অনন্যনিষ্ঠ মানুষদের কাছে অত্যুচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন, তাতে সন্দেহ কি! তা তিনি ছিলেনও। ম্যাকলাউড প্রভৃতি সারদানন্দকে 'দু নম্বর স্বামীজী' বলতেন।

সারদানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করা যাবে না, কারণ বহুক্ষেত্রেই তা প্রায় দৈনন্দিন যোগাযোগের ব্যাপার। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগ মানে অনেক স্থলেই সারদানন্দের সঙ্গে যোগ। পাঠকদের এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে তথ্য এখানে পরিবেশিত হবে—তা ব্যাপক সংযোগের তুলনায় সামান্যই।

ম্যাকলাউডের সঙ্গে সারদানন্দের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। আর ম্যাকলাউড ও সারদানন্দ নিবেদিতাকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। এঁদের চিঠিপত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্পর্কের রূপ ফুটেছে। নিবেদিতা ১৮৯৯-এর ৩ জানুয়ারী ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"ইচ্ছে হয়, তুমি যদি দেখতে, দু' নম্বর (সারদানন্দ) আমার সঙ্গে চা খেতে খেতে তোমার চিঠিগুলি বদলাবদলি করে পড়ছেন! তাঁর চিঠিগুলি তিনি পড়ছেন চেঁচিয়ে, আমারগুলি আমি!"

দুদিন পরে ম্যাকলাউড ও ওলি বুলকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা জানালেন—"সারদানন্দ গতকাল দু' ঘণ্টা এখানে কাটিয়েছেন। তিনি আমার বিষয়ে বলেছেন—'আমার পশ্চিমী বন্ধু', এবং তোমার বিষয়ে কথা বলেছেন।"

সারদানন্দের উপরে স্বামীজীর কতখানি নির্ভরতা ছিল, তা ৯. ৪. ১৮৯৯ তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে বোঝা যায়—

"পাশ্চাত্যযাত্রার বিষয়ে স্বামীজী বললেন, সারদানন্দ না ফেরা পর্যন্ত (তিনি তখন গুজরাটে) তিনি যাত্রাবিষয়ে কোনো চিন্তাই করতে পারবেন না, কারণ আর কারও উপর তিনি লোকজনের ভার বিশ্বাস করে দিয়ে যেতে পারেন না। তাঁর এইকথা তোমার ভাল লাগবে জানি।"

এই বছরেরই ৭ই জুন এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—"বেচারা সারদানন্দ মরতে পারলে বাঁচেন। পারিবারিক ব্যাপারে চাপ যথেষ্ট।......সেইসঙ্গে মঠের বিরাট দায়িত্ব।......"

১৯০৫-এর ৪ মে তারিখের এক চিঠিতে সারদানন্দের 'খুব বেঁচে যাওয়া'র কথা—

"*এক সন্ধ্যায় সারদানন্দ ডুবতে ডুবতে খুব বেঁচে গেছেন।* নদীতে হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়টির কথা তোমার মনে আছে—সেই অন্ধকার বারান্দা—স্বামীজীর এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি!*

নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যে লেখা একটি চিঠিতে সারদানন্দ নিবেদিতার বড় সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত ও ভূস্বামী রাজা প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা সেই চিঠিটির অংশ উদ্ধৃত করছি। এটি কুরুক্ষেত্র থেকে লেখা। সময়, রবিবার, ২৩।১০।৯৮।

মহাশয়—বহুকাল আপনাকে কোনো পত্রাদি লিখি নাই। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি (গত ফেব্রুয়ারীতে)। বোধহয় শুনিয়া থাকিবেন।......

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা একজন ব্রহ্মচারিণী সম্প্রতি কাশীধাম দর্শনে যাইতেছেন। ইনি ইংলণ্ড হইতে কয়েকমাস হইল আসিয়াছেন। বিবেকানন্দজী ইঁহাকে শ্রীমতী নিবেদিতা নাম প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার পূর্বনাম Miss Noble. ইনি বিশ্বনাথের আরাত্রিক দেখিবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমাকে কাশীধামস্থ কোনো বন্ধুকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে লিখিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমার তো কাশীধামে আপনি ছাড়া আর কোনো এমন বন্ধু নাই, যিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। তজ্জন্য আপনাকে এ বিষয়ে লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি আপনি শ্রীমতী নিবেদিতাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

নিবেদিতাকে জুতা খুলিয়া বা অন্য যাহা কিছু করিয়া বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতে বলিবেন, ইনি তাহাই করিতে রাজী আছেন। ইনি সম্প্রতি দুর্গম তীর্থ অমরনাথ (কাশ্মীরে) দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।......

---

* সারদানন্দ যে সত্যই বিপদে 'অনুদ্বিগ্ন' পুরুষ ছিলেন, নদীতে ঝড়ের এই ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। এ বিষয়ে ব্রহ্মচারী অক্ষরচৈতন্য লিখিত 'স্বামী সারদানন্দের জীবনী' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। ঘটনাটির বিষয়ে স্বয়ং সারদানন্দ বলেছিলেন—"কাঞ্জিলালের (ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল) সঙ্গে মঠে যাচ্ছি মহারাজের (ব্রহ্মানন্দের) একটা ফোড়া অস্ত্র করতে হবে। আমি তামাক খাচ্ছি, এমন সময় মহাঝড় উঠল। নৌকা টলমল। আমার কোনই উদ্বেগ হচ্ছে না, বেশ নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাচ্ছিলুম। কাঞ্জিলাল আমার এরকম নিরুদ্বেগ ভাব দেখে মহাক্রোধে ছিলিমটা গঙ্গার জলে ফেলে দিলে। যা হোক তখন পালটা নামিয়ে দিতে বললুম। পাল নামাতেই অনেকটা নিরাপদ বোধ হল। ঝড়ও ক্রমশঃ থেমে গেল।" অক্ষরচৈতন্য এ ব্যাপারে আরও একটু তথ্য যোগ করেছেন—"নিজের কথা বলিবার সময়ে শরৎ মহারাজ কতকটা রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল ছিলিমটি ফেলিয়া দিতেই হুঁকো দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'এটাও ফেলে দেবে নাকি?'"

শ্রীমান্ বিবেকানন্দ এখন কলিকাতায় আছেন। শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। সম্প্রতি অনেক ভাল আছে।......*

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে যখন প্লেগ-সেবার কাজ আরম্ভ হয়, তখন স্বভাবতঃই সারদানন্দের উপর সংগঠনের দায়িত্ব অনেকখানি ছিল। প্লেগ-সেবা করতে গিয়ে বেপরোয়া হয়ে নিবেদিতা কিভাবে নিজ জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিলেন, তা ১৮৯৯-এর ১১ মে তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা সারদানন্দের পত্র থেকে দেখতে পাই। নিবেদিতা সম্বন্ধে স্নেহ ও শ্রদ্ধা চমৎকার ফুটেছে এখানে—

"মার্গট দ্রুত তৈরী হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে একটা চুক্তি করা দরকার, যদি সে আমাকে সঙ্গে নেয়!! সে গতকাল, এবং তার আগের দিন এখানে এসেছিল। আমি তাকে সেই ছোট টেবিলটিতে চা খেতে দিলাম। স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দের বার্থ রিজার্ভেশন (পাশ্চাত্ত্য যাত্রার) বিষয়ে আমরা কথা বললাম, বাক্সপ্যাটরা কেনাকাটা বিষয়েও,—পরে স্বামীজীর সঙ্গে পরামর্শও হল। মার্গট আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে, আর প্লেগ-সেবার বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি-উৎসাহ দেখিয়েছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে প্লেগ-সেবায় নার্স যোগান দেবার প্রয়োজন হয়নি—কিন্তু 'প্রিয় বালিকাটি' দুবার জীবন বিপন্ন করে তা করেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে রক্ষা পেয়েছে—তাকে আরও বহুবছর আমাদের মধ্যে পাব। বর্তমানে প্লেগ কিছু কমতি—কিন্তু পরের শীতে আরও ব্যাপকভাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। মার্গট এখন বুঝেছে, তার শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে—নিজের জীবনকে মূল্যহীন ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। তুমি এ বিষয়ে তাকে দু'এক লাইন লিখতে পারো।"

নিবেদিতার নানা কাজ সম্বন্ধে সারদানন্দের চিঠিপত্রে আরও যেসব টুকরো তথ্য পাওয়া যায় সেগুলির উল্লেখের দরকার নেই,† কিন্তু নিবেদিতাকে লেখা সারদানন্দের একটি চিঠির কথা বলতেই হবে, যা নিবেদিতার জীবনের দারুণতম বেদনার কারণ। সে চিঠি এই—

প্রিয় নিবেদিতা,

সমাপন। গতরাত্রে ৯টার সময়ে স্বামীজী ঘুমিয়েছেন—সে ঘুম ভাঙার নয়।

তোমাদের
সারদানন্দ
(৫।৭।১৯০২)

---

* ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র রচিত 'স্বামী সারদানন্দ' দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা—১২২-২৩

† ১৬ই নভেম্বর, ১৮৯৯-তে নিবেদিতাকে লেখা সারদানন্দের একটি চিঠি পাই, যেটি পরে আমরা 'শিক্ষা সরস্বতী' অধ্যায়ে উধৃত করব।

নিবেদিতাকে যিনি গভীরতম বেদনার সংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি বেদনাতীর্থে নিবেদিতার সহযাত্রী ছিলেন। আমরা আগেই দেখে এসেছি, লোকান্তরিত স্বামীজীর দেহবস্ত্রের খানিক অংশ যখন স্মৃতিচিহ্নরূপে ম্যাকলাউডের কাছে পাঠাবার ইচ্ছা বোধ করছেন নিবেদিতা, তখন তাঁর সেই সংকুচিত ইচ্ছার কথা একমাত্র সারদানন্দের কাছেই প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

স্বামীজী অন্তর্হিত হলে, স্বামীজীর কথার সত্যতা প্রমাণ করে কয়েকজনের মধ্যে সহসা বিরাট শক্তির স্ফূরণ দেখা যায়। একপক্ষে ব্রহ্মানন্দ-সারদানন্দ প্রভৃতি, অন্যপক্ষে নিবেদিতাদি। সারদানন্দের জাগ্রত-ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রম জানিয়ে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০২, তারিখে লিখেছেন—

"মিসেস রোয়েথলিসবারজার ঠিকই বলেছেন, স্বামীজীর দেহই তাঁর পথের প্রতিবন্ধক। স্বামী সারদানন্দ কী অসাধারণ শক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন, তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না।"

অপরপক্ষে নিবেদিতা কোন্ অসাধারণ শক্তিতে পূর্ণ হয়েছিলেন, তা অকুণ্ঠে সারদানন্দ লিখেছেন নিবেদিতার মৃত্যুর পরে লিখিত এক রচনায়। সেটি উপস্থিত করার আগে, নিবেদিতার দুটি বইয়ের সূচনায় সারদানন্দের যে কটি কথা লিখিত আছে, সেগুলি উদ্ধৃত করছি।

নিবেদিতার The Master গ্রন্থ রামকৃষ্ণ মিশনই প্রথম প্রকাশ করেন—ভগিনীর জীবিতাবস্থাতেই। সারদানন্দ গ্রন্থ-সূচনায় লেখেন :

জগজ্জননীকে প্রণাম।

নিজ গুরুর প্রতি ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতার স্মারকরূপে লিখিত নিবেদিতার এই গ্রন্থটিকে বিশ্বসমক্ষে উপস্থাপনের সময়ে সমুদয় ভ্রাতৃগণ নিবেদিতাকে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছেন।

বেলুড় মঠ
ফেব্রুয়ারী ১, ১৯১০

সারদানন্দ

নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে প্রকাশিত হয় *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda* বইটি। মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্'পত্রে নিবেদিতা এটিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। বইটির সম্পাদনা করেন স্বামী সারদানন্দ। অধ্যায়ের নামকরণ এবং দু'একটি তথ্যগত ভ্রান্তি সংশোধন ভিন্ন তিনি বেশীকিছু করেন নি। ভূমিকায় সে কথা জানিয়েছেন। তারপর লিখেছেন—

"সমাপ্তিতে সম্পাদক এই ভরসা করেন যে, যথার্থই যোগ্য এই বইটি জনগণের সোৎসাহ অভ্যর্থনা লাভ করবে, কারণ এই বইয়ের মধ্যে সুমহান

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত অংশে উজ্জ্বল আলোকপাত করা হয়েছে, এবং যে-ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণে অমর শোকাভিভূত, যিনি ন্যায় ও সত্যের পক্ষে, ভারতের কল্যাণের পক্ষে অসংকোচ ধর্মযোদ্ধারূপে সাধারণের সমক্ষে এখন প্রতিভাত, তাঁর এহেন আত্মপ্রকাশের আগে নিজ আচার্যদেবের নিকট কি ধরনের শিক্ষা নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে পরিচয় মিলবে।"

'সমুদয় ভ্রাতৃগণের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা' পেয়েছিলেন যে নিবেদিতা, যিনি পরবর্তীকালে 'ন্যায় ও সত্যের পক্ষে এবং ভারতের কল্যাণের পক্ষে অসাধারণ ধর্মযোদ্ধারূপে' প্রতিভাত হয়েছিলেন—তিনি এই মহান ধর্মবীরের চোখে কী রূপে ধরা দিয়েছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত নিবেদিতার মৃত্যুর পরে রচিত প্রবন্ধটি—'সাহিত্য' পত্রিকার আষাঢ়, ১৩১৯, সংখ্যায় যেটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাটি খণ্ডিত আকারে সরলাবালা সরকার লিখিত 'নিবেদিতা' পুস্তকের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়েছে।—

"পূজ্যপাদাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য ত্যাগ ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রদর্শিত 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্বস্বত্যাগরূপ 'পন্থা'র অনুসরণ করিয়া পাশ্চাত্ত্যের যে-সকল মহাপ্রাণা রমণী দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ভারতের কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন, এ কথা বলিলেও, এক হিসাবে অত্যুক্তি হয় না। ঐ ব্রতাবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে শীত ঋতুর অবসানে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন, এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের পরমধামে উপনীতা হয়েন। ঐ ত্রয়োদশ বর্ষ তিনি যে কিভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন—কি অপূর্ব একনিষ্ঠা, অনন্ত অধ্যবসায় ও তন্ময়ধ্যানে রত থাকিয়া তিনি সর্বদা লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে কথা সাধারণে অবগত নহে। নিবেদিতাকে হারাইয়াই সে কথা জানিবার জন্য এখন সকলের প্রাণে একটা প্রবল বাসনা উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু ঐ বিষয়টি জানিতে হইলে আমাদিগকে নিবেদিতার বাহ্যজীবন-যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কেবল লোকনয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত তাঁহার বড় বড় কাজগুলি দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে—দৈনন্দিন জীবনে তিনি কিভাবে তাঁহার দরিদ্র অশিক্ষিত পাড়া-প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিভাবে তিনি তাহাদিগের সকলপ্রকার সুখ-দুঃখের সমভাগিনী হইবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন; সাংঘাতিক ব্যাধি-গ্রস্তকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কিভাবে নিজ অমূল্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় রত থাকিতেন; দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত হইতে অপরকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি নিজের অবস্থা সচ্ছল না হইলেও কিভাবে মুক্তহস্তে দান করিতে অগ্রসর হইতেন; দুর্ভিক্ষের তাড়না হইতে গ্রামবাসী-

দিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিভাবে তিনি অনশন অনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কঠোরতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া দিনের পর দিন পদব্রজে বন্যার জল ভাঙিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থার সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতের প্রাচীন গৌরব ও অক্ষুণ্ণ জ্ঞানসম্পদের সহিত বর্তমানযুগের বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্য-সমূহের সম্মিলনে দেশের রমণীকুলের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার সম্প্রসারেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি একমাত্র সম্ভবপর—এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া তিনি কি-ভাবেই বা এক নূতন স্ত্রী-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও অভিনব শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া আমাদিগের কুলবধূগণের হৃদয়-মনে বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকার স্থাপনে সমর্থা হইয়াছিলেন!—আর দেখিতে ও পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নিত্যানুষ্ঠিত ঐ প্রকারের শত চেষ্টার পশ্চাতে বিরাজিত তাঁহার হৃদয়ের সেই ভালবাসা, আয়-ব্যয়-হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত ভালবাসা—যে অসীম ভালবাসায় তিনি ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে কা কথা, প্রত্যেক উপলখণ্ডকেও পবিত্র ও আপনার হইতে আপনার বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন।

বাস্তবিক, মহতের মহত্ত্বের পরিচয় আমরা চিরকালই ঐভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন কার্যসহায়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। নতুবা দৈবাধীন ঘটনাচক্রের প্রবল প্রবাহে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া ভীরু কাপুরুষকেও অনেক সময় সংসারে বড় কাজ করিয়া ফেলিতে দেখা যায়। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সকলপ্রকার ক্ষুদ্র চেষ্টা ও অনুষ্ঠানের পশ্চাতেই আমরা ঐরূপ যথার্থ মহত্ত্বের নিত্য পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকই অদ্য তাঁহার অদর্শনে শোকে ম্রিয়মাণ, এবং সেইজন্যই সকলে আজি তাঁহার জীবন্ত শক্তিমতী মূর্তি হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নিত্যপূজা করিতেছে।"

নিবেদিতার প্রতি সারদানন্দের শ্রদ্ধা কেবল প্রবন্ধ রচনাতেই সমাপ্ত হয়নি। রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত থেকে নিবেদিতা যে বিদ্যালয়টি আরম্ভ করেছিলেন—সেটিকে চরম দুর্বিপাকের মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখার কাজে সারদানন্দ সাহায্য করেছেন, এবং তাঁরই চেষ্টায় বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ বিষয়ে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকায় (১৯৬৬) স্বামী সারদানন্দের প্রতি শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনকালে লেখা হয়েছে—

"নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সারদানন্দের আজীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণের পর ভগিনী নিবেদিতা যখন পুনরায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেন, তখন থেকে তাঁর এই কাজে প্রধান সহায় ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ভগিনী ক্রিস্টিনের সহায়তায় যখন বিদ্যালয় সংলগ্ন পুরস্ত্রী বিভাগের উদ্বোধন হয়, স্বামী সারদানন্দই ছিলেন নিবেদিতার প্রধান পরামর্শ ও সাহায্য-দাতা। নিবেদিতার অনুরোধে তিনি ব্যবস্থা

করেন যে, যোগীন-মা বিদ্যালয়ে অন্তঃপুরবাসিনীদের জন্য গীতার ক্লাস করবেন।*... ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগ হয় ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভগিনী ক্রিস্টিনকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয় (তিনি জার্মান জাতিসম্ভূত বলে)। অতঃপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার পড়ে ভগিনী সুধীরার উপরে। স্বামী সারদানন্দের সহায়তায় সুধীরা এই সময়ে বিদ্যালয় সংলগ্ন কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য মাতৃমন্দির নাম দিয়ে (বর্তমানে 'সারদা মন্দির') আশ্রম বিভাগ খোলেন। প্রধানতঃ সারদানন্দের প্রচেষ্টাতেই ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তখন থেকে ১৯২৬ সালে দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদে আসীন।"†

* ২৬ নভেম্বর, ১৯০২-এর এক পত্রে নিবেদিতা লিখছেন—"পরের শনিবার সন্ধ্যায় চমৎকার আসর হওয়ার কথা। স্বামী সারদানন্দ উঠানে চৌকির উপর বসে চণ্ডীগ্রন্থ থেকে মায়ের নাম গান ও কথকতা করবেন—মনোরম নয় কি ?"

† ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দের জীবনী'র মধ্যেও এই বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যগণের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক

স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে যাবার আগে রামকৃষ্ণ সংঘের সম্বন্ধে নিবেদিতার বহু বক্তব্যের মধ্যে অল্প কিছু উদ্ধার করা উচিত, কারণ, এই সংঘ মূলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল, সুতরাং সংঘের বিষয়ে মনোভাবকে শিষ্যসমষ্টির বিষয়ে সাধারণ মনোভাব বলেই ধরতে হবে। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন—

"ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল, জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য-বোধের নূতন আদর্শ সৃষ্টির প্রাথমিক উদ্দেশ্যে একটি সন্ন্যাসীসংঘ সংগঠিত হয়েছে। ইউরোপে, প্রত্যক্ষ ধর্মোপলব্ধি কম ঘটে বলে, সন্ন্যাসীদের পক্ষে এই ধরনের লোকসেবার কাজ পুণ্যকর্ম বলেই বিবেচিত হয়, কিন্তু ভারতে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কাছে প্রথম ও শেষ দাবি, তা যেন ঋষি সৃষ্টি করে।"

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ আদর্শের বিনিময়, এবং জীবনে তাকে সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে' রামকৃষ্ণ সংঘের যে সন্ন্যাসীগণ অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের নেতার কথায়, তাঁদের প্রতি নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে তিনি সুগভীর আনন্দের সঙ্গে স্বামীজীর প্রতি তাঁর গুরুভাইদের ভালবাসার বর্ণনা করেছেন, স্বামীজী যখন পরিব্রাজক হয়ে হারিয়ে যেতেন বারবার ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে, তখন গুরুভাইরা তাঁর অদর্শনে কাতর হয়ে কিভাবে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতেন, স্বামীজীর প্রচণ্ড গঞ্জনা সত্ত্বেও, এবং পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য-প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দের অ-রক্ষণশীল আচার-আচরণের সমালোচনায় যখন নিন্দুকের কণ্ঠ মুখর, তখন তাঁরা, ব্যক্তিজীবনে অতীব গোঁড়ারাও, বিনা ভ্রূক্ষেপে নেতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের প্রতি নমস্কার জানিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—'রামকৃষ্ণ সংঘ বিবেকানন্দ বিনা যেমন অর্থহীন, তেমনি বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেত যদিনা তিনি তাঁর পিছনে রামকৃষ্ণসংঘভুক্ত ভ্রাতৃগণকে পেতেন।'

'Meaningless as would have been the Order of Ramakrishna without Vivekananda, even so futile would have been the life and labours of Vivekananda, without behind him, his brothers of the Order of Ramakrishna.'

সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে নিবেদিতা যে সহৃদয়তা পেয়েছেন, তার বিষয়েও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন—

"বেলুড়ে স্বামীজীকেই কেবল আমরা দেখিনি। সমস্ত মঠই আমাদের অতিথি

স্নান করত। মমত্বপূর্ণ সেবা ও সাহায্যের নানা কাজে অতিথিবৎসল সন্ন্যাসীদের ব্যস্ত দেখা যেত। নিজেরাই দুগ্ধদোহন করে আমাদের পাঠাতেন। রাত্রিবেলা পথের মধ্যে যখন গোখরো সাপ দেখা গিয়েছিল, এবং ভৃত্য সেই পথ দিয়ে ভয়ে আসতে অস্বীকার করেছিল—তখন সাধুদেরই একজন চাকরের কাজটি করলেন। আমাদের ভারতবর্ষীয় গৃহস্থালীর দৈনন্দিনের বিচিত্র সমস্যার সমাধানে এক ব্রহ্মচারীকে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। অন্য একজনকে দেওয়া হয়েছিল বাংলা শেখানোর কাজে। রীতিরক্ষার জন্য বা সহৃদয়তাবশে প্রবীণ সাধুরা প্রায়ই আসতেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ যখন কয়েক সপ্তাহের জন্য বাইরে গেলেন, তখন সকালে চায়ের টেবিলে তাঁর স্থান কেউ না কেউ নিতেনই, অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব তাঁরা এমনভাবে বোধ করেছিলেন। এইসব এবং এহেন হাজারো ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই জ্বলন্ত স্মৃতিময় অতীত আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল, যার 'টানা'-র উপর এই ত্যাগীদের জীবন 'পোড়েনের' মত বোনা হয়েছিল।

"কারণ এইসকল সন্ন্যাসীদের চিন্তার বা আলোচনার একটি বিষয়ই ছিল—তাঁদের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর মহান শিষ্য বিবেকানন্দ।"

একথা ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যের সঙ্গেই নিবেদিতার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়। স্বামীজীকে বাদ দিলে ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দই তাঁর কাছে প্রধান দুই চরিত্র। তাহলেও বাকি অনেকেই নিবেদিতাকে যথেষ্ট স্নেহ-প্রীতির চোখে দেখতেন, তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলী যদি অনুমোদন নাও করেন। অপরপক্ষে সকলের সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখা যদিও আমরা তেমন পাইনি (নিবেদিতার অজস্র চিঠির কটাই বা আমরা পেয়েছি!) তাহলেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক শিষ্যের জীবন ও বাণীর স্বতন্ত্র গৌরবকে তিনি স্বীকার করতেন, এবং সিস্টার দেবমাতাকে সেকথা বলেছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অল্পস্বল্প উল্লেখ নিবেদিতার চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গে তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাও গিয়েছিলেন। নিবেদিতাদের উইম্বলডনের বাড়িতে স্বামীজীর সঙ্গে তুরীয়ানন্দ অতিথি হয়েছিলেন। আমেরিকাতেও পরে নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছে। শাস্ত্রীয় প্রশ্ন মীমাংসার জন্য নিবেদিতা তুরীয়ানন্দকে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছেন—দেখতে পাই।

ভারতে আসার পরে নিবেদিতা যখন শ্রীমায়ের আবাসে গিয়ে ওঠেন, তখন সেই বাড়িতেই মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী যোগানন্দ ছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। যোগানন্দের মৃত্যুর যে অপূর্ব বর্ণনা নিবেদিতা চিঠিতে করেছিলেন, তাও উদ্ধৃত করেছি আগে।

স্বল্প পরিচয়েও নির্মলানন্দকে নিবেদিতা শ্রদ্ধা করতেন।—"তাঁর স্বজনদের

শুরুর তুমি আছ—এ বড় সুন্দর। হাঁ, স্বামী নির্মলানন্দকে আমি মাত্র একবার দেখেছি, তাতেই তাঁকে অপূর্ব লেগেছে। স্বামীজীও আমার কথায় সায় দিয়েছিলেন"—নিবেদিতা ২১. ৭. ১৯০৫ সালের এক চিঠিতে লিখেছেন।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের একটি চিত্র, ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার পত্র থেকে—(৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯)—

"যখন সেদিন মৃত বালিকাটির ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম, তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কণ্ঠনিনাদ! সে ডাক যদি তুমি শুনতে,—শুনে মনে হল 'বীর ক্ষত্রিয় এবং জঙ্গলাক।'—'শুনলাম সিস্টার নিবেদিতা এখানে এসেছেন, সুতরাং অবিলম্বে আমি চলে এসেছি,'—তিনি বললেন। তারপরেই অবতরণ। চমৎকার। অতএব কখনো এঁর বিষয়ে মন্দ কিছু বলো না। সেই বলীয়ানের স্বর আর ক্ষত্রিয় মহত্ত্ব। অতি চমৎকার।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এক অসাধারণ পুরুষ, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, কারণ সমস্ত বাধা বিপত্তি এবং আপত্তির মধ্যেও, ভাঙা বাড়িতে, অনাহার বা অনিশ্চিত আহারের মধ্যেও 'ঠাকুর ঘরটিকে' রক্ষা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে দাস্যভাবের প্রতীক তিনি, 'মহাবীর', বুক চিরে দেখাতে পারতেন শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে ত্যাগী শিষ্যগণ যখন বৈরাগ্যে পরিব্রাজক, তখন, নিবেদিতার ভাষায়, 'একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, যাঁর নাম রামকৃষ্ণানন্দ, যিনি কিছুতে শ্রীগুরুর দেহ-ভস্মাবশেষ ত্যাগ করে যাবেন না, যিনি পর্বতের মত অটল ছিলেন একটি প্রতিজ্ঞায়—মাথার উপরে একটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা তিনি রাখবেনই, যে-পর্যন্ত না গুরুভ্রাতৃগণ আবার একত্র হচ্ছেন ঠাকুরঘরটিতে।'

ঠাকুরের প্রধান শিষ্যই ঠাকুরঘর ও ঘণ্টানাড়ার প্রধান প্রতিবাদী ছিলেন। শশীর (রামকৃষ্ণানন্দের) আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে নরেন্দ্রের অজস্র আক্রমণের সঙ্গে 'পত্রাবলীর' পাঠকমাত্রেই পরিচিত। কিন্তু কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল বিবেকানন্দের ঐ নিষ্ঠামূর্তির প্রতি! রামকৃষ্ণ-আদিষ্ট কার্য কখনই সফল হতে পারে না—রামকৃষ্ণানন্দগণ সেই কাজে যোগদান না করলে! স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, শশী একদিন দলপতি নরেন্দ্রের চুল ধরে টেনে তাঁকে ঠাকুরঘরের বার করে দিয়েছিলেন—ঠাকুরঘরের নিন্দা করায় তিনি এতই উত্ত্যক্ত হয়েছিলেন! তার দারুণ প্রতিশোধ বিবেকানন্দ নিয়েছিলেন—যে শশী পৃথিবীর বিপর্যয়েও ঠাকুরঘর ছাড়তে রাজি নন, তাঁকেই উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করেছিলেন মাদ্রাজে—প্রচার ও সংগঠনের কাজে। শশী মহারাজ গিয়েছিলেন—কারণ নরেন্দ্রনাথ কার্যের দ্বারা গুরুর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন—সুতরাং এবার ঠাকুরই শশীকে টান দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুরঘর থেকে দূরে—নরেন তো উপলক্ষ মাত্র।

প্রেম ও অভিমানের রসায়নে প্রস্তুত কী অপরূপ দিব্য নাটক!—যখন সমস্ত দিনের কঠোর শ্রমের পরে ক্লান্ত, প্রায় মূর্চ্ছিত শশী মহারাজ মাদ্রাজের একটি সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়ে নরেন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করে বলছেন—তাঁর এই সমস্ত যন্ত্রণার মূল নরেনই—পরক্ষণেই ভালবাসায় অনুতাপে বিগলিত কণ্ঠের

ক্ষমা প্রার্থনা, প্রিয়তম ভাইটির কাছে। এইসব গুরুভ্রাতাদের মনে রেখে স্বামীজী নিবেদিতাকে যেকথা বলেছিলেন—আজ যদি তিনি অধঃপতিত হয়ে যান, তাঁর শিষ্যরা পর্যন্ত তাঁকে পদাঘাত করে বিদায় দেবে, কিন্তু গুরুভাইদের ভ্রূকুঞ্চিতও হবে না—আগেই তা আমরা দেখে এসেছি। স্বামীজীর প্রতি গুরুভাইদের ভালবাসার বর্ণনায়, বন্দনায়, নিবেদিতা মুখর তাঁর 'আচার্যদেব' গ্রন্থে—তাও আগে দেখেছি আমরা।

রামকৃষ্ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন রামকৃষ্ণানন্দ। দেহটুকু উৎসর্গ করলেন তার পরে রামকৃষ্ণের ভাবের শরীররূপী বিবেকানন্দের কাছে। দেহকে ক্ষয় করলেন—আক্ষরিকভাবে—সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল, তাতে ক্ষয়রোগ ঢুকল—জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবার জন্য ফিরে এসেছিলেন বাংলা দেশে। তাঁর সেই প্রস্থানের বর্ণনা আমরা নিবেদিতার চিঠি থেকে কিছু পরেই উপস্থিত করব। তার আগে, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিবেদিতা যখন মাদ্রাজে বক্তৃতা করতে গেছেন, তখনো তিনি রামকৃষ্ণানন্দের কাছ থেকে কী রকম আদর ও প্রশ্রয় পেয়েছেন, নিবেদিতার চিঠিতে তার উল্লেখ আছে।—

২১. ১২. ১৯০২-এর চিঠি—

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—কী শক্তিমান! নিরন্তর পূজার পূর্ণতা থেকে যে শান্তি আসে, তার স্পর্শে আমার আত্মা পূর্ণ। শান্তি—এখানে! গৃহ—এখানে! মাধুর্যে পূর্ণ।"

২৯. ১২. ১৯০২-এর চিঠি—

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অত্যুত্তম। প্রতি বক্তৃতায়, বা কথাবার্তার কালে তাঁর শক্তিপূর্ণ অথচ শান্ত উপস্থিতি পেয়েছি।......সদানন্দের ভাইপো আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, নতুন ধরনের সন্ন্যাসে। এখানেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রস্তুত—তাঁর উৎসাহপূর্ণ সমর্থন নিয়ে।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দেহত্যাগের বর্ণনা, ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে (৪. ৭. ১৯১১)—

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিকটস্থ উদ্বোধন অফিসে বহুমূত্র ও ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী। আজ সকালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। কোনো আশাই নেই বাঁচবার। আহা! কী অপূর্ব! সমস্ত সংগ্রাম আর অনিশ্চয়তা পিছনে পড়ে রইল, সামনে শুধু নিশ্চয়তা—ধ্রুবজ্যোতি।......

স্বামীজী কত দ্রুত সকলকে ডেকে নিচ্ছেন! স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নেই! আজ দুপুরে একটায়, তাঁর ভাত বাড়া হয়ে গেছে, সমস্ত সকালটা ভাল কেটেছে, গায়ের তাপ স্বাভাবিক, এটা-ওটা খাচ্ছেন, ফলমূল, সবকিছু—সকলে ভেবেছিল তিনি একটু ঘুমোচ্ছেন, হঠাৎ দেখল—দেহ প্রাণহীন। কী শান্তি! অপরূপ মুখখানিতে সংগ্রামের এতটুকু চিহ্ন নেই, তা শান্তিতে পূর্ণ এমনই—যখন সাড়ে তিনটের সময়ে বিদায় নিতে যাচ্ছি, তখনও দেখলাম।

আমার সৌভাগ্য, ফুল পাঠাতে পেরেছিলাম। সাড়ে পাঁচটার সময়ে শবানুগমন করবার জন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হল—গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হবে। বরাহনগরের পথে একটা ব্রিজ পর্যন্ত গিয়েছিলাম; কিন্তু কয়েক মাইল হাঁটার পক্ষে আমার বার্ধক্য এসে গিয়েছে, ফিরে এলাম, শুধু একলা। বরাহনগরের ছেলেরা তাঁকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল, যদি সম্ভব হয় তাঁকে মঠে নিয়ে যাওয়া হবে, না হলে, শ্রীরামকৃষ্ণকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল, সেই ঘাটে তাঁর সংকার করা হবে, যার নিকটেই মঠে তিনি বহু বহু বছর কাটিয়েছেন, যখন সংঘের মূল শিকড়ের মত তিনি ছিলেন। পরিপূর্ণ জীবন! শেষ তার। আহা—সেই শেষ, সেই তো বিজয়!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম—দেহটি নিয়ে যাচ্ছে—যতক্ষণ না দৃষ্টির বাইরে গেল, চেয়ে রইলাম। মনে হল, হাঁ, ঐ তো তিনি আবার যাচ্ছেন এক মহাপুণ্য তীর্থযাত্রায়—যে-পথ দিয়ে তাঁরা সকলে গিয়েছিলেন যখন বালক ছিলেন, গুরুকে দর্শন করতে।......এখন এখানে আঁধার ঘনিয়েছে, আমার চারিদিকে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, বাতাস প্রার্থনামন্ত্রে পূর্ণ—কিন্তু আমি ভাবছি চিতার রক্তশিখাগুলির কথা।

নিবেদিতা—স্বরূপানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্যদের অন্যতম স্বামী স্বরূপানন্দের পরিচয় রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল, কারণ তিনি সমসাময়িক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্কৃতিমূলক ইংরাজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র বিখ্যাত সম্পাদক এবং ইংরাজীতে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদক। ভগিনী নিবেদিতা স্বরূপানন্দের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর 'আচার্যদেব' গ্রন্থে স্বরূপানন্দের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বরূপানন্দের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও সাধুত্বের বিষয়ে তিনি অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বরূপানন্দ স্বামীজীর কাছে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই, সাধারণ রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস দেন (২৯শে মার্চ)। এর থেকেই স্বরূপানন্দের বিষয়ে স্বামীজীর উচ্চ ধারণার পরিচয় মেলে। সে ধারণা তিনি প্রকাশও করেছিলেন,—মিসেস ওলি বুল প্রভৃতির কাছে সোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন,—'আমরা একটি রত্নলাভ করেছি।'

রামকৃষ্ণ সংঘে প্রবেশের আগেই স্বরূপানন্দ বাংলার সংস্কৃতিজীবনে অংশ গ্রহণের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব নাম অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম ভবানীপুর অঞ্চলে, ১৮৭১-এর ৮ই জুলাই। তিনি 'আশৈশব বিদ্যানুরাগী; নিজ প্রতিভাবলে উচ্চশিক্ষা, উন্নত নীতিবোধ এবং মার্জিত রুচির অধিকারী;...... সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি,......বৈদিক ধর্ম ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে উৎসাহ অপরিসীম।' পল্লীযুবকদের নৈতিক জীবন সংগঠিত ও তাদের পরোপকারে প্রবৃত্ত করতে তাঁর উদ্যমের সীমা ছিল না, এবং সেই উদ্দেশ্যে 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে শাস্ত্রজ্ঞ সংস্কৃত অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে সেখানে শাস্ত্র দর্শনাদি চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই সকল তথ্য স্বামী অব্জজানন্দ তাঁর 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থে স্বরূপানন্দ-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন। সেখানে আরও পাই—"ছাত্রসমাজের মধ্যে উচ্চ আদর্শের পরিবিস্তার, তজ্জন্য নিয়মিত পাঠচক্র, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং গ্রন্থাগার পরিচালনাও এই চতুষ্পাঠীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 'ডন' (*Dawn*) নামে একখানি মাসিকপত্রও অজয়হরির সম্পাদনায় এই চতুষ্পাঠীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকিল।......পরিশেষে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে, অজয়হরির অনুপ্রেরণায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হইলে 'ডন' পত্রিকা এই সমিতি দ্বারাই পরিচালিত হইতে থাকে। তৎকালীন সমাজে আদর্শবাদী 'ডন'-এর প্রভাব সর্বজনবিদিত। ভারতের জাতীয় শিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এই 'ডন' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অজয়হরি যতদিন গৃহত্যাগ না করিয়াছেন,

গোড়াদিন সতীশবাবুর সহিত তিনিও 'ডন' পত্রের যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন।"*

রামকৃষ্ণ সংঘে স্বরূপানন্দের যোগদানকে স্বামীজী 'রত্নপ্রাপ্তি' বলেছিলেন দেখেছি। স্বরূপানন্দের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চরিত্রের জন্যই স্বামীজী একথা বলেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাইরের দিক থেকেও রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষে স্বরূপানন্দ এক অতি প্রয়োজনীয় রত্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন তার বিস্তৃত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করার দরকার এখানে নেই, সংক্ষেপে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, মাদ্রাজ থেকে বিবেকানন্দ-আদর্শবাহী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা তার তরুণ সম্পাদক রাজম আয়ারের অকাল মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সে পত্রিকা অবিলম্বে পুনঃপ্রকাশ না করলেই নয়। ১৮৯৬-এর জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশের পরেই 'প্রবুদ্ধ ভারত' অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, এমনকি তৎকালীন ভারতবর্ষে 'সর্বাধিক প্রচারিত' মাসিক পত্রের গৌরব পর্যন্ত পেয়েছিল,—সেই পত্রিকার প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়া রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের পক্ষে মহা ক্ষতিকর। তাছাড়া সংঘের নিজস্ব মুখপত্রেরও বিশেষ প্রয়োজন। এইসব নানা কারণে 'ডন' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদককে সংঘে লাভ করে স্বামীজী স্বতঃই খুশী হয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়,—এক ইংরেজী মাসিক পত্রের শাস্ত্রজ্ঞ এক সম্পাদককে পাওয়াই নয়,—ঐ সম্পাদক অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, এই ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অজয়হরি ধর্মমতে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী। স্বামীজী সত্যই একজন খাঁটি অদ্বৈত-বাদীকে চাইছিলেন যিনি ভক্তিস্রোতে গা ভাসান দেবেন না, রামকৃষ্ণ-ভক্ত এবং রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়েও যিনি রামকৃষ্ণ-পূজক হবেন না, অভারতীয়দের কাছে যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন, এবং সেই আদর্শেই পত্রিকা পরিচালিত করবেন।

আরও একটি দিক থেকে স্বরূপানন্দের প্রয়োজন বড় হয়ে দেখা দেয়। স্বামীজীর অদ্বৈতবাদী ইংরাজ শিষ্যদম্পতি ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার হিমালয় অঞ্চলে একটি অদ্বৈত কেন্দ্র স্থাপনে বিশেষ উৎসুক হন। এই আশ্রমের কর্তারূপে অদ্বৈতবাদী স্বামী স্বরূপানন্দকে এবং আশ্রমের লৌকিক কর্মরূপে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাটিকে যুক্ত করে দেওয়ার সুযোগ তিনি পান।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়—মায়াবতী আশ্রমে অদ্বৈতবাদী মাদার সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজক সন্ন্যাসীদের সংঘর্ষ যে হয়েছিল, তার কথা স্বামীজীর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা জানেন। স্বামী বিমলানন্দ ও বিরজানন্দ প্রভৃতিরা মায়াবতী আশ্রমের একটি কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের পট পূজা করায় মাদার সেভিয়ার সে বিষয়ে স্বামীজীর কাছে অভিযোগ করেন এবং স্বামীজীও বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। তাঁর অভিপ্রায়মত শ্রীরামকৃষ্ণ পট অতঃপর সরিয়ে নেওয়া হয়। ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি এখানেই হয় না। স্বামীজীর অভিপ্রায় অভ্রান্ত কিনা,

---

* স্বামী অব্জজানন্দ তাঁর প্রদত্ত এই তথ্য শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় রচিত *The Origins of the National Education Movement* নামক গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন এবং মূল উদ্ধৃতও করেছেন।

সে বিষয়ে স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যেও সন্দেহ থাকে এবং তাঁরা এ বিষয়ে শ্রীমা সারদাদেবীর নির্দেশ প্রার্থনা করেন। শ্রীমা ঐ পত্রের একটি অপূর্ব উত্তর দেন—সে উত্তর স্বরূপানন্দের ডায়েরীতে লিখিত আছে।* সারদাদেবীকে যে কেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞানের দেবী সারদা বলতেন তা এই উত্তর থেকে বোঝা যায়। যেখানে নিজ স্বামীর পটপূজা করা হয়েছিল এবং সেই পট সরিয়ে নেওয়ার পরে তার ঔচিত্য বিষয়ে কাতর প্রশ্ন করেছিলেন ভক্তগণ, সেখানে বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামীর পটপূজা বন্ধ সমর্থন করে সহধর্মিণী পত্র লিখেছেন—

> "খগেন (স্বামী বিমলানন্দ) মাতা ঠাকুরাণীর পত্র পাইল, জয়রামবাটী হইতে, ১৩০৯, ১৫ ভাদ্র, ৩১ অগস্ট, ১৯০২;—লিখিয়াছেন—
>
> 'আমাদের গুরু যিনি তিনি ত অদ্বৈত, তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'" (৭. ৯. ১৯০২ তারিখের ডায়েরী)

স্বামী স্বরূপানন্দের মঠে প্রবেশের সময় থেকেই নিবেদিতা তাঁকে জেনেছেন। নিবেদিতার ব্রহ্মচর্য দীক্ষার কয়েকদিন পরেই স্বরূপানন্দের দীক্ষা হয়, এবং স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রশংসা নিশ্চয় নিবেদিতা জেনেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই স্বরূপানন্দ নিবেদিতার বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হন।† স্বরূপানন্দ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

'From morning of 28th April began to teach S. Nivedita Bengali'.

কলকাতায় থাকা কালেই স্বরূপানন্দের শিক্ষাদান শুরু হলেও তিনি যথার্থ শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেন আলমোড়ায় যখন নিবেদিতা প্রতিদিন 'বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে' তাঁকে পেয়েছিলেন। ব্যাপারটিকে নিবেদিতা 'মহাসৌভাগ্য' বলে উল্লেখ করেছেন। এমন বলার যে বিশেষ কারণ আছে, তার প্রসঙ্গে আসার আগে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সঙ্গে নিবেদিতার যোগের বিষয়টি বলি।

---

* ডায়েরীটি স্বামী অব্জজানন্দের কাছে আছে। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে সেটি আমাকে দেখতে দিয়েছেন।

† স্বরূপানন্দ কিন্তু নিবেদিতার প্রথম বাংলা শিক্ষক নন। ভারতে আসার অব্যবহিত পরেই অন্য একজনকে মার্গারেটের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তাঁর বিষয়ে নিবেদিতা ১৮৯৮-এর ৩১ জানুয়ারীর চিঠিতে লিখেছেন—"আমাকে বাংলা শেখাবার জন্য গতকাল যে ভদ্রলোককে পাঠানো হয়েছিল তিনি দুটি ছোট বই রেখে বললেন, 'এর মধ্যে আমাদের প্রভুর বাণী বাংলায় লেখা আছে; আপনি বাংলা শিখেই এগুলি অনুবাদ করবেন।' স্বামীজী কতখানি অসাম্প্রদায়িক তা তুমি বুঝবে আমার উত্তর থেকে—'প্রভু? কোন্ প্রভু?—কৃষ্ণ?' সৌভাগ্যবশতঃ আমার অসুবিধা কোথায় তিনি বুঝতে না পেরে বললেন—'হাঁ—আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ।'"

'স্বামীজী কতখানি অসাম্প্রদায়িক'—মার্গারেটের এই কথার অর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য হয়েও স্বামীজী 'আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণ'—এই ধারণা মার্গারেট প্রভৃতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। সুতরাং 'আমাদের প্রভু' বলতে মার্গারেট স্বভাবতঃই হিন্দুর সাধারণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝেছিলেন।

'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহের বিষয়ে *Wanderings* গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন—

"এই সময়ে (জুন—জুলাই, ১৮৯৮) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে মাদ্রাজ থেকে প্রবুদ্ধ ভারতের স্থানান্তর ব্যাপারটি আমাদের সকলের মন অধিকার করে ছিল। এই কাগজটির প্রতি স্বামীজীর সব সময়েই বিশেষ ভালবাসা ছিল—যে চমৎকার নাম তিনি এই পত্রিকাটিকে দিয়েছেন, তার থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া নিজস্ব মুখপত্র প্রবর্তনেও তিনি সর্বদা উৎসুক ছিলেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষায় এই পত্রিকার মূল্য তাঁর কাছে স্বতঃপ্রতীয়মান ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, তাঁর আচার্যের ভাবনা ও বাণী এর মারফৎ ছড়িয়ে পড়বে, যেমন তা ছড়াবে প্রচার ও কর্মের দ্বারা। সুতরাং নিজস্ব পত্রিকাদির বিষয়ে তাঁর দিনের পর দিন চিন্তা, যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজের বিষয়ে। দিনের পর দিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির বিষয়ে কথা বলেছেন। এক অপরাহ্নে যখন আমরা একত্র বসে আছি, তিনি একটি কাগজ এনে হাজির করলেন, যাতে 'তিনি একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু রূপ দাঁড়িয়েছে—" (ঐ পত্র স্বামীজীর একটি বিখ্যাত কবিতার রূপ নিয়েছিল, নাম— *To the Awakened India*; কবিতাটি প্রবুদ্ধ ভারতের অগস্ট, ১৮৯৮, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়)।

প্রবুদ্ধ ভারতের কাজে নিবেদিতার যোগদানের কথাও উঠেছিল। নিবেদিতা গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে *Wanderings* গ্রন্থের পরিশিষ্টে নূতন সংযোজিত অংশে পাই—

'The *Prabuddha Bharata's* first number had just arrived, and there was some thought of despatching Nivedita to Almora to help the Editor'.

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ব্যাপারটি এইকালে নিবেদিতার মনকে কিভাবে ব্যাপৃত রেখেছিল, তার প্রমাণ পাই তাঁর চিঠি থেকে। ১৮৯৮-এর ৭ অগস্ট তিনি মিসেস হ্যামণ্ডকে লিখেছেন—

"*Great Thoughts* (পত্রিকা) আশীর্বাদের মত এল।......কোনো সোসাইটি পত্রিকাকে এত পরিচ্ছন্ন ও চমৎকার ভাবাই যায় না। 'গ্রেট থটস্'-এর মত কোনো পত্রিকা তোমার কাছে থাকলে যদি তা পাঠিয়ে দাও, বিশেষ কৃতজ্ঞ হব। 'প্রবুদ্ধ ভারতে' যে ধরনের জিনিস যাওয়া উচিত বলে স্বরূপানন্দ এবং আমি মনে করি, তার চেহারা বুঝবার পক্ষে এই জাতীয় পত্রিকার নমুনার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।*

Great Thoughts পত্রিকাটি নিবেদিতার খুবই প্রিয় ছিল; এটিকে তিনি নিশ্চয় আদর্শভাবে সম্পাদিত পত্রিকা মনে করতেন। প্রবুদ্ধ ভারতের আগেই 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার জন্যও এটিকে আদর্শ নমুনারূপে সম্পাদকের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। ৬ জুন, ১৮৯৮, তারিখের এক পত্রে সেকথা পাই।

"স্বরূপানন্দ আলমোড়ায় শুধু আমার বাংলা শিক্ষক ও গীতাপাঠে সহায়ক ছিলেন; এখন থেকে, যখন তাঁর উপর নতুন পত্রিকার দায়িত্ব পড়ছে—সে বিষয়ে তাঁর আকর্ষণও বিশেষ—তাঁকে আমি সেরা একজন সুহৃদ্ মনে করি।"

নিবেদিতা স্বরূপানন্দের গুণমুগ্ধ হলেও সব সময়ে তাঁর ইংরেজী ভাষা বা সম্পাদনায় খুশী হতে পারেন নি; আবার খুশী হয়েছেন, এমন ক্ষেত্রও যথেষ্ট।*

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা দেশাত্মবোধক নানা কাজে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদনায় প্রত্যক্ষ যোগ রাখতে পারেন নি কিন্তু পত্রিকাটি তাঁর কাছে চিরদিনই গুরুর প্রিয়বস্তু বলে অতি প্রিয় ছিল, তাই ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে স্বরূপানন্দের অকাল দেহত্যাগের পরে পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনার অনেকখানি দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন।†

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ অগস্টের এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—'স্বামীজীকে বাদ দিলে স্বরূপানন্দ হলেন তিন জন বাঙালীর একজন, যাঁদের সঙ্গে পরিচয়ে আমি গর্বিত।' কয়েক মাস পরে, ১৮৯৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারীর এক চিঠিতে তিনি আবার লিখলেন—

'What marvellous men they (The Hindus) do produce! I have a group of 3 demigods now, Swarupananda, Mr. Padshah, and Dr. Bose.'

জগদীশচন্দ্র বা পাদশা-প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হবে, এখানে জিজ্ঞাসা—স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে এত গভীর ভাবাবেগের কারণ কি? নিবেদিতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁর 'আচার্যদেব' গ্রন্থে। তাঁর অতিবড় এক চিত্তসংকটের ক্ষণে স্বরূপানন্দের শিক্ষা মানসিক ভারসাম্যরক্ষার পক্ষে পরম সহায়ক হয়েছিল। সেই দারুণ সংঘাতের কথা নিবেদিতা *Wanderings* ও *The Master* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। *Wanderings* থেকে ঐ অংশটি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি—নিবেদিতার দৃঢ়মূল জাতীয় সংস্কারের সঙ্গে স্বামীজী-ঈপ্সিত ভারতবোধের সংঘর্ষ, তার তিক্ততা ও অপরূপ পরিণতি, যখন স্বামীজী আকাশে নবোদিত চন্দ্রের তলায় নবজীবন গ্রহণের জন্য নিবেদিতাকে আহ্বান ও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই নিবেদিতা *The Master* গ্রন্থে লিখেছেন—'আমার আচার্যদেবের সঙ্গে আমার এই সময়ের সম্পর্ককে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু বলা

* "নভেম্বর সংখ্যা প্রবুদ্ধ ভারত, যা আজ এসে পৌঁছল—পেয়ে খুবই খুশী! খুবই শক্তিপূর্ণ। সদানন্দ অখণ্ডানন্দের কাছে ভাগলপুরে গেছে দুর্ভিক্ষের কাজে, আর স্বামী সারদানন্দ স্বরূপানন্দকে গুজরাটে পাঠাবার কথা বলছেন। কিন্তু তা যে কি করে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না। সে ক্ষেত্রে পত্রিকাটির হবে কি? (১৮৯৯, ২৬ ডিসেম্বরের চিঠি)

† নিবেদিতা অতঃপর প্রবুদ্ধ ভারতে 'Occasional Notes' লিখতে থাকেন। এই Notes-গুলি থেকেই পরে তাঁর *Religion and Dharma* বইটি প্রস্তুত হয়। তাছাড়া *The Master as I Saw Him*-সহ নিবেদিতার বহু লেখা প্রবুদ্ধ ভারতে বেরিয়েছে।

যাবে না। আজ বুঝতে পারছি, তখন কত কি শিখবার ছিল, আর শিক্ষার সময় কত না অল্প ছিল! আর প্রথম শিক্ষণীয় বস্তু ছিল, শিক্ষার্থীর মনের আত্মতুষ্টির ভাব নষ্ট করা। কিন্তু সেই সময়ে আমার বহুযত্নপোষিত ধারণা-সম্পদগুলির উপরে যে অবিরত বিদ্রূপ ও আক্রমণ বর্ষিত হচ্ছিল—তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের বহু যন্ত্রণাভোগই যুক্তিহীন। তাই এইকালে যখন আমার কল্পিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রিয়মুখ গুরুকে সরিয়ে আর একটি মূর্তি আত্মপ্রকাশ করল, যা বহুলাংশে উদাসীন এবং সম্ভবতঃ প্রতিকূল,—তখন আমি যে-কষ্টবোধ করেছিলাম, তার ঔচিত্য যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারব না।"

এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন মিস্ ম্যাকলাউড; সেজন্য তাঁর প্রতি নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। এক্ষেত্রে স্বরূপানন্দেরও কিছু দান ছিল। *The Master* গ্রন্থে সে বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—

'আমার মহাসৌভাগ্য, এই সময়ে আমি প্রতিদিন বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে তরুণ সন্ন্যাসী স্বরূপানন্দকে পেয়েছিলাম, যার ফলে আমার চতুর্দিকে যে ঘনীভূত ভাব ও অনুভূতির রাজ্য বর্তমান ছিল তার অনুধাবনে কিছুটা সমর্থ হয়েছিলাম; একাজ সম্ভব হয়েছিল স্বরূপানন্দ ও আচার্যদেবের মনের সংযোগপথে আসতে পেরেছিলাম বলেই, যেমন দর্পণ-সংকেতের কালে বৃহৎ দর্পণ ও ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্যে অবস্থিত কেউ সংকেতের ভাষা বুঝতে পারে।'

স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের রহস্য বুঝবার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় যে অন্তর্মুখিনতা—তারই শিক্ষা নিবেদিতা এই সময়ে স্বরূপানন্দের কাছ থেকে লাভ করেন। —'স্বামী স্বরূপানন্দের প্রভাবেই আমি গভীরভাবে ধ্যানশিক্ষার চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য না পেলে আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বৃথা অতিবাহিত হত।' ('আচার্যদেব')

সমকালে লেখা একটি চিঠিতে ধ্যানশিক্ষার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মিসেস হ্যামণ্ডকে নিবেদিতা ৭ অগাস্ট, ১৮৯৮-তে লিখছেন—

"জানিনা তুমি ধ্যানের জন্য বুদ্ধ-ভঙ্গিতে বসতে সচেষ্ট হয়েছ কি না! ইংলণ্ডে থাকতে ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি; কিন্তু ভারতে সকলেই সহজে, খুব স্বাভাবিকভাবে, এ রীতি নেয়। স্বামী স্বরূপানন্দ অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে আমাকে ধ্যানের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। ধ্যান আর কিছু নয়—মনঃসংযোগ, ধ্যেয় বস্তুতে অব্যাহত মনোনিবেশ। তবে কোনো কোনো বিশেষ অবস্থানে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক শক্তি ঐ মনঃসংযোগকে সহজতর করে। সুতরাং বহিরঙ্গ ক্রিয়ারীতির উপযোগিতা আছে বৈকি! যেমন ধরা যাক, উপবেশনের জন্য চর্মাসন নিশ্চিত সহায়ক, যা বিচ্ছিন্নতা আনে, ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে কোনো না কোনোভাবে বর্ধিত করে। স্বামীজী কিন্তু ব্যাপারটাকে সহ্য করতে পারেন না, যেহেতু তার দ্বারা বহিরঙ্গ বস্তু দারুণ গুরুত্ব পেয়ে যায়।

"স্বরূপানন্দ বলেন, 'যে মুহূর্তে তুমি তোমার সমুদয় শক্তি সংহত করতে পারলে, সেই মুহূর্তে তোমার করণীয় সব কিছু তুমি সম্পাদন করে ফেললে—

[redacted]

তার ফল স্বতঃই উন্মোচিত হবে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তার পূর্বে কিন্তু বিরাট বিরাট অনেক কিছু সাধকের কাছে আবির্ভূত হবে।' যাই হোক, অন্ততঃ যদি সম্পূর্ণ শান্তিও পাওয়া যায়, যাকে মেটারলিঙ্ক 'বিরাট সক্রিয় নীরবতা' বলেছেন—সেটাই কি অপূর্ব নয়?

"আমি কিন্তু এই 'বিরতির' অভিজ্ঞতার স্বাদ এখনো পাইনি, যদিও পাবার জন্য চেষ্টা করেছি কয়েকবার। তবে অনেকে পেয়েছেন শুনেছি।

"এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে অল্পদিন পূর্বে বলেছেন, গোড়ার দিকে মাত্র দুটি বিষয় নিয়ে আমার ধ্যান করা উচিত, আর তা করার সময়ে সামনে কোনো ছবি বা বিগ্রহ থাকা দরকার, যাতে সমস্ত মন তন্নিষ্ঠ হতে পারে। ধ্যানের প্রথম বিষয় নিজ গুরু; তারপর যে-কোনো একটি বস্তু-বিষয়। বস্তু-বিশেষ ধ্যান করতে সমর্থ হলে নির্বিশেষ ধ্যানের অধিকার আসবে। এইসব খবরের জন্য তোমার কি কোনো আগ্রহ আছে? আমার কাছে এগুলি মূল্যবান, যেহেতু সহজে পাই না। তবে মনে হয়, এসব ব্যাপার হয়ত তুমি অনেক আগে থেকেই জানো। আর একটি কথা তোমাকে জানাবো-জানাবো ভেবেছি—কিন্তু—বলেই ফেলি—ব্যাপারটা শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে। এক রাত্রে আমার শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল—কিছুতে অস্থিরতা যাচ্ছিল না—অগত্যা আমি মনঃশক্তির প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলাম; কিছু পরেই লক্ষ্য করলাম—এঁরা যাকে অন্তঃশ্বাস বলেন তাই প্রবাহিত হতে শুরু হয়েছে আমার অজান্তেই, আর আমি সমস্ত ব্যাপারটির উপর আধিপত্য এনে ফেলেছি। এক মুহূর্তে মানুষ হঠাৎ-ঝলক পেয়ে যায়—জীবনের কী বিচিত্র রহস্য! তখন সে বোঝে নির্জনতার মূল্য এবং আরও নানা জিনিসের, যার কথা সে শুধু লোক-শ্রুতিতেই শুনে এসেছে।"

স্বরূপানন্দ নিবেদিতাকে ধ্যান ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন, অপরপক্ষে স্বরূপানন্দের নিজস্ব জীবনকথাই নিবেদিতার কাছে একটি মহৎ শিক্ষার রূপ নিয়েছিল। বাল্যে করুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী দ্বৈতবাদী স্বরূপানন্দ কিভাবে, কোন্ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠেছিলেন—সে কাহিনী নিবেদিতার জানার প্রয়োজন ছিল—অদ্বৈতবাদকে কেবল তত্ত্বরূপে নয়, জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের অঙ্গরূপে অনুভব করবার জন্য। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন—

"স্বরূপানন্দের মনোবিকাশ-কাহিনী আমার কাছে অতীব আকর্ষণের বস্তু। এই মানুষটি বাল্যে বৈষ্ণব বিশ্বাসের মধ্যে লালিত হয়েছিলেন। এই মতে ঈশ্বর পরম দয়াল প্রেমময় রক্ষাকর্তা প্রভু; শ্রীকৃষ্ণ পরিত্রাতা, ঈশ্বরের অবতার। পাশ্চাত্ত্য খ্রীস্টানধর্মেরই অনুরূপ এই মত। এই ধারণা প্রায়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, এখানেও তাই হয়েছিল। তাঁর বয়স যখন বাড়ল, তরুণ বয়সের বীরভাবে ও হৃদয়-বত্তায় যখন দেহমন পূর্ণ হয়ে উঠল—তখন জীবনের অবিচারের দৃষ্টান্ত চোখে গিয়ে বিঁধল, দেখলেন তিক্ত বাস্তবের চেহারা; দেখলেন, এ জগতের লড়াইয়ে বলবানেরই জয়। তখন ভেঙে গেল বাল্যের মধুস্বপ্ন; আর বিশ্বাস রাখতে পারলেন না দয়াময় ঈশ্বরের কল্পনায়। তাঁর জীবনের তেমন একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

জনকীর্ণ পথে যেতে যেতে একদিন দেখলেন, এক দরিদ্র নারী অনুচ্চে কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে পথের ধুলো থেকে খুঁটে খুঁটে চাল কুড়োচ্ছে—এক পথচারীর ধাক্কা লেগে তার হাত থেকে চালগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দেখে ঐ মানুষটির বুক চিরে তীব্র যাতনার চীৎকার ছুটে গেল, গভীর দুঃখ ও করুণায় বলে উঠলেন —রাক্ষস ঈশ্বর! এখন কী করছেন? যদি তিনি থাকেন—কোথায় তিনি? তিনি থাকলে এ জিনিস কী করে ঘটল?'

"এই ধরনের দুটি-তিনটি ঘটনা এক বছর ধরে তাঁকে এমন অন্তর্যাতনার মধ্যে রাখল যে, স্বাস্থ্য গেল নষ্ট হয়ে—আর কখনো ভালো স্বাস্থ্য কাকে বলে জানেন নি। কিন্তু এই আলোড়ন থেকে তিনি জীবন সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয় লাভ করলেন, তা শান্তি দিল তাঁকে। **স্বপ্ন তাঁকে ভাঙতে হবে।** অর্থাৎ তিনি সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, বুদ্ধদেবের সময় থেকে, পূর্বে থেকেও, যাতে পোঁছেছেন হাজার হাজার ভারতীয় জিজ্ঞাসু। অতঃপর তাঁর পক্ষে জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য 'উচ্চ সিংহাসনে আসীন ঈশ্বর এবং নিম্নে নতজানু মানব-আত্মা'—এই ধরনের কোনো কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হল না। বিপরীতপক্ষে তিনি দেখলেন, এই যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা দেখে থাকি,—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিচার-অবিচারের স্বপ্ন-গাঁথা এই যে জগৎ-বোধ—এর মূলে রয়েছে আমাদের অজ্ঞান ও অহং। এই মায়াকে জয় করবেন—তিনি স্থির করলেন, প্রত্যয় ও প্রজ্ঞাকে অধিকার করবেন,—বিপরীত বোধসমূহের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তিলাভ করে, হিন্দু যাকে মুক্তি বলে সেই স্থায়ী অভেদ-চেতনার জগতে উন্নীত হবেন।

"এর পর থেকে সর্বোচ্চ অবস্থালাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি দগ্ধ হতে লাগলেন। অতঃপর যে কয়েক বৎসর তিনি পিতৃগৃহে কাটিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর কৃচ্ছ্র-সাধনা এমনকি পরবর্তী বিভিন্ন মঠজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনা অপেক্ষা কঠোরতর ছিল—তা নানা সূত্রে বোঝা যায়। বহুদিন পরে আলমোড়ায় যখন আমি তাঁর কাছে ভগবদ্গীতা পড়েছি, তখন তাঁকে দেখে বুঝেছিলাম—কী দারুণ তৃষ্ণার রূপ ধারণ করতে পারে ঈশ্বরপ্রেম!"

দ্বৈতবাদী স্বরূপানন্দ যখন অদ্বৈতবাদী হয়েছিলেন তখন সত্যই তা হয়েছিলেন; সুতরাং অবতারবাদ মানতেন না, এবং তদনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ববিধ মহিমা স্বীকার করেও তাঁকে অবতার বলে মেনে নেন নি। নিবেদিতা এক চিঠিতে (৫. ৪. ৯৯) লিখছেন—'স্বরূপানন্দের মত যিনি অবতারতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না তিনি নিশ্চয় তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) অবতার বলবেন না।'*

* লণ্ডনে বৈদান্তিক স্বরূপানন্দের যাওয়া উচিত এমন একটা ভাবনা নিবেদিতার মাথায় ঢুকেছিল।—"জানো, ইদানীং আমার মাথায় একটা কথা ঢুকেছে—মিসেস সেভিয়ারকে স্বরূপানন্দের সঙ্গে লণ্ডনে ফিরতে প্রণোদিত করা উচিত, সেখানে তাঁরা বেদান্ত প্রচার-কাজ আবার আরম্ভ করবেন। সে কাজ সম্ভব হলে স্বামীজী কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন—একথা না ভেবে পারছি না।" (চিঠি—৮।৬।১৯০৬)

স্বরূপানন্দের ব্যক্তিগত মহত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ের পরে নিবেদিতা স্বভাবতই (তাঁর ইউরোপীয় বাস্তববোধে ও কৌতূহলে) স্বরূপের পরিবারের বিষয়ে সন্ধান নিয়েছিলেন। সেখানে অপেক্ষা করছিল একটি বেদনাদায়ক চিত্র। স্বরূপানন্দ মঠে যোগদানের পূর্বে বিবাহ করেছিলেন। স্বরূপের পক্ষে এই বিবাহ লৌকিক অর্থে বিবাহ নয়। 'আচার্যদেব' গ্রন্থে এ বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—'স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বিবাহের রূপ—যা তিনি তাঁর গুরুদেবের ক্ষেত্রে দেখেছেন, কিংবা গুরুভাই যোগানন্দের ক্ষেত্রে, কিংবা শিষ্য স্বরূপানন্দের—'। স্বরূপানন্দের পত্নীর অবস্থা বা মনোভাবের বিষয়ে আমরা কোনো তথ্য পাইনা, কিন্তু তাঁর মায়ের অবস্থার যে ছবি দিয়েছেন নিবেদিতা, তা মর্মান্তিক। ১৮৯৯, ৮ মে'র এক চিঠিতে পাই—

"গতকাল আমি আমার মিশনারী বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছিলাম। ফেরার পরে দেখি মিঃ মোহিনী (মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়) আমাকে ভবানীপুরে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বরূপের মাকে দেখবার জন্য। হৃদয়বিদারক দৃশ্য। স্বরূপ চলে যাবার পর থেকে তিনি অসুস্থ অর্ধোন্মাদ, আর যৎপরোনাস্তি অসহায়। সৌভাগ্যবশতঃ কিছু সাহায্য করবার মত অবস্থায় আমি ছিলাম।......কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ জিনিস হল, ক্ষণেকের জন্যও পুত্রকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এঁর হীন অক্ষমতা, যাতে সে তার মনোমত জীবন যাপন করতে পারে।

"সদানন্দ আমার সঙ্গে ছিলেন। এঁর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ক্রোধে প্রথমেই পুরনো ঘটনাগুলি বিবৃত করলেন: গৃহত্যাগের সময়ে স্বরূপ কত অসুস্থ ছিলেন, ট্রামে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন ইত্যাদি। তারপরে সদানন্দ এঁকে বললেন, 'এখন তাকে আশীর্বাদ করুন, যাতে সে স্বাস্থ্য ফিরে পায় এবং আপনার জন্য রোজগার করবার অবস্থা পেতে পারে।' অবশেষে হতভাগ্য জননী আমাকে আশীর্বাদ করলেন—গভীর আশীর্বাদ। আর স্বরূপের জন্য প্রার্থনা। আজ সকালে স্বরূপকে সেকথা লিখে পাঠিয়েছি।"

স্বরূপের পরিবার পালনের বিষয়ে নিবেদিতার আগ্রহ এখানেই নিঃশেষিত হয়নি। বছর দেড়েক পরে, যখন নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্যে আছেন, ম্যাকলাউডকে লেখা তখনকার এক চিঠিতে পাই (২৫. ১. ১৯০১)—'মিঃ মোহিনীর মারফৎ তুমি কি স্বরূপানন্দের বাড়ির লোকজনের বিষয়ে সন্ধান নেবে—তাদের হাতে কোনো টাকা অবশিষ্ট আছে কি? স্বামীজী আমাকে যে দশ পাউণ্ড দিয়েছেন, সেই টাকা তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

স্বভাবে সংযত স্বরূপানন্দের ডায়েরী অতীব সংক্ষিপ্ত, সুতরাং তাতে নিবেদিতা প্রসঙ্গ সামান্য থাকবে, তা আশ্চর্যের কি? নিবেদিতাকে বাংলা শিক্ষাদানের বিষয়ে ডায়েরীর অংশ আগে উদ্ধৃত করেছি। এখানে বাকি অংশ তুলছি:

28.5.1898:—Nivedita lectured on India and England and their services.........

11.6.1898:—Swamiji and the ladies left this morning for Kashmere.

13.5.1902:—Nivedita, Okakura, Bet and Kalu arrived.

20.6.1902:—Nivedita and Bet left on Calcutta.

4, July, Friday at Belur Math in his own room while sleeping on the floor Swami Vivekananda suddenly died: Brojendra was in attendance. After the [. . . . .] of July Nivedita wrote to the Indian Mirror of Calcutta that her work would thenceforth be independent of the Math.

6.3.1903:—Met two Baroda people at N's.

16.5.1904:—Dr. and Mrs. J. C. Bose, his sister, Nivedita and Greenstidel arrive and go back on 16th June.

স্বামীজীর মৃত্যুর পরে কিছু সময়ের জন্য নানাকারণে স্বরূপানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কে কিছু কাঠিন্য দেখা যায়। নিবেদিতার রামকৃষ্ণ সংঘ ত্যাগ ও খোলাধুলি জন-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এর অন্যতম কারণ হতে পারে। স্বরূপানন্দ নিশ্চয় চেয়েছিলেন, নিবেদিতা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের কাজে নিয়োগ করুন—প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদনাকর্মে সাহায্য করুন। এই কর্মপরিধি নিবেদিতার কাছে সঙ্কীর্ণ মনে হয়েছিল, তাছাড়া স্বরূপানন্দের স্বভাবে যে কঠোর নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আধিপত্যের ভাব ছিল, তাকে স্বয়ং আধিপত্যপ্রবণ ও স্বাধীনস্বভাব নিবেদিতার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ১৯০৪, ৩০শে জুনের এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—

"মায়াবতীকে, যেভাবেই হোক, সবসময়ে শ্বাসরোধী মনে হয়। স্বরূপানন্দ এতই ব্রাহ্মণ! এবং মিসেস সেভিয়ার সম্পূর্ণভাবে তাঁর দ্বারা অবনমিত! দেখা যাচ্ছে, ক্রিস্টিনের জীবনে এমন একটি সময় এসেছিল যখন তিনি বলেছিলেন—'কলকাতা ছাড়া আর কোথাও কাজ করতে পারব না।' আর তাই ক্রিস্টিন এখানে এসেছেন।......এখানে আমি গুরু, আর সেখানে সম্পাদকমাত্র।"

কিন্তু এই সকল মানসিক সংঘর্ষ আত্মিক সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি—মৃত্যুর সহসা আঘাতে চৈতন্যমূলে নাড়া খেয়ে নিবেদিতা তা অনুভব করলেন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত স্বরূপানন্দ সহসা দেহত্যাগ করলেন ২৭ জুন, ১৯০৬। নিবেদিতা চিঠিতে লিখলেন (২৯. ৬. ১৯০৬)—

"স্বরূপ নেই! আর কিছু ভাবতে পারছি না। স্বরূপ নেই!......

"স্বামীজীর 'জীবনী' নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু স্বরূপের সাহায্যের উপর কত না নির্ভর করেছিলাম!

"ছায়ান্ধকারের মধ্যে আছি—এখন। কিন্তু কী অদ্ভুত—স্বরূপ!—আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বছরের পর বছর শীতলতা গেছে; তারপর ইদানীং পুরনো ঘনিষ্ঠতা ও মিষ্টতার প্রত্যাবর্তন। তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছিলাম; ভেবেছিলাম, সে শক্তি পেয়েছে, তার প্রয়োগ করতে যাচ্ছে—কিন্তু এ জিনিস ভাবিনি। অপূর্ব পরিত্রাণ ঘটল, তার ক্ষেত্রে। তার উপরে চাপানো নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সে অধীর অস্থির, তারপরে—এখন সে খাঁটি সন্ন্যাসের অধিকারে বর্তমান;—এর দ্বারাই সর্বোত্তম কাজ করতে পারবে।"

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখা শোকলিপিতে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার বহু কথাই প্রচ্ছন্ন ছিল।—

"গভীর বেদনার সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদক ও মায়াবতী আশ্রমের সভাপতি স্বামী স্বরূপানন্দের মৃত্যুসংবাদ পড়লাম। তাঁকে হারিয়ে আমরা কতখানি হারালাম—সদ্য বিয়োগের এই পটভূমিকায় তা এখনই লিখে জানানো সম্ভব নয়। যদিচ এটুকু জানি যে, ক্ষতি অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস পান। সন্ন্যাসপ্রাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর উপর হিমালয় কেন্দ্রের ভারার্পণ করা হয়; সেই সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদকও হন। সেই অবধি এই দুই গুরু দায়িত্বের কার্যাবলী তিনি পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করে এসেছেন, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্বজাত নানা সম্পর্কের প্রতি কর্তব্যপালন করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতরা তাঁর পূর্ণ-পরিণত শক্তির কথা জানতেন,—যে-মহান জীবনদর্শনের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন তারই প্রচারে ঐ শক্তি সদা-প্রস্তুত ছিল। সংস্কৃতে তাঁর সমূহ পাণ্ডিত্য, এবং তিনি একনিষ্ঠ শঙ্করপন্থী ছিলেন। পূর্বাশ্রমে কুলীন ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমের অন্যান্য কাজের মধ্যে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। এঁর বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কতখানি উচ্চ ধারণা ছিল বোঝা যায়, যখন দেখি যে, বেলুড় মঠে যোগদান করার অব্যবহিত পরেই তিনি এঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন—অন্যান্যের মত প্রারম্ভিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়নি। স্বামীজীর এই বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি পরিপূর্ণ-ভাবে রক্ষা করেছিলেন পরবর্তী বৎসরগুলিতে, তাঁর উন্নত অবিচলিত নিষ্ঠাভক্তির অনুসরণে। যারা তাঁর কাছে 'ধ্যান' ও 'যোগ' শিক্ষা করতে আসত, তাদের কাছে তিনি সহৃদয়, ধৈর্যশীল শিক্ষকরূপে দেখা দিতেন—সাহায্য করার, উন্নীত করার অপূর্ব সামর্থ্য যাঁর ছিল। জীবনের সংকটক্ষণে যারা তাঁর উপর নির্ভর করত, তাদের দিতেন নিরন্তর স্নেহপূর্ণ আশ্রয়। আর যে ত্যাগ, তপস্যা ও পবিত্রতার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাকুল অভিসার—তাঁর জীবন সে সকলেরই মূর্ত বিকাশরূপে প্রতীয়মান হত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে। তথাকথিত ত্যাগ-বৈরাগ্য অনেক সময়ে আধ্যাত্মিকতার আবরণে কাপুরুষতার প্রশ্রয়,—তাঁর ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য। তাঁর মননশীল বুদ্ধি বাস্তব সমস্যার সম্পূর্ণ অনুধাবনে সমর্থ ছিল; তার সমাধানে অকুতোভয় ছিল তাঁর মন।

"আমরা যারা স্বামী স্বরূপানন্দকে জানতাম, বিরাট সম্ভাবনার শীর্ষে উন্নীত তাঁর মহৎ জীবনের অনুধ্যান করবার সময়ে একথা ভাবতেই পারি না—সে জীবনের সমাপন হয়েছে মৃত্যুতে। খুলে গেছে দ্বার, গভীর নীরবের, পূর্ণ নৈঃসঙ্গ্যের। অন্তরে চির আকাঙ্ক্ষী সাহসী আত্মা সেখানে প্রবেশ করেছে ত্বরিত বেগে। এ জীবনের চরম ত্যাগে অর্জিত সেই মৃত্যুর মহাসন্ন্যাস নিশ্চয়ই আবার নবজন্মে বিদীর্ণ হবে পূর্ণ তেজে, নূতন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে—যখন পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন হবে তাঁর আবির্ভাবের।"

(In Memoriam: *Prabuddha Bharata*, Sep. 1906).

স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা যখন মায়াবতী গেলেন—কী গভীর স্মৃতিতে আলোড়িত হয়েছিল তাঁর মন প্রাণ,—তার কিছু পরিচয় আছে তাঁর একটি চিঠিতে (জুন ২, ১৯০৭), সেই অংশটি দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি—

"দেওদারের নৈশ দীর্ঘশ্বাস! রাত্রি ও তারকার বিষয়ে উদাসীন মহান আত্মার তুল্য অপরূপ সুন্দর পর্বত। হায়—হায়—স্বরূপ! বিষাদে আচ্ছন্ন আমি। স্বরূপ নেই—সমস্ত জায়গাটিতে যেন কিছু নেই—কোনো মধুরিমা! উদাসীনতাকে সর্বোচ্চ ভাবাবস্থা বলে পূজা করতে শুরু করেছি। যখন কেউ মাতামাতি করে লড়াই করে, সে চারপাশে আলোর পথ বন্ধ করে দেয়। আশংকা হয়, আমিও অনেক সময় ঘরের জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।......"

নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশন

ধর্মসংঘ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিবেদিতা জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন—শুধু এই কারণের জন্য নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব অনেকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। কিছু আগে 'ব্রহ্মানন্দ—নিবেদিতা' প্রসঙ্গে বিষয়টির উত্থাপন করে কিছু বক্তব্য আমরা বলেছি। এখানে বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করে নেওয়া যায়।

বহু মহল থেকে ইদানীং অভিযোগ উঠেছে, নিবেদিতার প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন তার দায়িত্ব পালন করেনি। অভিযোগের বহর থেকে দুটি সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি :

রামকৃষ্ণ মিশন সত্যই দায়িত্ব পালন করেনি;
জনসাধারণ সত্যই দায়িত্ব পালন করেছে।

যাচাই করে দেখা যেতে পারে এই দুটি সিদ্ধান্তের কোন্‌টি কী পরিমাণে সত্য!

প্রথম সিদ্ধান্ত—রামকৃষ্ণ মিশন দায়িত্ব পালন করেনি,—ধরা যাক, কথাটা সত্য। নিবেদিতার যে-মহাজীবন এবং বিরাট কীর্তি এই গ্রন্থে আমরা উপস্থিত করেছি, তার আলোকে দেখা যাবে, এমন একটি চরিত্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সত্যই কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব। সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেনি মিশন। তবে যদি কথাটা এই দিক থেকে বলা হয় যে, নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মিশন তার সংঘমধ্যে আশ্রয় না দিয়ে দায়িত্ব পালন করেনি, তার উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে—*মিশন তার মূল চরিত্র বদল করার আগে তা করতে পারত না,*—করলে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাখাবিশেষ হয়ে উঠত!*

তাছাড়া মিশন আর কোন্ দায়িত্ব পালন করেনি, সে বিষয়ে লেখক ও বক্তাগণ সুস্পষ্ট নন। একজন মাত্র এই অভিযোগ এনেছেন—দার্জিলিঙয়ে নিবেদিতার দাহক্ষেত্রে কোনো স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা মিশন করেনি। সে কাজ করেছে কে—নিবেদিতার সংকারক্ষেত্রটুকু বাঁধিয়ে দেবার ব্যবস্থা?—করেছেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ, যাঁরা বৃহত্তর রামকৃষ্ণ সংঘেরই অন্তর্ভুক্ত।

নিবেদিতার রাজনৈতিক ভূমিকাকে সম্মানিত না করে যদি রামকৃষ্ণ মিশন অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেই অন্যায় মিশন আরও অনেকের সম্বন্ধে করেছে; যেমন ধরা

---

* রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণার কথা নিবেদিতা স্বয়ং এইভাবে লিখেছেন—

"Our Master (Vivekananda), at any rate, regarded the Order to which he belonged, as one whose lot was cast for all time with the cause of Women and People. . . . He ignored all the proposals that reached him which would have pledged him to one party or another as its leader. Only let Woman and the people receive education. All further questions of their fate, they would themselves be competent to settle".

যাক, সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে, (কিংবা জহরলাল সম্পর্কে, কিংবা গান্ধীজী সম্পর্কে) যিনি রাজনৈতিক ছিলেন, সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। আশা করা যায়, সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা রামকৃষ্ণ মিশন কেন করেনি, এই অভিযোগ উত্থাপন করবেন না কেউ।

এমনও কোথাও কোথাও শোনা গেছে, নিবেদিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার ব্যাপারে মিশন দীর্ঘদিন অবহেলা দেখিয়েছে। কথাটা সত্য। এই অবহেলা মিশন সংঘজননী সারদাদেবী, এবং প্রথম সভাপতি ও প্রথম সম্পাদক—যাঁদের রামকৃষ্ণ মিশনের মূল সংগঠক বলা যায়—সেই ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ সম্বন্ধেও দেখিয়েছে। সারদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ বা সারদানন্দ সম্বন্ধে যে-অন্যায় মিশন করতে পারে, নিবেদিতা সম্বন্ধে তা করা অসম্ভব নয়, কারণ মিশনের কাছে তিনি নিশ্চয় সারদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ বা সারদানন্দের চেয়ে বড় আসনে অধিষ্ঠিতা নন।

স্বাধীনতার আগে মিশনকে জীবনী প্রভৃতি রচনা অপেক্ষা লোকসেবামূলক কাজে বেশী মনোযোগী হতে হয়েছিল।

কিন্তু এই কালে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকেও নিবেদিতার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় কেউ এগিয়ে আসেনি। এসেছিলেন বিদেশিনী এক মহিলা, লিজেল রেমঁ, দীর্ঘ কয়েক বৎসর যিনি নিবেদিতার উপরে গবেষণায় ব্যয় করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরেই নিবেদিতার উপরে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ এদেশে জেগেছে।* এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনও, বিলম্বে হলেও, তার দায়িত্ব যোগ্যভাবে পালন করেছে। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা আরও গবেষণা চালিয়ে দুটি তথ্যপূর্ণ জীবনী রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকেই প্রকাশ করেছেন। সেই জীবনীগুলি অতীব প্রশংসনীয়; কেবল মৃদু সমালোচনা করে এটুকু বলা চলে, নিবেদিতার বিপ্লবাত্মক রাজনীতি সম্বন্ধে লেখার ক্ষেত্রে তাঁরা মানসিক অস্বস্তিবোধ করেছেন, এবং বিপ্লবের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ যাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এঁদের সমালোচনা কিছু বেশী উষ্মাপূর্ণ হয়েছে।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়—দীর্ঘদিন ধরে নিবেদিতার বিষয়ে ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট যে পুস্তকখানি প্রচলিত ছিল (সরলাবালা সরকার লিখিত), সেটির প্রকাশক রামকৃষ্ণ মিশনই।

এবং—নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলী একত্রে প্রকাশে ব্রতী রামকৃষ্ণ মিশনই।

এর বিপরীত প্রশ্ন—জনসাধারণ নিবেদিতার জন্য কি করেছে—যে-জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য তিনি মিশন ত্যাগ করেছিলেন এবং তার জন্য দীর্ঘ অন্তর্যাতনা বহন করেছেন? জনসাধারণের কিছু অংশে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরোধী সমালোচনা দেখে মনে হয়—নিবেদিতা ইতিমধ্যেই স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম স্থপতিরূপে স্বীকৃত হয়েছেন, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সরকারী ভবনসমূহে তাঁর প্রতিকৃতি লম্বিত হয়েছে, সরকারী প্রচারযন্ত্রগুলি তাঁর নিত্য নামগানে বিভোর! হায় কত অলীক

---

* এই বইটির বাংলায় অপূর্ব অনুবাদ করেছেন শ্রীনারায়ণী দেবী। তাঁর কাছে সকলেই কৃতজ্ঞ।

সেই স্বপ্ন। আর বেসরকারী প্রচেষ্টা? কোনো স্পষ্ট কাজ অপেক্ষা তা অপরে কি করেনি,' তারি হিসাব গ্রহণের উত্তেজনায় কতখানি নিঃশেষিত।

একটি নিষ্ঠুর সত্য বলা যাক; ভারতবর্ষের সভ্যতার মহিমা খ্যাপনের সময়ে নিবেদিতা সত্যই সামঞ্জস্য হারিয়েছিলেন। তিনি বড় বেশী 'ভারতবর্ষীয় কৃতজ্ঞতার' গুণগান করেছেন। নিবেদিতার অপরূপ রচনায় উদ্দিষ্ট সেই ভারতবর্ষীয় কৃতজ্ঞতা বাষ্পমাত্র বর্তমান ভারতবর্ষে নেই। যদি থাকত, তাহলে নিবেদিতা গ্রন্থাবলী সুলভে দেবার জন্য অর্থসাহায্যের আবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৌখিক এবং ভারত সরকারের সরাসরি প্রত্যাখ্যান—একমাত্র উত্তর হত না।* স্মৃতিরক্ষার অন্য ব্যবস্থা?—সেসব দাবি নিবেদিতার জন্য না করাই ভাল, কারণ তিনি নিজের অপেক্ষা ভারতবর্ষকেই বড় করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ছিলেন না, দেশপ্রেমিক ছিলেন, এবং রাজনৈতিকদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অপেক্ষা তাঁর গুরুর অন্তর্দৃষ্টিই স্বচ্ছতর ছিল।

তথাপি সত্য নির্ধারণের জন্য যদি নিখিল কোনো বিচারালয় থাকে, সেখানে ভারত সরকার বা ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক সরকারসমূহকে একটি জবাবদিহি করতে হবে—তাঁরা তাঁদের বর্তমান স্বাধীনতার সৌভাগ্যের জন্য যাঁদের কাছে ঋণী—তাঁদের প্রতি দায়িত্ব কেন পালন করেন নি! যদি না করেছেন—তাহলে মিথ্যা কথা কেন বলেন—কেন বলেন যে, আমরা আমাদের জাতীয় সৌধের স্থপতিদের কাছে কৃতজ্ঞ! বিশেষতঃ নিবেদিতার কাছে ঋণ স্বীকারের দায়িত্ব আরও বেশী। কেননা তিনি বিদেশিনী। ভারতবাসী ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য প্রাণ দেবে, তাই স্বাভাবিক। যদি বিদেশী কেউ তা করে, এবং তিনি যদি নিবেদিতার মত বিরাট চরিত্রের মানুষ হন—তাঁর প্রতি হৃদয়-উজাড়-করা কৃতজ্ঞতাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যে দেশ নাকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের মহান ভূমিকা গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

সরকার চিরদিনই যন্ত্র—জনসাধারণের ইচ্ছার বেগ তাকে সচল করে। জিজ্ঞাসা করা যায়, নিবেদিতা শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভাসমূহে নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষায় সরকারী ঔদাসীন্য কী পরিমাণে সমালোচিত হয়েছে? রামকৃষ্ণ মিশনের সমালোচনা যাঁরা নাটকীয় ভাবে সভাসমিতিতে করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ সংবাদ-পত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁদের পত্রিকাগুলি বহু ব্যাপারে ক্রুদ্ধ আক্রোশে সরকারের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভ বিদীর্ণ হা-হা ধ্বনি করে—এক্ষেত্রে নীরব কেন? এর একটি মাত্রই উত্তর সম্ভব, অতি তিক্ত উত্তর—আমরা কিছু গড়তে পারি না, কিন্তু যদি কিছু গড়ে ওঠে, তাকে ভাঙবার চেষ্টা করতে পারি। নিজেরা কিছু না করে রামকৃষ্ণ মিশন কি করেনি, তারই উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত হতে পারি।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার তথাকথিত সম্পর্কচ্ছেদ যে কত বাহিরের, দীর্ঘস্থান ধরে তার প্রমাণ আমরা দিয়েছি—বিচ্ছেদের পরেও রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে প্রভূত তথ্য দেওয়া হয়েছে। আরও দু' একটি তথ্য এখানে জানানো যায়। স্বামীজীর জীবনীর জন্য তথ্য সংগ্রহ, তাঁর গ্রন্থগুলি

* নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল এই উত্তরই পেয়েছে।

সম্পাদনার বহু দায়িত্ব নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন মঠ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। এ বিষয়ে লিজেল রেম'র গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

"ইংলণ্ডে বসে লেখা 'রাজযোগ' ছাড়া স্বামীজী এলোমেলো এক গাদা খসড়া আর নানা ধরনের টুকরো লেখা রেখে গিয়েছিলেন। গুডউইন শর্টহ্যাণ্ডে একরাশ ভাষণ ধরে রেখেছিলেন, সেগুলোও খুব সাবধানে সম্পাদনা করা দরকার। এ কাজে যে-সাধুরা নেমেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতাও হাত মেলান।......'কর্মযোগে'র কাজ করে নিবেদিতা 'জ্ঞানযোগে' আর একবার তুলি বুলোলেন।......নিবেদিতা তাঁর যা-কিছু সব তুলে দিলেন মিশনের সাধুদের হাতে। তাঁরা যে বিরাট বইখানার মালমসলা যোগাড় করেছিলেন, তার জন্য আমেরিকায় পাওয়া অটোগ্রাফ চিঠিগুলো নিবেদিতা তাঁদের দিয়ে দিলেন। বইখানার নাম হবে 'দি লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ, বাই হিজ ইস্টার্ন এণ্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপল্স্।'"

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকেই যে নিবেদিতা স্বামীজীর রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন, তার পক্ষে একটি স্পষ্ট প্রমাণ আমরা সম্প্রতি সংগ্রহ করতে পেরেছি। স্বামী নির্লেপানন্দের কাছে নিবেদিতার একটি চিঠি আছে, যাতে নিবেদিতা মঠ-কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গুডউইনের ভগিনীকে স্বামীজীর রচনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি মূলে উদ্ধৃত করছি :

To Mrs. Margaretta Edmunds
9, Englis Road, Southern Sportsmouth.

3 Oak . . .
Burling-in-Wharfdale
Feb. 12, 1909

Dear Mrs. Edmunds,

A letter which you wrote to the Swami Vivekananda, in 1898, on your mother's behalf regarding the death of your brother Mr. Goodwin has fortunately turned up. This gives me a little hope of reaching you, which otherwise I had failed to do, by writing to Bristol.

We have been trying to find you for some time, to ask if, amongst your brother's papers there might be any notes of talks or lectures by the Swami Vivekananda still unused. If so, would you feel that you could part with them? Would you mind writing to me on this point?

You probably know that the Swami himself died July 4th 1902. You will understand therefore how high a value his letters and

notes would have for us. I may say that I write with the authority of the monastery and his Brethren.

I am an English woman and the last of our little group who saw dear Mr. Goodwin. He met me at Madras and spent the whole day with me about the 21st of Jan. 1898.

Believe me dear Mrs. Edmunds,

Very Sincerely Yours,
Margaret E. Noble

নিবেদিতার দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরেজী ও বাংলা দুই মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারত ও উদ্বোধনে কি জাতীয় শোকপ্রবন্ধ বেরিয়েছিল, এই গ্রন্থের অন্যত্র সেগুলি আমরা অন্যান্য পত্র পত্রিকার শোকপ্রবন্ধের সঙ্গে উদ্ধৃত করব, এবং নিবেদিতার রচনাদি পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে কিভাবে প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশ করে আসছে, তাও স্মরণ করিয়ে দেব, সেই সঙ্গে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করব—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ককে নিবেদিতা কতখানি মর্যাদা দিতেন, এবং অন্য পক্ষও তাই। লিজেল রেম'র রচনা থেকে পুনশ্চ উদ্ধৃত করছি। নিবেদিতার জীবনের একেবারে শেষ ক্ষণের কথা—যখন দার্জিলিঙয়ে মৃত্যুশয্যায় তিনি শায়িত—

"শেষ একটি আনন্দ বুঝি তোলা ছিল তাঁর জন্য। গণেন মহারাজের সঙ্গে জয়পুরে আচার্য বসুর আলাপ হয়, তিনি ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন। মঠের বাগান থেকে এক ঝুড়ি ফল এনেছেন। সাধুরা পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, নিবেদিতা অসুস্থ, এবং যাওয়ার আগে এমনি-কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আছেন। এ ফল যে নিবেদিতার কাছে যাবার বেলায় গুরুর প্রসাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বলেছিলেন, ছুটি হলে আম দেবেন। সেই কথা নিবেদিতার মনে পড়ে যায়। সামর্থ্য থাকতে থাকতে বন্ধুদের সবাইকে নিয়ে আরেকবার নিবেদিতা আনন্দ করে ফল খেয়ে নিতে চাইলেন।"

দেহত্যাগের ৬ দিন আগে, ৭ই অক্টোবর, নিবেদিতা উইল করেছিলেন। তা এই—

"বস্টন শহর নিবাসী উকীল মিঃ ই. জি. থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যাহা কিছু দিবেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার নামে যে তিন শত পাউণ্ড আন্দাজ জমা আছে, এবং আমার যাবতীয় পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় ও উহাদিগের মধ্যে যেগুলির গ্রন্থস্বত্ব আমার আছে—সেই সকল আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্বামীজীর মঠের ট্রাস্টীগণকে দিতেছি। তাঁহারা ঐ অর্থ চিরস্থায়ী ফাণ্ডরূপে জমা রাখিবেন এবং ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহারা মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেলের পরামর্শমত উহার আয় মাত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন।" (মুক্তিপ্রাণা)

যে রামকৃষ্ণ মিশনকে নিবেদিতা যথাসর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিলেন (রামকৃষ্ণ মিশনকেই দিয়েছিলেন!) বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য—সেই মিশন কত সংকটের মধ্য দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করেছিল, তার বিষয়ে কিছু তথ্য অল্প পরেই স্বামী গম্ভীরানন্দের রচনাংশ থেকে পাঠক দেখবেন। এখানে শেষ কথা জানাই—স্বামীজীর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী যখন বেরুল, যে রচনাগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে গীতাতুল্য—সেই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লেখার ভার দেওয়া হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে দলত্যাগিনী নিবেদিতার উপরই!!

নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক সমালোচনার বিষয় হওয়াতে স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর *History of the Ramakrishna Math and Mission*-এর মধ্যে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তথ্যপূর্ণ, উষ্মাহীন, সামঞ্জস্যযুক্ত সেই অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি—

"নিবেদিতা নিজের মনপ্রাণ মিশিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষেই। ভারতে বৃটিশ শাসন তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে আঘাত করত। জন্মে আইরিশ তিনি, বৃটিশ পীড়নের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্বদেশে হোম রুল আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের জন্য একই পদ্ধতি প্রয়োগে স্বতঃই তিনি প্রণোদিত ছিলেন। কিন্তু আমরা গোঁড়ামির সঙ্গে একথা বলতে পারি না, তিনি বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ, আমাদের মতে, কোনো মতের প্রতি সহানুভূতি, তা প্রকাশ্য বা গোপন যাই হোক, এক জিনিস, আর কাজে সক্রিয়ভাবে নেমে পড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আমরা জানি, কোনো কোনো আধুনিক লেখক বলেন, তিনি যথার্থই বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এমনকি তার গুপ্ত নেত্রীও ছিলেন। এইসব বিতর্কমূলক বিষয়ে আমরা ইচ্ছাপূর্বক নীরব থাকতে চাই। আমরা যা সর্বাধিক জানি তা হল, স্বামীজীর মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অংশ ভ্রমণ করেন, এবং সেইসব স্থানে ভারতের রাজনৈতিক দাসত্বকে কঠোর ধিক্কার দেন। আমরা স্বীকার করি, এটি মহাবীরত্বের ভূমিকা এবং জাতীয় দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ প্রশংসার অধিকারী। আমরা আরও জানি যে, নিবেদিতার প্রতিভা বহুমুখী,—মনে দাগ কাটবার মত লেখিকা, নাড়া দেবার মত বক্তা তিনি; কথাবার্তার সময়ে মোহিত করে রাখবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল। এবং একথাও সম্ভবতঃ বলা যায়, মূলে ধর্মপ্রবণ হলেও তিনি 'আত্মপ্রকাশ' চাইতেন; তাঁর গতিময় ব্যক্তিত্ব এবং আত্মোৎসর্গ একটি বালিকা বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারে না, এমনকি অনুরূপভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মধ্যেও নয়। সর্বত্রই তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছিল—শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দেশপ্রেমিক, এক কথায় সেকালের ভারতবর্ষে যাঁরা সংস্কৃতিমান ও অগ্রগামী প্রগতিশীল—সকলের মধ্যেই তাঁর

সঞ্চরণ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য পেয়েছেন, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে সে একটা বিরাট লাভ. এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম অম্লান অক্ষরে লিখিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই, মিশন কি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারে, কিংবা যিনি ব্রহ্মচারিণীর বেশ ধারণ করেও সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলেছেন—তাঁকে আশ্রয় দিতে পারে? সে বিষয়ে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট দৃঢ় নির্দেশ—এই সংঘ রাজনীতি এবং উগ্র সমাজসংস্কার চেষ্টা থেকে দূরে থাকবে।

রামকৃষ্ণ আন্দোলনের নেতৃগণের নিকট কর্তব্য ছিল স্পষ্ট, যদিও বেদনাদায়ক; কারণ নিবেদিতা কি বিবেকানন্দের গুরুভাইদের পরম স্নেহ-পাত্রী ছিলেন না, এবং সংঘ কি স্বামীজীর এই গুণশালিনী অধ্যাত্মকন্যার নিকট অনেক কিছু আশা করত না? স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভগিনীকে ডেকে রাজনীতি ত্যাগ করতে বলেছিলেন। ভগিনীর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং মঠ ও মিশন থেকে নিজেকে বিমুক্ত করা ছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য উপায় ছিল না। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাইয়ের এক চিঠিতে তিনি সেই কাজ করলেন। এখনকার রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু বাঙালী লেখক এই বেদনা-দায়ক ঘটনাটি নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করেছেন। খুবই নাটকীয়ভাবে বলা হয়েছে, এ-হল মিশনের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে নিবেদিতার বিতাড়ন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁর উত্তরণ। কোনো কথাই সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। একদিক দিয়ে বলতে গেলে বিতাড়ন বলতে যা বোঝায় মিশন কখনই তা করেনি, বাইরের ব্যাপারে সম্পর্কচ্ছেদ মাত্র হয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। সে সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতার বিদ্যালয়কে আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য করে গেছেন। মঠের প্রবীণ সাধুদের কাছে, এবং শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণে আত্ম-নিবেদিতা সেই চিরদিনের প্রিয় কন্যা 'নিবেদিতা'ই ছিলেন; আর তিনিও জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই পরিচয়ই দিয়ে গেছেন। ১৯০৬ সালে স্বামী স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে নিবেদিতাই ১৯১১ সালে নিজ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রবুদ্ধ ভারতে (সেইকালে মিশন পরিচালিত একমাত্র ইংরাজী মাসিক পত্রিকা) মাসের পর মাস *Occasional Notes*-এর অধিকাংশ লিখেছেন। এইকালে তিনি একাধিকবার মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হিসাবে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রবুদ্ধ ভারত তার নভেম্বর সংখ্যাকে 'সিস্টার নিবেদিতা স্মৃতি সংখ্যা' রূপে প্রকাশ করে। তারপরে মিশনের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব, নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষায় তত-খানিই সে করেছে। এর পক্ষে প্রমাণরূপে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা থেকে নিম্নের অংশটি উদ্ধৃত করছি :

"গোড়ায় বিদ্যালয়টির নির্দিষ্ট কোনো নাম ছিল না। স্থানীয় লোকজন বলত 'নিবেদিতার স্কুল।' নিবেদিতাকৃত নামকরণ— 'The Ramakrishna

School for Girls'. কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্যবাসী বলেছেন— 'The Vivekananda School'। ভগিনী নিবেদিতার লোকান্তরের পরে ১৯১৮ সালে বিদ্যালয়টি যখন রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হল তখন বর্তমান নামকরণ করা হয়— 'The Ramakrishna Mission Sister Nivedita Girl's School.'"

আরও জানানো যায়, 'উদ্বোধন অফিস' থেকে নিবেদিতার কয়েকটি বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়, যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিবেদিতা বিদ্যালয় লাভ করবে। বাকি বইগুলি একই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা মেসার্স লঙম্যান, গ্রীন এণ্ড কোম্পানীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। উক্ত কোম্পানী যখন বইগুলি 'আর লাভজনক নয়' বলে দীর্ঘদিন ধরে সেগুলির পুনর্মুদ্রণে বিরত ছিল, তখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পক্ষে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করে। পুনশ্চ, ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিতার স্মৃতিতে ভারত এবং লণ্ডনে সভা আয়োজিত হয়েছিল, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকা অর্পণ করা হয় স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য। শেষতঃ উদ্বোধন অফিস প্রথমাবধি নিবেদিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত চালু রেখেছে এবং নিবেদিতার ছবিও। মঠ ও মিশনের সর্বত্র তাঁর চিত্র সম্মানের সঙ্গে টাঙানো থাকে।

অপরপক্ষে কেউ যদি একথা বলেন, এদেশে নিবেদিতা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছেন—সে ব্যাপারটা এখনো প্রমাণসাপেক্ষ। আমরা মিশনের প্রথম সাধারণ কার্যবিবরণীর (১৯১৩) কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

'[ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে তাঁর বিদ্যালয়ের] আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, কারণ ভগিনী নিবেদিতা তাঁর উইলের দ্বারা তাঁর গ্রন্থাদির যে স্বত্ব দান করে গিয়েছিলেন, তা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নির্বাহের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। ভগিনী নিবেদিতার স্মরণার্থে কলিকাতা টাউন হলে ১৯১২ সালের মার্চ মাসে যে স্মৃতিসভা হয়, তাতে ভগিনীর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু স্মৃতিভাণ্ডারে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু সংগৃহীত হয়নি। ভগিনী নিবেদিতার পরম পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য স্মৃতি সমিতি এ পর্যন্ত ২,৫২২ টাকা ৭ আনা ৯ পাই সংগ্রহ করেছে।......তার মধ্য থেকে ২,৩৮৪ টাকা ৭ আনা ৯ পাই রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির হাতে দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের জন্য।'

তাই বলে আমরা একথা বলতে চাইছি না, দেশ ভগিনীর কাছে ঋণ স্বীকার করেনি। যা বলতে চাই তা হল, এক্ষেত্রে উচ্চ উচ্চ উক্তির ব্যাপারে সংযত হওয়াই ভাল। এইসঙ্গে অবিলম্বে আমরা যোগ করে দিচ্ছি—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেকে ভগিনীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনেক কিছু করেছেন। যে সরু গলিতে ভগিনীর বিদ্যালয় স্থাপিত সেটিও তাঁর নামাঙ্কিত।"

গম্ভীরানন্দের এই সংযত রচনাটি প্রচন্ড সন্দেহ নেই। ভগিনীর প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত বাঙালী অতঃপর ভগিনীর স্মৃতিতে যথার্থ কিছু করার পরেই রামকৃষ্ণ মিশনের তথাকথিত ঔদাসীন্যের সমালোচনা করবেন, এই আশা করা যায়। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বিজ্ঞানাগারের প্রবেশপথে নিবেদিতার মূর্তি বসিয়েছিলেন, এবং নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার জন্য নিজ উইলে এক লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন— তিনি কিন্তু সমালোচকদের দলবৃদ্ধি করেননি।

গম্ভীরানন্দের রচনার শেষাংশে নিবেদিতা স্মৃতি সমিতির শোচনীয় কর্ম-শৈথিল্যের যে উল্লেখ আছে, যা আমাদের জাতীয় ঔদাসীন্যের স্মারক, সে বিষয়ে সমকালীন সংবাদপত্র থেকে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেগুলি উদ্ধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। ৯ই জুন, ১৯১৩, অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নের সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

It was shortly after the death of the late lamented Sister Nivedita in October, 1911, that a condolence meeting was held at the Town Hall. In that meeting it was resolved, amongst other things, to commemorate the hallowed memory of the Sister by *providing funds for the maintenance and development of the Girls'* School at Baghbazar which she had started and which she was rearing up with her heart's blood. The resolutions of course were moved with perfervid eloquence, of which there is never any dearth in our country, and surely no worthier way of perpetuating her memory than the one resolved upon could have been hit upon. But unfortunately, as is usually the case, as soon as the effervescence of the Town Hall speeches subsided, the practical aspect of the thing was relegated to oblivion. To day, after 20 months have rolled by we are told, by the authoritative report of that school published by Swami Saradananda of the Rama-*krishna-Vivekanand Mission*, that the only *subscriptions so far* collected towards this noble object amount to Rs. 932-7-9 collected before and after that meeting. Of this, the report says, Rs. 784-7-9 are in hand. The balance having been spent in meeting the expenses of the meeting. Among the donations promised at the meeting and not yet realised may be mentioned: Rs. 1000 from Dr. Rash Behari Ghose, Rs. 500 from Mrs. J. C. Bose, Rs. 250 from Babu Bhupendra Nath Bose, Rs. 100 from Mr. C. C. Ghose and others. In the meantime, as we are told, the present conductors *of the School are finding it rather* uphill *work* to keep up the institution to the requisite level of efficiency. We

hope the donors and the office-bearers of the Memorial Committee will kindly see that such a noble and useful institution does not languish for that support which it has a right to expect of them. Apart from the sacred duty of commemorating the late Sister's memory to which they and others have pledged themselves, this school has an additional title to the warmest support from the Hindu section of the public at least. For, it is decidedly one of the very few institutions, if not the only institution of its kind, that has real access to Hindu middle-class ladies behind the Purdah and that imparts education on thoroughly oriental lines.

চাঞ্চল্যকর মন্তব্য। 'আপত্তিকর'ও বটে; কেননা দেশের নামকরা কয়েকজনের বিরুদ্ধে নাম করে অভিযোগ করা হয়, তাঁরা নাকি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করেছেন, তাও সামান্য কয়েকটি টাকা। নিশ্চয় কানাকানি, আলোচনা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—হয়ত আইনের শাসানিও। অমৃতবাজার ভয় পেয়েছিল, যে-রকম ভয় পেতে সে অভ্যস্ত, এবং অকুণ্ঠে ক্ষমা চেয়েছিল, যে-রকম ক্ষমা চাইতেও সে অভ্যস্ত। মধ্যবর্তীকালে অমৃতবাজারের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটির কৈফিয়ত দিয়ে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরুল ১৩ই জুন সংখ্যায়। ঐ লেখাটির মধ্য থেকে মনোযোগী পাঠক অনেক কিছু ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারবেন। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে, প্রতিশ্রুত টাকা দেননি, (যাঁদের কেউ কেউ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন), তার মূলে ছিল—টাকাটা অনভিপ্রেত সংগঠনের হাতে যাবে—এই অস্বস্তি। নচেৎ 'বিদ্যালয় পরিচালনার উপযুক্ত দায়িত্বশীল কমিটি গঠিত হয়নি বলেই' তাঁরা টাকা দিতে পারেননি, এই অজুহাত উঠত না। নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার ক্ষেত্রে এঁরা পছন্দসই প্রতিষ্ঠান চেয়েছিলেন—স্বামী সারদানন্দের পরিচালিত সংগঠন সে পছন্দের অংশ পায়নি। অথচ নিবেদিতা তাঁর উইলের সব টাকাই রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্টিদের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন। অমৃতবাজার পত্রিকা এঁদেরই দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, আগেই দেখেছি।

অমৃতবাজারের দ্বিতীয় মন্তব্য এই :

We very much regret our recent paragraph on the late Sister Nivedita's school has caused some misapprehension in some quarters. When we mentioned some prominent names from whom subscriptions to the Nivedita Memorial fund were promised but "not yet realised" nothing was further from our intention than to

apportion any blame to any quarter for the non-realisation. Indeed, *the charity and patriotism of the persons referred to are too well-known to us—as to all the country—to lead us to insinuate, even remotely, that they were indifferent to the fulfilment of their respective promises. On the other hand, we are really glad to learn on enquiry that Mrs. J. C. Bose has, since the publication of the report we reviewed, paid down her quotum of Rs. 500. As regards Dr. R. B. Ghosh and Mr. C. C. Ghosh the matter stands thus, as our representative, who enquired into the matter, has gathered:

> "Both Dr. Ghosh and Mr. C. C. Ghosh were ever ready to pay the promised subscription as soon as a responsibl committee had been formed to manage the school. No such committee has yet been formed, and Dr. Nilratan Sircar could not accept their subscriptions in the absence of such a committee. It is understood that steps are being taken to form such a committee then and then not only these two gentlemen but others also will pay their promised subscrit-tions."

We need hardly say that it gives us the greatest pleasure to be able to announce this. In fact, one of our objects in mentioning the names was to remind the public that the institution counted amongst its supporters and patrons,—actual or prospective,—such worthy and distinguished personages."

দেবমাতার স্মৃতি

[সিস্টার দেবমাতা জাতিতে আমেরিকান। স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন। ভারতেও ছিলেন অনেকদিন। ভারতে অবস্থানকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্নেহপুষ্ট বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী পরমানন্দের আনন্দ আশ্রমেই ইনি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন।

সিস্টার দেবমাতা উল্লেখযোগ্য লেখিকা। কাব্যশ্রীমণ্ডিত রচনা, অথচ নাটকীয় গতি তাতে আছে। তাঁর লেখার প্রধান গুণ গভীর রহস্যানুভূতি, যা সাধারণ কথাকেও ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বহু গ্রন্থের এবং পুস্তিকার তিনি রচয়িতা, তার মধ্যে *Days in an Indian Monastery* এবং *Sri Ramakrishna and St. Francis* বিশেষ পরিচিত। প্রথম বইটি দেবমাতা তাঁর ভারতবাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন। এই বইটির বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯২৮) লেখা হয়েছিল—'বইটি ভারতের মূল প্রাণধর্মকে প্রকাশ করেছে। লেখিকা তাঁর বর্ণনাসমূহের মধ্যে ভারতের পরিবেশ, রঙ ও রস বজায় রাখতে পেরেছেন—যা সাধারণ একজন ভ্রমণকারীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ইনি পেরেছেন, কারণ এদেশকে ইনি ভালবেসেছেন, স্বদেশরূপে বরণ করেছেন।'

জিন হারবার্টের সহযোগিতায় লিজেল রেমঁ যখন নিবেদিতা-জীবনী রচনায় জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হলেন, তখন তাঁরা নিবেদিতাকে জানতেন এমন সম্ভাব্য সকল ব্যক্তিকেই তথ্যদানে অনুরোধ করেন। এঁদের মধ্যে দেবমাতাও ছিলেন, কারণ *Days in an Indian Monastery* গ্রন্থে নিবেদিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা আছে। 'ভারতীয় সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে আপনি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আপনার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠবে।'—জিন হারবার্ট লিখেছিলেন ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৮-এ।

দেবমাতা আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন, যদিও তাঁর 'স্বাস্থ্যশক্তি সীমাবদ্ধ এবং কাজের দায়িত্ব প্রচুর।'

জিন হারবার্ট ও লিজেল রেমঁ বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে, কারণ এ বিষয়ে 'মিশনের সন্ন্যাসীগণ খোলাখুলি আলোচনা করতে চান না।' পদত্যাগের পরেও নিবেদিতার সঙ্গে সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক কি ধরনের ছিল সে বিষয়েও এঁরা জিজ্ঞাসা করেন। 'মঠের সন্ন্যাসীরা কি তাঁর বাড়িতে আসতেন, এবং তিনি কি প্রায়ই মঠে যেতেন? তিনি কি বিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন? ডাঃ বসুর সেক্রেটারী হওয়ার কাজ তিনি কখন নেন, পদত্যাগের আগে না পরে?'—এ-ধরনের বহু প্রশ্ন এঁরা করেন।

দেবমাতা যথাসাধ্য উত্তর দেন। 'কিভাবে জানি না' দুটো চিঠি থেকে গিয়েছিল, স্মৃতিকথাসহ তাদের নকলও পাঠিয়ে দেন, যার একটি নিবেদিতা-কর্তৃক তাঁকেই লেখা, অন্যটি মাস্টার মহাশয়ের লেখা, যেটিকে দেবমাতা 'অত্যন্ত মূল্যবান' বলেছেন।

দেবমাতাকে লেখা চিঠিটি আমরা রেমণ্ড-সংগ্রহে পেয়েছি, অতীব দুঃখের বিষয় মাস্টার মহাশয়ের (শ্রীম) চিঠিটি পাইনি। দেবমাতাকে লেখা চিঠিতে কতকগুলি সাধারণ সংবাদ আছে, গুরুত্বপূর্ণ নয়, সুতরাং সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করারও দরকার নেই।

দেবমাতা এইসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন, কারণ তিনিই 'অন্য যে-কোনো মানুষের তুলনায় বেশিভাবে নিবেদিতার জীবনধারার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।'

প্রথমে আমরা *Days in an Indian Monastery* থেকে নিবেদিতা-প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করছি :

"বিদ্যালয়ের আসল অধ্যক্ষা ছিলেন সিস্টার ক্রিস্টিন। নিজের লেখার কাজে সিস্টার নিবেদিতা এমনই ব্যাপৃত থাকতেন যে, শিক্ষাকাজে বেশী সময় ব্যয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইসঙ্গে তিনি বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ জে. সি. বসুকে 'plant life সম্বন্ধে নূতন একটি গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করছিলেন। ডাঃ বসু প্রতিদিন স্কুলে কয়েক ঘণ্টা করে কাটাতেন, এবং কখনো কখনো দুপুরের আহারাদিও করতেন; সুতরাং তাঁকে জানবার আনন্দজনক সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর বাড়িতেও মনোরম সময় কাটিয়েছি কখনো কখনো—মিসেস বসুর সাহচর্যে এবং ডাঃ বসুর গবেষণাগার দেখে।

নিবেদিতার প্রদীপ্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ গুণশালী বক্তা ও লেখিকা তিনি। তাঁর চারদিকে দ্যুতি-বিকীর্ণ একটা পরিবেশ বিরাজ করত, সে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হত তাঁর কথাতেও, তার ফলে তিনি যা-কিছু বলতেন, লিখতেন বা করতেন—সব কিছুতেই প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার অনুভব করা যেত। কিছু বছর ধরে তিনি ভারতীয়দের মনের উপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এবং ভারতীয় চিত্ত-জাগরণে বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছিলেন। রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিল এবং রাজনীতিতে আমার উৎসাহের অভাবকে তিনি কখনোই ক্ষমা করেননি। তবে তা ছিল প্রীতিপূর্ণ সংঘর্ষ।"

রেমণ্ড-হারবার্টকে প্রেরিত দেবমাতার স্মৃতি

বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা গার্লস স্কুল বাইরে এবং ভিতরে উঠান নিয়ে তৈরী প্রশস্ত একটি বাড়িতে অবস্থিত। বাইরের উঠানের একপাশে, গাড়ি ঢুকবার উঁচু দেউড়ির পাশ দিয়ে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় একটি সরু লম্বা খিলান-যুক্ত ঘরের মধ্যে—সেইটেই সিস্টার নিবেদিতার পড়ার ঘর। উঠানের দিকে এবং সরু গলির উপরে ছড়িয়ে-থাকা বারান্দার দিকে,—এই দুই দিকে জানালা আছে। স্বল্পালোকিত এই ঘরটিতে আমরা দুজনে এক রবিবার গোটা বিকেল বসেছিলাম,—তিনি বলে গিয়েছিলেন মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনী। ভারতকে

স্বাধীন করার জন্য রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে সেবা করার জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা—এই উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ দারুণ সংঘাতের ইতিহাস যখন বলছিলেন, তখন তাঁর কণ্ঠে গ্রীক ট্রাজেডীর নিয়তি-নিঃশ্বাস। স্বামীজী তাঁকে তর্ক করে বলেছিলেন, কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। মিশনকে কোনোভাবে রাজনীতিতে জড়ানো চলবে না। তারপরে মানসিক সংগ্রাম—কতদিনের—অবশেষে বেছে নিলেন'—ভারতের স্বাধীনতা চাই, চাই-ই। স্বামীজী নেই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মিশনের সভাপতি। তিনি বললেন, এক্ষেত্রে নিবেদিতা সংবাদপত্রে জানিয়ে দিন—অতঃপর তাঁর কথা বা কাজের জন্য মিশন দায়ী নয়। বলতে বলতে তিনি থামলেন, তারপরে নীচু স্বরে বললেন—'ছাপার অক্ষরে যখন কথাগুলি দেখলাম, মনে হল, এর আগে মরলাম না কেন!'

ঘরের আলো আরও কমেছে। আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম, মুখোমুখি। আমার দুই কাঁধে নিবেদিতা হাত রাখলেন। বললেন—'তুমি উত্তম শ্রোতা। তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ পেয়েছি।'

নিবেদিতা কথোপকথনের মানুষ অপেক্ষা শোনার মানুষ চাইতেন। সদ্য সমাপ্ত লেখা তৎক্ষণাৎ কাউকে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে তিনি অদম্য আগ্রহী। সিস্টার ক্রিস্টিন আমাকে বলেছেন, তাঁকে স্থায়ী শ্রোতার ভূমিকা নিতে হয়েছিল। কোনো নতুন প্যারাগ্রাফ বা অধ্যায় লেখা হওয়া মাত্র তাঁর ডাক পড়া অবধারিত। কখনো কখনো স্কুলের ক্লাস থামিয়েও—মেয়েরা চুপ করে অপেক্ষা করছে—ক্রিস্টিনকে শুনতে হয়েছে নিবেদিতার তখনি সমাপ্ত কোনো লেখা।

সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আমার পরিচয়ের গোড়ার দিকটিতে দেখতাম, তিনি লেখার কাজেই ব্যাপৃত, স্কুলের ব্যাপারে খুবই কম সময় দেন। সুধীরার সাহায্যে সিস্টার ক্রিস্টিন প্রায় একাই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ক্রিস্টিন দার্জিলিঙয়ে গেলে নিবেদিতা আবার ভার তুলে নিলেন। কাজে ডুবে গেলেন সেই একই উৎসাহে যা তাঁর সবকাজেই দেখা যেত। ইংরেজী পড়ানোর ভার দিলেন আমার উপর, এবং কতকগুলি নতুন পাঠের পত্তন করলেন, যেগুলি পাশ্চাত্ত্যে তাঁর মাথায় জেগেছিল।

আমাকে তিনি যতদিন পারেন কলকাতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন—তাঁকে আড়াল করার কাজ আমি করেছিলাম। আমি স্কুলে আসার কিছুদিন পরে তিনি ইউরোপ থেকে ফেরেন। অবাক হয়ে দেখেছিলাম—ইউরোপের শেষতম ফ্যাশানে সজ্জিত তিনি, পরণে বহু যত্নে প্রস্তুত মহা পরিপাটী গাউন, মাথায় পালক-গোঁজা মস্ত সাদা টুপি। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার নিবেদিতা, আমি ভেবেছিলাম তুমি সন্ন্যাসিনীর আলখাল্লা পরো!' তিনি বললেন, 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমাকে ভারতে না ফিরতে বলা হয়েছিল, কারণ যে-মুহূর্তে আমি ভারতে পদার্পণ করব, সেই মুহূর্তেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু আমি আসবই। আমি জানতাম, এই পোষাকে আমি কে তারা সন্দেহ করতে পারবে না।'

পুলিশের ব্যাপারে তাঁর ধারণা সত্য। কারণ যখন আমি বাগবাজারের সরু গলিতে হাঁটতাম, প্রায়ই আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করা হত—'আপনি কি সিস্টার নিবেদিতা?' আমি যখন 'না' বলতাম, তারা ভেবে নিত, তাহলে স্কুলে সিস্টার ক্রিস্টিন ছাড়া যে দ্বিতীয় সিস্টার এসেছেন বলে শোনা গেছে, তিনিই আমি। আর স্কুলে যিনি আছেন, তিনি সিস্টার ক্রিস্টিন। যেহেতু আমার কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধির কথা জানা ছিল না, তারা স্কুলের ব্যাপারে মনোযোগ কমিয়ে দিল, এবং নিবেদিতাও উৎপাত থেকে বাঁচলেন।*

একদিন, যখন দক্ষিণেশ্বরে গেছি মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরেজী রূপান্তর আমি সম্পাদনা করে দিতে পারি কি না! বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা নিবেদিতাকে বললাম। দ্রুত তিনি বললেন, 'না, তুমি রাজি হয়ো না; আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ও-কাজটা আমি করি—আরম্ভ করতেও প্রায় প্রস্তুত।' সুতরাং মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধ আমি রাখলাম না, কিন্তু নিবেদিতাও কাজটা করলেন না। আমি জানি না কেন। তিনি যে করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তাঁকে লেখা মাস্টার মহাশয়ের নিম্নের পত্র থেকে বোঝা যায়। নিবেদিতা চিঠিটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, মাস্টার মহাশয় এতে আমার উল্লেখ করেছিলেন বলে। [চিঠিটি আমি পাইনি]

একদিন যখন 'The Master as I Saw Him' সম্বন্ধে আমরা কথা বলছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'স্বামীজী সম্বন্ধে যে-কাজ আমি করেছি, রামকৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে সেই কাজ তুমি অবশ্যই করবে। (শ্রীরামকৃষ্ণের) সব শিষ্যগণের বিষয়েই লেখা চাই। তাঁরা হারিয়ে না যান, দেখতেই হবে।'

নিবেদিতা রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল প্রচুর।

স্কুল বন্ধ হওয়া মাত্র নিবেদিতা ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করতেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে আবিষ্কারাদি নিয়ে ডাঃ বসু নতুন গ্রন্থ রচনা করছিলেন, নিবেদিতা তাকে সাহিত্যিক রূপ দেবার ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন। এই কাজে নিবেদিতার এমনই উৎসাহ যে, নিজের লেখার কাজ তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। ডাঃ বসু ৯টার সময়ে আসতেন, সাড়ে বারটা পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপরে আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করতাম। পরমানন্দের ভোজন। উদ্ভিদ জীবন, প্রকৃতির পরমাশ্চর্য রূপ সম্বন্ধেই আমাদের সমস্ত কথাবার্তা কেন্দ্রীভূত থাকত।

ডাঃ বসু এবং লেডী বসু তাঁর ঘনিষ্ঠতম ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে পড়েন।

* ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আমরা 'শিখাময়ী' অধ্যায়ে পুনশ্চ আলোচনা করব। নিবেদিতার পত্রাবলীতে এ ব্যাপারে অনেক তথ্য আছে।

নিবেদিতা একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে তাঁরা এক চুলের জন্য বেঁচে যান। পরে ডাঃ বসু যখন বললেন, 'আমরা একেবারে মারা যাচ্ছিলাম' নিবেদিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাতে কি, আমরা সবাই তো একসঙ্গে যেতাম।'

প্রতিবাসের কালেই নিবেদিতার সঙ্গে আমার একত্র হবার আসল সময়, কিন্তু বেশীক্ষণ একসঙ্গে থাকতাম না। নিবেদিতা ডাঃ বসুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে ব্যস্ত হতেন, আমিও একই ভাবে ব্যস্ত হতাম মাতা ঠাকুরাণীর কাছে যাবার জন্য। শ্রীমার কাছেই আমার সারাদিন কাটত। দুপুরে শুধু খাওয়া ও অল্প বিশ্রামের জন্য আসতাম। বিকালে শ্রীমায়ের কাছে যখন যেতাম, নিবেদিতা মাঝেমাঝে আমার সঙ্গে আসতেন। নিবেদিতার প্রতি শ্রীমার বিশেষ রকমের ভালবাসা ছিল। নিবেদিতাকে দেখতে পেলেই বড় আদরের সঙ্গে তার নামটি বেশ কয়েকবার বলতেন, আর তার কাছে সরে ঘেঁষে বসতেন। নিবেদিতার বাংলা শুনে খুব হাসতেন; বলতেন, ও বাংলা বেদের সময়ের। নিবেদিতা সাধু বাংলা বলতেন, অত্যন্ত থেমে থেমে, যত্ন করে করে। সিস্টার ক্রিস্টিন অনেক দ্রুত বলতে পারতেন, চলতি ভঙ্গিতে। তবে শ্রীমা সকলের কথা বুঝতে পেরেই খুশী।*

ভারতবাসের সূচনায় নিবেদিতা শ্রীমার সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেছিলেন। শ্রীমাকে খুবই আদরে যত্নে রাখতে চাইতেন তিনি। শ্রীমার পা (বাতে) পঙ্গু হওয়ার জন্য নিবেদিতা প্রায়ই তাঁকে কোলে করে উপরতলায় তুলতেন। আমাকে বলেছিলেন, 'মাকে তুলতে কিছুই ভার বোধ করতাম না, এত আনন্দ পেতাম।'

ভারতীয় যে-কোনো জিনিসের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসা মূল-প্রবিষ্ট। এক অপরাহ্নে শুনলাম, সমস্ত বাড়ি গম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্রোচ্চারণে গম্ গম্ করছে। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞাসা করলাম। নিবেদিতা বললেন, 'আমার দুই ভৃত্য এবং

* দেবমাতার প্রতিও শ্রীমার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। ৮।৯।১৯০৯ তারিখে দেবমাতাকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে পাই, 'মাতাঠাকুরাণী তোমার কথা প্রায়ই বলেন। (তুমি চলে যাওয়ার পরে) প্রথম রাত্রে তোমার শূন্য স্থানটির দিকে তিনি দেখালেন, বড় বেদনার সঙ্গে।' *Days in an Indian Monastery* বইতে দেবমাতা শ্রীমায়ের অনেকগুলি চিঠি দিয়েছেন। স্নেহসুধাক্ষরা চিঠিগুলি। শ্রীমা এক চিঠিতে লিখেছেন, 'যে জায়গাটিতে তুমি বসতে, ধ্যান করতে, যখনি সেই জায়গাটিতে চোখ পড়ে, অমনি তোমার প্রেমময় চেহারাখানি মনে পড়ে যায়। বাড়ির সবাই তোমার কথা বলে।' আর এক চিঠিতে— সারদানন্দ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সত্যকাম, কুসুম দেবী, গণেন, নিবেদিতা, সুধীরা, সবাই ভাল আছে। তারা সবাই প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে।'

আমেরিকা থেকে যাত্রা করে মাদ্রাজে যখন দেবমাতা এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীমায়ের একটি চিঠি পৌঁছল, তাঁকে স্নেহের আহ্বান জানিয়ে। নিবেদিতা প্রভৃতি বিদেশিনীদের কিভাবে সমস্ত সংস্কার কাটিয়ে শ্রীমা কোলে তুলে নিয়েছিলেন, তার বিবরণ ইতিপূর্বে দিয়েছি। এখানে আর একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীমার চিঠি—"আমার ভালবাসার দেবমাতা, আমাদের ঠাকুরের উপর তোমার গভীর ভক্তির কথা শুনে বড় ভাল লাগল। তুমি আমার মেয়ে। তোমার হৃদয়ে অফুরন্ত ভক্তি উঠুক—এই আমার আশীর্বাদ। ঠাকুরের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। বেঁচে থাক মা! আমার অন্য সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে তুমিও অনন্ত ঈশ্বরানন্দে থাক।"

তাদের ভাইয়েরা বেদপাঠ করছে। প্রতি বিকালে এরা এই কাজ করে। ভৃত্য হিসাবে অপদার্থ, কিন্তু ভক্ত, আর জানে কি করে স্তোত্রপাঠ করতে হয়। শুধু এই জন্যই এদের তাড়াইনি।'

নিবেদিতা আমাকে বলেছিলেন, যখন তিনি মায়াবতীতে (আসলে আলমোড়ায়) স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন, তখন প্রায়ই তাঁকে কাঁদতে হয়েছে। স্বামীজী তাঁর ভিতরকার একটা জিনিসকে চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন—যা যাচ্ছিল না। নিবেদিতা আরও বলেছিলেন, সিস্টার ক্রিস্টিন স্কুলে আসার পরে তিনি বেলুড় মঠে খুব কমই যেতেন। ক্রিস্টিন প্রায় প্রতিদিন যেতেন, স্বামীজী যেন তাঁকেই শিক্ষা দিতে মনস্থ করেছেন—মনে হয়েছিল। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন, তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। সুতরাং তিনি স্কুলেই থাকতেন, নিঃসঙ্গে, আঘাতে, যাতনায়। এক রবিবার স্বামীজী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সমস্ত দিন তাঁরই জন্য ব্যয় করলেন। ভারতবাসের সূচনার দিনগুলির একটি যেন ফিরে এসেছে! দুপুরে খাওয়ার সময়ে তিনি জল নিয়ে নিবেদিতাকে বললেন, তার হাত ধুইয়ে দেবেন। নিবেদিতা বললেন, 'স্বামীজী, এ কাজ আপনি করবেন সইবে না; আমারই আপনাকে সেবা করবার কথা।' স্বামীজীর উত্তর, 'খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।'* এর পরে নিবেদিতা তাঁকে যখন দেখলেন—তিনি আর নেই—দেহখানি পড়ে আছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি নিতান্ত বাহ্যিক ব্যাপার—তাঁর বক্তৃতা বা কথার রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে মিশনকে অব্যাহতি দেবার জন্য যা করা হয়েছিল। বেলুড় মঠের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। তিনি পূর্ববৎ মঠে যাতায়াত করতেন, সন্ন্যাসীরাও প্রায়ই যেতেন তাঁর স্কুলে। তাঁদের একজন (সদানন্দ) তাঁর বক্তৃতা-সফরের সময়ে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য. এবং ভ্রমণের ঝঞ্ঝাট বইবার জন্য।†

---

* সময়ের ব্যাপারে এখানে অল্প কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, পাঠকেরা যদি ইতিপূর্বে নিবেদিতার স্বামীজী সম্বন্ধীয় চিঠিগুলি পড়ে থাকেন, তা বুঝতে পেরেছেন। নিবেদিতা সত্যই রবিবার গিয়েছিলেন, এবং স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানও, তাঁর সত্যই মনে হয়েছিল, পুরনো দিন যেন ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজন ও হাত ধোয়ানোর ঘটনাটি ঘটেছিল আরও দু'দিন পরে বুধবারে—সেই শেষ সাক্ষাৎ।

† রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে আলোচনায় অনিচ্ছুক কেন, সেই কারণ ব্যাখ্যায় দেবমাতা পত্রে লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয়, তার কারণ, নিবেদিতা জনপ্রিয় জাতীয় চরিত্ররূপে গৃহীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে মিশনের কোনো সংঘর্ষের সম্পর্ক জনগণ ভাল চোখে নাও দেখতে পারত। আমি যখন ভারতে ছিলাম, তখন সরকারের সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক মনকষাকষি, এবং নিবেদিতা যেভাবে খোলাখুলি কথা বলতেন, তাতে মিশন বেআইনী ঘোষিত হতে পারত। সেইজন্য সন্ন্যাসীরা সরকারীভাবে জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভিতরে সম্পর্ক অব্যাহত ছিলই।'

দেবমাতা এখানে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আংশিক সত্য। মিশন সুস্পষ্ট নীতি অনুযায়ী সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, বেআইনী হবার ভয়েই নয়। সে ভয় নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোমার মামলার আসামীরা যখন পূর্ব মত ত্যাগ করে মিশনে যোগদান করেছিলেন, তখন তাঁদের নিতে মিশন পেছপাও হয়নি, যদিও তার ফলে বিপদ যথেষ্টই বেড়েছিল। বিষয়টি 'শিখাময়ী' অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে পর্যালোচিত হবে।

একবার ভ্রমণকালে যে বিরল অভিজ্ঞতার আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, তার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। প্রাচীন এক মন্দির দেখবার জন্য সঙ্গীসহ তিনি গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে রাত্রিযাপনে তাঁরা বাধ্য হন। রাত্রে মন্দির-উদ্যানে বন্য জীবদের জীবনের রূপ তিনি সতৃষ্ণ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। ঊষার উদয়ে মন্দির-সরোবরে স্নান করে আসেন, সুদূর অতীতে পূজার্থীরা যেমন করতেন। দীপ্ত চোখে তিনি বর্ণনা করেছিলেন—কিভাবে উদীয়মান সূর্যের কিরণ উদ্যানের ঘন বৃক্ষলতা ভেদ করে অপূর্ব মহিমার আলোকে ভরিয়ে তুলেছিল মন্দিরটিকে। রাত্রির নানা অসুবিধা, আরণ্যক হিংস্র জীবদের থেকে সম্ভাব্য বিপদ—এসব কিছুই নয় তাঁর কাছে। তাঁর সমস্ত কথা বা কাজের মধ্যে বীররসপ্রবাহ তরঙ্গিত হত। মেজাজে এবং ভঙ্গিতে তিনি নর্স সাগার নায়কদের কথা মনে করিয়ে দিতেন। সেই একই বেপরোয়াভাব, একই সাহসের ছন্দ, একই কল্পনার বিশালতা।

নিবেদিতা, বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ কখনই ছিন্ন করেন নি। বিদ্যালয়ের অংশীভূত তিনি। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা বা লেখা, এবং ডাঃ বসুর সঙ্গে তাঁর কাজ—এ সবের জন্য পড়ানোর কাজে তিনি সব সময়ে নিযুক্ত থাকতে পারতেন না। তিনি কখনই ডাঃ বসুর চাকুরিয়া-সেক্রেটারী ছিলেন না—তিনি তাঁকে বন্ধুভাবে সাহায্য করতেন। ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মে আমি যখন তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম, তার আগে থেকেই তিনি ডাঃ বসুর সঙ্গে কাজ করছিলেন। তারপর থেকে দেখলাম, বসুর সঙ্গে তাঁর কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সময় ও মনোযোগ গ্রাস করে ফেলতে লাগল, এবং অন্য কাজ কমতে লাগল।

লেডী বসুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর দার্জিলিঙ যাত্রাই শেষ যাত্রা। দারুণ আমাশয় ধরল সেখানে, দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে গেলেন। জীবনের শেষ রাত্রে চারটের সময়ে যাঁরা তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, তাঁদের বললেন, 'তরী ডুবছে, কিন্তু সূর্যোদয় দেখবই।' সে সূর্যোদয় তিনি দেখলেন, প্রয়াণ করলেন ঊর্ধ্বতরলোকে। ডাঃ বসু ও দার্জিলিঙয়ের প্রধান হিন্দু নাগরিকেরা তাঁর দেহকে বহন করে নিয়ে গেলেন সংকার স্থানে। বহু সংখ্যক বন্ধু ও অনুরাগীরা সার দিয়ে অনুগমন করলেন। তাঁর সংকার সর্বসাধারণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।*

তিনি কলকাতায় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আমাকে বলেছিলেন, তিনি ঠিক আরো এগারো বছর বাঁচবেন। মোটামুটি তাই ঘটেছিল।

---

* দেবমাতা জানিয়েছেন নিবেদিতার মৃত্যু ও সংকারের বিবরণ তিনি সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছ থেকে পেয়েছেন। এ বিষয়ে আরও তথ্য পরে দেওয়া হবে।

['রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'—গ্রন্থের এই খণ্ডে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যের সঙ্গেই নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে, আবার অনেকের বিষয়ে হয়নি। যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দের নাম করা যায়, বিবেকানন্দ-শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে স্বামী সদানন্দ, সিস্টার ক্রিস্টিন প্রভৃতি। মিসেস ওলি বুল বা মিস ম্যাকলাউডের কথাও উঠবে। এ'দের কথা আমরা পরবর্তী খণ্ডের অধ্যায়ে উপস্থিত করব—'শিক্ষা-সরস্বতী' অধ্যায়ে ক্রিস্টিনের কথা, 'লোকমাতা' অধ্যায়ে অখণ্ডানন্দ ও সদানন্দের কথা, 'অন্তরঙ্গ' অধ্যায়ে মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউডের কথা, ইত্যাদি।]

মৃত্যুরূপা কালী

এক মত থেকে অন্য মতে

নিবেদিতার বিষয়ে পরম বিস্ময়ে প্রশস্তি করে যে বলা হয়েছে, তিনি একই দেহে জন্মান্তর নিয়েছিলেন—এর পক্ষে চরম দৃষ্টান্ত, তাঁর কালীকে গ্রহণ করা। কালী বিশিষ্টভাবে ভারতীয় বা বাঙালী দেবী; পূর্বসংস্কার সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন না করতে পারলে বহিরাগত কারো পক্ষে কালীকে মেনে নেওয়া কঠিন। নিবেদিতা, বিবেকানন্দের (এবং শ্রীরামকৃষ্ণের) আরাধ্যা দেবীরূপে কালীকে অগত্যা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, এই কথাটি একেবারেই সত্য নয়। স্বামীজী ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হরণ করার কথা ভাবতেই পারেন না, পাশ্চাত্ত্যে তিনি সর্বজনীন ভাবের উপরেই তাঁর বক্তব্য দাঁড় করিয়েছিলেন, এবং সবসময়েই অন্যের ভাষায় অন্যের নিকটে কথা বলতে চেয়েছেন ধর্মের ব্যাপারে। নিবেদিতা যদি কালীকে গ্রহণ করেন, তার কারণ তাঁর মানসিক বা আত্মিক প্রয়োজন কালীতত্ত্ব মিটিয়েছিল। সেইসঙ্গে একথাও সত্য, বিবেকানন্দের বিরাট আধ্যাত্মিক চরিত্র দেখেই তিনি কালীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি; কেননা তাঁর মনে 'বিবেকানন্দকে সম্ভবপর করল কোন্ কোন্ বস্তু'—সে প্রশ্ন উঠেছিলই, এবং তার উত্তর পেয়েছিলেন : কালী এবং কালীর সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ।

নিবেদিতার নিকট 'কালী' কেবল একটি ধর্মীয় বা দার্শনিক সত্তাই নয়, তাঁর পরবর্তী সর্বকর্মের ক্রিয়াত্মিকা শক্তি। তা আমরা দেখতে পাই তাঁর সেবার মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে,* এক কথায় আত্মোৎসর্গের মধ্যে। মহাকালীর এক নন্দিনীর নাম নিবেদিতা।

কালীকে বরণ করে নিবেদিতা 'কী হলেন' তা আমরা বিস্তারিতভাবে দেখব। কিন্তু 'কী ছিলেন' তা না জানলে পরবর্তী পরিবর্তনের পরিমাণ বোঝা সম্ভব নয়। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে নিবেদিতার মনোবিকাশ, তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ও তার সংঘাতমুখর পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তাঁরই আত্মকথা মারফৎ আমরা একেবারে গ্রন্থসূচনায় উপস্থিত করেছি। 'পূর্বজীবন' নামক পরবর্তী অধ্যায়ে নিবেদিতার ভাই ও বোনের সাক্ষ্য হাজির করব। নিবেদিতার প্রথম বয়সের নানা-মুখী দার্শনিক অভীপ্সার চিত্র সেখানে পাওয়া যাবে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে নিবেদিতা যদিও প্রথম বয়সের খৃস্টীয় বিশ্বাসের জগৎ থেকে অবিশ্বাস বা অজ্ঞেয়বাদের জগতে প্রবেশ করে-ছিলেন, কিন্তু সেখানে, তাঁর সেই স্বাধীন যুক্তিবিশ্বাসের, ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সৌন্দর্যচেতনার জগতে কালীর সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না। কালী তারপরে যেন অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড বৈদেশিক আক্রমণের মতো তাঁর উপর এসে পড়েছিল, তাঁকে অধিকার করেছিল।

---

* কালী-তত্ত্বের সঙ্গে রাজনীতির যোগ পরে আলোচনা করা হবে।

কিন্তু কালীর আক্রমণ তো সত্যই বৈদেশিক অভিযানের মতো শারীরিক ব্যাপার নয়, তা মানসিক, সুতরাং মনে যদি কোনো পূর্বপ্রস্তুতি না থাকে, বিশেষত নিবেদিতার মত দুর্ধর্ষ চিত্তবৃত্তিশালী মানুষের ক্ষেত্রে—তাহলে 'বিজয়' কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কালীর সম্মুখীন হবার কয়েক বছর পরে নিবেদিতা এক চিঠিতে (৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৯) লিখেছেন :

> "এই ভয়ংকরের অর্চনা কি নতুন তাঁর (স্বামীজীর) কাছে? আমার তা মনে হয় না। মনে হচ্ছে, তাঁর মধ্যে সবসময়েই আমি কিছু জিনিসের সম্ভাবনা দেখেছিলাম, এমনকি একেবারে সূচনাতেও—'সম্ভাবনা' অর্থে 'ইঙ্গিত', যা তিনি পেয়েছিলেন, এবং তার চাবি আমাকে দেবেন—তাই মনে হয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়ালও। ভয়ংকরের অর্চনা তাঁকে ইদানীং বাস্তবিকই অনেক বেশী নিমজ্জিত করে রাখছে। আর...অতি অতি সম্প্রতি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চাবিটি আমাকে দিয়েছেন, আর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—কিন্তু জিনিসটি সব সময়ে তাঁর মধ্যে ছিলই।"

অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি কথা। পূর্বকথা রূপে নিবেদিতার পত্র থেকে আরও দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি, যাতে খ্রীস্টধর্ম থেকে নতুন ভাবগ্রহণের জন্য নিবেদিতার উন্মুখ মনের রূপ পাই। স্বামীজীর কাছে নিবেদিতা কী পেতে চেয়েছিলেন—সে কথাও। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর তারিখে ম্যাকলাউডকে যা লিখেছেন তা এখানে পুনরুদ্ধৃত করা হল :

> "খ্রীস্টধর্ম অবশ্যই নিত্য সত্যের, কিন্তু সম্ভাবনায়। সক্রিয়ভাবে, গতিশীলভাবে তা হতে গেলে তার জন্য কালোপযোগী নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন।
>
> স্পেনস্ খ্রীস্টসংঘে প্রবেশ করে নতুন কিছু করেনি—শুধু জানিয়েছে যে, প্রস্তর ও কণ্টকের পথে চলতে সে প্রস্তুত। ভয়ের শুরু এখন থেকেই।
>
> স্বামীজী একদা আমাকে বলেছিলেন, 'মার্গট, তোমার ধর্ম তুমি তৈরী করে নিও—তোমার শিষ্যদের জন্য। আর যদি পারো, তার মধ্যে কিছু সর্বজনীন ভাব প্রবেশ করিয়ে দিও। তবে মনে রেখো, সমস্ত পৃথিবীতে ৬ জন লোকও তার জন্য তৈরী দেখতে পাবে না।' মনে হচ্ছে, কথাগুলো মোটামুটি সত্য। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি স্থির-প্রত্যয় যে 'সাম্প্রদায়িকতার' (Sectarianism) গভীরে প্রবেশ করেই কেউ তবে উপরের পুষ্পশোভা আশা করতে পারে। যদি আমি সত্যই কিছু অর্জন করে থাকি, তা করতে পারার কারণ, একদা আমি অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীস্টান ছিলাম। আর মনে রেখো, কালীপূজাও সাম্প্রদায়িক ব্যাপার।
>
> স্বামীজীকে যখন প্রথম দেখি, তখন আমার প্রধান প্রয়োজন ছিল এই জানা যে, কী অর্থে কুসংস্কারগুলি সত্য? অন্যরা তাঁর কাছ থেকে সর্বজনীন সত্য শিখতে পারে, কিন্তু আমার মূল শিক্ষা : কিভাবে প্রতিটি পুরাণ-কথা (Myth) বা অনুষ্ঠানরীতিকে কেন্দ্রীয় সত্যের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। তুমি জানো, আমি তখনই সকল বিশ্বাসের মিথ্যাত্বে কী অনপনেয়ভাবে বিশ্বাসী

হয়েছিলাম। অথচ আমার ভক্তস্বভাব বলত, এটাই শেষ কথা নয়। ফলে টানা-পোড়েনের শেষ ছিল না। তারপর পেলাম তাঁর শিক্ষা।

কাশ্মীরের অরণ্যে সেই রাত্রির কথা তোমার মনে পড়ে, যখন তিনি আমাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং যখন আমি বলেছিলাম—'একটি গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে'—তিনি কি রকম দ্রুত সায় দিয়েছিলেন!"

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বরের চিঠির অংশ :

"বিজ্ঞানপ্রীতি সত্ত্বেও ক্যাথলিক মতকে আমি ভালবাসতাম, একথা তুমি জানো। যখন খুব ছোট ছিলাম, সবে শৈশব অতিক্রম করেছি, তখন ভাবতাম, বোধহয় এখনো ভাবি—আমার মধ্যে একমাত্র প্যাশন্ হতে পারে—সত্যকে জানার প্যাশন্। সেই সত্যের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভাবের সংঘর্ষই আমার জীবন-যন্ত্রণার কারণ। কিন্তু স্বামীজী সে যন্ত্রণামোচন করেছিলেন, নতুন জগতে তুলে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে সমস্ত পুরনো জগৎ অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। কী অদ্ভুত! জানো কি, একথা আক্ষরিকভাবে সত্য যে, যখন তাঁকে বলতে শুনেছিলাম—সর্বজ্ঞান, পরমতত্ত্ব, সবই আছে আমাদের ভিতরে—তখন নিজের মনে বলেছিলাম, 'বেশ, তাহলে এই পৃথিবীর প্রমাণ আছে বিজ্ঞানের মধ্যে—একে আমি কাজ-চলা মত রূপে গ্রহণ করলাম।' তারপরে এই পাঁচ বছর ধরে এই বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে পরীক্ষা করছি—তার সঙ্গে যুক্ত আছি।"

নিবেদিতা কী পেতে চেয়েছিলেন, এবং কী পেয়েছিলেন, তার আরও কিছু স্বীকারোক্তি মিলল। এখান থেকে আমরা ফিরে যেতে পারি পুরাতন ইতিহাসের ক্রম-উন্মোচনে, নিবেদিতার মধ্যে কালী-সংক্রমণের কিছু ধারাবাহিক বিবরণে।

কিন্তু এই ইতিহাস সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। কালী নাম এবং কালীপূজা-কেন্দ্রিক তথাকথিত বীভৎস বস্তুগুলি সম্বন্ধে সাধারণ ইংরেজতুল্য ধারণা নিবেদিতারও মনে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিপরীত ধারণার সূত্রপাত কবে থেকে? ১৮৯৫ এবং ১৮৯৬ সালের কোনো সময় থেকে নিশ্চয়, যখন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল; কিন্তু উল্টোদিকে দেখা যায়, ইংলণ্ডে ঐকালের প্রচারপর্বে স্বামীজী হিন্দুধর্মের সার্বভৌম ভাবকেই ব্যাখ্যা করছেন, দেবদেবী বা বিশিষ্ট ধর্মপদ্ধতির কথা বলছেন না। তথাপি ধরে নেওয়া যায়, ব্যক্তিগত আলাপে অন্ততঃ তিনি জিজ্ঞাসিত হলে মাতৃপূজা সম্বন্ধে বলেছেন, এবং হিন্দুর কুসংস্কার ও বিকট পুতুলপূজার বিরুদ্ধে পশ্চিমী কুৎসাকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন।*

---

* লুই বার্কের 'New Discoveries' -এর মধ্যে দেখা যায়, আমেরিকায় প্রথম অবস্থানকালে স্বামীজী ঈশ্বরের মাতৃভাবের কথা কখনো কখনো বক্তৃতাদিতেও বলেছেন। আনুমানিক ১৮৯৪ সালে শিকাগোয় জর্জ হেলের বাড়িতে থাকার সময়ে স্বামীজী পেনসিলে কিছু নোট লেখেন, বক্তৃতার বা গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যে। তার মধ্যে আছে—'God as father, God as mother, God as the lover' ইত্যাদি। মিনিয়াপোলিস জার্নাল-এ (২৭ নভেম্বর, ১৮৯৪) প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতা-বিবরণীতে পাই— "The Hindu faith recognized the motherhood of God as well as the fatherhood, because the former was a better fulfilment

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কালী

শ্রীরামকৃষ্ণের কালী

নিবেদিতা কেন কালীকে গ্রহণ করলেন, তার উত্তর সন্ধান করতে হলে ভূমিকা-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কালীকে দেখা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের সবটাই কালী, কালীদর্শন দিয়ে তাঁর সাধনার প্রথম সিদ্ধি, তাঁর মরজীবনের শেষ উচ্চারিত শব্দ 'কালী', এবং মধ্যবর্তী জীবন এই কালীর সঙ্গে নিত্য বোঝাপড়ার। শ্রীরামকৃষ্ণের কালীর কথা জানাতে গেলে উপাদান বাহুল্যের সম্ভাবনা, তা ঘটাব না এখানে, আমি একটি খণ্ড বর্ণনা শুধু তুলে ধরব—তাঁর প্রথম সিদ্ধিক্ষণের—সারদানন্দের রচনা থেকে। ধর্মোপলব্ধির ইতিহাস যাঁরা রচনা করবেন, তাঁদের কাছে এই বর্ণনা পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধার বস্তু হবে, কারণ আধুনিক পৃথিবীর অধ্যাত্ম-সমুত্থানের কেন্দ্রীয় চরিত্র কালীকে অবলম্বন করেই তরঙ্গসৃষ্টি করেছিলেন, কিংবা বলা যায়, ঐ ক্ষীণতনু মানুষটিকে দিয়েই কালী বিশ্বের আত্মসাগর মন্থনের কাজটি করিয়ে নিয়েছিলেন।

---

of the idea of love". এখানে স্বামীজী পিতৃউপাসকদের দেশে প্রকাশ্য বক্তৃতায় পরিষ্কারভাবে মাতৃউপাসনার শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানালেন। ভারতে অন্য উপাসনা পদ্ধতির তুলনায় মাতৃউপাসনার প্রতি প্রীতির কারণ বিশ্লেষণ করলেন এক বক্তৃতায় কিছুদিন পরে। ডেট্রইট ট্রিবিউনের ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় স্বামীজীর বক্তৃতাবিবরণে পাই—

"There were three different ways of looking at God. One was to look upon Him as a mighty personage and fall down and worship His might. Another was to worship Him as a father. In India the father always punished the children and an element of fear was mixed with the regard and love for a father. Still another way to think of God was as a mother. In India a mother was always truly loved and reverenced. That was the Indians' way of looking at their God."

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে 'নারীর আদর্শ—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে'—এই বিষয়ে স্বামীজী বিখ্যাত এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার শুরুতে বলেন—আস্তাকুঁড় দিয়ে কোনো জাতির বিচার হয় না। জাতিকে গ্রহণ করতে হবে তার আদর্শরূপের দিক দিয়ে। আর্যজাতির মধ্যে নারীর উচ্চ স্থান এবং সেমেটিক ধর্মে নারীর নিম্নাবস্থার কথা তিনি বলেন। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে নারীর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায় বৌদ্ধযুগে, সন্ন্যাসের প্রতি অতি-পক্ষপাতে। নারী নরকের দ্বার—এইসব কথার চল তখনই হয়। পাশ্চাত্যে একালে নারীর অধিকার ক্রীশ্চান ধর্মের দ্বারা যতটা না প্রতিষ্ঠিত, ততোধিক হয়েছে জন স্টুয়ার্ট মিল ও বিপ্লবী ফরাসী চিন্তানায়কদের দ্বারা। তারপরে স্বামীজী ভারতে নারীর অবস্থার কথা বিশেষভাবে বলতে গিয়ে মাতৃউপাসনার কথা বলেন, এবং প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব উপস্থিত করেন :

"In India the mother is the centre of the family and our highest ideal. She is to us the representative of God, as God is the mother of the Universe. It was a female sage who first found the unity of God, and laid down this doctrine in one of the first hymns of Vedas. Our God is both personal and absolute, the absolute is male, the personal, female. And thus that we now say: *The first manifestation of God is the hand that rocks the cradle.*"

সারদানন্দের রচনার সামান্য অংশ :

"অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছিলেন, তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে 'দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদপ্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করানো তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন, রামপ্রসাদপ্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন—জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন, 'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ, কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে।' ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত, এবং উহাতে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া তিনি 'দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা, ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল।

দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্ট কালও এই সময় হইতে তাঁহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়ত দুই ঘণ্টাকাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন। অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যুষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া 'দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাহ্ণে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সময় অতীত হইতেছে, একথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াও তাঁহাকে আরাত্রিকাদি কর্মসম্পাদনে সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল না।......

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের ঐ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানাপ্রকার বাহ্যলক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রবাহিত হওয়ায়, বক্ষস্থল সর্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে-মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ 'কি করিব, কেমনে পাইব'—এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যানপূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।"

এর পর সারদানন্দ সেই চরম ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ সাক্ষ্যে বর্ণনা করেছেন:

"তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এইসময়ে একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন, এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 'মা, এত যে ডাকছি, তার কিছুই তুই কি শুনছিস না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?' তিনি বলিতেন—

'মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা। জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে! মার দেখা বোধহয় কোনোকালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ-জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মা'র অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর বাহিরে কী যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপর দিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। অন্তরে কিন্তু অননুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল, এবং মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।'

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন—

'ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিসমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া, হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।'

ঐরূপ প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতি-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি? ঠাকুর কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতিসমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতর কণ্ঠে 'মা, মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"

পরবর্তী দিব্যোন্মত্ততার আরও কিছু কিছু অংশ সারদানন্দের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা যাক:

"পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল

উঠিয়াছিল। ক্রন্দনাদি বাহ্যলক্ষণে সকল সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত, এবং কখনো-কখনো এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে 'মা, আমায় কৃপা কর্, দেখা দে' বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারিপার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত। ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। বলিতেন, 'চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে-আঁকা মূর্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত, এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচের উদয় হইত না। ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম, এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম, মা'র বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি; দেখিতাম, ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।......

ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম, শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থি-সকলে, পায়ের দিক হইতে ঊর্ধ্বে, খট্‌খট্‌ করিয়া শব্দ হইতেছে, এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতর হইতে ঐ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে।......ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোতপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম; কখনো-বা কুয়াশার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চতুর্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম। আবার কখনো-বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম। আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতাম তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ, তাহাও জানিতাম না। সুতরাং মা'র নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম, 'মা আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুই-ই তাহা আমাকে শিখাইয়া দে। তুই না শিখাইলে কে আমাকে শিখাইবে মা! তুই ছাড়া আমার গতি বা সহায় কেহই যে নাই!'......

পূজা-ধ্যানাদি করিতে বসিয়া ঠাকুর ইতিপূর্বে কোনোদিন দেখিলেন, মার হাতখানি, বা কমলোজ্জ্বল পা-খানি, বা সৌম্যাৎ সৌম্য, হাস্য-দীপ্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রমুখখানি; এখন পূজা-ধ্যানকাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন সর্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস্ না' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেছেন।

পূর্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মা'র নয়ন হইতে অপূর্ব জ্যোতিঃরশ্মি লক্ লক্ করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্যসমুদয় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে! এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়া দিবা মাত্র, এবং কখনো কখনো দিবার পূর্বেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে, ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা 'রোস্ রোস্, আগে মন্তরটা বলি, তারপর

থাস্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পূজো সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন।

পূর্বে ধ্যান-পূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী মূর্তিতে এক জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে—এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন, যাঁহার চৈতন্যে জগৎ সচেতন হইয়া রহিয়াছে, তিনিই চিদ্‌ঘন মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়া তথায় সর্বদা বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন, 'নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্যসত্যই নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দির-দেউলে মা'র দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনো পতিত হইতে দেখি না। আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপরতলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্যসত্যই মা মন্দিরে দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখনো কলিকাতা এবং কখনো গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।

হৃদয় বলিত, ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন, তখন তো কথাই নাই. অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইয়া গা ছম্‌ ছম্‌ করিত। পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতাম, তাহাতে বিস্ময়ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইত।......

দেখিতাম, জবা বিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া মামা প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ. সর্বাঙ্গ, এমনকি নিজ পদ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

দেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর, গান, পরিহাস বা কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমূর্তির হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন।

দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগনিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন, এবং থাল হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মা'র মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন—খা, মা খা, বেশ করে খা!' পরে হয়ত বলিলেন, আমি খাবো? আচ্ছা খাচ্ছি!—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় মা'র মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি তো খেয়েছি, এইবার তুই খা!'

একদিন দেখি, ভোগনিবেদন করিবার সময়ে একটি বিড়ালকে কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও-ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মামা 'খাবি মা, খাবি মা' বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন।

দেখিতাম. রাত্রে এক এক দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া মামা 'আমাকে কাছে শুতে বলছিস্, আচ্ছা শুচ্ছি' বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ

শুইয়া রহিলেন।

আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন যে, বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া মা-কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, কখনও তিনি যেন কাহারো সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর-আবদার, রঙ্গ পরিহাসাদি করিতেছেন।

আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই। যখনি জাগিয়াছি, তখনি দেখিয়াছি, তিনি ঐরূপে ভাবের ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন, বা পঞ্চবটীতে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ]

'দিগ্বিজয়ীর মত অধ্যাত্ম জগতের রাজ্যের পর রাজ্য যিনি প্রচণ্ড প্রতাপে অধিকার করেছিলেন,'—তাঁর লীলারাজ্যের অতি অল্পাংশের উপরই আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে, এবং তারও নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ আমরা উপস্থিত করেছি। কী যন্ত্রণায় ঈশ্বর দর্শন হয়, কিংবা ঈশ্বর দর্শনের পরে সামান্যতম বিরহেও কী যন্ত্রণা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একালে তার প্রধান দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বীকারোক্তি সারদানন্দ পুনশ্চ উদ্ধৃত করেছেন—"শরীর সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐকালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনি-আপনি জট পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসংকোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত। আবার সময়ে সময়ে ভগবৎ-বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখ ঘর্ষণ করিতাম যে, কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত।......সন্ধ্যা সমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত, তখন মনে পড়িত, দিবা অবসান হইল, আর একটি দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না, আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা এখনো দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ও ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। লোকে বলিত, পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে তাই কাঁদিতেছে।"

জগন্মাতাকে দর্শনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এই সীমাহীন হাহাকারের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা সারদানন্দ নন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঐ সকল কথা শুনেছেন। স্বীকার করেছেন, "আমরা যখন শুনি, ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখ ঘর্ষণ করিতেন, দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও ঐ ভাবের বিরাম হইত না—তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না।" এই কথাগুলির মধ্যে স্বয়ং মহাসাধক সারদানন্দের আধ্যাত্মিক বিনয় কতখানি ছিল, তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে সারদানন্দ যে অকপট চিত্তেই কথা বলছিলেন, তা অন্য প্রমাণে বোঝা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা

তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, স্তম্ভিত হয়েছিলেন তার রূপে, কিন্তু সে ব্যাকুলতা, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তাঁর নিজের তুলনায় 'সিকিও হবে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতার সিকিও যা নয়, তার সামান্য বর্ণনা সারদানন্দের মুখে:

> "ঈশ্বর লাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্ধারিত টাকা জমা দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উঁহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে, নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় শহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, আহার-নিদ্রা ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময় হইতে দিবারাত্র ধ্যান, জপ, ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্রকঠোর-ভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন-চারি মাসের অন্তেই নির্বিকল্প সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন—ঐসকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছিল।"

বিবেকানন্দের জীবনে কালীর আবির্ভাব

যে-ব্যাকুলতার শক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদর্শন, সেই ব্যাকুলতার কিয়দংশ নিজস্বভাবে নরেন্দ্রনাথের ছিল, বাকি অংশ পূর্ণ করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা, যার ফলে যুক্তি ও সংশয়বাদী, নিরাকারপন্থী তরুণটি বাধ্য হয়েছিলেন মাতৃদর্শনে। সে এক চমকপ্রদ ইতিহাস, অধ্যাত্মজীবন এতখানি রক্তরসময়, মথিত, দহন-জ্বলন্ত হয়, তা প্রায় বিশ্বাসই হয় না। সেই মহারহস্যনাট্যের ভিতরে আমরা চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করতে পেরেছি, কারণ মুখ্য অভিনেতা স্বয়ং কিছু সময়ের জন্য যবনিকা সরিয়ে দিয়েছিলেন। সারদানন্দ-সংগৃহীত নরেন্দ্রনাথের আত্মকথা এইপ্রকার :

> "মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকুরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নে প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখের দুঃখী হইয়া কোনদিন সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই।

দেখিতাম, দুইদিন পূর্বে যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখনও কখনও সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময় একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেন্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই-এক জন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল— 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি। শুনিয়া মনে হইয়াছিল, মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদিত হওয়ায় ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে নে, চুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়-বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানা পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল— দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে! প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোনদিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোনদিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধু-গণের অনেকে পূর্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্বক তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না—তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ে জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল দুই-একজন কখন কখন বলিত, 'তোকে আজ এত বিমর্ষ ও দুর্বল দেখিতেছি কেন, বল্ দেখি?' একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

যৌবনে পদার্পণপূর্বক যে-সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জন করিতেছিল, তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহা-দিগের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রানির্বাহের জন্য হীন পথ

অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম তাহারা সত্যসত্যই আমার জন্য কাতর হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব হইতেই আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান করিতে পারি। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা-প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণী ঐরূপে প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাই-ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কত কি তো করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাকো।'

যাহা হউক, এত দুঃখকষ্টেও এতদিন আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ অথবা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ-মননপূর্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জনের উপায়-অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যাত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান! —ভগবান ত সব কল্লেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান কি বাস্তবিক আছেন এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অ-শিব কোথা হইতে আসিল, মঙ্গলময়ের রাজত্বে এতপ্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়া একসময় যাহা বলিয়াছিলেন—ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন?—তাহা কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।

গোপনে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন ঐরূপ করা দূরে থাকুক, অন্তরের চিন্তাটি পর্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন তো তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা ও প্রয়োজন নাই—একথা হাঁকিয়া-ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্পদিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয় পর্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার

যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভোগী হইতে পারি, একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

কথা কানে হাঁটে। আমার ঐ সকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ-অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে ইশারায় জানাইলেন। আমাকে তাঁহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া, দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্বলতা, একথা প্রতিপন্নপূর্বক হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম, আমার অধঃপতন হইয়াছে, এ কথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায়গ্রহণ করিলেন—বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম, এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়ত ইঁহাদের মুখে শুনিয়া ঐরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন—মানুষের ভালমন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদের মুখে ঐ কথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐ কথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও আগোচর!'—তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ কর শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।'

ঐরূপে অহঙ্কারে-অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে, জীবনে যে সকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের কথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে উদিত হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; দুঃখ-কষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূরপরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল। এখনও পূর্বের ন্যায় কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে, এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর

হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড়-পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবির তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য, এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে-সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী-অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।

সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতরসাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই—একথায় দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া পিতামহের ন্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল—গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।' নানা ওজর করিলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণপূর্বক সজল-নয়নে গাহিতে লাগিলেন—

কথা কহিতে ডরাই,
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়,
বুঝি তোমায় হারাই, হা-রা-ই।

অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগসংবরণ করিতে পারিলাম না—ঠাকুরের ন্যায় আমারও বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরূপ আচরণে অন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও-একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার

কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক।' ইহা বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নিকটে বিদায়গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা আসিয়া অন্তর অধিকার করিল, পূর্বের ন্যায় নানা চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে এটর্নির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম জুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণপোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ত ঈশ্বর শুনেন—তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের খাওয়া-পরার কষ্ট যাহাতে দূর হয়, এরূপ প্রার্থনা করাইয়া লইব; আমার জন্য ঐরূপ করিতে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলাম এবং নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম, 'মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে, আমি যে ওসব কথা বলিতে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস না—সেই জন্যই তোর এত কষ্ট।' বলিলাম, 'আমি ত মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন—বলতেই হবে—আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কতবার বলেছি—মা, নরেন্দ্রের দুঃখ-কষ্ট দূর কর। তুই মাকে মানিস না—সেইজন্যই ত মা শুনেন না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন—তিনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন!'

দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন ঐরূপ বলিলেন, তখন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। একপ্রহর গত হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল এবং মাকে সত্য-সত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব, এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া বিষম একাগ্র ও তন্ময় হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্য-সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য-সত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও; যাহাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি, এইরূপ করিয়া দাও।' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎ-সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, মার নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস তো?' তাঁহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি। তাই তো, এখন কি করি?' তিনি বলিলেন, 'যা যা, ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চলিলাম এবং মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত হইয়া সকল কথা ভুলিয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্বক জ্ঞান-ভক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কি রে, এবার বলিয়াছিস তো?' আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কী এক দৈবশক্তিপ্রভাবে সব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞান-ভক্তিলাভের কথাই বলিয়াছি।—কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দূর ছোঁড়া, আপনাকে একটু সামলাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না? পারিস তো আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা।' পুনরায় চলিলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিলাম, এ কী তুচ্ছ কথা আমি মাকে বলিতে আসিয়াছি। ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে 'লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা'—এ যে সেইরূপ নির্বুদ্ধিতা। এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘৃণায় পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'অন্য কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান-ভক্তি দাও।' মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল, ইহা নিশ্চয় ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিন বার মার নিকটে আসিয়াও বলা হইল না! অতঃপর তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে ঐরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে—আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কাহারও জন্য ঐরূপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে উহা বাহির হয় না। তোকে বললুম, মার কাছে যাহা চাহিবি তাহাই পাইবি; তুই চাহিতে পারিলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই, তা আমি কি করিব!' বলিলাম, 'তাহা হইবে না, মহাশয়, আপনাকে আমার জন্য ঐকথা বলিতেই হইবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না।' ঐরূপে যখন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না, তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'"

এই ঘটনার পরবর্তী অবস্থার কথা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীতারাপদ ঘোষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন স্বামী সারদানন্দ :

"মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকী গৃহে বসিয়া আছেন, এবং নরেন্দ্র বাহিরে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ঠাকুরের মুখ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মা-কে মানতো না, কাল মেনেছে। কষ্টে

পড়েছে, তাই মার কাছে টাকা-কড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম; তা কিন্তু চাইতে পারলে না, বলে, 'লজ্জা করলে।' মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে, মার গান শিখিয়ে দাও—'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে। তাই এখন ঘুমুচ্ছে। (আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে—না? তাঁহার ঐ কথা লইয়া বালকের ন্যায় আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, 'হাঁ মহাশয়, বেশ হইয়াছে।' কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?' ঐরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারংবার ঐকথা বলিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল, এইবার তিনি তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া একপ্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া)—'দেখছি কি—এটা আমি, আবার এটাও আমি, সত্য বলছি—কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নাই, একটাই রয়েছে!—বুঝতে পারছ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বলো—কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাবো।' আমি ব্যস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকাটি তাঁহাকে দিলাম। দুই এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে খাব' বলিয়া কল্কেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সংকুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর তো ভারী হীনবুদ্ধি, তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐকথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাক খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজ হাত-দুখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই-তিনবার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাক সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।' কিন্তু সেকথা শোনে কে? 'দূর শালা, তোর তো ভারী ভেদবুদ্ধি!' এইকথা বলিয়া ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। খাদ্য-দ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে-ঠাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কখনো খাইতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অদ্য ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদূর আপনার জ্ঞান করেন!

কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তখন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক পদব্রজে

> কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পরে কতদিন আমরা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিয়াছি, 'একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম-দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা ভাইরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস-ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারে অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে।'

এই 'দারুণ' ইতিহাস। নিবেদিতা এই ইতিহাস কবে সম্পূর্ণভাবে জেনেছিলেন? সঠিকভাবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনেই যে তিনি স্বামীজীর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণকথা শুনেছিলেন, তা নিজেই লিখেছেন 'আচার্যদেব' গ্রন্থে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা মানে একই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা'র কথাও। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজী নিজের কথা কতটুকু বলেছিলেন? নিবেদিতার লেখা থেকে মনে হয়, সামান্যই। বিবেকানন্দের কালীকে তিনি 'সম্ভবতঃ' ভারতবর্ষে এসেই জানতে পারেন। এবং তা এক অভিনব, আলোড়নকারী অভিজ্ঞতার রূপ নেয়।

কালী কিন্তু রূপান্তরিত আকারে ধরা দিলেন এবার। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-কালীর নিত্য সন্তান—সে কালী আপাততঃ মধুরা, স্নেহময়ী, তাঁর সঙ্গে খেলায় লীলায় ঠাকুরের দিন কাটে। নরেন্দ্রনাথকে তিনি যে-কালী দেখিয়েছিলেন, তিনিও 'অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী।' কিন্তু যে-কালীকে বিবেকানন্দ অতঃপর দেখবেন ও দেখাবেন, তাঁর রূপ ভিন্ন—ভয়ঙ্করী তিনি। সেই ভয়ঙ্করীকে জননীরূপে দেখাবেন, রামকৃষ্ণের কালীর 'নব সাজ' হবে বিবেকানন্দের চেতনায়। এই 'নব সাজ' নিবেদিতার কাছে এতই বিস্ময়কর ঠেকবে যে, যতক্ষণ না তিনি কালীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সম্পর্কের রূপ নির্ণয় করতে পারবেন, ততক্ষণ তাঁর অশান্ত কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে না। সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

এখানে শুধু পূর্বাহ্নে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দেব, মৃদু কোমল বিহ্বল হাসির রামকৃষ্ণ ভয়ঙ্করীকে দেখেন নি, একথা মোটেই সত্য নয়। বিবেকানন্দের তুলনায় তিনি অধ্যাত্মকেন্দ্রে অনেক বেশী পরিমাণে অবস্থিত। ভয়ঙ্করের সামনে বীরদর্পে অগ্রসর হবার প্রয়োজন তাঁর ছিল না, ঐ ভয়ঙ্করের অঙ্কেই তিনি সন্তানের আনন্দে উপবিষ্ট। বিবেকানন্দকে যেখানে ত্রিনয়নের অগ্নিতে জ্বলে উঠতে হয়েছে, সেখানে রামকৃষ্ণের চোখে শিব-ললাটের মধুচন্দ্রের হাসি। নচেৎ রামকৃষ্ণ—তিনিও কী সহজে কী ভয়ঙ্করই হতে পারেন—তার দৃষ্টান্ত কি তাঁর জীবন থেকে পাই না? তাঁর বেদান্ত সাধনের অংশ সারদানন্দের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। পশ্চিম ভারতীয় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদান্তসাধনের উপযুক্ত পাত্র দেখে এই মার্গে সাধনা করতে উৎসাহিত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকৃত হয়ে তোতাপুরীকে এই সাধনায় গুরুরূপে বরণ করেন তদনুযায়ী বিরজাহোম অনুষ্ঠিত হয় এবং শিখা সূত্রাদি ত্যাগ করে, 'গুরুপ্রদত্ত কোপীন, কাষায় ও নামে ভূষিত' হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তোতার নিকট উপদেশ গ্রহণে

জন্য উপবিষ্ট হন। 'ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ নেতি নেতি উপায়াবলম্বন-পূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত' করতে লাগলেন। অতঃপর :

> "ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি (তোতাপুরী) যেন সেদিন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈত-ভাবে সমাহিত করাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'দীক্ষাপ্রদান করিয়া ন্যাংটা (তোতাপুরী) নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া, আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনই হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নাম-রূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্যুপরি ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন নির্বিকল্প সমাধিসম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইলাম, এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কে'ও, হোগা নেহি?' অর্থাৎ—কী! হইবে না, এতবড় কথা! বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচীর ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আনো।' তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম, এবং **জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহাদ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম।** তখন আর মনে কোনোরূপ বিকল্প রহিল না। একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম।" (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

অধ্যাত্মসাধনা সম্বন্ধে উচ্চ কোনো মন্তব্য করবার অভিমান বা অভিপ্রায় আমাদের নেই। কিন্তু এইটুকু বলা উচিত, অবলীলাক্রমে অতি ভয়ানক কথা এখানে বলা হয়েছে। যে-কোনো দ্বৈতবাদীর কাছে ধর্মদ্রোহিতাতুল্য ঐ ব্যাপারটি—মাতৃমূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করা—ভক্তি-লীলা সংহারের এমন মারাত্মক রূপক-কল্পনা। কোনো পূর্বাবধি বৈদান্তিক, যিনি জ্ঞানের অসি নিয়েই সাধনজগতে অবতীর্ণ—তিনি মাতৃ-পিতৃদায়হীন, তিনি নন, কিন্তু যিনি ভবতারিণীর উপর একান্ত নির্ভরশীল সন্তান—তিনি রূপকার্থেও মাতৃ-হননের দারুণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন! রামকৃষ্ণ ভয়ঙ্করকে দর্শন করেন নি!! তিনিই ফিরেছিলেন আবার তাঁ মায়ের কোলেই, যা চিরদিনের অদ্বৈতপন্থী তোতাপুরীর পক্ষে সম্ভব হয়নি—যার জন্য মায়াঘোরে আচ্ছন্ন তোতাপুরীর দুর্দশা দেখে রামকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত হাসি-

সন্ত্রস্ত করে তোলে আমাদের।* এই রামকৃষ্ণই সহজে ভয়ঙ্করীর সন্তান হয়ে থাকতে পারেন, বিবেকানন্দকে যেখানে মহাবীরত্বের কিছুটা অ-সহজ ভূমিকা নিতে হয়েছিল।

বিবেকানন্দের মাতৃভাবাবেশ : নিবেদিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে নিবেদিতা' অধ্যায়ে আমরা আগেই দেখেছি, মাতৃতত্ত্বের মধ্য দিয়ে মূল ঈশ্বরতত্ত্বে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পৌঁছেছিলেন, এবং মাতৃতত্ত্বের মধ্য দিয়ে

---

* তোতাপুরী ভক্তিমার্গের ধার ধারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ সকাল-সন্ধ্যায় করতালি দিতে দিতে ও নৃত্য করতে করতে 'হরিবোল', 'হরি গুরু, গুরু হরি' ইত্যাদি বলতেন। তাতে তোতা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আরে কেঁও, রোটী ঠোকতে হো?' উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হাতে চাপড়ে রুটি তৈরী করে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তির করতালি সেই ছবিটিই তোতাপুরীর বিদ্রূপপূর্ণ মনে এনেছিল। উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, 'দূর শালা। আমি ঈশ্বরের নাম করছি, আর তুমি কি না বলছ—আমি রুটি ঠুকছি!' এই ব্রহ্মজ্ঞ তোতার ব্রহ্মকে কিভাবে পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে কাঁদতে হয়েছিল, সারদানন্দ তার বিবরণ দিয়েছেন। বাংলা দেশের জলবায়ু তোতাপুরীর শরীরকে জীর্ণ করে দিয়েছিল, অজীর্ণের আক্রমণে। দেহের যন্ত্রণা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল, যাতে সমাধিবান তোতাপুরীর মনও সমাধিভূমি থেকে স্খলিত হয়ে 'হাড় মাসের খাঁচায়' নেমে এসেছিল। প্রচণ্ড শক্তিধর অভিমানী এই পুরুষ মনের পতনের জন্য গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দেওয়াই স্থির করলেন। তারপর—

"ন্যাংটা বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর ভাগীরথী কি আজ সত্যসত্যই শুষ্কা হইয়াছেন? অথবা তোতা তাঁহার মনের ভিতরের ছবির বাহ্য-প্রকাশে ঐরূপ দেখিতেছেন? তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন, তথাচ ডুব-জল পাইলেন না। ক্রমে যখন রাত্রির ঘনান্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'এ কী দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! এ কী ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা মা মা, বিশ্বজননী মা; অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা। শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই।...

গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপূরিত চিত্তে জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত বিরাট রূপের দর্শন করিতে করিতে গম্ভীর অম্বুরবে দিকসকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন, এবং আপনাকে তৎপদে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি জল ভাঙিয়া ফিরিয়া চলিলেন।...

প্রভাত হইলেই ঠাকুর তোতার শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিতে আসিয়া দেখেন যেন সে মানুষই নয়! মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, হাস্য-প্রস্ফুটিত অধর, শরীরে যেন কোনো রোগই নাই। তোতা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে পার্শ্বে বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে রাত্রের সকল ঘটনা বলিলেন। ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'মাকে যে আগে মানতে না, আমার সংগে যে শক্তি মিথ্যা, ঝুট্ বলে তর্ক করতে। আমাকে তিনি পূর্বেই বুঝিয়েছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তাঁহার দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি!'

[লীলাপ্রসঙ্গ—প্রথম ভাগ]

এই সমস্ত অভিজ্ঞতাটিকে নিজের উপর তুলে নিয়ে সুগভীর রসিকতা করে স্বামীজী বলতেন, শরীর ভাল থাকলে ব্রহ্মচিন্তা করি, পেট কামড়ালে মা ডাকি।

যাওয়ার জন্য বিশ্বচ্ছন্দ কত সহজ সুরে তাঁর কণ্ঠে বাজতে পেরেছিল। এই বিষয়েই সেখানে নিবেদিতা আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখার জন্য তাঁর সব কথাই নিবেদিতার কাছে শ্রুতি, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃচেতনাকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। যে-কালী পূর্বে শুধু শোনা কথায় ছিলেন, তিনিই বিবেকানন্দ-মারফৎ যখন প্রত্যক্ষ অস্তিত্বে ঝলসে উঠলেন, তখন সেই অভিজ্ঞতাকে জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য বলে নিবেদিতা নমস্কার করলেন। সে নমস্কার অব্যাহত রইল জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত এবং তাঁর অমর লেখনীর মধ্য দিয়ে বিস্তারিত হল ভাবী কালে।

বিবেকানন্দের কালীকে নিবেদিতা কিভাবে দেখলেন, তার কয়েকটি ক্রমিক খণ্ডচিত্র এবার আমরা উপস্থিত করব। অনেকগুলি সুগভীর ক্ষণের সাক্ষাৎ পাঠক ইতিপূর্বেই পেয়ে গেছেন নিবেদিতার পত্রাবলীতে। সেগুলি পুনরুদ্ধৃত না করে এখানে উল্লেখমাত্র করব।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ৩রা মে তারিখের একটি চিত্র *Wanderings* থেকে :

"আমাদের দুজন শ্রীমার বাড়ীতে তাঁর (স্বামীজীর) সাক্ষাৎ পেলেন। রাজনৈতিক গগন কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। দীর্ঘ-প্রত্যাশিত ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ার মুখে। সন্ধ্যায় উদিত চন্দ্রকে ঘিরে লোহিতাভ কুয়াশা। মহাঅমঙ্গলের সংকেত—চারদিকে কানাকানি। ইতিমধ্যেই প্লেগ, তার আতঙ্ক ও দাঙ্গার বিভীষিকা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত। আচার্যদেব আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'কিছু লোকে কালীর অস্তিত্ব নিয়ে তামাশা করে। মহাকালী আজ বেরিয়ে পড়েছেন জনগণের মধ্যে। পাগলের মত ভয়ে পালাচ্ছে তারা। সৈন্য ডাকতে হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে। কে বলে, ঈশ্বর শুভের মতই অশুভেও নিজেকে মেলে ধরেন না? কিন্তু শুধু হিন্দুই তাঁকে অশুভ রূপেও পূজা করতে সাহসী।"

১৮৯৮-এর মে মাসে নিবেদিতাদিকে নিয়ে স্বামীজী হিমালয় যাত্রা করেন। তার আগেই নিবেদিতা 'সম্ভবতঃ' কালীঘাট মন্দির দেখে এসেছেন। যদি সত্যই নিবেদিতা কালীঘাট দেখে আসেন, তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ খুশী হননি। ইউরোপীয়ের কাছে কালীর আকার এবং মন্দিরে বলিদান সাধারণভাবে আনন্দদায়ক না হওয়াই সম্ভব, তদুপরি সেখানকার ভাবাতিরেক। উল্টোপক্ষে স্বামীজী তাঁর কথায় ও আচরণে একটি বিরাট সত্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ধর্ম, শিব যার প্রতীক, আবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক হল শ্মশান—কালীই সেই মৃত্যুশ্মশান। স্পষ্টভাবে হোক, অস্পষ্টভাবে হোক, নিবেদিতার মন এই ভাবপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। ৬ই জুন তারিখে তাঁর ডায়েরীর অংশ :

"তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, ত্যাগের এই পতাকাই মহা-বিজয়ের পতাকা; চিরন্তনী বধূকে বিবাহের জন্য যাত্রাকালে আত্মার একমাত্র উপযুক্ত ভূষণ হবে দারিদ্র্য ও আত্মজয়। 'শুধু দাও'—জীবন তারি এক সুদীর্ঘ সুযোগ; যা নেওয়া হল—জীবনের সে অংশকে ব্যর্থ বলে অনুভব করো, দুঃখ করো তার জন্য। অনেক সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে তিনি যখন

একই ধরনের কথা আবার বলেছিলেন, তখন আমাদের মধ্যে একজন সাহস করে বলতে চেয়েছিলেন, যে-অনুভূতি তিনি জাগাতে চাইছেন, তা কি দুঃখ-পূজা নয়, য়ুরোপ যাকে মনোবিকার বলে ঘৃণা করে?

ঝলসে উঠেছিল উত্তর তৎক্ষণাৎ—'আর সুখের পূজাই বুঝি খুব মহৎ?' একটু থেমে তিনি যোগ করেছিলেন, 'কিন্তু আমরা সুখেরও পূজা করি না, দুঃখেরও নয়, আমরা চাই উভয়ের মধ্য দিয়ে সুখ-দুঃখের পারে যেতে।'

এবং ২০ জুনের ডায়েরীর অংশ :

"*শ্রীনগরের দিকে পৌঁছতে দুই তিন দিন গেল। একদিন সন্ধ্যায় আহারের* আগে ক্ষেতের উপরে আমরা বেড়াচ্ছি, আমাদের মধ্যে একজন কালীঘাট দেখে এসেছেন, তিনি আচার্যদেবের কাছে সেখানকার ভক্তির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন, তা বড়ই বিসদৃশ। 'প্রতিমার সামনে এমন-ভাবে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন'—কিছুটা জোরের সঙ্গেই তিনি বলেছিলেন। স্বামীজি সেইসময়ে একটি তিল ফুল দেখিয়ে (তাঁর মতে ইংলন্ডের 'dill' তিল থেকেই হয়েছে) বলছিলেন যে, এই হল আর্যদের আদিতম তৈলবীজ, কিন্তু প্রশ্নটি শোনামাত্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, হাত থেকে ছোট্ট নীল ফুলটি পড়ে গেল, কণ্ঠে নামল সম্ভ্রমের সঘন গভীরতা, বললেন—ঐ প্রতিমার সামনে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর এই পর্বতমালার সামনে সাষ্টাঙ্গ হওয়া— একই জিনিস নয় কি?"*

২৬শে জুনের ডায়েরী-নোটে পাই, নিবেদিতা প্রভৃতি স্বামীজীর সঙ্গে ক্ষীরভবানী দর্শন করেছিলেন :

"আচার্যদেব আমাদের ছেড়ে একাকী কোনো নির্জন স্থানে প্রস্থানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনোভাবের কথা না জেনে তাঁর সঙ্গে ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রস্রবণ দেখতে যাওয়ার জন্য আমরা জোর করেছিলাম। শুনলাম যে, আমরাই প্রথম খ্রীশ্চান বা মুসলমান সেখানে পদার্পণ করেছি। স্থানটির দর্শন করে আমরা কতদূর কৃতার্থ হয়েছিলাম, তা কিছুতে বর্ণনা করে উঠতে পারব না, কারণ পরবর্তীকালে এই নামটি আমাদের কাছে সকল নামের মধ্যে পবিত্রতম হয়ে দাঁড়াবে।" (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

---

* *নিবেদিতার এই রচনাংশের উপর নির্ভর করেই আমি সতর্কতার সঙ্গে বলেছি,* তিনি সম্ভবতঃ আগেই কালীঘাট দেখেছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর বইয়ে কিন্তু স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'কলিকাতায় প্রথম আগমনের পরেই নিবেদিতা কালীঘাটে গিয়াছিলেন।' তাঁরও উৎস বোধহয় একই। যদি তিনি নিবেদিতার ডায়েরী থেকে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন, তাহলে ভিন্ন কথা, নচেৎ নিবেদিতার উদ্ধৃত রচনা থেকে একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, কালীঘাটে ভক্তদের ভাবাতিরেক সম্বন্ধে অভিযোগ তিনিই করেছিলেন, ওলি বুল বা ম্যাকলাউড করেননি। মুক্তিপ্রাণার লেখার ভঙ্গিতে মনে হয়, এইসময়েই পশুবলির বিরুদ্ধে নিবেদিতা আপত্তি করেন, এবং স্বামীজী তার উত্তর দেন। এই বিষয়টির উৎস 'আচার্যদেব' গ্রন্থ, সেখানে কিন্তু লেখা নেই কখন স্বামীজীর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমাদের ধারণা, ঐ আলোচনা হয় পরে কলকাতায়, কালীঘাট মন্দিরে নিবেদিতার বক্তৃতার কিছু আগে।

ক্ষীরভবানী নামটি কেন সকল নামের মধ্যে পবিত্রতম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার হেতু পাঠকগণ জেনেছেন, যাঁরা 'নিবেদিতার পত্রে স্বামীজী' অধ্যায়টি পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে পুনরায় আসার আগে আরও কিছু তথ্য দেওয়া যাক। মাতৃসঙ্গীতে স্বামীজী এইকালে কি রকম বিভোর থাকতেন, তার পরপর কিছু নমুনা দিচ্ছি।

২১শে জুন স্বামীজী প্রচুর ভারতীয় কবিতা ও গান শোনান, তার মধ্যে এই গানটিও ছিল :

এসো মা, এসো মা, ও হৃদয়রমা, পরাণ পুতলী গো,
হৃদয়-আসনে হও মা আসীনা, নিরখি তোরে গো।
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,
জান গো জননী কি যাতনা সয়ে,
একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো।

[Be seated, Mother, on the lotus of my heart,
And let me take a long long look at you.
From my birth up, I am gazing,
Mother, at your face—
Know you suffering what trouble, and pain?
Be seated, therefore, Blessed one
On the lotus of my heart,
And dwell there for evermore.]

১৬ই জুলাইয়ের ডায়েরীতে পাই :

"পরদিন স্বামীজীর সঙ্গে নদীপথে একটি ছোট নৌকার যাত্রার ভাগ্য ঘটল তাঁর এক শিষ্যার। যাত্রাপথে তিনি একের পর এক গেয়ে চললেন রামপ্রসাদের গান, এবং প্রায়ই সেগুলির অনুবাদ শোনালেন :

ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা,
(আমি) তবু কালী বলে ডাকি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা।

[I call upon Thee Mother.
For though his Mother strike him,
The child cries, 'Mother! Oh Mother!']

মন কেন রে ভাবিস এত,
যেন মাতৃহীন বালকের মত।

[Though I cannot see Thee,
I am not a lost child!
I still cry 'Mother! Mother!']

এবং তারপরে ক্ষুপিত শিশুর গর্ব ও অভিমান-ভরা একটি শেষের ছত্র :

আমি তেমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব।

[I am not the son to call
Any other woman 'Mother!']

২০শে জুলাই নানাদেশের ধর্মশাস্ত্রের পাপতত্ত্ব নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করেন, যার সঙ্গে কালীতত্ত্বের যোগ আছে দেখা যাবে :

"সেদিন সকালের প্রশস্ত নদী অগভীর ও স্বচ্ছ। নদীর ধারে ক্ষেত্রে উপর দিয়ে আমাদের দুজন স্বামীজীর সঙ্গে প্রায় তিন মাইল বেড়িয়েছিলেন। 'পাপবোধ' নিয়ে তিনি কথা আরম্ভ করেছিলেন। মিসরীয়, সেমিটিক ও আর্যদের মধ্যে পাপবোধ কিরকম তা বলেছিলেন। বেদে তা এসেই দ্রুত অন্তর্হিত। শয়তান সেখানে ক্রোধের অধীশ্বররূপে স্বীকৃত। বৌদ্ধদের মধ্যে পরে তা হল কামের অধীশ্বর 'মার'। বুদ্ধের সর্বপ্রিয় আখ্যার একটি—'মারজিৎ'।......কিন্তু শয়তান একেবারে বাইবেলের হ্যামলেট। বৈদিক ক্রোধের অধীশ্বর কিন্তু কখনো (বাইবেলের মত) সৃষ্টিকে দুভাগে ভাগ করে ফেলেনি। সে সর্বদাই অপবিত্রতার প্রতিভূ, কদাপি ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী দ্বৈতত্ত্বের প্রতিনিধি নয়।

জরথুষ্ট্র প্রাচীনতর এক ধর্মের সংস্কারক। তাঁর মতে অর্মাজ্‌দ্‌ এবং আহ্রিমান পর্যন্ত পরম শক্তি নন, পরমের বিকাশ মাত্র। ঐ প্রাচীনতর ধর্ম বৈদান্তিক না হয়ে যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মিশরীয় ও সেমাইটগণ পাপবাদ আঁকড়ে ছিল বা আছে, অপরপক্ষে আর্যগণ, যথা ভারতীয় ও গ্রীকগণ তা দ্রুত ছেড়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষে ন্যায় হয়ে দাঁড়াল 'বিদ্যা' এবং অ-ন্যায় বা পাপ—'অবিদ্যা।' এই দুইকেই অতিক্রম করতে হবে। আর্যদের মধ্যে পারসিক ও ইউরোপীয়রা ধর্মধারণায় সেমিটিকে ভাবকে গ্রহণ করে, তার ফলে তাদের মধ্যে পাপবোধের প্রাধান্য ঘটে।"

কালী বা মৃত্যুপূজারী বিবেকানন্দের একটি উদ্দীপ্ত মুহূর্তের আত্মউন্মোচনকে পাই ২০শে জুলাইয়ের ডায়েরীতে :

"সেদিন আসন্ন সন্ধ্যাকালে আপেল গাছের তলায় উপবিষ্ট ক্ষুদ্র দলের মধ্যে একজন (নিবেদিতা) হাজির হয়ে দেখলেন, বিরল ব্যাপার—আচার্যদেব নিজের বিষয়ে বলছেন ধীরামাতা ও জয়াকে। দু'টুকরো পাথর তুলে নিয়েছেন হাতে, বলছেন—যখন সুস্থ থাকেন, তাঁর মন এটা-ওটা নিয়ে থাকতে পারে, ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল হতে পারে কিছুটা, 'কিন্তু সামান্য পীড়া বা যাতনা আসুক দিকি, মৃত্যুর আভাস যদি পাই ক্ষণেকের জন্যও, তাহলে'—হাতের পাথর দুটো সজোরে ঠুকে বললেন—'তাহলে আমি এমনই কঠিন হয়ে যাই, **কারণ আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি।'"**

(স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

এর পরেই নিবেদিতার জীবনের চরম সৌভাগ্যের ঘটনা, জুলাইয়ের শেষে স্বামীজীর সংগে অমরনাথ যাত্রা এবং ২রা অগস্ট অমরনাথের তুষারবিগ্রহ দর্শন এবং চিন্ময় অমরনাথের দর্শনপ্রাপ্ত বিবেকানন্দের আলোকিত রূপ দর্শন। এই সময়ে স্বামীজীর দিব্যরূপের কথা আগেই আমরা বিস্তারিত দিয়ে এসেছি (৭ অগস্টের নেল হ্যামণ্ডকে লেখা চিঠি ও 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' এবং 'আচার্যদেব' গ্রন্থ)। নিবেদিতাকে স্বামীজী নিয়ে গিয়েছিলেন শিবের কাছে উৎসর্গ করার জন্য, এবং নিবেদিতা নেল হ্যামণ্ডকে লিখেছেন, 'তিনি সত্যই আমাকে উৎসর্গ করেছেন শিবের কাছে।' নিবেদিতা অধিকন্তু বিবেকানন্দকে এখানে শিব-সান্নিধ্যে দর্শন করেন, কয়েক মাস আগে নিজ দীক্ষাকালে তাঁর শিব সাজ দেখেছিলেন, এবং অনুভব করতে থাকেন—বিবেকানন্দ শিবের অবতার। এই বোধের সংগে নিবেদিতার কালী-বোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

শৈব বিবেকানন্দ কয়েকদিনের মধ্যেই শাক্ত বিবেকানন্দ হলেন। কেন হলেন তার গূঢ় আধ্যাত্মিক হেতু নিবেদিতা তাঁর মহনীয় ভাষায় বিবৃত করেছেন 'আচার্যদেব' গ্রন্থের 'ক্ষীরভবানী' অধ্যায়ের সূচনায় :

> "অমরনাথ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জীবনের সবকিছু শিব-ভাবনার সংগে জড়িত ছিল। প্রতি পদক্ষেপ আমাদের নিকটবর্তী করেছে সুমহান তুষার পর্বতমালার, যা তাঁরই সাক্ষাৎ প্রতিমা, তাঁরই ভবন। রাত্রি নামলে নবীন চন্দ্র যখন উদিত হত ঢালু হিমবাহের শীর্ষে, বাতাস মাতামাতি করত আরণ্য দেবদারুতে—অনিবার্যভাবে মনে হত দেখছি মহাদেবের ললাটচ্ছবি।* সর্বোপরি, যে-ধ্যানরাজ্যের বহির্দেশে অবস্থিত ছিলাম আমরা, তার হৃদয়-কেন্দ্রে বিরাজিত ছিলেন স্বয়ং যোগেশ্বর—নীরব-শান্ত, সমাহিত, গুণাতীত, বাক্যমনাতীত। নিঃসন্দেহে, হিন্দু-কল্পনার এই শিব, মানবপ্রজ্ঞার পক্ষে সর্বোচ্চ-সম্ভব ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা। সর্বোপাধিবর্জিত অথচ হৃদয়গম্য ঈশ্বর তিনি।
>
> চরম জ্ঞানের অন্বেষণে, অব্যক্তের উপর ব্যক্তিভাবের আরোপ করলে ঈশ্বর-বিষয়ক অপর ধারণাটি অনিবার্য হয়ে পড়ে—এই সকল ব্যক্ত-রূপের অন্তরালে অবস্থিত শক্তিও ঈশ্বরই। যে-ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এই দুই ধারণার গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন, তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের সকল প্রতীকের তাৎপর্য অনুধাবনে সমর্থ হবেন, কারণ সকল প্রতীকই উভয়ের (শিব ও শক্তি প্রতীকের) যে-কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হবেই। পরব্রহ্মকে যদি মানুষ চিন্তার অধীন করতেই চায়, তাহলে হয় অনাদি অনন্ত পুরুষরূপে বা অনাদি অনন্ত শক্তিরূপে, যে-কোনো ভাবে চিন্তা করতে হবে। ব্যাপারটির অন্তরালে কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম আছে কিনা, তা অনুমানের বিষয় হয়ে থাকবেই। যাই হোক, কোনো অজ্ঞাত কারণে অগস্ট মাসের মধ্যেই স্বামীজীর চিত্ত শিব থেকে সরে গিয়েছিল শক্তির দিকে। সর্বদাই রামপ্রসাদের গানগুলি তিনি গাইছিলেন,

---

* উৎকৃষ্ট কল্পনা : শুভ্র হিমবাহ শিবললাট, শিহরিত দেবদারু তাঁর জটাবন্ধন এবং নবোদিত তরুণ চন্দ্র—চন্দ্রশেখরের শিরশ্চন্দ্র।

> যেন নিজের মনকে শিশু-ভাবনায় ভরিয়ে তুলতে চাইছিলেন। আমাদের একজনকে একবার বলেছিলেন, যেদিকে তাকাচ্ছেন, সেদিকেই দেখছেন মা —মা যেন ঘরেই রয়েছেন, ঘরেরই মানুষ। খুব সহজে, স্বাভাবিকভাবে 'মা' বলে ডাকবেন। সে ভাবটি আমাদের দলের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল যে, বয়স্কদের মধ্যে কেহ কেহ একই ভাবে বলতেন, 'মার ইচ্ছা মাই জানেন,' যখন প্রিয় কোনো অভিপ্রায় পরিহার করার প্রয়োজন হত।
>
> ক্রমে তাঁর ভাবতন্ময়তা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। চিন্তাব্যাধি, আগুনের মত যা পুড়িয়ে মারে মানুষকে, শান্তি দেয় না, স্বস্তি দেয় না, নিদ্রা কেড়ে নেয়, মানবকণ্ঠ নিয়ে যেন ক্রমাগত উত্যক্ত উৎপীড়িত করে তোলে —এর বিরুদ্ধে তিনি তিক্ত ভাবে অভিযোগ করতে লাগলেন। আমাদের কাছে ইতিপূর্বে তিনি *অবিরত দুই বিরোধী সত্তা—সুখ ও দুঃখ, ভাল ও মন্দ*—এদের উপরে উঠবার আদর্শকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন, এইভাবেই হিন্দুরা পাপবোধ-সমস্যার সমাধান করেছে, কিন্তু এখন তিনি তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পৃথিবীর যন্ত্রণাদায়ক, দুর্বোধ্য, অন্ধকার দিকটির উপর; তাঁর প্রতিজ্ঞা, এই বিশেষ পথে জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালবর্তী সত্যকে লাভ করবেন।"

স্বামীজি অতঃপর একাকী গিয়েছিলেন ক্ষীরভবানীর শক্তিতীর্থে। যখন ফিরেছিলেন, তখন তাঁর সেই 'পরিবর্তিত উদ্দীপিত, দিব্যরূপ' দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছিল স্বয়ং ঈশ্বর। এই আবির্ভাবের বিষয়ে বলতে 'আমার লেখনী যেন মর্মরিত স্বরে কথা বলতে শেখে', 'দূরে সরে গিয়ে নীরবে পূজা করাই একমাত্র কর্তব্য'—মনে হয়েছিল নিবেদিতার। পাঠকগণ এই অপূর্ব ক্ষণের সাক্ষাৎ পূর্বেই পেয়েছেন তাঁর পত্র মারফৎ, এবং ক্ষীরভবানী যাত্রার পূর্বে রচিত 'কালী দি মাদার' কবিতাটির পটভূমিকাকেও, যে-কবিতাটি স্বামীজীর 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি।'

'কালী দি মাদার' কবিতায় উদ্ঘাটিত ভয়ংকরীর রূপ* এবং ক্ষীরভবানী প্রত্যাবৃত্ত *বিবেকানন্দের রূপ—নিবেদিতার দার্শনিক* সংশয়কে নিবৃত্ত করে দিল চিরদিনের জন্য। বিষয়টি আর সংশয়ের, জিজ্ঞাসার মধ্যে নেই, সাক্ষাতের স্তরে এসে গেছে। সাক্ষাৎ সত্যকে নিবেদিতা প্রত্যাখ্যান করবেন কি করে? *কালীকে* গ্রহণ না করে উপায় রইল না। দার্শনিক বিবেকানন্দ যা করতে পারতেন না, আধ্যাত্মিক

---

* বিবেকানন্দ-নিবেদিতার মহাকালীর উপরে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীনারায়ণী দেবী 'নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে।' বিবেকানন্দ যে-মহাকালীকে ধ্যানে দেখেছেন ও ভাষায় বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন, তার সম্ভাব্য উৎস সম্বন্ধে লেখিকা আলোচনা করেছেন। বাঙালী চিরদিন শক্তি উপাসনা করলেও "স্বামীজীর এই প্রলয়ঙ্করী মহাকালীকে বাঙালী চেনে কি? তার শ্যামাসঙ্গীতে ঠিক এ ধরনের রৌদ্ররস কোথায়?"—লেখিকার প্রশ্ন। তিনি বলেছেন—"'করালী', 'কপালিনী' বলে বিশেষণ যতই থাক—মায়ের 'সদানন্দময়ী', 'মনোমোহিনী', 'সুধাতরঙ্গিণী' রূপই আসলে আমাদের মন ভুলিয়েছে। সাধকাগ্রগণ্য রামপ্রসাদের লেখাতেও বিবেকানন্দের মহাভীমা রুদ্রাণীকে আমরা পাই না। কথামৃত-তে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কত কালীকীর্তন ধরা রয়েছে, কোনোটিতেই কি 'কালী দি মাদারে'র অনুরূপ ছবি পাই? তাহলে এই কালিকাকে বিবেকানন্দ পেলেন কোথায়? এ কি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি?" (পরের পাতায়)

বিবেকানন্দ তাই পারলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নিবেদিতার যে নব বিশ্বাসের সূত্রপাত হল, এই প্রাপ্ত বিশ্বাসের সমর্থনে পরবর্তীকালে দার্শনিক বা অন্যবিধ যুক্তি সংগ্রহের চেষ্টামাত্র করবেন, এবং সেই বিশ্বাসকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়াসও পাবেন, যজ্ঞসিদ্ধি কিন্তু পূর্বেই ঘটে গিয়েছে। নিবেদিতা তাই এইকালের বিবেকানন্দকে নমস্কার করে বলেছিলেন :

> নব বিশ্বাসের উদয়ক্ষেত্র দেখেছি,
> দেখেছি বিশ্বাসের জন্মদাতা পুরুষকে।

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নারায়ণী দেবী বলেছেন, 'তা কিন্তু নয়।'—"সপ্তশতীতে চণ্ডিকার ভ্রূকুটিকুটিল ললাট হতে আবির্ভূতা চামুণ্ডার যে বর্ণনা আছে, স্বামীজীর 'টেয়ার ইজ দাই নেম' বলে সম্বোধিতা দেবীর আদি প্রভব তিনি।" এই প্রসঙ্গে লেখিকা 'কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী', 'কালী করালবক্ত্রান্তর্দর্শিতদশনোজ্জ্বলা', 'নিনাদৈভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা' প্রভৃতি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। "চামুণ্ডার ধ্যানে পাই, 'দংষ্ট্রা কোটি বিসংকটা' এই দেবী 'সান্দ্রান্ধকারে স্থিতা।' স্বামীজীর লেখাতেও ঘনান্ধকার ঝড়ের তাণ্ডব, ঘূর্ণিবাত্যায় গর্জে ফিরছে প্রমত্ত প্রেতপিশাচপাল।...(স্বামীজীর কবিতার The flash of lurid light ইত্যাদি অংশ) পড়লে আবার যেন চণ্ডীর ভয়াবহ পটভূমিই ভেসে ওঠে সামনে। নবমাতৃকার কর-নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশি বিদ্যুৎ-ঝলকে ঝলসে উঠছে মুহুর্মুহু। আর মহাঝটিকার মত রক্তবীজের পিছনে তাড়া করে ফিরছেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণা চামুণ্ডা। 'মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্'—অসুরের ক্ষতস্থান হতে লোলরসনায় রক্ত শুষে নিচ্ছেন কালিকা। প্রতি রক্তবিন্দু হতে যে-সব প্রাণী জন্মাচ্ছে, রাক্ষসীর মত করাল দংষ্ট্রায় দেবী চর্বণ করে চলেছেন তাদের। চণ্ডীর এ চিত্র আবার মেলে গীতার একাদশ অধ্যায়ের (বিশ্বরূপ দর্শনের) সঙ্গে।" লেখিকার এক্ষেত্রে শেষ প্রশ্ন, যার উত্তরও প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত—"কালী দি মাদারের ধ্যানের উৎস তাহলে চামুণ্ডা আর গীতার মহাকাল বিগ্রহ?"

আলোচনাটি চমৎকার। স্বামীজীর দৃষ্ট কালিকামূর্তির তুলনামূলক বিচারকালে শাক্তসাহিত্য এবং ভারতীয় সাহিত্যের অন্যত্র উদ্ঘাটিত ভয়ঙ্করীর বিভিন্ন বর্ণনার কথা মনে আসবেই। লেখিকারও এসেছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন এখানে থেকে যায়—সাধক কি কেবল ঘোর বস্তুকেই দর্শন করেন? তা যদি হয়, তাহলে ব্যাপারটা বহুলাংশে কল্পনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বিবেকানন্দও কি তীব্র অনুভূতিযোগে তাঁর ধ্যান বা কল্পনা-বস্তুকে জীবন্ত দেখেছিলেন? সেক্ষেত্রে দেবদেবীর অস্তিত্ব ব্যাপারটি প্রশ্নাধীন হয়ে পড়ে। অদ্বৈতবাদী আপত্তি করবেন না, কিন্তু দ্বৈতবাদী? এই কবিতাটি লেখার কাছাকাছি সময়ে স্বামীজী কিন্তু বলেছিলেন—দেবদেবীরা মিথ্যা নন, সত্য। সুতরাং আমাদের পক্ষে সহজ গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হল—ভয়ঙ্করী মহাকালী অনেকটা একইভাবে সাধকচিত্তে আবির্ভূত হন, এবং উপলব্ধিপ্রাপ্ত মানুষ নিজস্ব দর্শনাদির বর্ণনাই করেন, যে-বর্ণনা অন্যের বর্ণনার অনেকটা অনুরূপ হতে পারে।

এখানে আমরা আরও কিছু কথা যোগ করে দেব। বিবেকানন্দের বর্ণনাকে দুই দিক দিয়ে বিচার করা সম্ভব। এক সাহিত্যিক বিচার—সে বিচার আমরা আগে করেছি, বলেছি যে বিবেকানন্দের বর্ণনার একমাত্র তুলনাস্থল হতে পারে গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা—গীতার বর্ণনার সঙ্গে স্বামীজীর বর্ণনার তফাতের কথাও আমরা বলে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ ভাবের দিক দিয়েও 'চণ্ডী' প্রভৃতির বর্ণনার সঙ্গে স্বামীজীর বর্ণনার কিছু প্রভেদ আছে। কেবল ভয়ঙ্করকে দর্শন বা ভয়ঙ্করতার দিক দিয়ে তার বর্ণনা বিবেকানন্দের অভিপ্রায় ছিল না—তিনি কেবল মহাকালীর রূপ আঁকতেই চাননি—গভীর আনন্দে, প্রেমে তাঁকে দেখেছেন—বরণ করেছেন। এ জিনিস আগেও বিক্ষিপ্তভাবে ধর্মসাহিত্যে ছিল—কিন্তু বিবেকানন্দেই তার পূর্ণতা। এইজন্য স্বামীজীর এই দৃষ্টিকে ভক্তের—সন্তানের—দৃষ্টি বলতে নিবেদিতা রাজী হননি,—এ দৃষ্টি স্বয়ং শিবের।

কালী-বক্তৃতা

প্রথম কালী-বক্তৃতার পটভূমিকা

নিবেদিতা যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন তাঁর মনে আছে স্বামীজীর সান্নিধ্যে কাটানো এমন কিছু সময়ের স্মৃতি 'যার উজ্জ্বল বিভায় সমগ্র ভাবিকা জীবন অতিবাহিত হবে,' এবং তাঁর কাছে 'সকল নামের মধ্যে পবিত্রতম নাম ক্ষীরভবানী।' নিবেদিতা কালীকে মেনে নিয়েছেন, কারণ কালীকে পেয়ে গিয়েছেন। অতঃপর সেই চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটি ঘটল। কলকাতার প্রকাশ্য জনসভায় নিবেদিতা কালী-উপাসনার বিষয়ে বক্তৃতা করলেন।

পটভূমিকাটি কিছু বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করা দরকার।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে নিবেদিতা ভারতে আসার পরে কিছু-দিনের মধ্যেই ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিষয়ে অল্পবিস্তর লেখা আরম্ভ হয়। *Viveckananda in Indian Newspapers* গ্রন্থে ঐসব লেখা যথাসম্ভব সংগৃহীত হয়েছে। নিবেদিতা এইসব লেখার জন্য ভারতের, বিশেষতঃ কলকাতার শিক্ষিত সমাজে নামতঃ পরিচিত হয়ে ওঠেন।

নিবেদিতা যখন প্রথম এলেন, তাঁর আগমন স্বামী বিবেকানন্দের আশ্চর্য কীর্তির দৃষ্টান্তরূপেই গৃহীত হয়েছিল। পরাধীন দেশের একজন মানুষ প্রভু-জাতির ভিতর থেকে শিষ্য সংগ্রহ করেছেন, যিনি এদেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করে এখানে শিক্ষা-বিস্তারে আত্মনিয়োগ করবেন—এই ঘটনার চমৎকারিত্বই সংবাদপত্রের সংবাদবিষয় হয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রথম পর্যায়ের সংবাদগুলি মূলতঃ অভ্যর্থনাসূচক এবং নিবেদিতার পরিচয়মূলক। পরিচয়-প্রসঙ্গে জানানো হয়, নিবেদিতা স্বামীজীর অবর্তমানে ইংলণ্ডে বেদান্ত-আন্দোলন সজীব রেখেছিলেন, এবং তিনি 'প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্' (ইণ্ডিয়ান মিরার ৮ ফেব্রুয়ারী)।

এর পরেই নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ফিরে আসার পরে, ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়া থেকেই ঠিক ঠিক ভাবে নিবেদিতার ভারতীয় কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মসমাজীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাতও এই সময় থেকে।

১৮৯৮-এর শেষ ভাগে নিবেদিতার স্কুল আরম্ভ হয়। স্কুলের কাজ ছাড়াও তিনি নানা স্থানে, যথা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশনে এবং এক মিশনারী প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষামূলক বক্তৃতাদি করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে নিবেদিতার সঙ্গে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ঘটে যায়। এবং তাঁর বিদ্যা ও ব্যক্তিত্বের বিষয়ে সম্ভ্রমের সূত্রপাতও হয়।* এই সময়েই ঐ চাঞ্চল্যকর সংবাদটি ঘোষিত হল—নিবেদিতা অ্যালবার্ট হলে কালীর বিষয়ে বক্তৃতা করবেন।

---

* নিবেদিতার ব্রাহ্মসংযোগ বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হবে, যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী প্রভৃতির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিবরণ দেব।

কালীর বিষয়ে বক্তৃতা—শিক্ষিত ভারতের রাজনৈতিক এবং 'সাংস্কৃতিক' রাজধানী কলকাতার বুকের ভিতরে—সে বক্তৃতা করবেন ইংরাজ মহিলা!! কলকাতার 'সুশিক্ষিত' বিবেক শিহরিত ও আতঙ্কিত। সে আতঙ্ক নিশ্চয় উপভোগ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কারণ ঐ বক্তৃতাটি আসলে বিবেকানন্দের চ্যালেঞ্জ—সংস্কারপন্থী, একেশ্বরবাদী, মিশনারী ও ইঙ্গ-ভাবাপন্ন ভারতীয়দের কাছে। ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজার বিরোধী, বিশেষতঃ কালীমূর্তির। মিশনারীরা রাশি রাশি গ্রন্থ ছেপে আর কিছু না পারুন, শিক্ষিত ভারতবাসীর একাংশের মনে বিদ্বেষ-সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন, (আমরা ডাঃ মর্ডকস্ লিখিত একটি কুৎসাগ্রন্থের কিছু চিত্র এ প্রসঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করেছি)। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস কালীসাধনায় সিদ্ধ (বিস্ময়ের কথা, ব্রাহ্মসমাজের গুরু রাজা রামমোহনও তান্ত্রিক, এবং কেশবচন্দ্র সেন জীবনের শেষ পর্যায়ে মাতৃভাবনায় ব্যাকুল)* এবং বিদ্রোহী অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দকে কালীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিলই। ভারতীয় ধর্মজীবনেও কালী-সাধনা ওতপ্রোত। বিবেকানন্দের মনে হয়েছিল, মিশনারী-পন্থায় কালীকে অগ্রাহ্য

---

* মিশনারী মর্ডকস্ তাঁদের মিশনারী নীতিতে জগন্নাথ, কালী ও গণেশের রূপচর্চা করার পরে রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্তলিকতা-বিরোধী উক্তি উদ্ধার করেছেন। এই দুইজনের কথা বিশেষভাবে হাজির করার কারণ মার্ডকসের মতে এঁরা হলেন, 'The two most distinguished Indians of modern times'. হিন্দু-ধর্মের নিন্দাকারী রামমোহন-কেশবচন্দ্র অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ভারতীয়, কিন্তু জানি না রামমোহনের শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে মার্ডকস্ সাহেবের কাছে বজায় ছিল কিনা যখন তিনি খ্রীস্টতত্ত্বকে নানা স্থানে আক্রমণ করেছিলেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের আবেগপূর্ণ বক্তব্য কিছুটা উদ্ধৃত করছি মার্ডকসের বই থেকে, পাঠকের কাছে এটি আকর্ষণীয় লাগবে কেশবের পরবর্তী রূপান্তরের ইতিহাস মনে রাখলে :

"There can be no doubt that the root of all the evils which afflict Hindu Society, that which constitutes the chief cause of its degradation is idolatry. Idolatry is the curse of Hindustan, the deadly canker that has eaten into the vitals of native society. It would be an insult to your superior education to say that you have faith in idolatry, that you still cherish in your hearts reverence for the gods and goddesses of the Hindu pantheon, or that you believe in the thousand and one absurdities of your ancestral creed. But however repugnant to your understanding and repulsive to your good sense the idolatry of your forefathers may be, there is not a thorough appreciation of its deadly character on moral grounds. It will not do to retain in the mind a speculative and passive disbelief in its dogmas, you must practically break with it as a dangerous sin and an abomination: you must give it up altogether as an unclean thing. You must discountenance it, discourage it, oppose it, and hunt it out of your country. For the sake of your souls and for the sake of the souls of the millions of your countrymen, come away from hateful idolatry, and acknowledge the one Supreme and true God, our Maker, Preserver, and Moral Governor, not in belief only, but in the every-day concerns and avocations of your life." (Contd. to next p.)

করার মধ্যে আছে আত্মঅবমাননা এবং সেই হীনমন্যতার বিরুদ্ধে তিনি আঘাত করতে চাইলেন। ইংরেজ মহিলা কালীর পক্ষে বক্তৃতা করবে, এইটাই বিবেকানন্দের সহাস্য ও সুগভীর প্রতিঘাত।*

নিবেদিতার এই বক্তৃতা কতখানি আলোড়ন ঘটিয়েছিল, তার বিষয়ে ডঃ যদুনাথ সরকার বলেছেন—

"আপনারা আজ অনুমানও করতে পারবেন না কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিবেদিতার বক্তৃতার বিষয় শুনে কি রকম আঁতকে উঠেছিল। কালী সম্বন্ধে একটা অতীব স্থূল ধারণা তখন, কালীঘাট-মন্দির থেকে সেই ধারণার সৃষ্টি, কেননা সেখানে প্রতিদিন শত শত পাঁঠাবলি হত এবং প্রাঙ্গণে মাংস-বিক্রয় হত, কসাইখানার মত। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ও পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার মনোজীবনে ছিলেন যুক্তিবাদী, অনেকটা নাস্তিকও বলা যায়, তিনি বলতেন, কারও কালীঘাটে যাওয়া বা কালীদর্শন করা উচিত নয়। বাস্তবিক নিবেদিতার বক্তৃতার কোনো সভাপতি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এন. এন. ঘোষ প্রথমে রাজি হয়ে পরে পেছিয়ে যান। নিবেদিতা অদম্য, তিনি বিনা সভাপতিতেই অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিলেন।"†

(প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯৪৩, জানুয়ারী)

নিবেদিতার বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজে বেরোয় ১১ই ফেব্রুয়ারী:

Miss Margaret E. Noble (Sister Nivedita) will deliver a lecture at the Albert Hall on Monday, the 13th February, at 6 p.m. Subject—"Kali-Worship." Miss Noble is already well-known amongst the educated public of the city who have no doubt will

---

এই উদ্ধৃতি সমাজসংস্কারকদের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের তিক্ত উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবে। স্বামীজী বলেছিলেন, সমাজসংস্কারকেরা নিন্দা-সাহিত্যের অতিরিক্ত বেশী কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি। মূর্তিপূজা কেন ত্যাজ্য, সে বিষয়ে রামমোহনের কয়েক কিছু যুক্তি ছিল হয়তো, কেশবচন্দ্র তার ধারে-কাছে বিশেষ যেতেন না। তাঁর ছিল সুন্দর ইংরাজীতে বিপুল উত্তাপ। মূর্তিপূজাকে যে-রকম পাপজনক বলে তিনি হাজির করেছেন এবং জাতির প্রাণশক্তির ক্ষয়কারী করে নির্দেশ করেছেন—এক্ষেত্রে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, কেশবচন্দ্রের উক্তির পরবর্তীকালে ভারতের শক্তিমানেরা মূর্তিপূজার ঘর থেকে এসেছেন, অন্ততঃ মূর্তিপূজাবিরোধীদের ঘরের তুলনায়। 'আমি যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পায়ের তলায় না বসতাম, কোথায় যেতাম'—বিবেকানন্দ বলেছেন, এবং কেশবচন্দ্রকেও সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পাদমূলে বসতে হয়েছিল (ভক্তিতে অথবা ভদ্রতায়)—ইতিহাসের এই বিচিত্র লীলা।

* এখানে বলা উচিত, স্বামীজী কদাপি নিবেদিতাকে কালী-বক্তৃতা করতে প্ররোচিত করেননি। এ ধরনের প্রচারে নিবেদিতারই বিশেষ আগ্রহ। তবে স্বামীজী যে রাজী হয়েছিলেন, সেটাই যথেষ্ট ব্যাপার এবং সেটাই প্রতিঘাত।

† বিনা সভাপতিতে অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার বক্তৃতা দেওয়ার কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সভাপতি একজন ছিলেন, কিন্তু বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন। পরবর্তী কালী বক্তৃতা নিবেদিতা সভাপতি ছাড়াই দেন। 'অকেজো সভাপতি' সম্বন্ধে নিবেদিতা চিত্তিত মন্তব্য করেছেন।

muster strong to hear an exposition of Hindu worship from the lips of an English lady, thoroughly imbued with Western Science and philosophy.

বক্তৃতার জন্য নিবেদিতা বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ৩ জানুয়ারীর এক পত্রে মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন :

> "৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমার জন্য অ্যালবার্ট হল নেওয়া হয়েছে। বক্তৃতার বিষয় কালী ও কালীপূজা। যা বলতে চাই তা লিখে ফেলে রাজার কাছে নিয়ে যেতে চাই, তিনি মূল ব্যাপারটায় (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ব্যাপারে) সাহায্য করবেন। আমার সর্বোচ্চ প্রার্থনা এই, কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে কালীপূজাকে সহানুভূতির আলোকে তুলে ধরতে যেন ব্যর্থ না হই।"
>
> (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

এই চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে, নিবেদিতা অন্ততঃ এক মাস আগে থেকে প্রস্তুত হয়েছেন। বক্তৃতার তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে আলাপও করেছেন। তবে ব্যাখ্যা-ভঙ্গি তাঁর সম্পূর্ণ নিজের।

৩০শে জানুয়ারী তিনি পুনশ্চ লিখলেন একই জনকে—

> "রবিবারে বোধহয় আমার কালী-বক্তৃতা। সময় এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস—সব জিনিসেরই যেমন সময় আছে। মিসেস বুল Blessed Sacrament-এর সময়ে ধ্যানকে যেমন ভালবাসেন—সেই জিনিসটি কালী-বক্তৃতায় তুলে ধরব।"

৪ ফেব্রুয়ারী বক্তৃতা হয়নি, হয়েছিল ১৩ ফেব্রুয়ারী, অ্যালবার্ট হলেই। হলে ঠাসা ভিড়, উপস্থিত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। মুক্তিপ্রাণা লিখিত নিবেদিতা-জীবনীতে পাই, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন ঠাকুর*, ব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্তও ছিলেন। এঁরা সবাই কিছু কিছু বলেন। মহিলাদের মধ্যে সরলা ঘোষাল ও মিসেস সালজারও ছিলেন। "ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, আমরা এইসব কুসংস্কার দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, আর তোমরা বিদেশীরা আবার সেইসব প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগেছ।" তখন দর্শকদের মধ্য থেকে একজন উঠে আবার ডাঃ সরকারের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন এবং হৈ-হৈ বেধে যায়। সভাপতি অসহায়; নিবেদিতাই উঠে গোলমাল নিবারণ করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে নিবেদিতা এই সভার বিবরণ দিয়ে ম্যাকলাউডকে লেখেন :

> "ভাল কথা, আমার কালী-বক্তৃতা হল সোমবারে। অ্যালবার্ট হল ঠাসা। প্রিয় বন্ধু ডাঃ সরকার (মহেন্দ্রলাল সরকার) আমার ও কালীর বিরুদ্ধে

---

* সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর? সমকালীন পত্রিকায় S. N. Tagore আছে।

বললেন; তাঁর দু'চোখ ভরা জল, ভারী মর্মস্পর্শী। এই সময়ে এক খ্যাপা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে নানা কথার সঙ্গে তাঁকে 'বুড়ো শয়তান' বলে সম্বোধন করলেন। তোমাকে বলতে সংকোচ হচ্ছে, ব্যাপারটার বিষয়ে যখনি ভাবি, হেসে বাঁচি না। স্বামীজী বস্তুত মহাখুশী।...ব্রাহ্মরা বলল, তোমার ও জিনিস কালী-পূজা নয়; সাধারণ লোকের নিম্নতম প্রবৃত্তিকে যা চঞ্চল করে, কালীপূজায় তাতেই শুধু সাড়া দেয়।...

যাইহোক, কালীঘাটের কর্তারা সেখানে কালী-বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে। স্বামীজী তাতে অতীব খুসী।...তিনি মনে করেন, এর দ্বারা গণ্ডীবদ্ধতার উপর প্রচণ্ডতম মার পড়বে।*

বলিদানের চরম কথাটা খুঁজে পেয়েছি; সেটা লিখে প্রকাশ করতে পারব কিনা জানি না। পশুবলি ততক্ষণই চলে, যে-পর্যন্ত না ভক্ত নিজেকে বলি দেবার মত মানসিক শক্তিসংগ্রহ করে উঠতে পারে, তারপর পেলিক্যানের† মতই নিজ রক্ত নিষ্কাশন করে তাতে পুষ্পার্পণ, মায়ের চরণখানি তার মধ্যে স্থাপন করে। এইভাবেই স্বামীজী এখন পূজা করছেন। আর এই জিনিসটি আমার কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে—সব কিছুর সমর্থন এনে দিচ্ছে। জানি না, এ বিষয়ে তুমি কি অনুভব করবে। স্বামীজী যখন ব্যাখ্যা করলেন, মনে হল, এতো সকলেরই জানা ব্যাপার, সবাই মেনে নেয় তত্ত্বটা।...

জানো কি, সোমবার রাত্রের প্রায় মুক্ত সংঘর্ষের পরে আমার যোদ্ধৃ-প্রবণতা পরিতৃপ্ত হয়েছে।

সভাপতি একেবারে অকেজো। যখনই সংকট ঘটেছে, আমি আসর নিয়েছি এবং শৃংখলা সম্পাদন নিজেই করেছি। মহা মজার ব্যাপার।

পরের বক্তৃতা *Young India Movement*, কোনো সভাপতি থাকবে না।"

তাহলে, কলকাতার শিক্ষিত মহলে নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা কিছু সময়ের জন্য একটা দারুণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এই বক্তৃতা যে-পরিমাণে নাড়া দিয়েছিল, ইংরাজী সংবাদপত্রে সেই পরিমাণে কিন্তু বিবরণ বেরোয়নি। তার কারণ, সংক্ষেপে, ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজী যে-ধরনের আপোষ-বিরোধী মনোভাব দেখান, তাতে তাঁর প্রবর্তিত কোনো আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ দেখাতে সংবাদপত্রগুলি প্রস্তুত ছিল না। (সে এক দীর্ঘ ইতিহাস, অন্য গ্রন্থে আলোচনা করেছি)। 'বেঙ্গলী' রাজনৈতিক পত্র, এইসব বিতর্কমূলক ধর্মীয় ব্যাপারে নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে

---

* এই প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষের বিপরীত ব্যবহারের কথা ওঠে। সে কথা মনে রেখেই স্বামীজী 'গণ্ডীবদ্ধতা' কথাটি বলেছিলেন। অল্প পরেই এ-বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

† বৃহৎ জলচর মোরগ-জাতীয় পক্ষীবিশেষ। পেলিক্যান-মুরগী নিজের ঠোঁট দিয়ে নিজের বুকে ক্ষত করে শিশুকে রক্তপান করায়।

করেছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' এই সময়ের ফাইল আমরা পাইনি। 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এর কালী-বক্তৃতার বিরুদ্ধে আপত্তি না থাকলেও কলকাতার ইঙ্গ-ভাবাপন্ন মহলের বিরোধিতা করতে এর সম্পাদক ভয় পেয়েছিলেন, তা ডাঃ যদুনাথ সরকারের কথায় দেখেছি। সম্পাদক যেখানে সভাপতি হতে স্বীকৃত হয়েও শেষে ভয় পেয়ে গররাজি হন, সেখানে তাঁর কাগজে বিবরণ থাকার কথা নয়। অপরপক্ষে অমৃতবাজারের নীরবতা আসলে প্রতিবাদ। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক অমৃতবাজার প্রেমতত্ত্বের প্রচারক হলেও শাক্তমতের দিকে সেই প্রেমকে প্রবাহিত করতে ঘৃণাবোধ করেছিল। শুধু তাই নয়, শাক্ত-বৈষ্ণবের পুরনো ঝগড়ার সূত্রপাতও করেছিল। ১২ জানুয়ারী, ১৮৯৯, তারিখে 'গৌরাঙ্গ সমাজে'র সেক্রেটারী 'বাবু রসিকমোহন চক্রবর্তী' অমৃত-বাজার পত্রিকায় কালী-দুর্গা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ যে পত্র লেখেন, কানাইলাল ঘোষাল ১৯ ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান মিররে তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। রসিকমোহনের অবলম্বিত রীতিকে ইনি খ্রীশ্চান মিশনারী কৌশলের অনুসৃতি বলেন। রসিকমোহনের ঐ ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষযুক্ত পত্রটি যে-পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে, সে পত্রিকা যে কালী-বক্তৃতাকে পাবলিসিটি দেবে না, সহজেই বোঝা যায়।

এইসব কারণে আমরা 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজের উদারতার প্রশংসা করতে বাধ্য। থিয়জফিস্টদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর প্রচণ্ড আক্রমণে ('আমার সমরনীতি' ইত্যাদি বক্তৃতায়) সবচেয়ে বেশী আহত হয়েছিল থিয়জফি-সমর্থক এই পত্রিকাটিই। তবু তাঁরাই নিবেদিতার বক্তৃতার সবচেয়ে বেশী প্রচার করেন। নিবেদিতার প্রশংসাসহ তাঁর বক্তৃতার যে বিজ্ঞপ্তি এ'রা ১১ ফেব্রুয়ারী প্রকাশ করেন, তা অল্প পূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি। তারপরে এ'রা হরিপাল-এর জনৈক শরৎচন্দ্র চৌধুরী লিখিত একটি দীর্ঘ পত্র ছাপেন, যাতে পত্রলেখক, ইংরেজ মহিলা কালীর বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন, এই সংবাদ পাঠ করেই হর্ষোচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়ান মিরার থেকে পত্রটি উদ্ধৃত করছি :

AN ENGLISH WOMAN ON KALI WORSHIP

[To the Editor of 'Indian Mirror']

Sir,—The news of Miss Margaret Noble (Sister Nivedita) an English lady, intending to deliver a lecture on the worship of Kali fills me with joy. Hitherto my belief was that, whatever foreigners might say or think about Hinduism must be confined to its Universal and Catholic side; a true appreciation and thorough insight into the worship of the particular forms of the Mother of the Universe shall remain, perhaps, a sealed book to them. And I had my reason to believe so. You will agree with me that when the worship of the *Isthadeva* (in any particular form of the Deity, vouchsafed to a particular worshipper) does not

dive deep into the reality, but ends in a mere lip-profession, it is hard even for a Hindu to realise what such a worship is. About six years ago (in Oct. of 1893), I remember to have gone to a pundit of acknowledged sanctity in the hope of getting explained certain expressions which I could not then understand. But a few preliminary words convinced me of the futility of my attempt. Our conversation appeared like one carried on between two persons speaking in two different languages, and I had the art to make the conversation drift on to subjects foreign to my purpose. If a Brahman of some reputation as a religious man can question the fact of a God or Goddess appearing to mortal eyes in the *Kaliyuga*, what can we expect from one who has never had even the faintest approach to the spiritual culture of the Hindus? But the anouncement of Miss Noble's lecture disillusionises me, and it is a joyful disillusion. The noble lady must be in a position to speak from personal experience, otherwise I can not persuade myself to believe, that a non-Hindu speaker, however favourably disposed towards Hinduism, would venture on so delicate a subject. The *three orders* and *seven ways*, laid down in *Tantras* for the worship of the Universal Mother, covers the whole field of humanity, and a *Mlechcha* is as much welcome to the doctrine as a Brahman.

But I venture to suggest, that a public meeting is not the place suited for recounting one's experiences of a spiritual nature. Readers of the *Tantras* know how secrecy is enjoined almost in every chapter, and that is not done without reason. The language of experience to the ears of theory or indifference is always ineffectual, and is likely to bring discredit to the speaker and the principles he teaches ; though such language bears immense fruits, when it proceeds from the holy lips of the *Guru* and falls into the willing ears of the believing disciple. Such recountings to be of any advantage must be before a limited and select audience who can properly appreciate them. One word will suffice for one who has experience of the matter, while a thousand volume will fail to convince one whose mind feeds on theories, and has not an iota of experience. There the speaker speaks, and the audience hears a language which is not bound down with cannons of grammar and rhetoric, but consists of sighs, tears and sounds only half-uttered.

Such utterences as, however, come from the noble lips of those foreigners who have interested themselves in the cause of Hinduism, should not be permitted to loose themselves in the air like momentary evanescence, nor to be solely enjoyed by the mere favoured residents of the Metropolis, but measures should be adopted to preserve these noble thoughts on the noble religion of the Hindus given expression to the noble language of England, and to bring them within the reach of the poorest student of that language.

Haripal, the 12th February,
1899

SARAT CHUNDER CHOWDHURI
Your etc.,

বক্তৃতা হয়ে যাবার পরে মিরারে ১৮ ফেব্রুয়ারী নিম্নের সংবাদ প্রকাশিত হল যাতে সভাস্থলে মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিবাদের উল্লেখ আছে, এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা আছে নিবেদিতার বাগ্মিতা ও যুক্তিক্ষমতার, এবং অনুচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণের—

AN ENGLISH LADY ON KALI WORSHIP

A correspondent writes: 'The lecture on Kali-worship which Sister Nivedita (Miss M. Noble), the English lady disciple of Swami Vivekananda, delivered on last Monday at the Albert Hall, was a great success from an orthodox point of view. As it was a novel thing to hear an English lady speaking in support of Kali-Worship, people mustered in large numbers, and her explanation which was a most rational and philosophical one, was all that could be expected from a foreigner on a subject which was so serious and sacred for explanation in a public meeting. We are glad to note that the lecture was free from orthodoxy, and bigotry and it was the pure and rationalistic side of the Kali-Worship that the lecturess advocated. To her Kali-worship signified Motherhood of God. We are very sorry to learn that some discordent note was raised in the meeting by a few distinguished countrymen of ours noted for their vast learning and erudition in Western science. But the reply which it called

forth from the lecturer in her sweet eloquence was most convincing and even the opponent had to admire the lady-lecturer for her power of reasoning and eloquence. We hope, such useful discoureses will be given from time to time.

এর পরে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান মিরারে 'An English lady on Kali and Her worship' শিরোনামায় অ্যালবার্ট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার চার কলম দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১ মার্চের সম্পাদকীয়তেও নিবেদিতার বক্তৃতার সপ্রশংস উল্লেখ আছে :

'Sister Nivedita (Miss M. Noble) whose very interesting, and in some ways, light-imparting lecture (Kali and Her worship) we published on Sunday last . . . . 'Etc.

আরও কিছু সংবাদ অন্যত্র পাওয়া গেল, তবে অবশ্যই বিপক্ষে। এইকালে স্টেটসম্যান খ্রীস্টধর্মভাব প্রচারে বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছিল; সুতরাং 'হিন্দু রিভাইভ্যালকে' বিতৃষ্ণার সঙ্গে চিত্রিত করছিল স্বভাবতই। অ্যানী বেশান্ত সেই কারণে স্টেটসম্যানের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল। স্টেটসম্যানে ২ ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে অ্যানী বেশান্তের দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। ৫ ফেব্রুয়ারী স্টেটসম্যানের প্রধান সম্পাদকীয়তে তার তীব্র সমালোচনা করে খ্রীস্টান মতের শ্রেষ্ঠতার কথা বলা হয়। এর আগের দিন জনৈক পত্রলেখক India and Christianity নাম দিয়ে এক পত্র লেখেন, তাতে বিশপ ওয়েলডনের আগমনে ভারতে খ্রীস্টধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-কল্পনায় হর্ষপ্রকাশ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী এই পত্রিকায় পুনশ্চ বেশান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনাত্মক সম্পাদকীয় লিখিত হয়। এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী একই বিষয়ে একটি পত্র বেরোয়।

এই পরিস্থিতিতে নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা কঠোরভাবে সমালোচিত হওয়ার কথা। কিন্তু সরাসরি তা করা হয়নি। কারণ, ইতিমধ্যেই নিবেদিতা বোধহয় স্টেটসম্যানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্ভ্রম সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। নচেৎ ১৮ ফেব্রুয়ারী ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক গ্রন্থের উপরে নিবেদিতার (বেনামা) আলোচনা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দু-কলম জোড়া হয়ে প্রকাশিত হতে পারত না।

এই লেখাটি নিবেদিতার কালী-বক্তৃতার পাঁচদিন পরে প্রকাশিত হয়। লেখাটি পূর্বেই আমরা উপস্থিত করেছি রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে। পাঠকগণ দেখেছেন, কালী উপাসনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবে ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধনায় কী আশ্চর্য সিদ্ধি পেয়েছিলেন, তার বর্ণনা সেখানে নিবেদিতা করেছেন। লেখাটি নিবেদিতার কালী-বক্তৃতাদানের প্রায় অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে নিবেদিতার বক্তৃতাকে অবিলম্বে খোলাখুলি আক্রমণ করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। অথচ বিরোধী বক্তব্য হাজির করার তাগিদও ছিল নিশ্চয়। সুতরাং স্টেটসম্যানে ২২ ফেব্রুয়ারী

Mrs. Besant and idolatry নামে একটি সংবাদ বেরুল, যেটি আসলে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের *Unity and Minister* পত্রিকার উদ্ধৃতি—তার মধ্যে নিবেদিতার কালী-বক্তৃতার সমালোচনাও ছিল। মন্তব্যটি সম্পূর্ণতঃ আমরা উদ্ধৃত করছি; পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, স্বামী বিবেকানন্দের নামোল্লেখে *Unity and Minister* এর চিত্তে কি ধরনের দ্বিতীয় রিপুর প্রাবল্য ঘটত :

Unity and Minister, the organ of the Brahmo community writes: "The *Statesman* deserves the sincerest thanks of all thoughtful men for boldly exposing the unsoundness and unreality of neo-Hindooism under the leadership of Mrs. Besant and giving a timely warning to the Christian people and other thoughtful persons to withhold, on conscentious grounds, their sympathies, much more their active support, from the Hindu College to be started at Beneras. We shall be most glad to see a healthy revival of Hindooism, but we are the last persons to wish resurrection of idol-worship, superstiton, and the darker side of Hindooism in the name of our ancestral religion at the fag end of nineteenth century. Mrs. Besant's idea of amulgating Hindooism with modern thought is injurious morally, religiously, as well as politically. It is inconsistent with itself. It will foster disloyalty as well as caste distinction and many other evils from which the country is struggling to be free. It is wonder how our countrymen professing orthodoxy, hear with bended heads expositions of their religion from a *Mlechcha*, who is ignorant of the sacred Sanscrit language. The heart of a true Hindoo really weeps for the sad degeneracy of the Hindoo race, and secretly invokes the spirits of their devout forefathers to rescue their progeny from a mischievous delusion. The *Statesman* has truly observed that the very fact that Mrs. Besant, *Mlechcha*-born herself, affects to be a leader of the Hindoos, surely ought to convince her of the inconsistency of her pretensions. Affairs have come to such a miserable pass that a prophet's voice is needed to denounce them and warn the present generation of Hindoos of their danger. We are told, and we think our information is correct, that a regular scene was about to be enacted the other day at Albert Hall. One,

Miss Noble, a disciple of our old friend Norendra Nath Dutt, who has taken the name of Vivekananda, delivered an address at the Albert Hall, advocating the worships of Kali and other gods and goddesses. Dr. Mahendra Lal Sircar, the apostle of Science in India, with his usual repugnance to idolatry and superstition, as contrary to the spirit of Science, protested against the lecturer's advocacy of Kali Pooja ; he was supported by Mr. S. N. Tagore, who happened to be there. These protests would have resulted in violence from certain persons who were among the audience, had not the fair lecturer intervened and deprecated the spirit of violence by a declaration of the principle of toleration, which she said entitled every person to give out his honest opinion."

রোষ, বিদ্বেষ, আশাভঙ্গ এবং আত্মবিরোধে পূর্ণ এই রচনার অসঙ্গতির আলোচনা এখানে দরকার নেই। শুধু বললেই চলে, এ'দের কৌশল মজাদার, নানা মাপে নানা জনকে মাপার মনোরম দৃষ্টান্ত। ক্রীশ্চান-সাহেবদের সতর্ক করার জন্য হিন্দু-পুনরুত্থানের জুজু-দেখানো, শাসক-সাহেবদের ভয় দেখাবার জন্য 'লয়্যালটি'-নাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, রক্ষণশীলদের খোঁচাবার জন্য ম্লেচ্ছকে গুরু করার গঞ্জনা, এবং অবতারবাদ-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও প্রফেটের অভ্যুদয়ের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা! সেইসঙ্গে হিন্দুজাতির অধঃপতনে বেদনায় প্রায় মূর্ছিতাবস্থা!! আর—১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসেও 'আমাদের পুরনো বন্ধু, যিনি ইদানীং বিবেকানন্দ নাম ধরেছেন'—এই বুকের জ্বালা!!!

নিবেদিতা-লিখিত ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থ সমালোচনা স্টেটসম্যানের ভিতর মহলে নিশ্চয়ই কিছু আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তার প্রমাণ, একই গ্রন্থের বিষয়ে ১৮ জুন তারিখে ঐ কাগজে আর একটি আলোচনা বেরোয়, যেটিও নামহীন, আকারে সংক্ষিপ্ত এবং কিয়দংশে কটাক্ষপূর্ণ।

নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা কেবল কেশবপন্থীদের মধ্যে নয়, অন্য মহলেও মর্মান্তিক বেজেছিল। মাদ্রাজের 'সোস্যাল রিফর্মার' কাগজ এই বক্তৃতার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করে ২১ মে, ১৮৯৯-তে—

Different men have different conceptions of the goal towards which the world is marching. Miss Noble, alias Sister Nivedita, believes that the nations are journeying on to the feet of the goddess Kali. There is evidently some illusion of spiritual optics here, for while we can easily

behold men moving away from the dread presence of the great goddess, we see no movement in the contrary direction. This pious lady preaches that "religion is for the heart of the people. To refine is to emasculate it. Every man must be able there to find bread. . . . The man who drives brutal satisfaction from life, or who sees no further than the surface of things, this man has a right to find these satisfactions, and to make for himself a worship which shall express these instincts. The man who is violent in his modes of thought, and vivid in his apprehension of life, the man who appreciates the struggle of Nature, and is strong enough to plunge into it fearlessly, that man has a right to offer to God that which he hourly demands from life." That man does all these things we know; but why he should be said to have a right to do them is more than we can understand. A worshipper of Kali, according to the doctrine, has a right to shed human blood, to violate the chastity of woman, to drink spirituous liquors and to indulge in all the disgusting rites of the tantrikas. This is revivalism with a vengeance.

মিশনারী পত্রগুলিও যে তিক্ত আক্রমণ চালিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। Bombay Guardian নামক মিশনারী পত্রিকায় আমরা দেখেছি ১১ মার্চ, ১৮৯৯, সংখ্যায় অভয়ানন্দের বেদান্ত-বক্তৃতা ও নিবেদিতার কালী-বক্তৃতার উপর বিষ-শর নিক্ষিপ্ত হয়, এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মিস মুলারের মোহভঙ্গে উল্লাস জানানো হয়। নিবেদিতার 'প্রাপ্তি' এই প্রকার :

> " . . . We also hear of a Miss Noble professing to be a disciple of Norendra Nath Dutt, who has taken the name of Vivekanand. She delivered an address recently in Calcutta advocating the worship of Kali and other gods and goddesses. Thoughtful Hindus, who long to rid India of idolatry and caste, deplore the course these women are taking, yet look upon them as sincere but deluded. Apart from religion, we cannot conceive of a sincere, cultured lady of any civilised land, who would not revolt from idolatry as debassing and barbarous. . . . We believe that two years will be long enough to give these ladies to finish their present career as Hindus, and the public can afford to wait. Their

insincerity will either develop into some scandal, as did Madame Blavetsky's, or they will leave for more congenial fields; or if sincere and humble seekers after truth, they will renounce their mistake. In the end God will cause the wrath of man to praise Him."

মিশনারী ও সংস্কারপন্থীদের এইসব আক্রমণ প্রত্যাশিত। নিবেদিতা সেগুলি লক্ষ্য করেছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপেও নিশ্চয় অনেকে আপত্তি জানান। এই সকল আক্রমণের উল্লেখ করে নিবেদিতা তাঁর বান্ধবী মিসেস হ্যামণ্ডকে যে পত্র লেখেন (৯. ৩. ১৮৯৯), তার মধ্যে এই বক্তৃতাকে তাঁর ইংলণ্ডের পরিচিতজনেরা যে সুচক্ষে দেখবে না, সে সংকোচও ছিল :

"আমার কালী-বক্তৃতা তোমাকে পাঠাবার ইচ্ছা আছে, যদি কোনো কপি অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এটিকে তুমি একেবারে ব্যক্তিগত করে রাখবে। কারণ গোঁড়া উইম্বলডনে এসব ব্যাপারে আমার ভাবভঙ্গি যদি জানাজানি হয়ে যায়—নিমকে (বোনকে) কষ্ট পেতে হবে। সময়ে সবই প্রকাশ পাবে, কিন্তু আমার একান্ত আশা, তার আগে নিম-এর অব্যাহতির ব্যবস্থা যেন হয়ে যায়।

অবশ্য আক্রমণ হচ্ছেই। কিন্তু লোকে একটা জিনিস ভেবে দেখেনি—গোড়ায় কালীপূজায় এই ইনভেস্টমেণ্ট—পরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধির স্বাদ পাবার জন্যই—যদিও সে উপলব্ধি হয়ত আসবে বহু সহস্র বছর পরে। কালীকে আমরা পূজা করি তাঁর মূল স্বরূপে, অর্থাৎ ঈশ্বর ভেবে—ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা কল্পনার, নানা নামের একটি, কালী—এবং প্রয়োজনে বা ভালবাসায় ডাক দিলে তুমি যেমন সাড়া দাও, তেমনি ঈশ্বর তাঁর কালী নামে সাড়া দেন, যেমন দেন তাঁকে যখন ডেকে বলি—হে আমার স্বর্গস্থ পিতা!

বলির কথা যদি বলো, আমাকে মানতে হবে, বলির সবটুকু অংশ অনভ্যস্ত মনের কাছে রুচিকর ঠেকবে না। তাতে প্রমাণ হয় যে, বলির ঐ অধ্যায়টি আমরা পেরিয়ে এসেছি। সেইসঙ্গে একথাও আবার জোর দিয়ে বলা যায়, খ্রীস্টীয়তার নামে বলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার কারো নেই, কারণ ইহুদী মত, ক্রুশবিদ্ধকরণ, একই ব্যাপার। আসল কথা, বিপুল সংখ্যক মানুষ যে এইভাবে পূজা করে, তার মানে নয়, এইটেই একমাত্র অনুষ্ঠান, যা করতেই হবে, কারণ যখন কোনো মানুষ পশুবলি ছাড়া অন্যতর পন্থায় অর্চনা করতে পারে, তখন সেটা উচ্চতর জিনিস বলেই গৃহীত হয়, এবং সেখানে বলির কোনো প্রয়োজন থাকে না।

মূল কথা, ভারতে ধর্মের নামে যে-কোনো কাজ করতে পারো, যদি সর্বপ্রকার বাসনা ও কর্মকে শ্রেণীবদ্ধ করে ফেলা হয়, যাতে তুমি বুঝতে পারো যে, তোমার বাসনার আকার অনুযায়ী আধ্যাত্মিকভাবে তুমি কোন্ স্তরে আছো!"

নিবেদিতার বক্তৃতাটির অনুবাদ এবার উপস্থিত করা যাক :

প্রথম কালী-বক্তৃতা

এখানে দাঁড়িয়ে কালীপূজার বিষয়ে বক্তৃতা করার অধিকার আমার অল্পই আছে এবিষয়ে আমি সচেতন। সংস্কৃত-জ্ঞান বা ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে এমন জ্ঞান আমার নেই, যার দ্বারা এই উপাসনার বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নানা মতের বিচার আমি করতে পারি। ভারতে মাত্র এক বছর আমি এসেছি, এবং আমাকে প্রায়শঃ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ যা আমার কাছে অবিসংবাদিত সত্য মনে হয়, এক বছর পরে তা ভিত্তিহীনরূপে প্রতীয়মান হতে পারে।

সে যাই হোক, কিছু দাবি আমার আছে। প্রথমতঃ, সারা জীবন ধরে আমি কালীপূজার কথা শুনে আসছি, কালী বা তাঁর পূজকদের সম্বন্ধে মোটেই স্তুতি-বাচক সেসব বক্তব্য নয়; এখন নিজে আমি সেই বস্তুটির সংস্পর্শে এসেছি, সুতরাং এখানে উঠে আমার একথা বলার অধিকার আছে যে, বাল্যকালে যে-কথা আমি শুনেছি, তা অর্ধসত্য, পূর্ণ সত্য নয়, এবং পূর্ণ সত্যের সন্ধানই আমাদের ব্রত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, একজন ইংরাজ রমণীরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করবার অধিকারও আমার আছে; আমার দেশের নরনারী অন্য একটি দেশের মানুষের—সমতুল মানুষের—প্রাণপ্রিয় ধর্মবিশ্বাসের কুৎসা করে যে অন্যায় করেছে, তার জন্য প্রকাশ্য ক্ষমা আমি চাইতে পারি, এবং এই আশা পোষণ করতে পারি, পারস্পারিক সদিচ্ছা ও সহানুভূতির বিস্তারের দ্বারা এই ধরনের কুৎসাপ্রচার বন্ধ হবে। শেষ কথা, সদ্য-লব্ধ কোনো ধারণাকে প্রকাশের অধিকারও আমার আছে। অনেক সময়ে আমরা ভুলে যাই যে, প্রথম ধারণাসৃষ্টি যার দ্বারা হয়, সর্বশেষ ধারণাসৃষ্টিকারী জিনিসের মতই তা সত্য, উভয়েই সমগ্রের আবশ্যিক অংশ। সকল শ্রেয় এবং সকল সুন্দর সম্বন্ধে একথা খাটে। ধর্মচেতনার মত জটিল ও বিস্তারিত ক্ষেত্র সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। ধর্মবোধ তার সকল অভিব্যক্তি-স্তরের দ্বারাই বিচার্য। প্রতীক, সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ, যে অনুভূতিই সৃষ্টি করুক না কেন, তার কোনো কিছুকেই অবজ্ঞা করা যায় না। অবশ্যই সর্বোচ্চকে প্রধান স্থান দেব। অবশ্যই মনে রাখব, প্রতীককে সহজে মেনে নিলে মানুষ বদ্ধ হয়ে পড়ে; যে প্রতীকের মধ্য দিয়ে দিয়ে যোগী উচ্চতর ঈশ্বরানুভূতি পেয়েছে, সেই জিনিসই নিতান্ত বাহ্যিক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই নিম্নতর পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিচার করার কালে বা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাবধান হতেই হবে, অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এটি ক্রমোন্নয়নের নিম্নতর পর্যায়, যাকে অতিক্রম করে সাধক সমুচ্চ দর্শনাদি লাভ করেছে।

আবার অনেক সময়ে সতেজ নতুন দৃষ্টির প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি। এখানে তার প্রয়োজন কতখানি, আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমরা

নিজেদের বিষয়ে বলতে পারি, বাল্যকাল থেকে খ্রীস্টধর্মের কথা গল্প শোনার মত মারাত্মক জিনিস খুব কমই হয়; তার ফলে গ্যালিলির সমুদ্রতীরে, জুডার শৈলশিরে যাপিত সেই অপূর্ব জীবনের সমস্ত তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যায়—কোনো তাৎপর্যই আর বহন করে না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের জীবনের সামনে প্রথম আবির্ভূত হলে হয়তো তা পৃথিবীর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রাণবস্তুর অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং বহিরাগত মনের উপরে আমাদের ধর্মের প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখলে অনেক সময়ে আমাদের উপকার হয়। আরও দুটি জিনিস একইভাবে সাহায্য করে—(১) অন্য ধর্মের অনুশীলন, যা তুলনার ও নব সিদ্ধান্তের সুযোগ দেয়; (২) এক দল মানুষ (কিংবা একটি মানুষ, তার জীবনের এক পর্বে,) কর্তৃক সমস্ত ব্যাপারটার সত্যতা অগ্রাহ্য করা, যার ফলে মতের ভিত্তিভূমি, তার তাৎপর্য, এবং জীবনের কাছে তার দাবির বিষয়গুলি পরীক্ষিত ও পর্যালোচিত হতে পারে। কলকাতার এখনকার জীবনে একদল লোকের মধ্যে মাতৃরূপে ঈশ্বরারাধনার ভাবটিকে অশ্রদ্ধা ও অগ্রাহ্য করার যে মনোভাব রয়েছে, ধন্যবাদের সঙ্গে জানাতে পারি, মাতৃসাধনার ভাবকে শক্তিশালী ও পরিস্কৃত করার ব্যাপারে তার চেয়ে 'সুপরিকল্পিত' উপায় আর কিছু হতে পারে না। আমরা যেন ভুলে না যাই, তাঁরাও আমাদেরই মত সত্যসন্ধানী; তাঁরা যা বলতে চান, সাবধানে তার বিচার-বিবেচনা করা দরকার, এই কথা জেনে যে, স্বয়ং জগন্মাতা তাঁদের কণ্ঠে আমাদের কাছে তাঁর কথা বলছেন, যাতে তাঁদের এবং আমাদের ভালবাসা ত্রুটিহীন হয়ে ওঠে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা অনুভব করেন যে, ঈশ্বরসন্ধানই জীবনের সব-হওয়া সব-পাওয়ার লক্ষ্য, এবং তিনিই প্রাপ্ত, ও পূর্ণ জীবনবস্ত, যিনি সমগ্র আত্মাকে বিদীর্ণ করে চীৎকার করে উঠতে পারেন, 'তৃষার্ত প্রাণ যেমন নির্ঝরিণীর জন্য ব্যাকুল, তেমনি আমার আত্মা ব্যাকুল তোমারি জন্য, হে প্রভু!'—তাঁদের কাছে জাতীয় রীতি-নীতি, জাতীয় ইতিহাস, জাতির জীবনদৃষ্টি—এসব কিছুই ঈশ্বরোপলব্ধির প্রকাশ, ভিন্ন নামে ভিন্ন বেশে।

এইজন্য সেমাইটগণ ঈশ্বরধ্যানের সর্বোচ্চ ভাবাবেশের ক্ষণে ঈশ্বরকে 'আমাদের পিতা' বলে সম্বোধন করেন; এবং ইউরোপীয়েরা ঈশ্বরের প্রতি পুত্রভাব যোগ করার অভিপ্রায়ে দেখেছে—তাঁর উপরে আনত হয়ে আছেন মহিমান্বিত নারী (Glorified Maiden), যাঁকে তারা জানে, 'Our Lady' বলে।

ভারতে কিন্তু নারী সম্বন্ধে ধারণা সহজতর, অনেক ব্যক্তিগত এবং সুসম্পূর্ণ। কারণ ভারতের কাছে গৃহবন্ধনের হেতুস্বরূপ একটি সম্পর্কই আছে, যা দেহের প্রতি তন্ত্রীতে প্রবিষ্ট, যা শুচিতা সৃষ্টি করে, যা কিন্তু পিতৃত্ব নয়,—সুতরাং বিস্ময়ের কি আছে যদি ভারতবর্ষ সেই সম্পর্কের সূত্রেই মধুরতম নামে ঈশ্বরকে ডাকে—'মা' বলে?

ঈশ্বর—জননী! আশ্চর্য রহস্যের আকর্ষণ অনুভূত হয়, যে-আকর্ষণ ও রহস্য-বোধ 'ভারত' শব্দটিকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে, ভারতীয় ইতিহাস বা দর্শনের অনুশীলনকারীদের কাছে।

বহু প্রাচীনকালে, বৌদ্ধধর্মের জন্মের বহু পূর্বে, ভারত রত্নভাণ্ডার,—মূল্যবান পাথর, চন্দনকাঠ, হাতীর দাঁতের জন্য যার দ্বারস্থ হতেই হোত। তারপরে এক

সময় এল, গ্রীসের উপরে যখন পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর দিনোদয় হচ্ছে—তখনো ভারতের মূল তাৎপর্য ছিল সেই নূতন জীবনের কাছে। সেই বৌদ্ধযুগ, যখন ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গ্রীক দার্শনিকদের শিখিয়েছিল তার প্রাচীন প্রজ্ঞার কথা,—'প্রাচীন'? হাঁ, তখনো কালের হিসাবে সে প্রজ্ঞা প্রাচীন। তারপর এল ইউরোপে মধ্যযুগ, ভূমধ্যসাগরের চারপাশের দেশগুলি নিঃশ্বাস ফেলবার কিছুটা সময় পেয়েছে, ক্রুসেড বেধে গেছে। ক্রুসেড প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সম্মিলনভূমি—প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্যস্বার্থ বাগদাদের দিকে প্রবল ধারায় প্রবাহিত, তারপরে সারাসেনদের দ্বারা সিরিয়ার মরুভূমে নিক্ষিপ্ত।

এই ক্রুসেডের কালে, পরে স্পেনে মুর-অধিকার কালে, এবং সেই চির আকর্ষণীয় ভেনিস ও জেনোয়ার প্রাচীন বন্দরসমূহের রাজপথে ও সংকীর্ণ গলিতে সর্বকালে—ভারত নামটি ঘিরে চিররহস্যের সূত্রপাত অবশ্যই হয়েছিল।

ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের কথিত অপূর্ব কাহিনীগুলি : ভারতীয় প্রাসাদ-সমূহ এবং প্রহরীগণের জাঁকজমক, যাদুকরদের অদ্ভুত খেলা এবং হঠযোগীদের শারীর সামর্থ্যের অসাধারণ প্রদর্শনী—এইসব কিছু 'ভারত' শব্দটি উচ্চারণমাত্রে তাদের মনে জেগে উঠত, যারা কখনো নির্জন জন্মভূমে তালীবনপথে হাঁটেনি, কিংবা বনময়ূরের কলাপবিস্তার দেখেনি।......

পরবর্তীকালে, ভারতে ইংরাজ-অধিকারের সূচনাপর্বে ভারতীয় দার্শনিক শব্দ-গুলিকে কেন্দ্র করে মোহসৃষ্টি হয়েছিল। 'মায়া' শব্দটির চলিত অর্থের চারিপাশে মায়ালোকের বিস্তার, এবং চেতনার শিহরণ 'মাতৃরূপী ঈশ্বর' সম্বন্ধেও।

তাই বলে, আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন কোনো ধর্মের পক্ষে কি এই মাতৃভাবকে সম্পূর্ণ এড়ানো সম্ভব? কদাপি নয়। গ্যালিলিয়ার আচার্যপ্রবর তা বিস্মৃত হননি। একটি ক্ষুদ্র শিশুকে সকলের মধ্যে স্থাপন করে তিনি বলেছিলেন, 'যে নিজেকে এই ক্ষুদ্র শিশুর মত নম্র কোমল করে তুলতে পারবে, সে স্বর্গরাজ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হবে।' সেন্ট পল তাঁর শিষ্যদের কাছে চিঠি লিখতেন আতুর জননীর মত, যাতে তাদের মধ্যে খ্রীস্টের জাগরণ হয়। সেমিটিক ভাবের মধ্যে সাহায্য ও সদুপদেশের যথার্থ ও মধুর প্রতিটি শব্দ প্রবেশ করেছে,—'যেমন পিতার সকরুণ ভালবাসা সন্তানের প্রতি,' এবং আর্যদের মধুরতর ধারণার মতই—'যেমন মাতার সকরুণ ভালবাসা সন্তানের প্রতি'।

খ্রীষ্টধর্মে কিন্তু ঐ ভাবটি স্পষ্ট প্রকাশিত হয়নি, আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এবং এখানে নারী সম্বন্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয় আদর্শের বিচিত্র পার্থক্যের কথা ওঠে—যা ইউরোপের ক্ষেত্রে অধিকভাবে ঈশ্বরারাধনায় মাতৃভাবের প্রবেশকে ব্যাহত করেছে।

মধ্যযুগের ইউরোপ থেকে ভক্তিসাহিত্যের সুন্দরতম একটি নমুনা আমরা পেয়েছি, একটি পুরাতন ক্ষুদ্র ফরাসী পাণ্ডুলিপি, যার নাম *"Our Lady's Tumbler."* এখানে, মনে হয় যেন, আমরা খাঁটি মাতৃ উপাসনায় উপনীত। আসলে কিন্তু তা নয়, কারণ বিশিষ্ট প্রয়োগটি হল, 'অয়ি নারী মহীয়সী, তুমি আমার আনন্দময়ী, সারা বিশ্বের আলোকস্বরূপিণী' (Lady, you are the *mon-joie* that lightens

[redacted]

all the world) —অর্থাৎ এখানে 'মাতাকে পূজার্পণ করা হল না, হল 'রানীকে'। ভারতে তা কখনো হয় না। প্রাসাদ-প্রাচীরের অন্তরালে, কিংবা পর্ণকুটীরে—সর্বত্র ভারতীয় নারীর সেই একই সরল, সুন্দর জীবন, যা ছিল প্রাচীন আর্য গ্রামে। অপরিমেয় পরিচ্ছন্নতা এবং সরলতা, অনন্ত শুচি-সাধনা, এবং সর্বসময়ে একই সুগভীর মাতৃত্ব।

ভারতের কাছে নারী সম্বন্ধে 'Lady',—এই ধারণা বিজাতীয়। এমন যে হয়েছে, তার জন্য দেশপ্রেমিক মানুষেরা কৃতজ্ঞ না হয়ে পারবেন না। এর অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় নারী যার দ্বারা মহৎ, মধুর এবং শক্তিমতী হতে পারে, তার থেকে বঞ্চিত হবে; আসল কথা, জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই তারা যা পেয়েছে, বিদেশাগত ধারণার চেয়ে তা অধিকতর সুন্দর, কারণ অধিকতর মহৎ। ভারতীয় স্বার্থশূন্যতা, প্রজ্ঞা এবং সামাজিক শক্তিকে গভীর ও গতিশীল করতে পারলেই 'বন্ধনমুক্তি' আসবে।

বিলাস ও আত্মপ্রীতি থেকে এই মুক্তিই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শরূপ—এই জিনিসটি সুযোগ্য প্রতীক লাভ করেছে ভারতের ঈশ্বরভাবনার বিশিষ্ট রূপটির মধ্যে, যাকে বোধহয় পৃথিবীর সর্বাধিক মূল্যবান প্রতীক বলা যায়—মাতৃরূপিণী ঈশ্বর,—রাজ্ঞীরূপিণী ঈশ্বর নয়।

মাতৃরূপিণী ঈশ্বরের তিনটি রূপ : দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী।

দুর্গার মধ্যে রাজ্ঞীভাবের অনেকটা পাওয়া যায়, তবে রাজ্ঞীর শক্তিটুকু, অধিকারবোধ নয়।

দিগ্‌বাসিনী দুর্গা, তাঁর এক পদ সিংহের উপরে, অন্য পদ অসুরের স্কন্ধে, সর্পের দ্বারা আক্রমণরতা, হস্তে পূজার দ্রব্য এবং বিনাশের অস্ত্র,—এই দুর্গার কল্পনায় অপূর্ব কাব্যিক ব্যাখ্যার উপাদান রয়েছে। 'প্রকৃতিস্বরূপে বিকাশশীল মহাশক্তির তিনি প্রতীক, সৃষ্টিচক্রের কেন্দ্রীয় প্রাণচেতনা।

উপরে, অস্পষ্ট-আভাসিত চিত্রাবলী, দেবগণের দানচিত্র, তা এই মহাশক্তির সঙ্গে দেবগণের ও আমাদের আত্মার সম্পর্ক দৃশ্যমান করে তোলে।

নিম্নে সবকিছুই গতিময়, আলোড়ন-সংক্ষুব্ধ; উপরে অনন্ত ধ্যানের শান্তি। আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি চৈতন্যময়ী। এর বাইরে আছে যা, যা আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়রূপেই ব্যক্ত, তা হল ব্রহ্ম।

যেভাবেই দেখা যাক না কেন, এর থেকে দ্বৈত বিকাশের পূর্ণতর, সুন্দরতর চিত্র সম্ভবপর? কিন্তু দুর্গা আবার বিশ্বজননী। ঐশী অনিবার্য শক্তি—যিনি যেমন সৃষ্টি করেন, তেমনি ধ্বংস করেন, যিনি অযোগ্যকে বিনাশের ভয়ংকর উপায়ের মধ্য দিয়ে পালন করে যান।—

তাহলে কি ঈশ্বর আর প্রকৃতি সংঘাতে অবতীর্ণ,
যার জন্য প্রকৃতি এমন অশুভ স্বপ্ন বিস্তার করেন!
যে-প্রকৃতি সমষ্টিরক্ষায় এতই যত্নশীল
অথচ ব্যষ্টির সম্বন্ধে এমন উদাসীন?

আমি বিবেচনা করেছি সবকিছু, তাঁর কীর্তির
রহস্যসন্ধান করেছি সর্বত্র,
দেখেছি পঞ্চাশটি বীজ নিয়েও অনেক সময়ে
ফুটিয়েছেন একটিকে মাত্র।

যেখানে দৃঢ়পদে যেতে চাই, পা যায় কেঁপে,
জীবনের দায় জমে আর তার ভারে
লুটিয়ে পড়ি বিশ্বপৃথিবীর বেদীমূলে,
গড়িয়ে পড়ি অন্ধকারে, ঈশ্বরের দিকে যা বিস্তারিত।

বিশ্বাসের ভাঙা হাত বাড়াই, আঁকড়াতে চাই,
মুষ্টিতে ধরা পড়ে ধূলি আর আবর্জনা—
মনে হয়, সর্বময় প্রভু যেন আছেন তারই ভিতরে,
তখন অস্পষ্ট বিশ্বাস জাগে বৃহত্তর আশার উদ্দেশে।

[Are God and Nature then at strife
That Nature sends such evil dreams?
So careful of the type she seems,
So careless of the single life?

That I, considering everywhere
Her secret meaning in her deeds
And finding that of fifty seeds
She often brings but one to bear.

I falter where I firmly trod,
And falling with my weight of cares
Upon the great world's altar stairs
That slope through darkness up to God.

I stretch lame hands of faith, and grope
And gather dust and chaff and call
To what I feel is Lord of all,
And faintly trust the larger hope.]

মানবের কম্পমান স্নায়ু বেদনার রূপ জানে। দুর্গা কী চোখে দেখেন তাকে? যেসব দেবতাকে মানুষ নিজেরা নির্মাণ করেছে, বিশ্বজীবনের একই বাণীকে

তাঁরা উচ্চারণ করবেন না। কিন্তু মানুষের প্রাণবাসনার কোনো কোনো দিক উপবাসী ও ব্যাহত থাকবেই, যদি না সেই দেবমূর্তিকে ভক্তের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী-রূপে কল্পনা করা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, এসব কিছুই ঈশ্বরকে দেখার একজাতীয় পথ—প্রতিটি কাজ বা অনুভূতি যেখানে অসচেতন পূজা। ঈশ্বর মানুষের সত্য স্বরূপ; এবং যদি আমরা প্রেমের জন্য, সহানুভূতির জন্য, উৎসাহ বা সান্ত্বনার জন্য আতুর হই, মানুষের মধ্যে সে জিনিস আমরা পাব না—যদিও মানুষের মধ্যেই হয়ত সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে থাকে আমাদের আর্তনাদ। সুতরাং ঈশ্বরের মূর্তিনির্মাণের কালে এইসব ক্ষুধার্ত মানবপ্রাণের প্রতি আঘাত করা সম্ভব নয়। তার বাসনাকে চরিতার্থ করা যায়—করতেই হয়। দুর্গা কি তা করতে পারেন?

যদি না পারেন, যদি সেই বিরাট বিশ্বশক্তি আমাদের আনন্দ-বেদনায় নির্বিকার থাকেন,—তিনি মানবাত্মার মাতা হতে পারেন না।

জগদ্ধাত্রীর মধ্যে রক্ষয়িত্রীভাবের কিছু বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীর কাছেই—ভয়ংকরী, অগ্নিরসনা, অগ্নিবদনা, মৃত্যুশ্মশানের মধ্যে আসীনা যিনি—তাঁর কাছে আত্মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, আর উচ্চারণ করে সেই পরম শব্দটি 'মাতা।'

শিশুদের কাছে, তাদের শৈশবের প্রয়োজন পূরণ করেই তিনি 'মাতা'। যিনি রক্ষা করেন, যাঁর কাছে আমরা আশ্রয় নিই, যিনি মানবসন্তানের কাছে বলেন, ঈশ্বরের কণ্ঠে: 'বাছা মোর, আমাকে খুশী করার জন্য তোমার অনেক কিছু জানার দরকার নেই, শুধু গভীরভাবে ভালবাসো আমায়',—সেই মাতা।

আর যদি তাঁর চারিপাশে এমন কিছু থাকে, যা বয়স্কের চোখে ভয়ঙ্কর বলে প্রতিভাত হয়—শিশুদের চোখ কিন্তু সেদিকে রুদ্ধ থাকে, তারা সে রূপ দেখতে পায় না, তাদের জীবন এবং অভিজ্ঞতার পক্ষে বোধগম্য রূপটুকুই মাত্র তারা দেখে। প্রতীককে এই ভাবেই নানা জন নানা ভাবে দেখে।

আর, বয়স্ক মানুষের কাছে, তাদের প্রয়োজন অনুরূপে তিনি মাতা—যে মাতা 'রক্ষা' করেন না, কিন্তু বিজয়ী হবার মত শক্তিদান করেন, যে-মাতা আমাদের সর্বোচ্চ দানকে দাবি করেন, সন্তুষ্ট হন না তার অল্পে।

না, কালীর মধ্যে প্রতিটি ক্ষতের শুশ্রূষা নেই, প্রতিটি যাতনার উপর তিনি মধুবর্ষণ করেন না, সত্যের নগ্ন চেহারার সামনে চোখ বন্ধ করার ব্যাপার সেখানে নেই, কোনো একের রক্ষা-ব্যবস্থা নেই যাতে অন্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়! যদি তাই আমরা চাই—যে-পর্যন্ত আমরা তা চাইব, যে-পর্যন্ত আমরা শান্তির ছায়া কামনা করব আর অপরকে ঠেলে দেব বোঝা বইতে রৌদ্রতাপের মধ্যে, যে-পর্যন্ত আমরা পাওয়ার তৃপ্তিতে কৃতজ্ঞ থাকতে চাইব, যে-পর্যন্ত আমরা আমাদের ভালবাসার মানুষদের ক্ষেত্রেও কাপুরুষের আচরণ করব—সে অবধি ঈশ্বরের মধ্যে কাপুরুষের পরিতৃপ্তিই চাইব, পাবও তাই।

কিন্তু যখন এ অবস্থাকে অতিক্রম করে যাব, তখন দেখব, উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদ, সেইসঙ্গে বামহস্তে মৃত্যু। তখন বিশ্বের ধ্বংসক্ষণই হবে পরম

উপলব্ধির ক্ষণ। জীবন হবে উন্মাদনা ও কৃতজ্ঞতার মহাসংগীত, কারণ চরম উৎসর্গ দাবি করা হয়েছে আমাদের কাছে।

[এইখানে নিবেদিতা স্বামীজীর *Kali the Mother* কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। মূল ইংরাজী রূপটি আর এখানে দেওয়া হল না, তবে পাণ্ডুলিপির মহামূল্য প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে]

ধর্ম, দেখা যাচ্ছে, সভ্য ভব্যের ব্যাপার নয়, তা মানুষের প্রাণের জিনিস। তাকে পরিস্রুত করতে গেলেই তার প্রাণবীর্য নষ্ট করে দেওয়া হয়। প্রতি মানুষ যেন তার নিজস্ব আহার্য পায় ধর্ম থেকে। খ্রীস্টধর্ম থেকে দৃষ্টান্ত আমাকে দিতেই হয়। খ্রীস্টধর্ম যে, কিছু পরিমাণে স্থূলতা এবং কুসংস্কারকে রক্ষা করেছে, যা না থাকলে তা এমন সব জায়গায় পৌঁছেচে যেখানে যেতেই পারত না—এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

যে-মানুষ জীবন থেকে বর্বর ভোগের আনন্দ নিষ্কাশন করে, বস্তুর উপরের চেহারাটুকুই মাত্র দেখতে পায়, তারও পরিতৃপ্তির অধিকার আছে, এবং ঐসব প্রবৃত্তির প্রকাশ আছে এমন উপাসনা-পদ্ধতিও সে গ্রহণ করতে পারে। যে-মানুষ চিন্তা-রীতিতে উগ্র, জীবনবোধে স্পষ্ট কামনার অধীন, প্রাকৃতিক সংঘর্ষকে যে উপভোগ করে, এবং তার মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত শক্তিমান—সে মানুষ নিজ অধিকারে ঈশ্বরকে দৈনন্দিন জীবনকামনার অনুরূপ উপাদানে অর্চনা করবে। অপরপক্ষে যে-মানুষ জীবন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে করুণাপূর্ণ, সে ঈশ্বরকে দেখবে সর্বাশ্রয়রূপে, স্নেহময়ী, করুণাময়ী বিশ্বজননী রূপে। মাতার করুণাঘন ক্রন্দনকে সে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করবে পৃথিবীর পটে : 'হে মানব, মানবগণ! তোমরা ঈশ্বরদূতদের মেরেছ, পাথর ছুঁড়েছ প্রেরিত পুরুষদের উপরে, কতবার আমি তোমাদের সন্তানদের একত্র করেছি আমার পক্ষপুটে, যেমন মুরগী-মাতা করে থাকে তার বাচ্চাদের,—তবু তোমরা পরিবর্তিত হওনি!'

কিন্তু মানবচৈতন্যের যাত্রা সমাপ্ত হচ্ছে না এইখানেই। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর—দৃশ্য বস্তুর ধ্বংসের—বীভৎসতা বা আতঙ্কের—অর্থ কি? অগ্নিদাহ, হত্যা ও দগ্ধ নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ঐশী শক্তির প্রেম ও মুক্তিবাণী আমাদের নিকট বাহিত হয়ে আসে না কি? যে মানুষের কাছে একদা ধর্মের মহাবাণী ছিল : 'বাছা, আমাকে খুশী করবার জন্য তোমার অনেক কিছু জানার প্রয়োজন নেই, শুধু গভীরভাবে ভালোবাসো আমাকে; মা যখন তোমাকে কোলে তুলে নেন, তখন যেভাবে তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলো, সেইভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো।'—সেই একই মানুষ এখন প্রতিটি কথা, কাজ ও চিন্তার দ্বারা বলতে পারবেন : 'যদিও মারছ আমাকে, তবু বিশ্বাস করি তোমাকে।'

তারপরে অতি দূরে, অনন্ত দূরে কোনো কালে যখন দ্বৈতত্বের বোধ চলে গিয়েছে, যখন পৃথক ঈশ্বরবোধ পর্যন্ত অবলুপ্ত, তখন হয়ত অন্যবিধ অভিজ্ঞতার অবতরণ ঘটবে, যার বিষয়ে আচার্যদেব বলেছেন : 'শবরূপী ঈশ্বরের বুকের উপরেই আনন্দময়ী মাতার দিব্য নৃত্য।'

একটি শিশু যেখানে সবসময় ব্যস্ত তার মহাসম্পত্তিগুলির গণনায়, সেখানে বয়স্ক মানুষ ব্যাপৃত থাকে উচ্চতর গণিতের সত্য নির্ণয়ে, যেখান থেকে সে মানসিক বৃত্তিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উন্নীত হয় ঊর্ধ্বতর সত্যের জগতে,—তেমনি এখানেও প্রারম্ভিক প্রতীক শেষতম প্রতীকের মতই গুরুত্বপূর্ণ, সর্বশেষ স্তরে পৌঁছানই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়। শেষ স্তরে শিশুর গণনার মূল্য নেই, তবু গণিত থাকতেই পারত না তার ঐ গণনা না থাকলে। সুতরাং উপাসনাকে মাটিতেই পা রেখে দাঁড়াতে হবে, যদি স্বর্গে ছোঁয়াতে হয় তার মাথা। প্রতি স্তরেই আমরা এমন কিছু উপলব্ধি করি, যা থেকে যায় আমাদের সঙ্গে চিরদিন। **মায়ের সন্তানের কাছে সকল মানুষই ভাই ভাই।** বিচ্ছেদ নয়, পার্থক্য নয়—সকলেরই এক মা। মানুষের মুখে তাঁরই বাণী, মানুষের হাতে তাঁরই বাহু, তার চোখে তাঁরই প্রেমদৃষ্টি. —মানুষের দায়িত্ব তাই মানুষের চির সেবা। ব্যক্তিমুক্তির কী প্রয়োজন যদি ঈশ্বর, অনন্ত ঈশ্বর, প্রেম ও সেবা আহ্বান করেন?

বস্তু-সত্য কী বিরাট! অনুভব করি আমরা। শুধু সুন্দর, সহজ, মধুর কোমলকে বিশ্বাস করা, পূজা করার চেয়ে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে? আমরা যেন স্বেচ্ছায়, সানন্দে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পারি রূঢ় কঠিনের, বীভৎসের, ভয়ংকরের।

ঈশ্বর জীবন দিয়েছেন—সত্য। কিন্তু নিহন্তাও তিনি।

ঈশ্বর কালাতীত নিত্য,—এই ভাবের সঙ্গে জেগে ওঠে নাকি মহাকালের কৃষ্ণ-ছায়া, যার শুরু ও শেষ দুর্জ্ঞেয় রহস্যে?

সুখের পরিবেশে জন্মেছি আমি। তিনিই তা দিয়েছেন। একই কথা বলার সাহস থাকে কি যখন অপরকে ক্লেশ, যাতনা আর দায়িত্বভার দেন? সেইজন্য, তাঁর ধ্বংস-লীলার মধ্যে কি তাঁকে অর্চনা করব না—সেই শ্মশানই কি একমাত্র স্থান নয় যেখানে নতজানু হয়ে আমরা বলতে পারি—মা, মাগো!

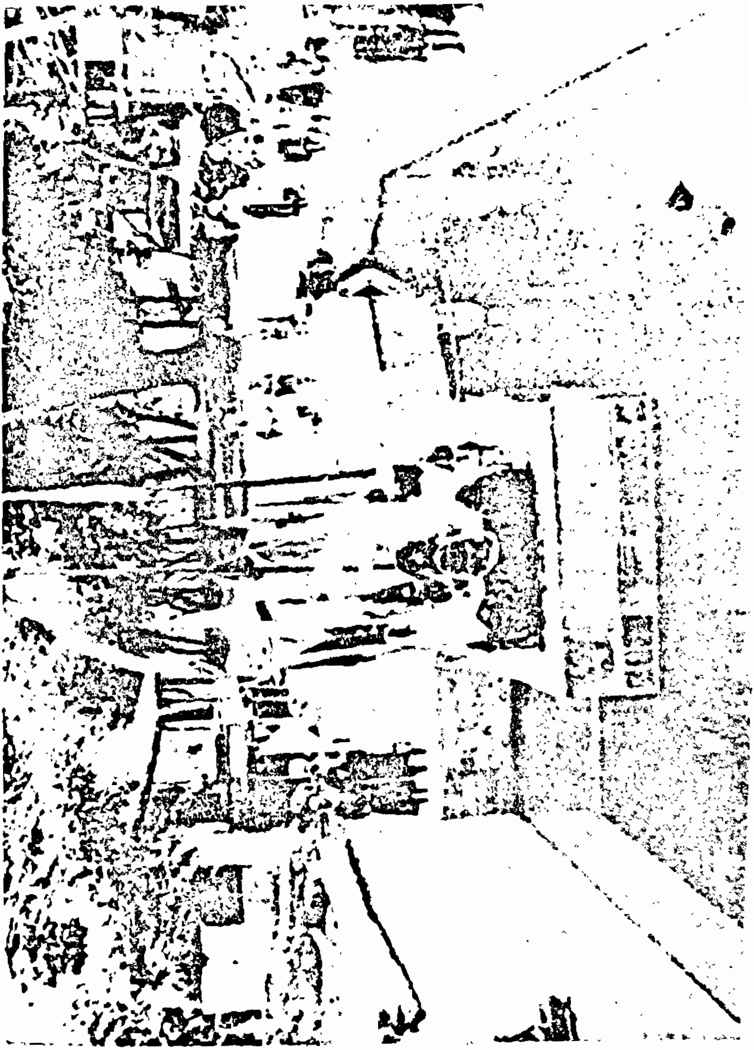
এর সঙ্গে অন্য ভাবেরও সংযোগ আছে, যা এর মধ্যে, বা এর পারে আমাদের চালিত করে। 'যদি তোমার হাত বা পা অসদাচরণ করে, কেটে ফেল তাদের। পঙ্গু, অঙ্গহীন হয়েও পৃথিবীতে আসা ভাল—অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই হস্ত-পদের চেয়েও।' যিনিই সত্যের দেবতা তিনিই বলির দেবতা। শেষ কথা, মাতৃ-উপাসনার মহাগৌরব হল—**পৌরুষ** দেয় তা। যুগে যুগে কালী ভারতকে **মানুষ** দিয়েছেন। প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, শিখেরা—এঁদের দিয়েছেন তিনি। যদি বাংলা দেশ, মাতৃপূজার এই আদিপীঠ, মাতৃসাধকদের এই জন্মভূমি—মাতৃপূজা ত্যাগ করে, তাহলে নিজ পৌরুষকেই ত্যাগ করবে। প্রাচীন পূজাকে দশ গুণ বেশী ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে,—না করলে এ দেশের চির দুর্দশা ও অপমান।

বিস্তারিতভাবে না হলেও মনে হয় আমি কথাপ্রসঙ্গে কালীপূজার বিরুদ্ধে উত্থাপিত তিনটি অভিযোগের বিষয়ে বলেছি :

(১) এটি প্রতিমা পূজা;

(২) প্রতিমাটি আকারে বীভৎস;

(৩) এই পূজায় পশুবলি দেওয়ার দরকার হয়।



[H]OW A CULTURED ENGLISH [LA]DY BECAME A HINDOO.

We are so accustomed to think that missionary work in India can only operate in one direction, namely, that Indians [become] Christians, that when we hear of a Christian [becom]ing a Hindoo we are more than astonished [and c]an hardly credit the fact. Yet such a con[version] has recently taken place. Miss Margaret [Noble], an English lady of remarkable intellectual [gifts, h]as voluntarily and from conviction embraced [Hindu]ism, and now lives the life of an Indian lady [in Calc]utta. She has been admitted to the Order [of Ram]akrishna, and is known in that Order as [Sister] Nivedita. She [is] a somewhat [...]-looking [...] white serge, [which f]alls in long folds, and is [...]in at the waist [by a] cord; at her [...], hangs a [...], but here the [mon]astic resem[blance] ends, for she [does] not live a [...] contempla[tiv]e in a convent; [she de]votes her days [to the] service of her [fellow-c]reatures.

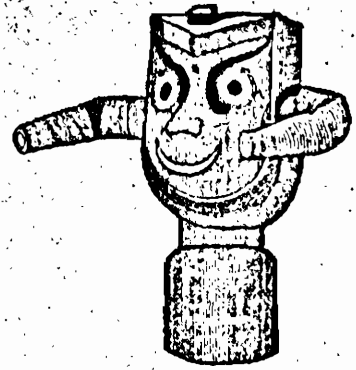
[The] story of her [change] of faith is [...]. Born in [...], Miss Noble, [...] up to the [age of] eighteen the [...] education of [an Eng]lish girl; to [...]m and fervid [...] religion, [...] the self-[...] of Christ, [...]d very [...]. Her intel-[l]ectual gifts [...] her into [ed]ucational [work], and she was [call]ed to high and responsible positions. But [then] came religious doubts, and she became [a prey] of torturing uncertainty. She sought as a [refuge t]he study of natural science, and, to her [mind, th]e great laws of the universe seemed more [importa]nt than the principles of Christianity. The [message] which came to her almost as a revelation, [was that] of a great Hindoo teacher, the Swami [Vivek]ananda. Of this noble and spiritually-[minded m]an I can only say that he is regarded with [the deep]est veneration throughout India. He lived [the] ancient tradition in the East; luxury had [no cha]rm for him, the garb of a beggar and the [...], but especially of his own people [...] to him than material possessions. [...] said, of the rights of women, and of [...] to make them worthy, and to be [...] teacher [...] recently, and Sister Nivedita's appreciation of him and the significance of his work is one of the most touching tributes one can read to the memory of a great man. He was the representative of Hinduism at the Parliament of Religions held at the Chicago Exhibition some years ago, and such was the charm of his personality that many occidental friends would fain have kept him in the West; but India had his heart and to India he returned, a true patriot. "his whole heart and soul," says his enthusiastic disciple, "was a burning epic of his country; he was touched to an overflow of mystic passion by the very mention of India's name." He taught no creed; told no personal story, nor made no individual claim; but the hopes and fears of his countrymen were poured into his sympathetic ear, and in India to-day, deep in her heart, the Teacher is not forgotten.



MISS MARGARET NOBLE.

This was the teacher who eventually brought rest to the perturbed soul of Miss Noble. Acting on his advice, she went to India, to study life and religion in that country. She did not join Anglo-Indian circles, but took up the life of a Hindoo lady in Calcutta. Being unmarried, she ranked as a widow; and it was with eyes desirous of looking beneath the outward aspect of Indian home life—that aspect which strikes Europeans as so strange, dull, and monotonous — and with the sympathetic mind of a student seeking the true meaning of what she saw, that Miss Noble made herself one with the secluded ladies of our Eastern dependency. She also occupied herself with the children, teaching them Kindergarten ways and leading them on to knowledge that makes strong without bias of Eastern or Western civilisation or religion.

In this way Miss Noble became imbued with Hinduism and Hindoo life; and there is no abler exponent of either the religion or life than she is. It was as a Christian that she was admitted to the Order of Ramakrishna, an Order which knows no religious distinction, but demands the dedication of its members to the good of humanity. After spending some considerable time in India, Sister Nivedita, as she likes to be called, went to America and then returned to England. She lectured [...] mainly on her experiences in India, and [...] a very different [...] of woman's position [...] that popularly accepted in the W[est].



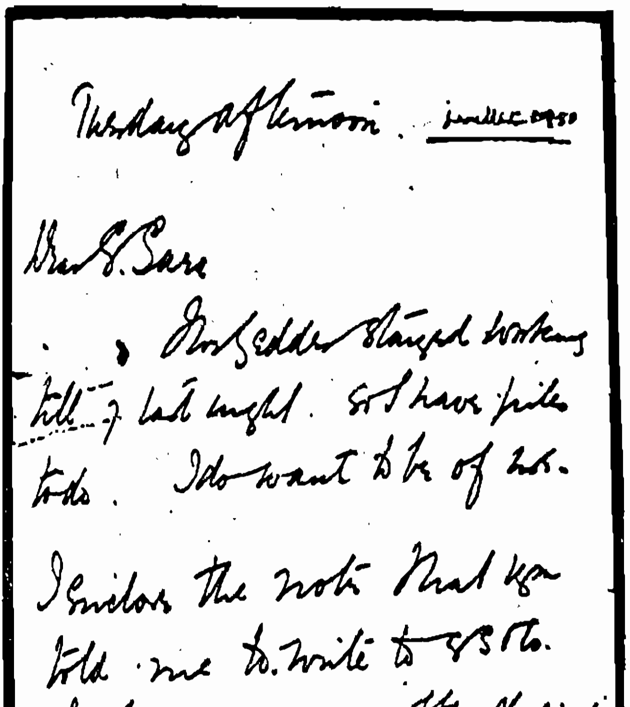
It is fully described as "exceedingly ugly, the most hideous caricature of the human face divine."*

The following is a native representation of Kali, the goddess from which Calcutta takes its name :



* In the *Antiquities of Orissa*, Vol. II., pp. 121-123, a full account is given of the Image.

ক্রীশ্চান মিশনারীরা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কি জাতীয় কুৎসা প্রচার করত, তার নমুনা। এ ধরনের বইয়ের লেখক হিসাবে বিখ্যাত ডঃ মার্ডকস্-এর বিবেকানন্দ-বিষয়ক একটি পুস্তিকা থেকে ঐ ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে। উপরের ছবিতে জগন্নাথের রূপার্চনা করা হয়েছে। তার নীচে কালীর মুদ্রিত ছবিটি ভাল করে লক্ষ্য করলে কিছু মিশনারী-কৌশল বোঝা যাবে। হিন্দুরা মূর্তি-নির্মাণের সময়ে যে কিছু আলঙ্কারিক রীতিকে মান্য করে, তাকে একেবারে মুছে দিয়ে কালীর পদতলে শয়ান শিবকে দাড়ি-গোঁফওয়ালা এক প্রৌঢ় হিন্দু দাঁড় করানো হয়েছে, যার ফলে এইসব গ্রন্থের সুসভ্য পাশ্চাত্য পাঠকেরা মনে করেছেন—"কালী বাস্তব এক নারী, যে নিজের স্বামীকে খুন করেছে।"—গ্রন্থের ৩০১—৩১২, ৩২৯. ৩৪১—৩৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।


Thursday afternoon.

Dear S. Sara

Mr Geddes stayed working till 7 last night. So I have piles to do. I do want to be off now.

I enclose the note that you told me to write to S.S.R.
Ly Betty approves of the dedication.
Vireshwar is Swami's real name.
It is the name of the Siva in Benares to whom his mother prayed.
Very few people know this

'কালী দি মাদার' গ্রন্থ 'বীরেশ্বর'কে উৎসর্গ করা। বাইরে থেকে মনে হয় বীরেশ্বর-শিবকেই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে, বিশেষতঃ বইয়ের বিষয় যখন কালী। নিবেদিতা কিন্তু 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দকে'ই উৎসর্গ করেছিলেন, যদিও সেকথা ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় লেখা হয়েছিল বলে বিরক্ত হয়েছিলেন। মিসেস বুলকে লেখা এই চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মধ্যে নিবেদিতার স্বীকারোক্তি পাই—

"Ly. Betty approves of the dedication. *Vireshwar* is Swami's real name. It is the name of the Siva in Beneras, to whom his mother prayed. Very few people know this. . . . . ."

—গ্রন্থের ৩৫২-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Kali the mother

The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant sonant;
~~[illegible]~~ In the roaring whirling wind,
Are the souls of a million lunatics;
* Just loose from prison house,
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky.
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand thousand shades
Of death begrimed and black;
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy.
Come mother Come.

For terror is thy name,
Death is in thy breath,
And every shaking step,
destroys a world for e'er.
time = Kali (f) Thou "time" the all destroyer.
~~Then~~ Come O mother Come

Who dares misery love,
And hug the form of death,
Enjoy destruction's dance,
To him the mother comes.

স্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত 'কালী দি মাদার' কবিতার প্রতিলিপি।

আদ্যাশক্তি কালীর সংগে স্বামীজীর ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক কিছু অবিস্মরণীয় কথা স্বামীজীর নিজের মুখ থেকে শুনে নিবেদিতা অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অধ্যাত্মরাজ্যের সেই গোপন দলিলটিকে আমরা প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

S. Do you remember the man who said "I believe in God & the angels & not in nothin' else"?

K. Wasn't it about "loafing about the Throne"?

S. Yes — a damned sight better business than loafin' about the Throne".

Well. That's my position. I believe in Brahman & the gods — & not in nothin' else."

They have put me down to preside at your lecture. But I shall not go, unless I am perfectly well. & I must tell you plainly that I don't expect to be that. It will be awfully hot. & I'll not [illegible] my [illegible]. For we have been Kali worshippers for centuries. Every bit of that place is holy land. Even the very sand on the ground is holy. Every drop of it. I'd lick it all up out of reverence.

But I have given strict orders about your lecture. There are to be no chairs. Everyone is to sit on the floor of the theatre at your feet. And all shoes shall are to be taken off. If Europeans & Mussalmans are present you may have to sit on this yourself. You will be on the steps with a few of the guests.

How I used to hate Kali & all Her ways. This was my 6 years' fight, because I would not accept Kali.

S. Do you remember the man who said, "I believe in God and the angels and not in nothin' else"?

N. Was it about "loafin' about the [. . .]" ?

S. Yes, "a damned sight better business than loafin' about the [. . .]".

Well, that's my position. I believe in Brahman and the gods; and not in *nothin'* else.

They have put me down to preside at yr. lecture. But I shall not go unless I am perfectly well, and I must tell you plainly that I don't expect to be that. It will be awfully hot, and I could not restrain my excitement, for we have been Kali worshippers for centuries and every bit of that place is holy to me. Even the very blood on the ground is holy. Every drop of it. I could lick it all up out of reverence.

But I have given strict orders about your lecture. There are to be no chairs. Everyone is to sit on the floor of the theatre at Yr. feet. And all shoes and hats are to be taken off. If Europeans and Brahmos are present you may have to insist on this yourself. *You* will be on the steps with a few of the guests.

How I used to hate Kali and all Her ways. *That* was my 6 year's fight, because I would not accept Kali.

U.. But now you have accepted Her openly, have you not, Swami?

S. I had to. Remember how Paramahansa delivered me to Her. And you know I believe that He guides me in every little thing I do. Think how what She likes with me.

But I fought so long.. I was stubborn you see, and that told me. 'I thought him the most [illegible] man I had ever seen. I knew that he loved me as my own father & mother [illegible] not power [illegible].

U. But when you battled so long, with all your chances. What kind of [illegible] still [illegible]

S. Yes. but they never saw that innermost [illegible] him that I saw! . . . How [illegible] the love.

U. But I thought it was His greatness that [illegible] the love would you without falling - wasn't it?

S. His greatness had not dawned on me then. That was afterwards, when I had given in. At that time I thought him simply a beaming baby.

N. But now you have accepted Her specially, have you not, Swami?

S. I had to. Ramakrishna Paramahamsa dedicated me to Her. And you know I believe that she guides me in every little thing I do, and just does what She likes with me.

Yet I fought so long. I loved the man, you see, and that held me. I thought him the purest man I had ever seen, and I knew that he loved me as my own father and mother had not power to do.

N. But when you doubted so long, with all yr. chances, what wonder if Brahmos still doubt?

S. Yes, but they never saw that immense purity in Him that I saw! . . . . nor got the love.

N. But I fancy it was His greatness that made the love hold you without palling. Wasn't it?

S. His greatness had not dawned on me then. That was afterwards, when I had given in. At that time I thought Him simply a brain-sick baby,

always seeing visions & things. I hated it.. Then I had to accept them too

U. Won't you tell me what made you do that Sir? What broke all your opposition down?

S. No that will die with me. I had great suffering at that time you know. My father died & so on. And she saw the opportunity to make a slave of me. "I beg was the very words — "To make a slave of you". And R. P. made me one too......
Curious, she only lived 2 years after doing that & most of that time she was suffering. She was only 8 months in this own health & brightness.

Guru Govind Singh (or Nanak?)
was like that, you know, looking for the one disciple to give his power to — And he passed over all his own family. His children were as nothing to him. Till he came upon the boy & gave it to him, & then he could die.

U. I always look upon Sri R.P. as incarnation of Kali. Is it not what the future will call Him?

always seeing visions and things. I hated it. And then *I* had to accept Her too!

N. Won't you tell me what made you do that Sw.? What broke all your opposition down?

S. No, that will die with me. I had great misfortunes at that time you know. My father died, and so on. And she saw Her opportunity to make a slave of me. They were Her very words: "To make a slave of you." And R. P. (Ramakrishna Paramahamsa) made me over to Her. . . . . Curious, He only lived 2 years after doing that, and most of that time He was suffering. He was only 6 months in His own health and brightness.

•Guru Govind Sing (or names?) was like that, you know, looking for the one disciple to give his power to, and he passed over all his own family. His children were as nothing to him. Till he came upon the boy, and gave it to him, and then he could die.

N. I always look upon Sri R. K. as an Incarnation of Kali. Isn't that what the future will call Him?

S. Yes. I think there is no doubt that we picked up the [illegible] of Ramak. for the Hindus. You see [illegible] I cannot help believe that there is somewhere a Great Power that thinks of itself as Feminine and called Kali, the Mother! . . . .
-- -- And I believe in Brahman too, - that there is nothing but Brahman [illegible]. - But you see it's always like that. It's the multitude of cells in the body that make up the person - the many brain-centres that produce the one consciousness.

H. Yes - always Unity in Complexity

S And so? And why should it be different with Brahman? It is Brahman, the One - & yet it is the gods too.

And so you see I believe in [illegible]

S. Yes, I think there's no doubt that Kali worked up the body of Ramakr. for Her own ends. You see Margot I cannot *but believe* that there is, some where, a Great Power that thinks of itself as Feminine and called Kali, and the Mother! . . . And I believe in Brahman, too,—that there is nothing but Brahman even,—but you see it's always like that. Its the multitude of cells in the body that make up the person—the *many* brain-centres that produce the one consciousness.

N. Yes, always Unity *in Complexity.*

S. Just so! And why should it be different with Brahman? It is Brahman—the One—and yet it is the gods too.

And so you see *I* believe in Brahman

the "gods and not in nothin' else!"

But now the torments me sometimes. And then I go to the sometimes, & sing "If you don't give me so the tomorrow, I'll throw you over to preach Chautauqua", — And that thing always comes.

But these things must never be told to anyone — mind that.

U. You mean Maggie not yet ready for the world to hear?

"Never!" said Swami — going away.

and the gods and not in nothin' else!

But how She torments me sometimes! And then I go to Her sometimes, and say, "If you don't give me so and so tomorrow, I will throw you over and preach Chaitanya" and that thing always comes.

But these things must never be told to anyone, mind that.

N. You mean they are not arguments for the world to hear?

"Never!" Said Swami, going away.

KALI-WORSHIP

A LECTURE DELIVERED BY

MISS MARGARET NOBLE

(Sister Nivedita of the Rama Krishna Mission).

AT THE KALI'S TEMPLE AT KALIGHAT

On the 28th May, 1899.

PUBLISHED BY

HARIDAS HALDAR,

PRIEST TO HIS HIGHNESS THE MAHARAJAH OF JEYPURE (RAJPUTANAH) AT THE KALIGHAT TEMPLE.

Calcutta:

PRINTED AT THE "DIANA PRINTING WORKS"

2/1. KEDAR NATH BOSES LANE,

BHOWANIPORE.

1900

For free distribution.

২৮ মে, ১৮৯৯ তারিখে কালীঘাট মন্দির-প্রাঙ্গণে নিবেদিতা তাঁর দ্বিতীয় কালী-বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তারই প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।—গ্রন্থের ৩৪৬-৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

THE WORLD: SUNDAY, APRIL 1, 1900.

YOUNG ENGLISH GIRL WORSHIPS IMAGES.

Miss Noble Renounces Wealth and Society to Become Nun in a Hindu Order.

> "From the Unreal lead us to the Real; from Darkness lead us unto light; from Death lead us unto Immortality. Reach us through ourselves and evermore protect us, O Thou Terrible One, from ignorance, by Thy sweet, compassionate face."—Miss Margaret Noble's (Sister Nivedita's) substitute for the Lord's Prayer.

On the limited train that left New York for Chicago yesterday was a sweet-faced young woman clad in a strange garb. Around her was wrapped a long garment of gray woollen stuff, with loose Cassock sleeves, half dress and half robe, held in at the waist by a Hindu girdle. It was the dress of an Indian devotee. She was Miss Margaret Noble, a wealthy Englishwoman, who has been converted to the weird beliefs of the Far East.

She believes in Kali worship—the bowing down before the image of a black woman dancing on the body of a white man. Her faith in reincarnation is supreme; the prayer to the goddess Shivna she thinks is far superior to the Lord's prayer. She holds that the Supreme Being should be typified by motherhood, rather than by fatherhood, which is the essence of Kali worship. She holds very dear all the mysticisms of the Orient—yet she still clings, she says, to her Christianity.

In the Order of Ramkrishna.

Miss Noble is now Sister Nivedita. She has been initiated into the mysteries of the Hindu order of Ramkrishna. There are only two other persons of foreign birth within its ranks, an English officer and his wife.

Sister Nivedita was in New York a week, and stayed with her friends, Mr. and Mrs. Francis H. Leggett, at their beautiful home, No. 21 West Thirty-fourth street. On Thursday evening she gave a talk there on "The Message of India" to about twenty society people, who were vastly interested in this extraordinary young woman who has renounced the pleasures of money and of society to join a mystic order of Hindus.

"I have renounced the English world," said Sister Nivedita to a World reporter, who saw her just before she left. "I will spend the rest of my life in India. It is far more satisfying than the crude West. I am an Indian nun now, for I have taken the three vows—never to marry, never to possess anything, always to obey.

"Our monastery and nunnery are at Belur, just outside of Calcutta. The head of the order is Swami Vivekananda, an intellectual Hindu. We have no objections to Christianity. In fact, I am still a member of the Established Church, but our order goes farther. We believe in letting each soul choose its own religion and work out its own destiny. We have parted company with creeds.

Not Understood by Masses.

"Kali worship is opposed by the missionaries very strongly, but I believe in it. The image may be grotesque, but the symbolism of motherhood rather than fatherhood in the Supreme Being is one of great dignity. Unfortunately the masses can't understand this.

"We put no intellectual limitations on religion. We accept no authority. We believe in anything we like. The Hindus say that if we were able to walk to the sun and take a photograph at every step, all would be different, but all would be true. So it is with religions. All may be true, but different."

Miss Noble left England for India eighteen months ago and spent her time between living in the squalid native quarters of Calcutta and in travelling in Northern India. She is in America to publish a book and to raise funds for an educational movement in India which purposes teaching girls m[illegible] training, in order that they may [illegible] support themselves.

[পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

'পুতুলপুজো করেন, এমন ইংরাজ তরুণী' সম্বন্ধে আমেরিকান সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ বিবরণীকে যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন এবং তথ্যানুগ বলতে হবে।। এই বিবরণে যদি মিস নোবল 'ধনী ইংরাজ মহিলা' হন, এবং তাঁর নতুন নাম হয় 'নিভেদ্‌তিনা'—সেটা সংবাদপত্রের পক্ষে কিছু মারাত্মক ভুল নয়। সংবাদপত্রটি স্বভাবতঃই তাঁর 'বিচিত্র পোষাকের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল, যিনি 'স্থূল-রুচি পাশ্চাত্ত্য দেশ ত্যাগ করে' ভারতবর্ষে বসবাস করতে গেছেন 'দূর প্রাচ্যের অলৌকিক রহস্যময় ধর্মে' বিশ্বাসী হয়ে। মিস নোবল অবশ্য তাঁর খ্রীস্টান মত ত্যাগ করেননি, কারণ তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা 'ইনটেলেকচুয়াল হিন্দু' স্বামী বিবেকানন্দ খ্রীস্টান ধর্মের বিরোধী নন। তাহলেও মিস নোবল বিশেষভাবে ঈশ্বরের মাতৃভাবের উপাসক, অর্থাৎ তিনি কালীমূর্তির সামনে প্রণত হন, যে-কালী মূর্তি আর কিছু নয়, এক শাদা পুরুষের বুকের উপর এক ঘন কালো নারীর নৃত্য। 'নিভেদ্‌তিনা' অবশ্য স্বীকার করেন যে, সর্বসাধারণে এই মূর্তির রহস্য বুঝতে অসমর্থ ইত্যাদি।—গ্রন্থের ৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মনে হয়, এইসব প্রশ্ন এখানে ত্যাগ করাই উচিত; ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রশ্নের আলোচনাতেই এগুলি আসতে পারে।

মনে রাখা ভাল, আমরা সত্যের সন্ধানী; কোনো দলের জয়লোভী নই। আরও মনে রাখা ভাল, কালীপুজোর দোষদর্শনে তিনিই অধিকারী যিনি তা 'অর্জন' করেছেন কালীপুজোর সবকিছু জানার ও তার থেকে সবকিছু পাবার পরে।

সে অধিকার যে মানুষটির ছিল, তিনি কিন্তু কোনো দোষ দেখেন নি। অপরপক্ষে জগন্মাতার নামে যে-বাণী উচ্চারণ করেছেন তা আজ ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে, নানা জাতির মানুষকে আকর্ষণ করে আনছে মায়েরই পদতলে।

যে অনন্ত অখণ্ড পরাচৈতন্যের কাছে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ অলীক বলে প্রতীয়মান হয়, বেদান্তে তা-ই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত, এবং যে শক্তি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ রূপে ব্যক্ত হয়, তার নাম 'মায়া'। তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করার উপযুক্ত স্থান এ নয়, কিন্তু মায়া তত্ত্বটি কি তা বলার প্রয়োজন আছে। অনন্ত ও পরমকে সংজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না, আপেক্ষিক সম্বন্ধে আনা যায় না, বা অংশে ভাগ করা যায় না। যদি কোনো বস্তুকে অপর বস্তুর মত দেখায়, যা আসলে তা নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, তখন আমরা বলি দৃষ্টি-মায়া। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ক্ষেত্রে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের এই ধরনের অসংখ্য বর্ণময় লীলাচাতুরী ঘটে। ব্রহ্ম যদি চিরসত্য হন, তাহলে বস্তুজগৎ বিশ্বজগৎ মায়ার লীলা ছাড়া কিছু নয়।

প্রাচীন ঋষিরা এই মায়াকে প্রতীকরূপ দিতে চেয়েছেন, তাকে স্পষ্ট আকারে প্রকাশ করেছেন কালীমূর্তিতে।

হিন্দুদের তথাকথিত পৌত্তলিকতা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, পৃথিবীর সকল সাধকই শব্দ-প্রতিমা ব্যবহার করেন, হিন্দু ঋষিরা তার অতিরিক্ত স্পষ্ট মাতৃমূর্তি রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বোঝার সুবিধার জন্য, তার ফলেই তাঁদের মধ্যে প্রতিমাপুজোর চলন।

কালীমূর্তি কি, এখন দেখা যাক।

তিনি যে ভয়াল, ভয়ঙ্করী, প্রথমেই চোখে পড়ে। তিনি উলঙ্গিনী। স্বামী-বক্ষে নৃত্যপরা। কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা। সদ্য নিহতদের তপ্ত রক্তপানে ব্যাদিত রসনা। খড়্গধারিণী; নিক্ষিপ্ত অস্ত্রমধ্যে এবং ভূতপ্রেত পিশাচদলের মধ্যে বিরাজমানা। সর্বনাশা মেঘপুঞ্জের মতই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। মুক্তকেশ ছড়িয়ে আছে পদতলে। হা-হা হাসিতে লজ্জা পায় বজ্রধ্বনি। তিনি স্বয়ং ত্রাস।

এই কি তরুণী হিন্দুনারীর ছবি? হিন্দু নারীর স্বামী ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তিনি এতই মাধুর্যময়ী, লজ্জাশীলা, সংকুচিতা, সর্বদা সর্বাঙ্গে আবৃতা, কম্র কোমল প্রেমময়ী মাতা। কালী এই হিন্দু নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিচ্ছবি।

ঠিক সেইভাবেই ঋষিরা তাঁকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন; আর আমাদের বলতেই হবে, তাঁরা সফল হয়েছেন। তাঁদের নির্মিত কালীমূর্তির চেয়ে অ-নারীজনোচিত, বিশেষতঃ অ-হিন্দুজনোচিত আর কিছু হতে পারে না।

ব্রহ্ম ভিন্ন মায়ার পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যেমন সর্প ভিন্ন রজ্জুতে সর্পবোধ

সম্ভব নয়, কিংবা জল ভিন্ন বুদ্‌বুদ্‌। সুতরাং হিন্দুরমণী, সনাতনী নারীপ্রকৃতির নমুনা যিনি, স্বামী ভিন্ন তাঁর পৃথক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মায়া দেখালেন কী? —সর্বদা পিছনে থেকে নিজের আদর্শ ভূমিকা পালন করে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি ব্রহ্মকে অধিকার করেছেন, আচ্ছন্ন করেছেন, নিজেকে প্রকাশ করেছেন অনন্ত ভয়ংকর নারীত্ব-বিরোধী, মাতৃত্ব-বিরোধী উপায়ে। অনন্ত, অম্লান, তরঙ্গোৎক্ষুব্ধ অমৃতসমুদ্রের পরিবর্তে আমরা পাচ্ছি আপেক্ষিক জগতের বহুধাব্যাপ্ত রূপকে, পাচ্ছি দুঃখ ও মৃত্যুর অশান্ত ক্রন্দনকে, আত্মসংরক্ষণের উন্মত্ত সংগ্রামকে—যে সংগ্রাম নীহারিকা থেকে মানবজীবন পর্যন্ত সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়কে আকারিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। যদি আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা না করি, স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে না থাকি, আমরা কখনই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সকল পর্যায়ের মধ্যে বিস্তারিত, জীবনের অগ্রগতির নিয়ামক *ঐ নীতিটিকে অস্বীকার করতে পারব না, যার নাম—আত্ম-সংরক্ষণের সংগ্রাম*। এবং, কালীদেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আতিশয্যপূর্ণ কিংবা অতিরঞ্জিত মনে হবে না, যদি তাঁকে আপেক্ষিক জীবনের এই মৌল নীতির স্পষ্ট প্রতিমারূপে দেখা হয়।

কালীমূর্তির এই ব্যাখ্যা শোনার পরে মনে প্রথম যে জিজ্ঞাসা জাগবে, তা হল—যদি কালী এমনই হন, তাঁকে পূজা করা কেন? তিনি অন্ততঃ কোনোমতে পূজার্হ হতে পারেন না।

কিছু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই প্রশ্নের পিছনে রয়েছে উপাসনার মূল অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতারই প্রতিক্রিয়া। উপাসনার অর্থ, হিন্দুর কাছে, নিত্য স্মরণ মনন।

তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে মোক্ষলাভের পক্ষে—এই যে প্রতীয়মান জগৎ, যা তার অগণ্য ভয়ংকর রূপে আমাদের আতঙ্কিত করছে, তা আসলে মিথ্যা আকার ভিন্ন কিছু নয়, পিছনে আছেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম,—এই বোধের মধ্যে নিত্য সঞ্জীবিত থাকা ছাড়া এ জগতে গুরুত্বপূর্ণ আর কি থাকতে পারে?

মায়া মিথ্যা, কালী তারই প্রতীক। কালীকে যদি আদর্শ হিন্দু নারী করে চিত্রিত করা হত, তাহলে তিনি সত্য হয়ে উঠতেন। তাঁর অবাস্তবতা দৃশ্যমান করবার জন্য—কালী নিজেই তাই করেছেন—তাঁকে আদর্শ না-নারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

শিবকে পদতলে তিনি আবৃত করে আছেন, নাচছেন শিবের বুকে, অন্যের মনোযোগ টেনে এনেছেন নিজের উপরে—যেমন মরীচিকা ঝলমল করে উঠে বিভ্রান্ত করে দৃষ্টিকে।

তাই কালীকে ভেদ করে দৃষ্টি প্রেরণ করতে হবে; তাঁকে অতিক্রম করে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা, তাঁর উপাসনা ছাড়া গত্যন্তর কি? কোনো বই যদি কেউ মুখস্থ করতে চায়, সে কি সাদা কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে?

তাই আসল সাধক, যিনি তাঁর ভিতর দেখে তাঁকে জেনেছেন, তিনি শান্তভাবে তাঁর অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন; যেভাবে তিনি দেখান নিজেকে, সেভাবে তাঁকে না দেখে, দেখতে পেরেছেন আসল যা-তিনি, তাঁকে। ব্রহ্মের মধ্যেই তাঁর সত্য অস্তিত্ব, যেমন জাগ্রত 'আমি' থেকেই স্বপ্নের 'আমি' উদ্ভূত। কোনো নির্দিষ্ট-

মনে স্বপ্ন যতই জীবন্ত সত্য বলে মনে হোক, জাগ্রত অবস্থায় তার অস্তিত্ব নেই। দ্রষ্টা বলেন, কালীকে যা মনে হয়, তা তিনি নন, যথার্থত কালী ও ব্রহ্ম এক। তিনি মোক্ষদায়িনী তারা, তিনি ব্রহ্মময়ী।

দিব্যসাধক রামপ্রসাদের চেয়ে কালীকে পূর্ণতরভাবে প্রকাশ করতে আর কেউ পারেন নি। প্রাণশক্তিতে, সহজতায়, গভীরতায় তাঁর মাতৃভাবের গানগুলির কোনো তুলনা নেই। আমরা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গানেরই মাত্র অনুবাদ এখানে শোনাতে পারব :

কে জানে কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে পায় না দরশন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের বচন।
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম, অন্যে কেবা জানে তেমন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন,
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ,
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।

[কথামৃত, পঞ্চম খণ্ড (পৃষ্ঠা ৩) থেকে এই পাঠ নেওয়া হয়েছে।]

Who knows what Kali is?
The six *darshanas* (system of philosophy)
have not obtained Her *darshana* (sight).
Kali as a swan, plays with the swan
in the lotus forest.
The Yogi always meditates on Her in the
Muladhara (the plexus underneath the
spinal chord) and in the *Sahasrara*
(that in the brain).
Kali is *Atma* (self) of the *Atmarama*
(enjoyer of the self);
Innumerable are the wonderful evidences
and administrations of Her.
Tara resides in all forms just as she pleases.
The universe is the Mother's womb—you know
what size it is.

The *Mahakal* understands her properly,
who else knows Her like Him?
The world laughs at Prasad's words,—
"crossing the ocean by swimming?"
My mind has grasped it—but not the *prana*.
This dwarf wants to touch the moon.

মন করো না দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসী।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

My mind, don't be intolerant.
I have looked and searched through the
Veda Agama and Purana ;
Kali, Krishna, Shiva, Rama—
my Elokeshi (she with dishevelled
hair) is all these.
She holds the horn as Shiva, and
plays on the flute as Krishna,
O Mother, you have a bow as Rama,
and a sword as Kali.
Prasad says, the attempt to demonstrate
Brahman is like the smile of the person
who has got big rows of teeth
always projecting out.
My Brahmamayi is in all forms and
at her feet are the Ganges, Gaya
and Kashi.

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥

হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা॥

ত্যজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

শ্রীরামপ্রসাদ রটে মা বিরাজে সর্বঘটে।
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা॥

Would, O Tara, such a day come, when
streams will flow down my eyes with
my repeating Tara Tara?
The lotus inside the breast will blossom and
raise up its head and the darkness of
the mind shall vanish.
And I shall fall down on the earth, and be
inside myself with the name of Tara.
Then shall I be able to give up the questions
of distinction and non-distinction (or
duality and non-duality),
All wants of the mind will vanish.
O the Veda is true a hundred times—
my Tara is formless.
With the greatest happiness Ramaprasad
proclaims to the world that the Mother
resides in all forms,
Look O blind eyes, at the Mother,
She is the dispeller of darkness.

আমি জানি, কালীপুজোর সঙ্গে নানা অশুচি পাশবিক রীতিনীতি এসে জুটেছে। সে সব বিষয়ে আমাদের দুঃখ যেমন অসীম, তেমনি অপরপক্ষে কালীপুজোর সবকিছুর বিরুদ্ধে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যে উগ্র বিদ্রূপ করে থাকেন অনেক সময়, তার মধ্যে উচ্চ প্রজ্ঞার লক্ষণ ιদখি না। আগাছাকে দূর করুন, কিন্তু দোহাই, বাগানকে নষ্ট করবেন না।

[redacted]

দ্বিতীয় কালী বক্তৃতার পটভূমিকা

নিবেদিতা কয়েক মাসের মধ্যে আর একটি কালী-বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা কালীঘাট মন্দিরপ্রাঙ্গণে হয় ২৮ মে, ১৮৯৯। অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতার পরে, নিবেদিতার চিঠিতে দেখেছি, কালীঘাটের মন্দির-কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে কালীঘাটে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান এবং স্বামীজী কালীঘাট মন্দির-কর্তৃপক্ষের উদারতায় বিশেষ খুশী হয়েছিলেন; হিন্দুসমাজের 'গণ্ডীবদ্ধতা' দূর হওয়ার লক্ষণ এর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন।

স্বামীজীর আনন্দের পিছনে ছিল একটি বেদনার ছায়া। সে তিক্ত ইতিহাস, হিন্দুসমাজের একাংশের নীচতার কাহিনী আমরা একদা এক প্রবন্ধে উন্মোচন করেছিলাম।* তার থেকে অল্প কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে ধর্মপ্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ভারতবর্ষের উপর দিয়ে ভাবাবেগের মহাবন্যা বয়ে গিয়েছিল, এবং ভারতবর্ষ তাঁকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তখন পর্যন্ত ভারতের সেকালের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। দ্বিধাহীনভাবে একথা বলা যায়, রাজনৈতিক নেতা ছাড়া সেই বিপুল জনকল্লোল আর কারও পক্ষে ভারতের ইতিহাসে পরবর্তীকালেও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতীকরূপে, বিজয়ী বীরের মত বিবেকানন্দ যখন ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়েছেন, যখন রাজা ও প্রজা সকলে আক্ষরিকভাবে তাঁর রথের রশি টানছে—তখন একথা সত্যই বিশ্বাস করানো কঠিন হবে, হিন্দুধর্মের এই শ্রেষ্ঠ আচার্যের মুখের সামনে কলকাতার একটি হিন্দু-মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—এবং সে মন্দির—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির!!!

পৃথিবীতে বহু অবিশ্বাস্য বস্তুকে চোখ রগড়ে, চোখের পাতা উপড়ে ফেলে সত্য বলে মানতে হয়, এখানেও তাই মানতে হবে; ঔচিত্য, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়নীতি প্রভৃতি বহু জিনিস ভুলতে হবে—ভুলতে হবে প্রথমেই, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ রূপেই পৃথিবীর তীর্থ, এবং তা যে 'পৃথিবীর তীর্থ', এই সত্য উদ্ঘাটিত করেছিলেন পৃথিবীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দই।

তথাপি, বিবেকানন্দ যত বড়ই হোন, আইনের শক্তি তাঁর থেকে অনেক বড়, যে-আইনে নিজ সম্পত্তির উপরে ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ছিল পারিবারিক সম্পত্তি—সেই 'পারিবারিক দেবালয়ে' যে-কোনো ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ করার অধিকার উক্ত পরিবারের অবশ্যই আছে। স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সেই অধিকারই প্রয়োগ করা হয়েছিল। এবং পাঠক বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বিরুদ্ধে সেই অধিকার 'প্রায়' প্রযুক্ত হচ্ছিল।

---

*স্বামী বিবেকানন্দ ও দক্ষিণেশ্বর মন্দির বিতর্ক : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ; কথাসাহিত্য, কার্তিক, ১৩৭১।

কারণ—শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীর কাছে যাই হোন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ছিলেন 'ছোট ভট্‌চাজ্‌।' দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি এবং পরবর্তী মালিক মথুরামোহন বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবতাজ্ঞান করে, তাঁর জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু তা হলেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাতায় তাঁর মাসিক বরাদ্দ ছিল ৫ টাকা (বেড়েছিল বা বদলেছিল কি?)—এবং ঐ মন্দিরের অনেকে সেই কথাটার উপরে সবিশেষ আস্থা রেখেছিল।

মথুরামোহনের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবায় পিতা বা মাতামহীর অনুগামী ছিলেন না, তা নানা প্রসঙ্গেই পাই। (মূল প্রবন্ধে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। তারপর—)

শ্রীরামকৃষ্ণের সামান্যতম ইচ্ছাপূরণে উদ্‌গ্রীব মথুরামোহন—তাঁর পুত্র ত্রৈলোক্য 'রাগের মাথায়' হলেও শ্রীরামকৃষ্ণকে মন্দির ছেড়ে যেতে বলতে পারেন!—সেই মন্দির —যার অন্নভোগ হতেই পারত না শাস্ত্রমতে, যদি না শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্য পক্ষে বিধান দিতেন, এবং যে-মন্দিরের দেবতার অঙ্গহানি দূর করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যার দেবীকে জাগ্রত করেছেন তিনিই।......

এই ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসই স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করতে দেননি। কারণ?—বিলেত যাওয়ার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ আর হিন্দু নন। এই ত্রৈলোক্যনাথই শ্রীরামকৃষ্ণের উপর বিরূপতা দেখিয়েছেন—কারণ—শ্রীরামকৃষ্ণও যথেষ্ট হিন্দু থাকছিলেন না—তিনি বিলেতফেরত ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শুধু মেলামেশা করছিলেন না, তাঁর বাড়িতে আহার্য পর্যন্ত গ্রহণ করছিলেন। হিন্দুধর্মের শুদ্ধিরক্ষার যে দায়িত্ব ত্রৈলোক্যনাথ গ্রহণ করেছিলেন, তদনুযায়ী তিনি, কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও দক্ষিণেশ্বরের শূদ্র-মন্দিরে পৌরোহিত্য স্বীকারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে তিরস্কার করেছিলেন কি না জানি না—যে অনুচিত পৌরোহিত্যের জন্য, আমরা এটুকু জানি—শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ব্রাহ্মণসমাজে পতিত ছিলেন।"

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামীজীর প্রবেশ নিষিদ্ধই শুধু হয়নি, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এসবই হয়েছিল নিবেদিতার ভারতে আগমনের অব্যবহিত আগে। বিবেকানন্দের প্রতি নিক্ষিপ্ত অপমানে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় দলই খুশী হয়েছিল। রক্ষণশীলেরা কেন খুশী, তার কারণ বোধগম্য—এই লোকটি প্রথমতঃ শূদ্র, অন্যায় করে সন্ন্যাসী হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসী হয়েও গুহায় বাস না করে সমুদ্র ডিঙিয়েছে; তৃতীয়তঃ সমুদ্র লঙ্ঘনের মত মহা অপরাধ করেও লজ্জিত নয়, বরং সেই দুষ্কর্মটাকেই মুক্তিপথ বলে প্রচার করতে চায়; চতুর্থতঃ শুধু ম্লেচ্ছ-দেশে গিয়েছে তাই নয়—ম্লেচ্ছাহার করেও সেটা গোপন করে না; পঞ্চমতঃ, ম্লেচ্ছাহার তো করেই, আরও মারাত্মক, ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বসে আহার করে; ষষ্ঠতঃ, সবচেয়ে ভয়াবহ, এই ব্যক্তিত্বশালী নেতা-জাতীয় লোকটি এমন প্রভাববিস্তার করেছে যে, সাধারণ লোকে এর কথাকেই ধ্রুববাক্য বলে মেনে নিতে শুরু করেছে। এত কারণ!! রক্ষণশীল আক্রোশ তাঁর সামাজিক অমর্যাদা করতে অসমর্থ হয়ে অন্ততঃ পারিবারিক অধিকার-সীমায় তাঁকে অপমানিত করতে পেরে পরিতুষ্ট হল।

কিন্তু কিছু প্রগতিশীলের এক্ষেত্রে আমোদের কারণ কি? অন্য কিছু নয়, তাঁদের প্রগতিশীলতার একচেটিয়া অধিকারে যে বিবেকানন্দ হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি আত্মশোধন করতে বলেছিলেন দেশকে, কিন্তু আত্মশোধনের নামে আত্মাবমাননা করতে নিষেধ করেছিলেন। অপরদিকে কিছু আত্মাবমাননা না থাকলে আর সংস্কারস্পৃহা জাগে না।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে খুশী হয়েছিলেন ক্রীশ্চান মিশনারীগণ। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন, বিবেকানন্দ তাঁদের প্রচারের সর্বনাশ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালেই তাঁর বিরুদ্ধে ভারতে (বলাই বাহুল্য ভারতের বাইরেও) তাঁরা যথেষ্ট কুৎসা করেছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট অভিপ্রেত ফল হয়নি। তাঁরা সুযোগ খুঁজছিলেন। বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তনের পরে জয়ধ্বনির ঝাপটে যখন তাঁদের অভিপ্রায়গুলি গুঁড়ো হয়ে হাওয়ায় উড়ছে, তখন সহসা সেই শূন্যে তাঁরা সোঁধ দেখলেন—দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বিবেকানন্দকে নাকি ভ্রষ্ট হিন্দুরূপে বিতাড়িত করা হয়েছে! এতো শুধু সুযোগ নয়—একেবারে সুবর্ণ সুযোগ—ওহ্ ক্রাইস্ট!! হিন্দুধর্মের আচার্যরূপে কীর্তিত মানুষটি হিন্দু মন্দির থেকে বিতাড়িত, জাতিচ্যুত, অসম্মানিত একটি লোক—বাহবা কী আনন্দ! কী অপূর্ব প্রচারসামগ্রী!! অবিলম্বে বিবেকানন্দের মূল বৈদেশিক কর্মক্ষেত্র আমেরিকায় সে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং আমেরিকার পত্রপত্রিকা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল মুখরোচক খবরে।

নিন্দা গ্লানি বিবেকানন্দ গায়ে মাখতেন না, মনে করতেন 'persecution ছাড়া জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না', অপমানের ধূলিধূসর মহাদেবের মূর্তি নিয়ে তিনি পৃথিবীর পথে হেঁটেছেন, উপেক্ষা করতে চেয়েছেন পথের কাঁটাকে, তবু—তিনি যে ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারছেন না—এ ব্যথা বোধহয় তাঁর মন থেকে যায়নি। হয়ত ব্যাপারটাকে দার্শনিক ঔদাস্য নিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন, দুঃখের কৌতুক ফুটে উঠেছে তাঁর কথায়*—তবু—শ্রীরামকৃষ্ণের চল্লিশ বছরের পবিত্র অস্তিত্বে পূর্ণ যে মন্দির—সেখানে তাঁর জন্মোৎসব নিষিদ্ধ! নরেন্দ্রনাথের যৌবনের জ্বলন্ত তপোবনে বিবেকানন্দ প্রবেশ করতে পারবেন না!

---

* স্বামীজী ই. টি. স্টার্ডিকে এক চিঠিতে লেখেন : "মিসেস জনসনের মতে ধার্মিক ব্যক্তির রোগ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে, আমার ধূমপানাদিও পাপ। মিস মুলারও আমাকে ছেড়ে গেছেন—ঐ রোগের জন্য। হয়ত তাঁরাই ঠিক। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য, এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয় হই যে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন লোক আজও তো দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ যাকে বহু জায়গায় যেতে হয় তার পক্ষে সকলকে তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন প্যান্টালুন না থাকলে লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করত। তারপর আমাকে শক্ত আস্তিন ও কলার পরতে বাধ্য করা হল— তা না হলে তারা আমায় স্পর্শই করবে না। তারা আমায় যা খেতে দিত, তা না খেলে অদ্ভুত মনে করত—এমনি সব।" (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯)

এই পটভূমিকা দেখিয়ে দেয়, কালীঘাট-কর্তৃপক্ষের উদারতায় স্বামীজী কেন আনন্দিত। নিবেদিতার ১৫ই মে, ১৮৯৯ তারিখের এক চিঠিতে পাচ্ছি, স্বামীজী ১৪ মে তারিখে কালীঘাট দেখে এসেছেন—

"গতকাল স্বামীজী এক আত্মীয়ের সঙ্গে কালীঘাটে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেখানে তাঁর রাজকীয় অভ্যর্থনা করেছিলেন। খুবই উল্লাসের কারণ।"*

হিন্দুসমাজের পক্ষে এই উদারতার রন্ধ্র-আলোক একদিকে, অন্যদিকে ব্রাহ্ম ও মিশনারী সম্প্রদায়ের পক্ষে জ্বালা, এই পরিস্থিতিতে নিবেদিতা তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কালী-ব্যাপারে বিচিত্র সব বক্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। যেমন, পরম হাস্যকর একটি (ঘটনাটি অবশ্য দ্বিতীয় কালী-বক্তৃতার পরে ঘটে) :

"বুধবার সন্ধ্যায় রাটারদের কাছে বিদায়ী ডিনারে গিয়েছিলাম। অবাক হলাম, অনেকগুলি মানুষ আমার চায়ের আসরে এসে হাজির। হিন্দুধর্মের পক্ষে বলতে বলা হল আমাকে। অবশ্যই বললাম। ডিনারের সময়ে পরদিন নিমন্ত্রণ, এইসব বন্ধুদের কাছ থেকে। যেতে পারিনি, কিন্তু খুব চমৎকার নয় কি! **এঁরা সব সময়ে ভেবেছেন, কালী বাস্তব একজন নারী, যে নিজ স্বামীকে খুন করেছে।!"**

(স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

নিবেদিতার যোদ্ধৃস্বভাবের পরিচায়ক একটি ঘটনা (৭ ফেব্রুয়ারীর চিঠি) :

"মিঃ পাদশা ও মিস্ পাদশা গত বৃহস্পতিবার চায়ের সময়ে এসেছিলেন। স্বামীজীর পায়ের কাছে বসে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে শুনছিলেন। আমার দুর্গার পটটি স্বামীজীর হাতে ধরে আছে—তিনি কালীর দিকে সোজা এগোচ্ছেন—এমন সময়ে দুই মিশনারীর আবির্ভাব, আমার ইতিহাস-বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিতে

---

* কালীঘাট-মন্দিরে যাওয়ার আর একটি ঘটনার বিবরণ পাই স্বামি-শিষ্য-সংবাদে। ছেলেবয়সে স্বামীজীর এক বড় অসুখের সময়ে তাঁর মা কালীঘাটে বিশেষ পূজো দেওয়ার ও ছেলেকে নিয়ে সেখানে গড়াগড়ি দেওয়ার মানত করেন। সে মানতের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন; স্বামীজীর শেষজীবনে অসুখবিসুখের সময়ে তাঁর জননীর হঠাৎ ঐ মানতের কথা স্মরণ হয়, এবং স্বামীজীও মায়ের ইচ্ছার মর্যাদা রাখেন। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন : "কালীঘাটে যাইয়া স্বামীজী কালী-গঙ্গায় স্নান করিয়া জননীর আদেশে আর্দ্রবস্ত্রে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তৎপরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। অমিত বলবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর সেই যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে মায়ের মন্দিরে সেদিন খুব ভীড় হইয়াছিল। শিষ্যের বন্ধু, কালীঘাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি শিষ্যের সহিত বহুবার স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন, ঐ ঐ যজ্ঞ স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুনঃ পুনঃ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সেদিন স্বামীজী দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন বলিয়া গিরীন্দ্রবাবু ঐ ঘটনা আজও বর্ণনা করিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক, ঘটনাটি শিষ্যকে পূর্বোক্তভাবে শুনাইয়া স্বামীজী পরিশেষে বলিলেন, "কালীঘাটে এখনো কেমন উদার ভাব দেখলুম। আমাকে বিলাতপ্রত্যাগত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোনই বাধা দেননি, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজো করায় সহায্য করেছিলেন।"

ও আরো বক্তৃতার অনুরোধ জানাতে। আগে আমি স্থির করেছিলাম, এইসব মহিলাদের কালীর কথা বা মতভেদের বিষয়গুলির কথা জানার দরকার নেই—কিন্তু ব্যাপারটা আমার হাতের বাইরে চলে গেছে তখন, এবং আমার লড়ুয়া স্বভাবের যা ধর্ম, স্বামীজীকে যেতেও দিলাম না, বিষয় বদলাতেও দিলাম না। তাঁকে প্রসঙ্গটি শেষ করতে হলই, যদিও দ্রুত তা করলেন, এবং তারপরে আমি কালীর প্রতি কিছু ভালবাসা ও স্তুতি-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম। তবু তারা আমার ইতিহাস-ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে পূর্বের মতই উৎসুক রইল!!!!"

এসব বহিরঙ্গ ব্যাপার—ইতিমধ্যে আর একটি রহস্যময় আত্ম-উন্মোচন ঘটল—স্বামীজীর বিরল আত্মপ্রকাশের একটি, যার রহস্যটুকু নিবেদিতা শেষ পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধায় হৃদয়মধ্যে রক্ষা করেছেন, প্রকাশ করেছিলেন আংশিকভাবে—আমাদের পরম সৌভাগ্য তার সবটুকু অংশ আজ আমাদের গোচর। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা কিছু অংশ আছে, যা যুক্তির শৃংখলায় ধরা দেয় না, লীলার পাখায় ভাসে, ভাবের গভীরে ডোবে, এবং মিস্টিক-ব্যাপারের দৃষ্টান্তরূপে পরবর্তীকালের কাছে বর্তমান থাকে। বিবেকানন্দের অধ্যাত্মজীবনের গহনে এই চকিত আলোকপাত আবার অধিকভাবে লক্ষণীয়, কারণ নিজ অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তিতে তাঁর আত্মশাসনের সীমা ছিল না।

২৮ মে রবিবার কালীঘাটে বক্তৃতার দিন স্থির হয়েছিল। শূন্যতায় আচ্ছন্ন ছিল নিবেদিতার মন, নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন—বক্তৃতার ঠিক আগের দিন সকালে ৬টার সময়ে স্বামীজী সহসা হাজির। তারপর—নিবেদিতা ২৮ মে'র চিঠিতে লিখেছেন—

> "স্বয়ং জগন্মাতা স্বামীজীকে পাঠিয়েছিলেন কথা বলতে। আমি একেবারে অথৈ জলে ছিলাম।......তিনি সেই সব-হারানো মনোভাব থেকে আমাকে বিরাট শক্তিতে তুলে ধরলেন—সেই সঙ্গে এমনই অপার্থিব পবিত্রতা এবং আমার প্রতি ঘনীভূত বিশ্বাস যে, সেকথা লিখতে যাওয়াও যেন অন্যায় মনে হচ্ছে! কিন্তু ভয় পাই, পাছে একটি কথাও হারিয়ে যায়। তোমাকে রেজিস্ট্রি করে পাঠাচ্ছি। সারার কাছে পাঠাবার আগে তুমি কপি করে রাখবে।"

সে কোন্ কথাগুলি, যার প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণে নিবেদিতা এত উদ্‌গ্রীব—যার বিষয়ে লিখেছেন—

'You are going to have such a treasure in this letter—as you never received in your life'.

সে কথাগুলি উদ্ধৃত এখনি করব। তার আগে, সেদিনকার আলোচনার মূল কথা অন্যান্যদিনের আলোচনার সঙ্গে জড়িয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন তাঁর 'আচার্যদেব' গ্রন্থে 'শক্তিপূজা ও স্বামীজী' অধ্যায়ে—সে বিষয়ে কিছু তথ্য দিতে পারি। 'আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী' বিবেকানন্দ অতি বাল্যকাল থেকেই সমাধির সহজ অধিকারপ্রাপ্ত; যৌবনে তিনি ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদের প্রভাবাধীন; পরে ইউরোপ-আমেরিকায় তাঁর প্রচারজীবন, যেখানে তিনি এমন কিছু প্রচার করেন নি যা—মূর্তিবিশেষের

উপরে প্রতিষ্ঠিত। 'ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই তাঁহার একমাত্র আদেশ, অদ্বৈতদর্শন তাঁহার একমাত্র মতবাদ, এবং বেদ ও উপনিষদ তাঁহার একমাত্র প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ।'

তারপর নিবেদিতা লিখেছেন—

"তথাপি এর সঙ্গে একথাও সত্য, ভারতবর্ষে 'মা' শব্দটি সর্বদা তাঁর মুখে লেগে থাকত। জগন্মাতা সম্বন্ধে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন—যেভাবে আমরা বাড়ির একান্ত জনদের সম্বন্ধে বলে থাকি। সারাক্ষণ 'মা'-এর মধ্যেই ডুবে থাকতেন। অন্য ছেলেদের মত তিনি সব সময় শান্তশিষ্ট ছিলেন না। কখনো কখনো রীতিমত দুষ্ট, বেয়াড়া, বিদ্রোহী। কিন্তু দুষ্টুমি দৌরাত্ম্য মায়ের কাছেই। ভাল বা মন্দ—এসবের জন্য কখনো আর কাউকে দায়ী করেন নি। কোনো এক শুভকার্যকালে এক শিষ্যকে একটি প্রার্থনা শিখিয়ে দেন, যা তাঁর নিজ জীবনে মন্ত্রশক্তির কাজ করেছিল।—'আর মনে রেখো'—সহসা ফিরে অতি তীব্র প্রখরভাবে বলেছিলেন—'বেটিকে বাধ্য করবে তোমার কথা শুনতে। মায়ের কাছে দীনা হীনা ভাব একদম নয়—একেবারে নয় —মনে রাখবে—হাঁ!' প্রায়ই নূতন নূতন বর্ণনার অংশ ঝলসে উঠত তাঁর কণ্ঠে—উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদ, বাম হস্তে ভীষণ কৃপাণ—'তাঁর শাপই তাঁর বর!'—সহসা উদ্দীপ্ত কণ্ঠ, তারপরেই দীর্ঘ নীরব তন্ময়তা। কিংবা গভীর ভাবাবেগে প্রায় কাব্যের ভাষায়—'যাঁরা তাঁর একান্তই আপনার, তাদের হৃদয়ের গভীরে ঝলসে ওঠে কালীর রক্ত-রাঙা অসি!—মা নেমেছেন খঙ্গ ধরে—এই মূর্তির তারা আজন্ম উপাসক।' এই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত 'মাতার কণ্ঠ' ('Voice of the Mother') নামে আমার একটি ক্ষুদ্র স্তোত্র জাতীয় রচনার প্রায় প্রতিটি বর্ণ বা ছত্র স্বামীজীর এই ধরনের 'উন্মোচন' থেকে সংগৃহীত।*—'আমি ভয়ঙ্করের উপাসক'—তিনি অবিরত বলতেন। তার মধ্যে একবার বললেন—'মনে করা ভুল যে, সুখই সকলের কাম্য। যত লোক সুখ চায়, ঠিক সেই সংখ্যক লোকই আজন্ম দুঃখ চায়। এসো, আমরা ভয়ের জন্যই ভয়ঙ্করের অর্চনা করি!'

বেশী খুতখুতেপনা বা প্যানপেনে ভাবকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। মন্দিরে পশুবলির ব্যাপারে মানসিক অস্বস্তি নিয়ে আমি যখন তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলাম—তিনি মাত্র কয়েকটি কথায় ব্যাপারটি শেষ করে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যেসব কথা সহজেই বলা যেত—যেমন, যারা বলির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠ, তাদের কিন্তু কোনই আপত্তি থাকে না যদি বলিটা হয় নিজের জিভের সুখের জন্য; কিংবা আধুনিক জীবনে কসাই ও কসাইখানার চেহারার বর্ণনা—সে সব তিনি কিছুই বললেন না,† আমার আপত্তিসমূহের বিষয়ে তাঁর সোজা উত্তর—'ছবিটা সম্পূর্ণ করতে দু'এক

---

* এই লেখাটি আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন বিষয়ক অধ্যায়ে উপস্থিত করব।

† আমেরিকায় কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে পাশ্চাত্ত্যের কসাইখানা নিয়ে প্রতি-বিদ্রূপ করেছেন।

ফোঁটা রক্তপাত হলই বা!' তারপরে তাঁর কাছ থেকে এবং নিকটে উপবিষ্ট অপর এক শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের (সম্ভবতঃ সারদানন্দ) কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের কালীপূজার প্রকৃত তথ্যগুলি আদায় করে নিতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল—কৃচ্ছ্রসাধ্য যে উন্নত উপাসনা জীবহিংসার স্তর অতিক্রম করে গেছে। অবশ্য তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি কখনই মা-কালীর অনুচর ভূতপ্রেতদের উদ্দেশ্যে জীবহত্যা সমর্থন করেন না। ওটা শয়তানের পূজো ছাড়া কিছু নয়—তিনি একেবারে ও জিনিসটির পক্ষে নন। নিজ মন থেকে ভয় ও দুর্বলতা দূরীকরণে সর্বদা সচেষ্ট, মাধুর্য ও আনন্দের মধ্যে যেমন, তেমনি পাপ, ভয়, দুঃখ ও বিনাশের মধ্যে স্বতঃই একই জগন্মাতার দর্শনে যত্নবান তিনি—এর থেকে বোঝা যায়, কোনোমতে তিনি বিশাল তত্ত্বটিকে তরল করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভীষণের পূজার বিষয়ে—তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনার বিষয়ে—শান্তভাবে বলতে বলতে হঠাৎ সরবে তিনি বলেছিলেন একদিন—'মূর্খ ওরা! মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয়—দয়াময়ী! মূর্খ! মূর্খ!' তাঁর কথা শুনতে শুনতে, দয়ালু, পালনকর্তা, সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বরের পূজো—যাতে ভূমিকম্পের, আগ্নেয়গিরির ঈশ্বরের ঠাঁই নেই—সে পূজার অন্তর্নিহিত অহংবোধ আমাদের কাছে একেবারে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। দেখেছিলাম যে, এ ধরনের পূজো, হিন্দুরা যাকে 'দোকানদারী' বলে তা ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বর ভালোর মতই মন্দের মধ্যেও সমভাবে প্রকাশিত—এই শিক্ষাকে মনে হয়েছিল লক্ষগুণে নির্ভীক ও যথার্থ। যে-মন ব্যক্তি-আমির স্বার্থবোধে বিচলিত হতে না চায়, সে মনকে স্বামীজীর বজ্রবৎ উক্তির অনুসরণে দৃঢ় হতে হবে: 'মৃত্যু চাই—জীবন নয়! ঝাঁপ দিতে হবে তরবারির মুখে। এক হয়ে যেতে হবে চিরদিনের জন্য ভয়ঙ্করীর সঙ্গে।'

স্বামীজী যদি নিজের ধারণাগুলি শিষ্যের উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, তাহলে স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যেসব কথা বলে এসেছেন, তার উল্টো কাজই করা হত। কিন্তু শিক্ষাব্রতীরূপে আমার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি ভারতীয় জীবনবোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলাম—ঐ ভারতীয় ভাবজীবনে বিশিষ্ট পূজাপদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে অমরনাথ তীর্থযাত্রায় লব্ধ অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার মনকে বিহ্বল করে রেখেছিল। সেই জন্যই আমি কালীপূজার রহস্য বুঝতে সচেষ্ট হলাম, যেমন মানুষ নূতন ভাষা শিক্ষা করে, কিংবা নূতন জাতির মধ্যে নবজন্ম নিতে চায়। এইরূপ করেছিলাম বলেই আমি আচার্যদেবের জীবন ও চিন্তা কতকটা বুঝতে পেরেছিলাম। অল্পে অল্পে, ঝলকে ঝলকে একটু একটু বোধ। ধর্মব্যাপারে তিনি তাঁর অজ্ঞাতেই জন্ম-শিক্ষক। তিনি কখনোই অন্যের দ্বিধাসংকুল অথচ প্রকাশব্যাকুল চিন্তাকে বাধা দিতেন না। তাঁর সঙ্গে একদিন বসে আছি, এক কালীপ্রতিমা সেখানে আনা হলে চকিত চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল এবং আমি সহসা বলে উঠেছিলাম, 'স্বামীজী! কালী বোধহয় শিবের ধ্যানপ্রতিমা— তাই কি!' আমার দিকে

ক্ষণেক তাকিয়ে তিনি সস্নেহে বলেছিলেন, 'বেশ বেশ! যেভাবে তোমার পছন্দ সেভাবেই প্রকাশ করো।"

এই সমস্ত আলোচনা ঠিক কখন হয়েছিল, বলা শক্ত, কিছু আগে হয়েছিল, আলোচ্য সময়েও কিছু হয়ে থাকতে পারে। তারপরেই স্বামীজীর মুখ থেকে কালীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক অবিস্মরণীয় কথাগুলি নিবেদিতা শুনলেন, যার মধ্যে, 'মাতৃ উপাসনার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক অভ্রান্ত স্পষ্টতায় উন্মোচিত।' স্বামীজীর কথাগুলি অনেকাংশে বর্জন করে নিবেদিতা 'আচার্যদেব' গ্রন্থে দিয়েছিলেন, আমরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে তার অনুবাদ দিচ্ছি; মূলের প্রতিলিপিও গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হয়েছে :

স্বামীজী : সেই লোকটির কথা মনে আছে যিনি বলেছিলেন, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং দেবগণে (Angels) বিশ্বাসী, আর কিছুতে নয়?

নিবেদিতা : সেটা কি—

স্বামীজী : হাঁ, 'a damned sight better business'...

হাঁ, এই হল আমার ভূমি—আমি ব্রহ্মে বিশ্বাসী, এবং দেবদেবীতে, অন্য কিছুতে নয়।*

তোমার বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করতে আমাকে বলেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে আমি যাচ্ছি না। আর সোজা কথা বলি—সম্পূর্ণ সুস্থ হবার ভরসাও করি না। ওখানে দারুণ গরম হবে, এবং আমি উত্তেজনা সামলাতেও পারব না, কারণ বহুশত বৎসর ধরে আমরা কালী-উপাসক —ঐ স্থানের প্রতিটি ধূলিকণাও আমার কাছে পবিত্র—মাটিতে গড়িয়ে

---

* এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে নিবেদিতা 'আচার্যদেব' গ্রন্থে লিখেছেন, "...তারপরে কুণ্ঠিতভাবে কর্নেল হে-র *Guardian Angels* কবিতার উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, ব্রহ্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে আমারও তাই মত—আমি ব্রহ্ম এবং দেবদেবীতে বিশ্বাসী, অন্য কিছুতে নয়।"

তারপরে লিখেছেন—

"স্পষ্টই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তাঁর নিজের বুদ্ধিবোধে যেখানে খটকা বেধেছিল, সেখানে আমারও খটকা বাধবে—বেদান্তের সর্বোচ্চ ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বিশেষ ধরনের পূজা পদ্ধতিকে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা। তিনি এটুকু বোঝেননি যে, তিনি স্বয়ং আমাদের কাছে যেভাবে বর্তমান ছিলেন, তাতে তিনিই এইসকল বৈপরীত্যের সমন্বয় এবং প্রতিটি সত্যের সাক্ষীস্বরূপ। তাঁর পূর্ব চিন্তার সূত্র ধরে তিনি কিছুক্ষণ বসে থেকে ছাড়াছাড়া ভাবে বলে যেতে লাগলেন, প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন, স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন নিজের বক্তব্যকে, কিন্তু সারাক্ষণ মগ্ন হয়ে রইলেন ভিতরের কোনো একটা জিনিসে, যেন কোনো একটা ভাবের ঘোরে রয়েছেন, যার ঝোঁক কাটাতে পারছেন না—ডুবে রয়েছেন—কথাগুলি অর্ধ-স্বগতোক্তির মত।"

খাওয়া রক্ত পর্যন্ত—তার প্রতিটি বিন্দুও! পরম ভক্তিতে সে রক্ত চেটে তুলতে পারি।

তোমার বক্তৃতার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দৃঢ় নির্দেশ দিয়েছি। কোনো চেয়ার থাকবে না প্রত্যেককে মেঝের উপরে বসতে হবে—মঞ্চের তলায় তোমার পায়ের নীচে। টুপি ও জুতো খুলে রাখতে হবে। যদি ইউরোপীয় বা ব্রাহ্ম কেউ উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে ও-জিনিস যাতে করা হয় স্বয়ং তোমাকে দেখতে হবে। তুমি বসবে সিঁড়িতে, কয়েকজন অতিথির সঙ্গে।।*

ওঃ! কালীকে ও কালী-ব্যাপারকে কী ঘৃণাই না করতাম! ৬ বছর ধরে সেই লড়াই—কেননা কালীকে কিছুতে মানব না।

নিবেদিতা—কিন্তু এখন আপনি তাঁকে বিশেষভাবে মেনে নিয়েছেন, তাই না স্বামীজী?

স্বামীজী—মানতে বাধ্য হয়েছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজেও তিনি (মা) আমাকে চালিত করেন—আমার এই বিশ্বাসের কথা তুমি জানো। তিনি আমাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করান।

তবু কত দিনের লড়াই! লোকটিকে আমি ভালবাসতুম, বুঝতে পারছ—তাতেই আটকে পড়েছিলুম। আমার দেখা পবিত্রতম ব্যক্তি তিনি—অনুভব করেছিলুম। আর জানতুম, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন, সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ-মায়েরও নেই।

নিবেদিতা—এত সুযোগ সত্ত্বেও যখন আপনিই এত দীর্ঘদিন সন্দেহ করেছেন, তখন ব্রাহ্মরা যে করবে তাতে আশ্চর্য কি?

স্বামীজী—হাঁ—ঠিক, কিন্তু তারা তাঁর মধ্যে ঐ সীমাহীন পবিত্রতা কখনই দেখতে পায়নি, যা আমি দেখেছিলুম। আর—সে ভালবাসার স্বাদও পায়নি।

নিবেদিতা—আমার কি মনে হয় জানেন, তাঁর বিরাটত্বই তাঁর ভালবাসাকে এমন দুশ্ছেদ্য করে তুলেছিল আপনার কাছে।

---

*নিবেদিতা এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—"কোনো দেবস্থানেই এর ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি নিজেদের দেবস্থানের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য রক্ষায় উদ্যত না হয়, সে নিতান্ত অশ্রদ্ধার পাত্র।"

স্বামীজী—তাঁর বিরাটত্ব সম্বন্ধে বোধ কিন্তু তখন আমার মধ্যে জাগেনি। সেটা এল পরে, আত্মসমর্পণের পরে। তার আগে তাঁকে খ্যাপা শিশুর মত ভাবতুম—সব সময়ে এই দেখছেন, সেই দেখছেন, দেবদেবী, কত কি! সেসব জিনিসকে ঘৃণা করতুম। কিন্তু তারপরে—এমনকি কালীকেও—মেনে নিতে হল আমাকে।

নিবেদিতা—কেন মেনে নিতে হল, তাকি বলবেন না স্বামীজী—কিসে আপনার অত বিরোধিতা চূর্ণ হল?

স্বামীজী, না; সে রহস্য আমার সঙ্গেই চলে যাবে। সে সময়ে আমার দুর্ভাগ্যের চরম; পিতার মৃত্যু ও নানা দুর্বিপাক; 'মা' দেখলেন, এই সুযোগ—আমাকে গোলাম করার। মা'র একেবারে মুখের কথা—'তোকে গোলাম করে রাখব।' আর রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর হাতেই আমাকে তুলে দিলেন।—বিচিত্র, এরপর তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) মাত্র দু'বছর বেঁচেছিলেন, আর তার বেশী সময় ভুগেছিলেন। ৬ মাস যেতে না যেতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হল—সে উজ্জ্বলতা কোথায় চলে গেল!

গুরু গোবিন্দ সিংহেরও* একই দশা হয়েছিল। তিনি সেই শিষ্যটির সন্ধান করছিলেন, যাকে নিজের শক্তি দিয়ে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে নিজ পরিবারের দাবিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। নিজ সন্তানাদির কোনো মূল্যই ছিল না তাঁর কাছে। সেই বালকটিকে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন— যাতে তাকে সব দিয়ে মরতে পারেন।

নিবেদিতা—শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সর্বদা কালীর অবতার মনে করি। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁকে কি তাই বলবে না?

স্বামীজী—হাঁ। এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ যে, কালী রামকৃষ্ণের উপর ভর করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। মার্গট দেখ, আমি বিশ্বাস না করে পারি না, কোথাও একটা মহাশক্তি আছে যা নিজেকে নারীপ্রকৃতি বলে অনুভব করে—কালী বা 'মা' নামে নিজেকে আখ্যাত করে।—আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই—বুঝতেই পারছ সর্বদা এমনই হয়। শরীরের অগণ্য কোষ-সমষ্টিতেই ব্যক্তির আকার—বহু মস্তিষ্ককেন্দ্র তৈরী করে অখণ্ড চৈতন্য—

*নিবেদিতার মূল ডায়েরীতে ছিল 'গুরু গোবিন্দ সিংহ'। পরে 'আচার্যদেব' গ্রন্থে 'গুরু নানক' ছাপা হয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বামীজী যাঁর কথা বলেছিলেন, তিনি গুরু নানকই। বলার সময়ে স্বামিজীর ভুল হতে পারে, কিংবা শোনায় বা টোকায় নিবেদিতার ভুল হতে পারে।

নিবেদিতা—হাঁ, বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য ঐক্য—

স্বামীজি—তাই কি! কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে ভিন্নতার কারণ কি! ব্রহ্মই—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—আবার দেবদেবীও—

সুতরাং দেখছ, আমি ব্রহ্মে বিশ্বাসী, আবার দেবদেবীতে, কিন্তু আর কিছুতে নয়—

কিন্তু কিভাবে না তিনি (মা) আমাকে যন্ত্রণা দেন কখনো কখনো! তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলি, 'যদি তুই এই এই জিনিস আগামী কাল আমাকে না দিবি, তাহলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রীচৈতন্যের পূজা করব।'—এবং সেই জিনিসগুলি আমি অতি অবশ্যই পেয়ে যাই!

এসব কথা কিন্তু কদাপি কাউকে জানাবার নয়, মনে রেখো!

নিবেদিতা—আপনি বলতে চান, এসব আলাপ পৃথিবীর শোনার জন্য নয়—

"কদাপি নয়!"—বলে স্বামীজী চলে গেলেন।

অধ্যাত্মরাজ্যের এক গোপন দলিলে চোখ বুলোবার সৌভাগ্য এখানে পেলাম। নিবেদিতা এই 'প্রমাণপত্রটি' পাঠাবার পরে ২৮ মের চিঠিতে শেষদিকে লিখেছেন—

"স্বামীজীর ঐ কালীর উপরে রাগ করে কড়া হওয়ার ব্যাপারটি খুবই মিষ্টি আর মজাদার, নয়কি? বিশ্বরহস্যের উপরে যেন ইন্দ্রিয়-চেতনার খুবই পাতলা আবরণ! ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছ—শিবের সম্বন্ধে—যা বলতে চাচ্ছি? 'তাঁর (কালীর) ক্রীতদাস'—কথাটা ঐ মূর্তির ভঙ্গি সম্বন্ধে নতুন অর্থ দিয়েছে আমার কাছে।

অসাধারণ হয় নাকি—সব ব্যাপারটা যখন প্রতীকের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে—অতীত কালের মানুষেরা এমন সব বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল?..... কিংবা সকলই মানবমনের সৃষ্টি? পূর্ণ মানবই কি ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন.

এইসব কথা বা চিন্তার সঙ্গে কালীপূজার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে।"

নিবেদিতা নানাভাবে, আভাসে ইঙ্গিতে একটি কথা মিস ম্যাকলাউডের কাছে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন, যে-কথাটি তাঁরই মত ম্যাকলাউড বিশ্বাস করেন। তবু গভীর বোধের ক্ষেত্রে কিছু আত্মগোপনের ভাব থাকেই—আশঙ্কা থাকে যে চিন্তাগুলি শব্দে বা লেখায় আকারিত হলেই স্থূল হয়ে দাঁড়াবে। কথাটা আর কিছু

নয়—স্বামীজীর ঐশ্বরিক স্বরূপে বিশ্বাস—নিবেদিতা স্বামীজীকে শিবের অবতার মনে করেছিলেন, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর অবতার। এর আগে সারদাদেবী-প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি পত্রের উল্লেখ করেছি, যাতে তিনি সারদাদেবীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এই কথার সমর্থনে—স্বামীজী National God অর্থাৎ শিবের direct incarnation (সাক্ষাৎ অবতার) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ—কালীর। এই তত্ত্বটি নানাভাবে বেশ কিছুদিন ধরে নিবেদিতার মাথায় জেগেছিল—নানা ঘটনায় তার সমর্থন পেতেন এবং সমর্থন চাইতেন। স্বামীজীর মৃত্যুতত্ত্ব বা কালীতত্ত্ব নিবেদিতাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। এই প্রচণ্ড তত্ত্বটি কিভাবে স্বামীজীর কাছে এত সহজ সত্য হয়ে উঠল—এই প্রশ্ন তাঁর ছিলই, এবং উত্তরও সন্ধান করেছেন সর্বসময়। নানা উত্তর পেয়েছেন নানা সময়ে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যয়-বোধক উত্তরটি তিনি এক চকিত উপলব্ধির পরে লিখে পাঠান ৫ জুলাই ম্যাকলাউডকে :

"কালী বিষয়ে আমার নতুন অনুভূতি জেগেছে। কলকাতায় শেষ দিনে তা পেয়েছি, যখন আমি রাজার সঙ্গে কালীমূর্তির পাশে বসেছিলাম—যেটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করি।

শায়িত ঈশ্বরের (শিবের) আবেশগ্রস্ত দৃষ্টির অনুসরণ করে দেখলাম, তা সত্যই দেবীর (কালীর) নয়নের সঙ্গে মিলিত—যেকথা সদানন্দ আমাকে বলেছিলেন। তারপর দেখলাম, কালী কিভাবে 'মা' সম্বন্ধে স্বামীজীর দর্শনের অনুরূপ। শুধু শিবের পক্ষেই ঈশ্বরসত্যকে ঐ আকারে দেখার সাহস করা সম্ভব—শুধু শিবই পদদলিত হয়েও ঐ প্রেমাবিষ্ট নয়নে দেখতে সমর্থ। বুঝতে পারছ, সমস্ত ব্যাপারটা কত স্পষ্ট!"*

ঐ চিঠিতেই নিবেদিতা লেখেন—

"আর সব সময়ে তাঁর (স্বামীজীর) সেই দাবিটি গাঢ়তর গভীরতর হচ্ছে—'আমি বিশেষ অর্থে কালীর ছেলে।' আমার কাছে প্রতীয়মান সত্য যা—যা দিবালোকের মত স্বচ্ছভাবে দেখছি—যা কখনো তাঁকে বলতে চেষ্টা করিনি—তা হল 'ছেলে নয়, স্বয়ং শিব—ওঁরা দেবদম্পতি।"

স্বামীজী এবং নিবেদিতার কালী-উপাসনা অনেকেই বিচলিত করেছিল। পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজী বেদান্ত-প্রচারক রূপেই পরিচিত। শক্তিসাধনার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সংযোগের কথা সেখানে পরিচিত ছিল না। নিবেদিতা কালীবিষয়ে বক্তৃতা করার পরেই ব্যাপারটা সর্বজনবিদিত হয়ে পড়ে। ১৮৯৯—১৯০০ খৃীস্টাব্দে আমেরিকা-ভ্রমণকালে নিবেদিতা তাঁর এই বিশেষ ধর্মানুরক্তির কথা গোপনও করেন নি। কালী-উপাসক

---

* "I worked at the intoxicated eyes of the prostrate God, and I saw how they did indeed meet Hers, as Sadananda had said—and then I saw how She was Swami's Vision of the Mother. Only Siva would have courage to see the Divine in such a guise, only Siva would look with that rapture, though Her feet are trampling on Himself."

ইংরেজ মহিলার কথা সেখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলও। (তেমন একটি সংবাদের প্রতিলিপি আমরা দিয়েছি।) স্বামীজীও মাতৃউপাসনার উপর বক্তৃতা করেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে স্বামীজীর বিদেশী সুহৃদ্‌মণ্ডলীতে। মেরী হেলকে স্বামীজী নিজের বোন বলে মনে করতেন, এবং মেরী হেলও সেই অধিকারে স্বামীজীর মতের বা কাজের মুক্ত সমালোচনা করতেন। নিবেদিতার গুরুভক্তি এবং স্বামীজী ও নিবেদিতার কালীভক্তির বিরুদ্ধে মেরী হেল নিশ্চয় সমালোচনা করে চিঠি লিখেছিলেন। এক্ষেত্রে স্বামীজী নিজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে যে-চিঠি লেখেন, তার মধ্যেও কালীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রহস্যময় সম্পর্কের স্বীকৃতি আছে। এ ধরনের স্বীকারোক্তি স্বামীজী খুব কম ক্ষেত্রেই করেছেন বলে এটি খুবই মূল্যবান। স্বামীজী মেরী হেলকে ১৭ জুন, ১৯০০-তে লিখেছিলেন :

“কালী-পূজা কোনো ধর্মের অপরিহার্য সোপান নয়। ধর্মের সব কিছুই উপনিষদ শিক্ষা দিয়েছে। কালী-পূজা আমার **বিশেষ খেয়াল**। আমাকে এর প্রচার করতে তুমি কোনোদিন শোননি, ভারতেও তা প্রচার করেছি বলে পড়োনি। বিশ্বমানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, আমি শুধু তাই প্রচার করি। যদি কোনো অদ্ভুত প্রণালী থাকে, যা শুধু আমার পক্ষেই খাটে, তা আমি গোপনে রাখি, এবং সেখানেই তার ইতি। কালী-পূজা কি বস্তু, তা আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করব না, কারণ কখনো তা অন্যকে আমি শেখাইনি।*......

আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক প্রভৃতির স্থান নেই আমাদের ধর্মে—তা বিশুদ্ধ উপনিষদের তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। অনেকে মনে করে, অনুষ্ঠানাদি তাদের ধর্মবোধের পক্ষে সহায়ক। তাতে আপত্তি নেই আমার।

শাস্ত্র, আচার্য, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা ত্রাণকর্তাদের উপর ধর্ম নির্ভর করে না। এই ধর্ম ইহজীবনে বা অন্য কোনো জীবনে অপরের উপর আমাদের নির্ভরশীল করে তোলে না। এই অর্থে উপনিষদের অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম। তবে ত্রাণকর্তা, আদিষ্ট পুরুষ, শাস্ত্র বা অনুষ্ঠানাদির স্থান আছে ধর্মে। সেগুলি অনেককে সাহায্য করতে পারে, **যেমন কালী উপাসনা আমাকে আমার ‘ঐহিক কাজে’ (সেকুলার ওয়ার্ক) সাহায্য করে।** এগুলি স্বাগত।

তবে গুরু একটি স্বতন্ত্র ভাব। শক্তি-সঞ্চারক ও শক্তিগ্রাহকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ও হল তাই—আত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে। শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রতি জাতিই বিশিষ্ট ধাঁচের। প্রতি জাতিই অবিরত অন্য জাতির ভাব নিয়ে নিজের ধাঁচের মধ্যে অর্থাৎ নিজস্ব জাতীয় ধারায় গ্রহণ করে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। নির্দিষ্ট জাতীয় আদর্শ ধ্বংস করার সময় এখনো আসেনি। শিক্ষা-বস্তু যে-কোনো সূত্র থেকেই আসুক না কেন— যে-কোনো দেশের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তার ভাবৈক্য থাকেই, কেবল

* না, নিবেদিতাকেও নয়। অনেক পীড়াপীড়ি করে নিবেদিতা কালীতত্ত্ব কিছু শুনতে পেয়েছিলেন স্বামীজীর কাছ থেকে, কিন্তু স্বামীজীর বিশিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি চিরদিন তাঁর মধ্যেই থেকে গিয়েছিল- ‘That . . . . is a secret that will die with me’.

তাকে গ্রহণ করবার সময়ে জাতীয় ভাবাপন্ন করে নিতে হবে, অর্থাৎ সে শিক্ষা যেন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হয়।"

কালীঘাটে বক্তৃতার আগের দিন স্বামীজীর মুখ থেকে আশ্চর্যজনক কথাগুলি নিবেদিতার মনে কী আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে তিনি 'আচার্যদেব' গ্রন্থে পুনশ্চ লিখেছেন :

"আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, ঐ কথোপকথন আমার জীবনে নব যুগের সূচনা করল। এই ব্যাপারটি ঘটার পর থেকে আমি যেন দেখতে লাগলাম—আচার্যদেবের ভাবে-গতিকে কার্যকলাপে রয়েছে অন্যের গচ্ছিত বিশ্বাস ও দায়বহনের ইঙ্গিত। কালী-প্রতিমার ব্যাখ্যা করতে বলা হলে তিনি যা বলতেন তাতে বোঝা যেত—কালী, অভিজ্ঞতার মহাগ্রন্থ, মানবাত্মা তার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে গিয়ে সবশেষে দেখবে কিছুই নেই। এই হল কালীর চরম ব্যাখ্যা—আমার তাই মনে হয়। ভাবী ভারতবর্ষে কালীমাতাই একমাত্র উপাস্য হবেন। তাঁর নামে তাঁর সন্তানেরা নানা অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় পৌঁছতে সমর্থ হবেন। এবং একেবারে শেষে তাদের হৃদয়ে সনাতন জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশ ঘটবে, পরম লগ্ন সমাগত হলে প্রতিটি মানুষ জানবে—তাদের সমগ্র জীবন ছিল স্বপ্ন, স্বপ্নময়।

গীতার সেই বেদগম্ভীর বাণী কার না স্মৃতিতে উদিত হয়—'কর্মের আরম্ভমাত্র না করিয়া কোনো ব্যক্তিই নৈষ্কর্ম্য-লাভ করিতে পারে না; শুধু কর্মত্যাগ করিলাম বলিলেই সিদ্ধি করতলগত হয় না।'* সেইরূপ আমরাও কি নিশ্চিতভাবে জানি না যে, এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হলে আমরা অন্তে সত্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাব? মাতার (শক্তির) মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম; নূতন জীবন, নূতন জ্ঞান, পরিবর্তন, সংগ্রাম, জয় ও পরাজয়ের সাময়িক সংঘটনের মধ্য দিয়া আত্মার নিশ্চিত স্বর্গে উত্তরণ, যেখানে অভেদ শুধু, শুধু মহাশান্তি। যাঁর পদাঙ্ক আমি অনুসরণ করেছিলাম, সেই শ্রেষ্ঠ আচার্যের জীবনের মধ্যে যতই গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেছি, প্রতিদিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর দেখেছি—তিনি স্বয়ং নিজ জীবন-মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি উল্টে গিয়েছিলেন একের পর এক, যখন একেবারে শেষ শব্দটিতে পৌঁছে-ছিলেন শ্রান্ত শিশুর মত এলিয়ে পড়েছিলেন মায়ের কোলে—পরম উন্মোচনে নিমজ্জিত সেই ক্ষণের পরম জ্ঞান : স্বপ্ন। এ সকলই স্বপ্ন।"

[Open the gates of light, O Mother
 To me, Thy tired son,
I long, oh long to return home!
Mother, my play is done.]

(স্বামীজীর 'My play is done' কবিতার অংশ]

---

* ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

দ্বিতীয় কালী বক্তৃতা

২৮ মে, রবিবার কালীঘাটে মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে বক্তৃতা হয়। "বিকাল পাঁচটার সময়ে নিবেদিতা নগ্নপদে কালীঘাট গমন করিলেন।" আগেই দেখেছি, স্বামীজীকে সভাপতি হতে বলা হলেও তিনি নানা কারণে রাজি হননি। বক্তৃতা বিষয়ে নিবেদিতা ৩১. ৫. ১৮৯৯ তারিখে ওলি বুলকে লিখেছেন—

"একেবারে কালীঘাটে গত রবিবারে বক্তৃতা করেছিলাম।...যথার্থতঃ আমি ছোটখাট একটি বৈদান্তিক বক্তৃতা করেছিলাম—তাতে আমিই অবাক। আর একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম, দু'তিন হাজার লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি বিষয় বলা যায় না, যা কয়েক শো লোকের মধ্যে করা যায়। আরও সহজ হতে হয়, মূল কথায় জোর দিতে হয়—কাজটা সোজা হয়ে দাঁড়ায়।"

একই বিষয়ে ম্যাকলাউডকে :

"কালীঘাট ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর কিছু দাঁড়ায়নি। সমবেত পুরুষদের আকার খুবই মার্জিত।"

বক্তৃতা সাফল্যমণ্ডিত হলেও তার দু'একটি অংশ স্বামীজী অপছন্দ করেছিলেন, নিবেদিতার এক চিঠি (৩১. ৫. ১৮৯৯) থেকে পাই :

"আজ সারদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব, আপত্তিকর বাক্যগুলি কি কি?"

কালীঘাট-বক্তৃতার মূল অংশ অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার অনুরূপ। 'বিশেষ অনুরোধেই' তা করতে হয়েছিল, নিবেদিতা চিঠিতে লিখেছেন। বক্তৃতার সূচনা ও সমাপ্তিতে কিছু নূতন কথা ছিল। সূচনায় তিনি কালীঘাটের স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে বলেন, তার সাক্ষাৎ প্রেরণা স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথন, তা সহজেই বোঝা যায়।

নিবেদিতা আরম্ভে বলেন :

"যে-জায়গাটিতে আজ সন্ধ্যায় আমরা মিলেছি, এটি কালীর পবিত্রতম পীঠস্থান। যুগ যুগ ধরে কত ভক্ত প্রাণের প্রার্থনা, বেদনা ও কৃতজ্ঞতার পূজা নিবেদনের স্থান এটি, মৃত্যুক্ষণে শেষ চিন্তার লক্ষ্যস্থল। মা এখানে কত সাধককে দর্শন দিয়েছেন, তার নির্ণয় কে করবে? কেউ মায়ের সন্তান, কেউ তাঁর চিহ্নিত বীর। কেউ শুধু ভক্ত, তাঁর ভাব ও রূপসুধাপানে পাগল, আবার কেউ তাঁকে নিজ আত্মার স্বরূপজ্ঞান করেছেন। অনন্ত আত্মা, তাদের অনন্ত শক্তি, বাসনাও অনন্ত—যার তৃপ্তিসাধন মা করে থাকেন।

এই স্থান থেকেই তরঙ্গিত হয় তাঁর স্বর, ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীতে,

ছায়া সন্ধ্যার মৃদু মধুকণ্ঠে ডেকে বলে : 'শিশুরা, আমার শিশুরা, আমি—আমিও তোমাদের মা।'

দিবস যখন প্রখর উজ্জ্বল, পৃথিবী কর্মশব্দে মুখর, তখন মায়ের কণ্ঠ হয়তো চুপ যায়, কিন্তু আবার যখন শান্তিলগ্ন ঘনায়, নিজ অন্তরের মুখোমুখি হয়ে বসে মানুষেরা, তখন তারা যত পরিবর্তিত-ভাবেই শুনুক না কেন, তবু বার্তা আসে, শান্ত ক্ষুদ্র সুরগুলি—এত ক্ষুদ্র, এত সুন্দর যে, আমাদের কানে প্রায় পশে না, যদিও একদিন আমরা অনুভব করবই যে বিশ্বের সবকিছু—জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা—কালীর অখণ্ড নিত্য সঙ্গীতের এক একটি সুর।

পবিত্র এই স্থানের আবহ, পবিত্র এই সন্ধ্যাকাল, মন্দিরের রক্ত-ধূলি—পবিত্র! পবিত্র! আমরা যেন অনুভব করতে পারি, এই স্থানে—যেখানে লক্ষ লক্ষ অতীত মানুষ প্রার্থনা করতে এসেছে—এখানে আমরা বক্তৃতা শুনতে আসিনি, এসেছি পূজা করতে।"

এর পরে কালী-তত্ত্ব সম্বন্ধে অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতায় নিবেদিতা যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলিই বলেন। সব শেষে অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তিগুলির উত্তর দেন। উত্তরগুলি গভীর মর্যাদাবোধ, জ্ঞান ও অনুভূতি-গভীরতার পরিচায়ক। মূর্তিপূজা, বলিপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে পুরাতন অভি-যোগসমূহ ছিলই, নিবেদিতা সেগুলির উত্তরও দিয়েছিলেন—কিন্তু সবচেয়ে প্রচণ্ড উত্তর হয় কালী মূর্তি কুৎসিত—ক্রীশ্চান মিশনারীদের এই পুরাতন অভিযোগের ব্রাহ্ম পুনরুক্তি সম্বন্ধে। ব্রাহ্ম অভিযোগকারী কিছু শিল্প প্রসঙ্গও তুলেছিলেন—তাঁর নিকটে—যিনি শিল্পজ্ঞানে অভিযোগকারীর চেয়ে বহু যোজন এগিয়ে আছেন। নিবেদিতার উত্তরটি ভারতীয় চিত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে কালের দিক থেকে গুরুত্ব-পূর্ণ—যথাসময়ে তার বিচার আমরা করব। সবশেষে ছিল নিবেদিতার বিশাল আহ্বান—বিবেকানন্দের কণ্ঠ যার মধ্যে ধ্বনিত—যে আহ্বান শুনলে মনে হয়, নিবেদিতাও কিয়দংশে 'অভিজ্ঞতার মহাগ্রন্থপাঠ' করেছিলেন।

আপত্তি ও নিবেদিতার উত্তর নিম্নোক্ত প্রকার :

"বক্তা অতঃপর কালীপূজা সম্বন্ধে অ্যালবার্ট হলের সভায় কতিপয় ভদ্র-মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত কয়েকটি অভিযোগের উত্তর দিতে অগ্রসর হন।

প্রথমতঃ, একজন বলেছিলেন, অনন্ত ঈশ্বরকে মূর্তিরূপে পূজা করা অসম্ভব।

তার উত্তরে ভগিনী নিবেদিতা বলেন, হিন্দুরা মূর্তিকে সম্বোধন করে পূজা করে না। ঠিকভাবে বলতে গেলে মূর্তি মনঃসংযোগের অবলম্বন বিশেষ। আসল পূজা সম্মুখস্থ জলপূর্ণ পাত্রটিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। প্রকৃতি ও জীবনপাত্রে ঈশ্বররসধারা পূর্ণ হয়ে আছে, তারই প্রতীক ঐ পাত্রটি।

যাই হোক, এক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর পূর্বতন বক্তব্যে ফিরে যেতে চান—বস্তুকে যে আমরা দেখি, আসলে তার মধ্যে ঈশ্বরকেই দেখি, এবং ভগিনী প্রশ্ন করতে চান, এখানে আমরা সমবেত হয়েছি কেন—যদি না ঐ কথা সত্য হয়? প্রতিমার মধ্যে আমরা ঈশ্বরকেই দেখি,—অন্যত্রও কি দেখি না? আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের

প্রতিমা, আমাদের জীবনের প্রতিটি গতিচ্ছন্দ ঈশ্বরেরই পূজা, যে-কোনো রূপে, আমাদের বা অন্যের; এবং যেহেতু আমরা বর্তমান জীবস্তরে রয়েছি, সেজন্য (প্রতিমার মধ্য দিয়ে পূজার) সত্য ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া কি ভাল নয়, যাতে আমরা স্বাভাবিক বিবর্তনে ঊর্ধ্বতর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারি?

পরবর্তী আপত্তি কালী-প্রতীকের আকার নিয়ে। অভিযোগকারীর মতে, কালীর এমনই আকার, যার কাছে মাতৃভাব শুকিয়ে যাবে। এই কথাটি এক দ্বিতীয় বক্তা সমর্থন করেন। তিনি যীশু-কোলে মেরীর সুন্দর মূর্তিকে বিপরীত তুলনায় উপস্থিত করেন।

ভগিনী নিবেদিতা বলেন, তিন দিক থেকে এই আপত্তির সম্মুখীন হওয়া যায়। প্রথমতঃ, একথা সত্য, ইউরোপে কোনো এক যুগে ধর্মধারণা ও কলাশিল্পের উন্নতি পাশাপাশি চলেছিল, যার ফলে ধর্মবস্তুর বাহ্যিক চাকচিক্য এবং আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তথাপি এর দ্বারা কেউ এমন মনে না করেন যে, মেরী ও শিশুর মূর্তি সব সময়েই সুন্দর ছিল। বাইরের মানুষ যদি কেউ দেখে, যার মনের মধ্যে ক্রীশ্চান ভক্তের ভাবানুভূতির পরিমণ্ডল নেই, তাদের কাছে প্রাচীন বাইজাণ্টিয়ান চিত্রাবলী এবং খোদাই কাজ অতীব প্রাণহীন ও কুৎসিত ঠেকবে—ইউরোপীয় ভাবাপন্ন সমালোচকের কাছে কালীমূর্তি যেমন ঠেকে।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিস্থিতি শিল্প বা ভাস্কর্য বিকাশের পরিপন্থী নয়। কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করদের সময় পর্যন্ত সমস্ত গ্রীস তীর্থযাত্রা করে যেত ডেলফির মন্দিরে, যেখানে প্রায়-নিরাকার মূর্তিটি ছিল। যে-কালের মানুষেরা এহেন মূর্তির পাদমূলে প্রণত হত, তারাই জন্ম দিয়েছিল ফ্রিডিয়সের (Phridios)।

তৃতীয়তঃ, এসব ব্যাপার আমাদের আলোচ্য বিষয়কে স্পর্শ করে না। ভক্তের কাছে মায়ের মূর্তি কুৎসিত নয়। যে-মূর্তিটিকে তুমি তোমার বাল্যকাল থেকে ভালবেসেছ, ভক্তি করেছ, সে মূর্তি কি তোমার থেকে আলাদা কিছু যে, তার সামনে গোমড়া মুখে দাঁড়াবে নিন্দা বুকে পুরে! 'নিষ্ঠুর', 'কুৎসিত', 'অবাস্তব'—এসব উক্তি তো বিদেশীর। জীবন, অভিজ্ঞতা ও ভাবনা যা দেখতে দেয়, মানুষ ধর্মীয় প্রতীকের মধ্যে তা-ই দেখে। কোনো খ্রীস্টান কি বর্ণনানুযায়ী ছবিটা চোখের সামনে জাগিয়ে রাখে যখন সে গায়—'রয়েছে উৎস, পূর্ণ রক্তে'? ('There is a fountain filled with blood')

এই ধরনের উক্তি কত না মানুষের কাছে পুণ্যতম, পবিত্রতম ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে; এবং একথা না বললেও চলবে, এগুলির খুঁটিয়ে বিচার করা হয় না। যাইহোক ইউরোপীয় শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতেও কিন্তু কালী মূর্তির অসাধারণ নাটকীয় গতিশক্তি ধরা পড়ে। কোনমতে চোখ এড়াবার বস্তু তা নয়। সকল আদিম শিল্পই ভাবনা ও অনুভূতির প্রকাশ চেষ্টায় আঁকুপাকু করেছে, যেহেতু প্রকাশের উপযুক্ত উপাদান তার আয়ত্তে ছিল না। কালীমূর্তি দেখে অভ্যস্ত এমন চোখেও ধরা পড়ে তার সুগভীর, সুতীব্র, চমকপ্রদ অর্থদ্যোতকতা। যে অভিযোগকারী ইউরোপীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছেন, তিনি যদি ইউরোপীয় হতেন, তাহলে কালী-মূর্তি-কল্পনার বিষয়ে ঐ কথাও বলতেন। এখানে এইটুকু বলা যায়, নিজেদের

পুরাণ-কথা, বা সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয়রা পশ্চিম থেকে চোখ সরিয়ে তুলনাদি ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকলেই ভাল করবেন। মাতৃরূপের চিত্রণে নিজস্ব উপায় বজায় রেখে তাতে অধিকতর শ্রদ্ধা ও আদর্শবোধ সঞ্চারিত করাই তাঁদের পক্ষে উচিত কাজ হবে। তা করলেই তাঁরা যথার্থ জাতীয় এবং মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন। তা না করলে তাঁরা বিদেশী সৃষ্টির বহিরঙ্গ সৌন্দর্যটুকু দেখে বিভ্রান্ত হবেন, যদিও ঐ সৌন্দর্যের পশ্চাদ্বর্তী গভীর প্রেরণা ও আদর্শের চরিত্র বুঝবেন না, এবং নিজেদের শিল্পকে ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন করতে গিয়ে আরও স্থূল ও নিম্ন-মুখী করে তুলবেন।

পরবর্তী আপত্তি বলির বিরুদ্ধে। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। তাঁর কানে এই কথাটা খুবই কপট ঠেকে, যখন শোনেন, নিজের জন্য বলি চলবে, কিন্তু দেবীর কাছে নয়। কালীপূজায় লুকোচুরির ভাব নেই। যা জুটিয়েছি, দিতে হবে তা-ই। তথাপি কালীপূজার রীতি অনুসারে অপরকে নয়, নিজেকেই শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করার কথা আছে, এতে তিনি আনন্দিত। এইজন্যই শক্তি পূজায় এত শক্তি লাভ হয়। ত্যাগের দ্বারাই মাত্র শক্তি আসতে পারে, আর কালীকে কখনই ত্যাগ ভিন্ন পূজা করা সম্ভব নয়—ত্যাগ, আরও ত্যাগ চাই তাঁর পূজায়। আত্মোৎসর্গসহ জীবনবরণের যে অভিপ্রায় একদা খ্রীস্টধর্মে প্রবল হয়েছিল, কালীপূজার মধ্যে সেই ভাবের পুনর্জন্ম হয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। কারণ এই ভাবের তুল্য আর কোনো ভাবই এত স্থায়ী ও শক্তিশালী নয়। কালীপূজার কুণ্ঠিত পক্ষ সমর্থনে তিনি আসেন নি, সর্বশক্তি দিয়ে তার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত।

আলোচনার সর্বশেষে অংশ নিয়েছিলেন বৃদ্ধ মানুষটি, দুই চোখে জল নিয়ে শ্রোতাদের অনুনয় করেছিলেন পৌত্তলিকতা পরিহার করতে। ভারতীয় মন্দির সমূহকে তিনি কঠিন শব্দে ভূষিত করে বলেছিলেন, তার চতুর্দিকে নোংরামি ও লাম্পট্যের দৃশ্য। তাঁর স্থির বিশ্বাস, এ দেশের দুর্বলতার মূল কারণ মূর্তিপূজা। কালীর সামনে কখনো কখনো নরবলি দেওয়া হয়, সেকথাও তিনি বললেন। ভগিনী নিবেদিতা বললেন, শ্রদ্ধেয় বন্ধু যেসব কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন, সেগুলিকে তিনি সত্য বলে মেনে নিতে পারেন না। কোনো অভিযোগই, তাঁর মতে, প্রমাণিত হয়নি।

নরবলির ইতিকথা কালীর শত্রুরাই বিশেষভাবে লিখেছেন।* ব্যাপারটা যদি সত্যও হয়, এর দ্বারা, মানুষ মাঝে মাঝে খুন করে—তার অতিরিক্ত কি প্রমাণ হয়? এভাবে বা সেভাবে, যেভাবেই হোক খুন হল খুন।

তিনি তাঁর পুরাতন সূত্রে ফিরে যেতে চান (এক্ষেত্রে যা তাঁর বক্তব্যকে অধিক

---

* ভারতে এবং ভারতের বাইরে নরবলি প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে প্রকাশিত হয়। মার্ডক্স সাহেব ভারতবহির্ভূত দেশের ব্যাপারে ব্যস্ত না হয়ে স্বভাবতই ভারতের কুপ্রথায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন—তাঁর গ্রন্থে।

বোধগম্য করে তুলবে)—যদি সমস্ত কিছুই ঐশী হয়, সমস্ত কাজই পূজো হয়, তাহলে হত্যাও পূজাকর্ম, যার মধ্য দিয়ে এক ধরনের চরিত্র ঈশ্বরমুখী হয়।

ধর্মভাবকে যেহেতু সত্যপূর্ণ, মহত্ত্বপূর্ণ ধরে নেওয়া হয়, তাই তার কিছু অনুগামীকৃত বিকৃত কাজের জন্য বিশিষ্ট ধর্মপদ্ধতিকেই দায়ী হতে হবে—এ যুক্তি হাস্যকর। যদি তাই বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন করা যায়—কোন্ ধর্ম তার প্রবর্তকের নামে সর্বাধিক মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে? অবশ্যই খ্রীস্টধর্ম। কিন্তু কেউ কি যীশুখ্রীস্টকে স্বপ্নেও তার জন্য দায়ী করেন? যদি করেন, তাঁরা কি সংগত কাজ করবেন? কখনোই নয়। ব্যভিচারাদির দারুণ অভিযোগের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। ধর্মের ঘোষিত সত্য দৃঢ় ও মহৎ হলেই হল। তার বিপরীত কিছুর জন্য তাকে দায়ী করা উচিত নয়। প্যারিস, লণ্ডন এবং আমেরিকায় একই ধরনের Satanites এবং Diabalistes সম্প্রদায় রয়েছে, যারা একই ধরনের কাজ চালিয়ে যায় অন্য এক ধর্মের আচ্ছাদনের মধ্যে। এই পৃথিবীতে কোনো নীতি বা আদর্শই প্রকাশিত হয়নি, যার বিরুদ্ধে কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেনি। এসব কথাই সত্য। তাই বলে কি আমরা নীতি বা আদর্শ ঘোষণায় বিরত থাকব? এইভাবেই আমরা ভারতীয় পাপাদির কারণ ভারতীয় ধর্ম—এমন কথা বলতে পারি না।

সবশেষে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর শ্রোতাদের কাছে নিবেদন করেন—তাঁরা যেন কদাপি মনে না করেন যে, ধর্ম-সংশয়ের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতে চেয়েছেন। গভীরে দেখলে, ধর্ম সম্বন্ধে সংশয়, চূড়ান্ত সত্যে বিশ্বাসেরই অপর দিক। আমাদের কর্তব্য, ঐ সংশয়ের সম্মুখীন হওয়া, তাকে প্রণিধান করা, তার পক্ষে তথ্য সন্ধান করা, এবং যদি মৃত্যুই তাদের নিয়তি হয়, সযত্ন সমাধিতে তাদের শায়িত করা। যে মন সন্দেহ করেছে—আন্তরিক সন্দেহে আলোড়িত হয়েছে—সেই মনই বেঁচে রয়েছে। কিন্তু সন্দেহ যেন যথেষ্ট সন্দেহ হয়। যেন অতি সহজ, নিতান্ত সাধারণ সমাধানকে যথেষ্ট বলে মেনে নেওয়া না হয়। ঈশ্বর প্রেমময়, বলা খুব সহজ, কারণ —আমাদের পারিবারিক সুখশান্তি তার প্রমাণ! কিন্তু ঈশ্বর যে প্রেমময়—ঠিক ঠিক সেকথা শিখি কখন, কিভাবে? আমাদের জীবনের যন্ত্রণার মুহূর্তেই কি মহাসত্য আমাদের কাছে আবির্ভূত হয় না—পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ আনন্দ রূপে? কালীমূর্তির মধ্যে এই বিপরীত সত্যটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে—প্রকৃতি, পৃথিবী ও মানব-আত্মার এই বিরোধী সত্যটুকু: মানবের কাছে ভয়ঙ্কর যা-কিছু, সেই সকল কিছুর মাঝখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই, তা সত্ত্বেও 'মা' এবং আমরা সকলে তাঁর শিশুসন্তান।"

'কালী দি মাদার' গ্রন্থ

কালীঘাট-বক্তৃতার ২৩ দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা পাশ্চাত্য যাত্রা করেন। জাহাজে স্বামীজীর সান্নিধ্যে যে অবিস্মরণীয় কাল নিবেদিতা কাটিয়েছিলেন, যা তাঁর কাছে 'শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রা', সেই সময়েও ভয়ঙ্করীর ভাবাবেশ স্বামীজীর কাটেনি। সুতরাং ২৮ মে, ১৮৯৯, নিবেদিতা যে লিখেছিলেন—

'I have practically ended school. I give up the house tomorrow. I began, do you remember, on the Kali Puja morning, and I end at the Kalighat',—

সেই কালী-কাল কিন্তু সমাপ্ত হয়নি নিবেদিতার জীবনে কখনো, এবং জ্বলন্তভাবে বর্তমান ছিল পরবর্তী মাসাধিক সময়ে।

ঐকালে স্বামীজী পুনশ্চ বৈষ্ণবধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে কালী-তত্ত্বের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন :

"দাম্পত্যপ্রেম এবং সৃষ্টিকামনা অধিকাংশ ধর্মের ভিত্তিতে; ভারতে সে ধর্ম বৈষ্ণবধর্ম এবং পশ্চিমে খ্রীস্টধর্ম। কিন্তু কয়জনই বা মৃত্যুকে কিংবা কালীকে উপাসনা করার সাহস দেখাতে পারে! এসো, মৃত্যুর উপাসনা করি, ভয়ংকরকে আলিঙ্গন করি—তাকে ভয়ঙ্কর জেনে, নরম করে না নিয়ে! দুঃখ জেনেই দুঃখপুজো করি—এসো!"

এই ভ্রমণকালেই স্বামীজী 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি রচনা করেছিলেন, নিবেদিতার উদ্ধৃত পত্রাংশ থেকে তা আগেই দেখেছি, তাঁর মহানাটকীয় আবৃত্তির কথাও শুনেছি। তাঁর সেই পৌরুষ-ভীষণ উক্তিগুলি, যা কোনো অনুবাদেই ধরা পড়বে না—

"Yes! The older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. That is my new gospel. Do even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale!"

"I love terror for its own sake, despair for its own sake, misery for its own sake. Fight always. Fight and fight on, though always in defeat. That's the ideal. That's the ideal."

তারপরে অবিস্মরণীয় ইতিহাস :

"স্বামীজী বললেন—সগুণ ঈশ্বর হলেন সকল আত্মার সমষ্টি, কেবল মানবাত্মার সমষ্টি নন। সেই সমষ্টিভূত বিরাটের অভিপ্রায়কে কেউ রোধ

করতে সমর্থ নয়। তারই নাম নিয়তি। শিব, কালী প্রভৃতি বলতে তাকেই বুঝি আমরা।'

পৃথিবীর সর্বোত্তম নৈসর্গিক সৌন্দর্যময় স্থান আমার কাছে সুন্দরতর হয়ে উঠেছিল, যখন তাদের মধ্যে অবস্থিত থেকে আমি ঐসব সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি শুনেছিলাম।

সিসিলি দ্বীপের কাছে যখন পৌঁছেছিলাম, তখন আঁধার ঘনিয়েছে, অস্ত-সূর্যের আকাশপটে এটনা-আগ্নেয়গিরি—শীর্ষে ধূম-বাষ্পের মৃদু উদ্‌গিরণ। মেসিনা প্রণালীতে যখন প্রবেশ করলাম, চন্দ্রোদয় হল আকাশে। স্বামীজী পায়চারি করছেন ডেকে, সঙ্গে আমি, তিনি এই সত্য বোঝাতে লাগলেন—সৌন্দর্য বহিরঙ্গ বস্তুগত নয়, তা মনোগত। আমাদের একদিকে ইতালী-উপকূলের ধূসর পাহাড়ের ভ্রূকুটি-রেখা, অন্যদিকে রূপোলী আলোয় ধোয়া দ্বীপখানি।—'আমি নয়, মেসিনাই ধন্যবাদ দিক আমাকে!'—তিনি বললেন—'আমি-ই দিয়েছি তাকে তার সকল সৌন্দর্য।'

তারপর বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের জন্য তীব্র আকুলতা জন্মেছিল—তার কথা বলতে লাগলেন, কিভাবে একাসনে স্থিরভাবে বসে সারাদিন একটি মন্ত্রই জপ করতেন—সেই কথা। আমার প্রশ্নের উত্তরে তপস্যা কি, সেই কথাই ব্যাখ্যা করছিলেন, পুরাতন 'পঞ্চতপা' ব্রতের কথা বলছিলেন, যাতে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে মাথায় জ্বলন্ত সূর্য নিয়ে তন্ময় মনে বসে থাকে সাধক ঘণ্টার পর ঘণ্টা। 'পূজো করো ভয়ংকরের! পূজো করো মৃত্যুর! আর সব বৃথা—বৃথা সকল সংগ্রাম! এই শেষ শিক্ষা। তাই বলে কাপুরুষের মৃত্যুকামনা নয়, দুর্বলের আত্মঘাত নয়। এ হল বীরের অভ্যর্থনা—মৃত্যুকে—সবকিছুকে যে শেষ পর্যন্ত যাচিয়ে বাজিয়ে দেখেছে, জেনেছে—এই শেষ উপায়। শেষ উপায়!' "

এর পরে নিবেদিতার পক্ষে 'কালী দি মাদার' গ্রন্থরচনা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। নিবেদিতা অনুভব করেন, যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তা এক মহান আচার্য কর্তৃক ন্যস্ত মহাদায়িত্ব—প্রকাশ তাকে করতেই হবে। নিবেদিতার প্রকাশ-অধীর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সেই ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি—'কালী দি মাদার' গ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে Swan Sonnenschein & Co. Ltd., London, থেকে, পকেট সাইজে। ভারতীয় জীবনে এইটিই নিবেদিতার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

একথা সত্য যে, 'কালী দি মাদার'ই নিবেদিতার প্রথম পুস্তক, যত ছোট আকারেই হোক, কিন্তু নিবেদিতার একটি পুস্তিকা এর আগেই বেরিয়েছিল—কালী সম্বন্ধেই। সেটি আর কিছু নয়—নিবেদিতার কালী-বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ। অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার আগেই নিবেদিতা বক্তৃতাটি লিখে স্বামীজীকে দেখিয়ে নিয়েছিলেন ('যা বলতে চাই, লিখে ফেলে নিয়ে যেতে চাই রাজার কাছে—৩. ১. ১৮৯৯)। অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার পরেই পুস্তিকাটি বেরিয়েছিল কি না বলা শক্ত। সম্ভবতঃ বেরিয়েছিল। ২৮. ২. ১৮৯৯ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন—"তোমাকে এবং সারাকে কালী-বক্তৃতা পাঠাবার ভরসা করছি।

শুনেছি বেরিয়েছে।" ২. ৫. ১৮৯৯ মিসেস হ্যামণ্ডকে—"আমার কালী-বক্তৃতা তোমাকে পাঠাবার ইচ্ছা আছে, যদি কোনো কপি অবশিষ্ট থাকে।" ২. ৫. ১৮৯৯ তারিখে একই জনকে—"মনে হয় 'কালী' প্যাঠিয়েছি তোমাকে, যদি না পাঠিয়ে থাকি, মিঃ স্টার্ডির থেকে চেয়ে নিও।" এ সমস্তই নিশ্চয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তৃতা বিষয়ে নয়, পুস্তিকাকারে মুদ্রিত বক্তৃতার বিষয়েই।

পুস্তিকা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত উল্লেখগুলি সবই কালীঘাট-বক্তৃতার পূর্বে। কালীঘাট-বক্তৃতার পরে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, কালীঘাট মন্দির কর্তৃপক্ষের দ্বারা, সম্ভবতঃ সুষ্ঠুতরভাবে। ২৮ মে রবিবার বক্তৃতা হয়েছিল, আগের বুধবার নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন, "রবিবার কালীঘাটে বক্তৃতা; বক্তৃতাটি পরে হাজার কপি মুদ্রিত হবে; সুতরাং তুমি যা চাও পাবে—৫০টি পুস্তিকা।" বক্তৃতা হয়ে যাবার কয়েকদিন পরে ৩১. ৫. ১৮৯৯ তারিখে—"শুনছি, কালী-বক্তৃতা হাজারে হাজারে ছাপবে।"

এই কালীঘাট-বক্তৃতার একটি পুস্তিকা বেলুড় মঠ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। প্রকাশক: হরিদাস হালদার। সময়—১৯০০। বিনামূল্যে বিতরণের এই পুস্তিকা। অনুমান করছি, 'কালী দি মাদার' প্রকাশিত হবার আগেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

'কালী দি মাদার' বইয়ে যে-সকল রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়, তার মধ্যে সর্বাগ্রে কোন্‌টি রচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। বইয়ের মধ্যেই দেওয়া ছিল: *The story of Kali* লেখা হয় লেগেটে শিশুর জন্য, ১৮৯৮-এর বড়দিনের সময়ে বালীতে থাকাকালে। আত্মপ্রাণা জানিয়েছেন, ১৮৯৮-তেই *Voice of the Mother* ও লিখিত হয়। কোন্ সূত্রে তিনি এই সংবাদ পেয়েছেন জানি না, ডায়েরী বা পত্রজাতীয় কোনো সূত্র থেকে পেলে ভিন্ন কথা, কিন্তু নিবেদিতা স্বয়ং 'আচার্যদেব' গ্রন্থে যা বলেছেন, তাতে আত্মপ্রাণা-প্রদত্ত তথ্য 'আংশিক' সত্য মনে হয়। 'স্বামীজী ও শক্তিপূজা' নামক অধ্যায়ে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে কালী সম্বন্ধে শ্রুত কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "From him was gathered, in such moments as these, almost every line and syllable of a certain short psalm called the *Voice of the Mother* which I wrote and published about this time."

আমরা আগেই দেখেছি—১৮৯৮-এর মাঝামাঝি থেকে ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে মাতৃভাবাবিষ্ট রূপে নিবেদিতা স্বামীজীকে দেখেছেন। সুতরাং আলোচ্য লেখাটি ১৮৯৮-৯৯ সালের যে-কোনো সময়ে রচিত হতে পারে।

আত্মপ্রাণা-প্রদত্ত তথ্যে পাচ্ছি ২৪ মে *A Visit to Dakshineshwar* এবং ৪ জুন, ১৮৯৯, *An Intercession* লিখিত হয়।

'কালী দি মাদারে'র অধিকাংশ লেখা হয় আমেরিকায় মিঃ লেগেটের পল্লীভবন 'রিজলি ম্যানরে'। 'নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরে হাডসন নদীর তীরে পাহাড়ের উপরে জায়গাটি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।' ২০শে সেপ্টেম্বর নিবেদিতা

রিজ্জলি ম্যানরে পৌঁছান—সে সময়ে স্বামীজী ও-খানেই ছিলেন। ব্রতধারিণী নিবেদিতার কৃচ্ছ্র-সাধনার ইচ্ছা, এবং স্বামীজী কর্তৃক তাঁর জন্য 'শান্তি' (Peace) কবিতাটি রচনা প্রভৃতি বিষয় আগেই জানানো হয়েছে। 'কালী দি মাদার' সম্বন্ধে মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন :

"এই সময়ে নিবেদিতা *Kali the Mother* পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করেন। নির্জন পরিবেশের মধ্যে ধ্যান-ধারণা এবং অবকাশমত লেখার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু দূরে একটি নির্জন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৭ই অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এই কুটীরে অবস্থান করিয়া পুস্তকখানি শেষ করেন। এই পুস্তকের অন্তর্গত *The Story of Kali* ও *The Vision of Siva* প্রবন্ধ দুটি পূর্বেই লেখা ছিল। জগন্মাতা কালী সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন নিজের মনোগ্রাহ্য অনুভূতির দ্বারা অপূর্ব ভাষায় *Voice of Mother* নাম দিয়া তাহাও পূর্বেই লিখিয়াছিলেন।"

নিবেদিতার চিঠিতে আরও কিছু সংবাদ পাই। ১৮ অক্টোবর, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"দেখছ, 'কালী' শেষ করতেই হবে। অন্য কাজও আছে। আবার যে-ভাবেই হোক আমি সর্বসময় নির্জনবাস চেয়েছি। সে পথে প্রধান বাধা আচার্যদেব। তাঁর সঙ্গে এবং সেণ্ট সারার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যবস্থা হল—সকলকে জানানো হল, ১৫ দিনের জন্য নির্জনবাসে যাচ্ছি।......

আজ রাত্রে কালী-সাধকদের বিষয়ে রচনায় আটকে গেছি। রামপ্রসাদের শেষাশেষি অবধি লিখেছি। সেটি শেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশের বাসনা ছিল—কিন্তু পারলাম না। কয়েকপাতা আজেবাজে লিখলাম, তারপর ছিঁড়লাম, তারপর হতাশ-বিরক্তিতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় টুকতে বসলাম। তুমি হয়ত হাসবে, কিন্তু আমার চিন্তাগুলি সুশৃঙ্খল হচ্ছে না এখনো, তবে ভরসা করি, এইসব অসুবিধা সাময়িক।"

এই চিঠিতেই নিবেদিতা স্বামীজীর উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছিলেন—স্বামীজীর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা (তিনি 'পবিত্র' নন, 'স্বয়ং পবিত্রতা' ইত্যাদি), রামপ্রসাদের গান—যা আগেই উপস্থিত করেছি আমরা। নিবেদিতা স্বামীজীর মুখে সদ্য শোনা এইসব বিষয় 'কালী দি মাদার'-এর মধ্যে তখনি সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

২৭ অক্টোবর নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন—

"গত রবিবার 'কালী দি মাদার'-এর শেষ ক্ষুদ্র রচনাটি শেষ করেছি। ছোট বইয়ের পাণ্ডুলিপি...শিশুর জন্য গল্প—তুমি ডায়েরী থেকে পাতা-গুলি কেটে পাঠিয়ে দিও।"

'শেষ ক্ষুদ্র লেখাটি' কোন্‌টি বোঝা শক্ত। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত 'কালী দি মাদার'-এর রচনাসূচী নিম্নোক্ত প্রকার :

Concerning symbols

The Vision of Siva—	(মুক্তিপ্রাণা অনুযায়ী ১৭ অক্টোবরের আগে লেখা)
Two Saints of Kali—(Ramaprasad and Ramakrishna)	(নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে লেখা)
The Voice of the Mother—	(এর তারিখ আত্মপ্রাণার মতে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের কোনো সময়। এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কথা জানিয়েছি)
A Visit to Dakshineswar	আত্মপ্রাণা অনুযায়ী ২৪শে মে, ১৮৯৯
An Intercession	আত্মপ্রাণা অনুযায়ী ৪ঠা জুন,১৮৯৯
The Story of Kali for a Western Baby	গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত নোট অনুযায়ী ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে লিখিত।
Kali the Mother	স্বামীজীর কবিতা

আত্মপ্রাণা-প্রদত্ত তথ্যগুলি ঠিক হলে 'কালী দি মাদার' গ্রন্থে প্রথম সন্নিবিষ্ট রচনা *Concerning symbols*-ই নিবেদিতা-কথিত 'শেষ ক্ষুদ্র রচনা'।

আরও বোঝা যাচ্ছে, লেগেট-শিশুর জন্য লেখা গল্পটি নিবেদিতার ডায়েরী-পৃষ্ঠায় ছিল (লেগেটদের কাছে পৃথকভাবে সেটি তিনি পাঠাতেও পারেন), যে-ডায়রী তিনি ম্যাকলাউডের কাছে পাঠিয়ে দেন, এবং ম্যাকলাউড সেখান থেকে উদ্ধার করে তাঁকে পুনশ্চ পাঠিয়ে দেন।

বইটির প্রকাশ কিন্তু সহজসাধ্য হয়নি। তার জন্য নিবেদিতাকে যথেষ্ট চিন্তায় থাকতে হয়েছে। যে প্রচণ্ড আবেগে তিনি বইটি লিখেছিলেন—লিখে অনুভব করেছিলেন যে এর মধ্যে একটা মেসেজ আছে—সেই আবেগ গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে অযথা বিলম্বে প্রতিহত হয়েছিল। মিঃ লেগেটের প্রভাব ও প্রচেষ্টা ভিন্ন বইটি পশ্চাত্য থেকে প্রকাশিত হতে পারত কিনা সন্দেহ। ৪ নভেম্বর, ১৮৯৯-এর চিঠিতে দেখছি নিবেদিতা লিখেছেন, 'মিঃ লেগেট প্রকাশক ঠিক করার চেষ্টা করছেন।'

এ চেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরে চলে, শেষকালে এমন অবস্থা ঘটে যে, পাঁচ মাস পরে ৫ এপ্রিল তারিখে হতাশ নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন—

"তোমার কি মনে হয় না, পাশ্চাত্য থেকে কালী বইটি ছাপাবার সমস্ত অভিপ্রায় ত্যাগ করে স্বরূপানন্দের কাছে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল—কপিরাইট রেখে দিয়ে। ভারতেই বইটি বিশেষ বিক্রীর সম্ভাবনা। যদি তাই স্থির কর স্থানত্যাগের আগে তুমি ওটি (পাণ্ডুলিপি) পাঠিয়ে দেবে কি? এসব ব্যাপারে আমি একেবারে ব্যস্ত নই, শুধু জানতে চাই, ওর থেকে স্কুলের টাকা জুটবে কি?"

ইতিমধ্যে নিশ্চয় দ্রুত কিছু ব্যবস্থাদি হয়েছিল। ১২ মে তারিখে নিবেদিতা লিখলেন—"সত্যি-ই কি কালী-বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে?...আশা করি,...ভারতীয় কপিরাইট সংগ্রহ করবে এবং সোজা আকারে বার করবে। **ভারতকে 'কালী' কিনতেই হবে।"** (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

পুনশ্চ ১৩ মে তারিখে—"কালী-বইটির সংবাদ কী অপরূপ! জানিনা কিভাবে আমার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। এ বিষয়ে মিঃ লেগেটকে লিখতে এখনো চেষ্টা করিনি।"

কালী বই কেবল প্রকাশের ব্যবস্থাই হয়েছিল তাই নয়, সেইসঙ্গে ফরাসী অনুবাদের সম্ভাবনাও ঘটে। মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু মঁসিয়ে নোবেল এ-ব্যাপারে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। ঐ ১৩ মের চিঠিতেই নিবেদিতা লেখেন—

"মঁসিয়ে নোবেল—কী না চমৎকার! নিশ্চয় 'কালী দি মাদার' তাঁর অনুবাদের (ফরাসীতে) উপযোগী ছোট আকারের—যদি তিনি সত্যই অনুবাদের যোগ্য মনে করেন!"

কয়েকদিন পরে ১৮ মে তারিখে নিবেদিতা লিখলেন—

"বইটির ব্যাপারে ব্যবস্থাদির জন্য কৃতজ্ঞতার পরিসীমা নেই। প্রুফ পেলে দারুণ খুশী হব। দুটি আলাদা প্রচ্ছদপট সম্ভব হবে, তাতেও আনন্দবোধ করছি। ভারতীয় কপিরাইট সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া চাই, আমার বিশ্বাস, ভারতে বইটি চলবে।"

'কালী দি মাদার' ঠিক কোন্ সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলা শক্ত। মনে হয় মে থেকে অগস্টের মধ্যে কোনো এক সময়ে। পয়লা অগস্টের (?) এক চিঠিতে বইটিকে নতুনভাবে সাজানোর কথা পাচ্ছি—তা কি বইটি বেরিয়ে যাবার আগে না পরে?—বলা শক্ত। নিবেদিতা ওলি বুলকে লেখেন :

"You will be delighted to know that they offered to reset the type and everything and make *Kali the Mother* exactly like the project of the R.K.... for £38-2—instead of £35-8-10. So Mr. Leggette paid at once, and I think it is now probably will on."

মনে হয়, এই সময়েও বইটি প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত বলতে অবশ্য বাজারে প্রকাশিত ধরতে হবে। নচেৎ বইয়ের উপরে লেখা আছে, নভেম্বর, ১৮৯৯।

নিবেদিতা বইটির ভারতীয় সংস্করণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন আগেই দেখেছি। তিনি ভারতীয় সংস্করণের কপিরাইট ছাড়তে রাজী হননি। ৯ জনু (?) ১৯০০, তারিখে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"মায়াবতীর অবশ্যই কালী-মদ্রণ করা উচিত। আর ভারতে বিক্রীও হবে, এবং ক্যালিফোর্ণিয়ায়। এক্ষেত্রে ইংলণ্ডে ছাপার চেয়ে অনেক সস্তা পড়বে এবং ডাক খরচও কম হবে।"

ভারতীয় সংস্করণ অবিলম্বে করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে নিবেদিতা কিছু হতাশ হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে অবশ্য মদ্রণ-সম্ভাবনা দেখা যেত। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল চিঠিতে লিখেছেন—"যদি স্বরূপ শেষ পর্যন্ত ছাপতে রাজী হয়, কভারের জন্য আমি ধূসর (Grey) রঙের কাগজ জোগাড় করে দেব, কারণ কালী—ধূসর। আমি পাটল রঙ (Pink) একেবারেই পছন্দ করি না।"

কাছাকাছি সময়ে বইটির ভারতীয় কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বলতে পারব না। আত্মপ্রাণার মতে হয়নি—প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক।

বইটির আমেরিকান সংস্করণও কি প্রকাশিত হয়েছিল? বলতে পারব না। এক্ষেত্রে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী তারিখে মিঃ লেগেটকে লংম্যানস্ গ্রীন কোম্পানীর তরফ থেকে লেখা একটি চিঠিতে সেজাতীয় প্রয়াসের কিছু বিবরণ পাই :

Hand 93 Fifth Avenue
New York Jan 16, 1909

Francis H. Leggette, Esq.,
West Broadway,
New York City.

Dear Sir,

We are in receipt of your favor of January 15th, authorizing us to proceed with an American edition of "Kali the Mother", and in reply we would say that since writing you in December, we have had a communication from Miss Noble, informing us that she is in correspondence with the publisher of London edition, regarding her general rights in the matter, and we presume we shall hear from her, in due course, as to the outcome of that correspondence. As soon as we do hear from her, we will proceed with the matter.

With Compliments, we are
Yours very truly,
Longmans, Green & Co.

আগেই বলেছি, নিবেদিতা মনে করতেন, এই বইয়ের মধ্যে একটা 'মেসেজ' আছে ভারতের জন্য। এটিকে নিজের প্রেরণা-মুহূর্তের সৃষ্টি মনে করতেন। সে প্রেরণা অবশ্য সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ-প্রাপ্ত। তাই তাঁর বক্তব্য—"জানো কি, আমার মনে হচ্ছে, স্বামীজীই ছোট্ট 'কালী'-বইটির আসল লেখক।" একথা ভাবগতভাবে সত্য, বহুলাংশে তথ্যগত ভাবেও। কেবল স্বামীজীর প্রেরণাই নয়, স্বামীজীর উক্তিসমূহকেও নিবেদিতা বহু সময়ে অব্যাহতভাবে ধরে রেখেছেন এই বইয়ে, 'Voice of the Mother' কার্যতঃ স্বামীজীর উক্তির অপরিবর্তিত সংকলন, একথাও বলেছেন), শ্রীরামকৃষ্ণ বা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে স্বামীজী বা সারদানন্দ প্রভৃতির কাছ থেকেই শুনেছেন, রামপ্রসাদের গানের অনুবাদও বহুলাংশে স্বামীজীর করা, নিবেদিতার পত্রাদি থেকে তা পাই, সংস্কৃত স্তোত্রাদির অনুবাদও তাঁর মারফৎ-ই পাওয়া, কালী-তত্ত্ব কিভাবে স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছেন, তাও দেখেছি, সুতরাং বস্তুগতভাবেও যে বইটি প্রধান অংশে স্বামীজীরই—একথা নিবেদিতা বলতে পারেন।*

এই কথাই নিবেদিতা আরও পাঁচ বছর পরে লিখছেন, স্মৃতিচারণার সুরে—

> "লেডী বেটী (মিসেস লেগেট) রিজলিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেখানে আর একবার যেতে পারলে খুবই আনন্দিত হব। কিন্তু এবছর তা হওয়া সম্ভব নয়। সেখানে কত কি রয়েছে আমার! সেখানে 'কালী' লেখাও হয়েছিল। সমস্ত কাজের উৎসর্গ তার মধ্যে, কারণ আমার বিশ্বাস তিনি এ বই আমার হাতে লিখেছিলেন।" (২১ জুলাই, ১৯০৫, ম্যাকলাউডকে)

সুতরাং নিবেদিতা বইটি স্বামীজীকে উৎসর্গ করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না। উৎসর্গ তাই বলে 'বিবেকানন্দ' নামে নয়—বিবেকানন্দ যে স্বরূপে নিবেদিতার কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন সেই নামে।

TO

VIRESHWAR

LORD OF HEROES

এই তত্ত্বটি কিন্তু নিবেদিতার কাছে গোপন গভীর একটি সত্য—ম্যাকলাউড, ওলি বুল প্রভৃতি মাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ এর কথা জানতেন। স্বামীজীর 'বীরেশ্বর' ডাক নাম নিবেদিতার উপলব্ধ সত্যের বিচিত্র পূর্ব-স্বীকৃতি।

উৎসর্গের মূল কথাটি বাইরের কেউ বুঝুক, নিবেদিতা কদাপি তা চাননি। তাই ব্রহ্মবাদিন কাগজে যখন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় 'কালী দি মাদারে'র সমালোচনায় ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলা হল—তখন নিবেদিতা অত্যন্ত

---

* নিবেদিতা যে স্বামীজীর কথাই বলেছেন বা লিখেছেন, তা সহজেই বোঝা যায় 'আচার্যদেব' গ্রন্থের পরিশিষ্টে যুক্ত মাতৃউপাসনা সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত নোট দেখলে। নোট করেন মিস ওয়াল্ডো, বক্তৃতা হয় আমেরিকায়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের এক রবিবার অপরাহ্ণে।

অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করেছিলেন। মনে করেছিলেন, তাঁর গভীর কথাটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল প্রকাশ্য দিবালোকে, জনচক্ষে। ঐ বিরক্তি কিছুটা আতঙ্কযুক্তও ছিল। নিবেদিতা প্রমুখ কেউ কেউ স্বামীজীর অবতারত্ব নিজেদের মধ্যে চালু করতে চাইছেন, এই ধরনের কানাঘুষা এবং সমালোচনা কোথাও কোথাও ছিল। এসব ব্যাপারে স্বমীজীর আশঙ্কাও যথেষ্ট। এখন 'বীরেশ্বর শিব' যদি পরিষ্কার বিবেকানন্দ হয়ে দাঁড়ান, তাহলে সমালোচকদের কণ্ঠই আরও জোরালো হয়ে উঠবে —ব্রহ্মবাদিনের লেখা থেকে তারই সম্ভাবনা নিবেদিতা দেখেছিলেন।

নিবেদিতা ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯০১-তে ম্যাকলাউডকে লেখেন—"ব্রহ্মবাদিনের কালী-বইয়ের সমালোচনা একেবারে যা-তা। কৌতূহলী পৃথিবীর কাছে ব্যাখ্যা করে—খুলে বলে দিলে—বীরেশ্বর স্বামীজীর বাড়ির নাম......।"

ব্রহ্মবাদিনের লেখায় অজ্ঞান্তে নিবেদিতার বিরুদ্ধে যত 'অন্যায়ই' করা হোক না কেন—লেখাটি মনোযোগের বস্তু হতে পারে। কালীতত্ত্ব যে এতখানি দার্শনিক ও কাব্যিক গভীরতার সঙ্গে লিখিত হওয়া সম্ভব— ভারতবাসীর কাছে তাই ছিল পরম বিস্ময়ের বস্তু। নিবেদিতার আধা-মিস্টিক রচনার দুরূহতা অথচ অনস্বীকার্য আকর্ষণ সম্বন্ধে সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এবং সেই চরম বাক্যটি লেখা হয়েছে—'নিবেদিতাই তাহলে এই পৃথিবীতে জগন্মাতার ভাষ্য রচনার জন্য আবির্ভূত।'

লেখাটি উদ্ধৃত করছি :

Kali the Mother—By the Sister Nivedita of the order of Ramakrishna (Published by Swan Sonnenschen & Co., London, 1900).

A weired little book, 3 in by 6. Dark blue wrapper folding over on either side. We open the book with great curiosity, and wonder at the dedication:

To Vireswar—Lord of the Heroes.

A friend explains, that was the home name of Swami Vivekananda, usually abbrerviated to *Beele.* The next page discloses the strange contents. . . . . . .

We are so fascinated, we do not care to read the chapters from begining to end in the given order. We turn to the simplest title—A visit to Dukineswar, and read it slowly through, and could not without much effort make anything of it, the friend proposing various guesses as to the meaning. The result is that the weird first impression is deepened. We then take up the first chapter, and are charmed with the many profound reflections on the contrast between the religious genius of the East and that of the West. And so we read on, a chapter here and a chapter there, stopping

now and then to enjoy the inspiration produced by the *Sat Sanga* of the book, occasional remarks of a 'very sincere woman' 'truly religious' &c. escaping us. We recognise a true artist's hand in the portraits given of Ramaprasad and Ramakrishna; and we are reminded of painters who with a few black lines produce perfect pictures. Two of the chapters are prayers of a deeply sincere religious spirit, and we are tempted to compare them with the meditations of the devoted Thomas a Kempis.

A friend to whom we gave the book to read, became so enraptured with the interpretation of Kali the Mother, that he exclaimed "Was Nivedita born to interpret the Divine Mother to the world!"

Another, after going through it remarked that there was a mystic glow of loveliness about tht poetic prose of Nivedita's booklet which in several places mirrors forth the sentiments of Swami Vivekananda in all the glory of an English woman's language and imagery.

'কালী দি মাদার' নিবেদিতার হাত দিয়ে স্বামীজীর রচনা, সত্য, তবু স্বামীজী লেখাটির সবটুকু অংশ পছন্দ করেন নি। আমরা আগে নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী দেখে এসেছি, স্বামীজী কালী-বক্তৃতার অংশবিশেষকেও অপছন্দ করেছিলেন। 'কালী দি মাদার' বইটির অংশবিশেষ সম্বন্ধে স্বামীজীর আপত্তি আরও স্পষ্ট, হয়ত কঠোর হয়েছিল। নিবেদিতা বিশেষ আহত হয়েছিলেন তাতে। যে-বস্তুকে তিনি গুরু-প্রদত্ত মনে করেন, স্বয়ং গুরু যদি তার কোনো অংশকে অপছন্দ করেন, মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য তাহলে অবশ্যই ঘটে। এ ব্যাপারে নিবেদিতা তাঁর আহত মনোভাব এক পত্রে তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন। ৮ অগস্ট, ১৯০০-তে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

> "স্বামীজী যে-কালী-অধ্যায়টিকে পছন্দ করেননি—সে বিষয়ে বিশেষ ভাবছি; কিন্তু সেখানে যা বলেছি অন্য কিভাবে তা বলতে পারতাম বুঝতে পারছি না। যদি তিনি আমার হয়ে কিছু লিখে দেন, আমি সানন্দে তা সেই জায়গায় বসিয়ে দেব। কিন্তু আমি মনে করি, জিনিসটি বলতেই হবে। জানি, তিনি যা বলেছেন সব সত্য। এ পর্যন্ত এমন কোনো নির্বোধ জিনিস ঘটেনি, যাকে কেউ না কেউ নিজের প্রেরণায় সৃষ্টি বলে দাবি করেনি —তাঁর একথা ঠিক। তাহলেও, আমরা কেউই অন্য-লব্ধ প্রেরণার উপর ভর করে কাজ করতে পারি না। ভ্রান্তি ঘটানো কখনো-কখনো কারো কারো ভাগ্যে থাকেই। কথাগুলো এত অবাধ্যের মত শোনাচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। যদি স্বামীজী আদেশ করেন অংশটি বাদ দিতে, দেব। আর তা যদি তিনি

> না করেন, তাহলে—যদি অচিন্তিতপূর্ব বিকাশ কিছু আমার মাথায় না আসে—ও জিনিসটা থাকবে।
>
> আমি যা প্রকাশ করতে চেয়েছি তা হল—আমাদের কারো কারো দ্বারা অনুভূত কালীপূজার অনিবার্য নৈতিকতার রূপ, যাতে কালীপূজার বিরুদ্ধে প্রচলিত আপত্তিগুলি মূল্যহীন হয়ে যায়।
>
> অবশ্য আমার সিদ্ধান্ত বিজ্ঞোচিত বা যথাযথ হয়েছে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত নই; নিশ্চয় করে শুধু এইটুকু বলতে পারি—সিদ্ধান্ত আমি করেছি।"*

স্বামীজীকে যদি আমরা জেনে থাকি, নিশ্চয় করে আমরাও বলতে পারি, নিবেদিতার জন্য সংশোধনী কিছু তিনি লিখে দেননি, এবং কোনো একটা অংশকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে, এমন আদেশ দেননি। সুতরাং কালীপূজার নৈতিকতা সম্বন্ধে নিবেদিতার ব্যাখ্যা অব্যাহত থেকে গিয়েছিল। তথাপি এই ঘটনার আরও প্রায় পাঁচ বছর পরে (জুলাই ২১, ১৯০৫-এর উদ্ধৃত পত্র স্মরণ করুন) কি করে লিখতে পারলেন, 'আমার বিশ্বাস, তিনি এই বই আমার হাতে লিখে-ছিলেন'? এখানে একমাত্র ব্যাখ্যা নিবেদিতার কথা থেকেই উপস্থিত করতে পারি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মত প্রেরণা-পুরুষদের সম্বন্ধে নিবেদিতা বারবার বলেছেন—তাঁদের অনেকখানি প্রকাশই অসচেতন: যিনি দিচ্ছেন তিনি জানেন না, যিনি পাচ্ছেন তিনিই জানেন।

নিবেদিতা যখন বইটি লিখছেন তখন তিনি কিরকম কালীগতপ্রাণ তার সামান্য পরিচয় তাঁর পত্র থেকে তুলে ধরছি:

"মিসেস ওয়াটারম্যানের পুত্র এবং পুত্রের এক বান্ধবী এসেছিলেন বলতে যে, প্রথমজনের পিতা মৃত্যুশয্যায়, আর মিসেস ওয়াটারম্যানও সেই আঘাতে মৃত্যু-যাতনায়। কী ভয়ংকর! আর-গত সোমবার সন্ধ্যায় মেরী হেল ও আমি তার ঘরের আগুনের পাশে বসে ছিলাম, 'The Voicc of Kali' পড়ছিলাম এবং Law of Suffering সম্বন্ধে তর্ক করছিলাম।" (১০. ১২. ১৮৯৯)

---

* অংশবিশেষে অপছন্দ করলেও স্বামীজী বইটিকে নিশ্চয় সম্পূর্ণ অপছন্দ করেননি, এবং তার প্রচারগত সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০১, মিসেস ওলি বুলকে লিখেছেন—

"মার্গটের 'কালী দি মাদার' বইয়ের প্রশংসা সকলেই করছে। কিন্তু হায়, কেনার জন্য কেউ বই পাচ্ছে না—পুস্তক বিক্রেতারা বিক্রয় বাড়ানোর ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন।"

নিবেদিতার বই যে সমকালে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল, স্বামীজীর কথা থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় বেশী আলোচনা আমাদের চোখে পড়েনি। তবে অভিনব সৃষ্টি বলে সম্মানিত যে হয়েছিল তা বুঝি, কারণ, হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রিকার অগস্ট, ১৯১২, সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'History of Bengali Language and Literature' বইয়ের আলোচনার মধ্যে ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী লেখেন—

"Amongst the the later poets, like Rama Prasada Sen, were devout worshippers of Kali. No one as yet, except the late Sister Nivedita in her *Kali the Mother*, has attempted to make the idea of Kali intelligible to European minds."

সুতরাং—নিজ জীবনের ধ্রুব রূপ কোন্ মহাশক্তিতে নির্ধারিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই সে বিষয়ে স্থির প্রত্যয় হয়ে নিবেদিতা লিখলেন :

> "এখন আমি দৃঢ় নিশ্চয়—আমার সম্বন্ধে স্বামীজীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে?—যদি কালী, শিব ও গুরুভক্তি প্রভৃতির বিষয়ে তাঁর মনের গভীর অংশটুকু না জানতাম, তাহলে এই শক্তি পেতাম না।" (২০.১২. ১৮৯৯)

পাঠককে এইখানে পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দেব, এই সময়েই স্বামীজী ওলি বুল ও নিবেদিতার উপরে তাঁর কর্মভার চাপিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—'নারীর কাছ থেকে যা এসেছিল, নারীকেই তা অর্পণ করলাম।' এবং নিবেদিতা বলেছিলেন, পৃথিবীতে এই প্রথম একজন প্রফেট তাঁর মিশন অর্পণ করে গেলেন নারীর উপরে।

প্রসঙ্গের একেবারে শেষে একটি সাক্ষ্য উপস্থিত করছি। 'হিন্দু রিভিউ' পত্রিকায় নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে যা লিখিত হয়, তার অংশ :

> "একদিন নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বসে তাঁর বিচিত্র স্বদেশী কাপে চা খাচ্ছি—সহসা আকাশ ঢেকে গেল গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার পরিচিত দারুণ কালবৈশাখীর কালো মেঘে। দেখি—তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ত্রীর মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন। প্রকৃতির করাল গতির ছায়া তাঁর মুখে। নূতন দীপ্তি সেখানে—ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর। একেবারে স্তব্ধ—আমার অস্তিত্ব যেন সেই মুহূর্তে বিস্মৃত—জানালার বাহিরে খরদৃষ্টি নিবদ্ধ—সেখানে আকাশ ও পৃথিবী-জোড়া ভীষণের ক্রম সমারোহ; ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে শুনছেন ধেয়ে-আসা, আছড়ে আছড়ে পড়া ঝঞ্ঝার হুঙ্কার। তারপরে—যখন মেঘে মেঘে প্রথম সংঘর্ষ—প্রথম ঝলসানো বিদ্যুৎ—তখন বলে উঠলেন রুদ্ধশ্বাসে—কালী।"

একটি আলোচনা

[নিবেদিতা প্রধানতঃ ইংরেজীতে লিখতেন বলে বাংলা পত্রপত্রিকায় তাঁর গ্রন্থের উপরে বেশী আলোচনা হয়নি, অন্ততঃ আমাদের চোখে পড়েনি। সুখের বিষয় 'কালী দি মাদার' বইটি অবলম্বন করে বিস্তৃত একটি লেখা বেরিয়েছিল 'সাহিত্য' পত্রিকায়, কার্ত্তিক, ১৩১৯, সংখ্যায়। লেখক শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইনি সেকালে সুপরিচিত গ্রন্থকার। তত্ত্বভূয়িষ্ঠ রচনায় এ'র খ্যাতি ছিল।

এই লেখাটি খুবই উচ্চাঙ্গের, এমন কথা আমরা মনে করিনা। গুরুভার বাচনভঙ্গিতে স্বচ্ছতার অভাব আছে। তবু, একজন তাত্ত্বিক পণ্ডিত অভারতীয় নিবেদিতার রচনার তাত্ত্বিক অংশকে প্রশংসার চোখে দেখে বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকায় তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—এইটাই লেখাটির পুনঃ-উপস্থাপনার পক্ষে যথেষ্ট কারণ।]

কালিকা

Kali the Mother—by Sister Nivedita

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হিন্দু বিশ্বের বীজস্বরূপিণী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী মহামায়া পরমাপ্রকৃতির প্রতীক পূজা করিয়া থাকেন। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, দারু প্রভৃতিতে যে মূর্তি রচিত হইয়া থাকে, সেই মূর্তিরূপ যন্ত্রের সাহায্যে পূজাসাধনের নামই প্রতীক-পূজা। ইহা ভিন্ন ঘটে ও পটে প্রতীক-পূজা হইয়া থাকে। এখন সমাজের এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে, হিন্দুর সন্তান প্রতীক-পূজার ও পুত্তলী পূজার তফাৎ করিতে অসমর্থ। মায়ার বৃতিতে আবদ্ধ, সংস্কারের সঙ্কীর্ণতায় সসীম মানবের মানস-মুকুরে যে ভূমার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। সান্ত অনন্তের প্রতিবিম্ব ধারণে অসমর্থ। তাই মানব সকল বিষয়েই প্রতীকোপাসক। মানবের মনে, ভাবে, ভাষায়, কল্পনায়, ধ্যানে, ধারণায় সান্তের প্রতিমা বা প্রতিবিম্বই প্রতিফলিত হইয়া থাকে;—ক্ষুদ্র মুকুরে বৃহতের পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়ে না,—পড়িতে পারে না,—বৃহৎ বিপ্রকৃষ্ট থাকিলে ক্ষুদ্র হইয়াই ক্ষুদ্র মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে;—সন্নিকৃষ্ট হইলে উহার ক্ষুদ্র অংশই ক্ষুদ্র মুকুরে দেখা যায়। কিন্তু অনন্তের অংশও অনন্ত, সুতরাং সান্ত জীবাত্মার মানস-মুকুরে তাহা প্রতিবিম্বিত হয় না—হইতেই পারে না। সেই জন্য সাধকের হিতার্থ অনন্ত ব্রহ্মের সান্ত মূর্তি কল্পিত হইয়াছে।

মূর্তি বা প্রতিমায় অনন্তের বিভূতি কল্পিত ও ব্যক্ত করিতে হয়। মূর্তি-কল্পনার ইহাই প্রকৃত রহস্য। প্রকৃতির প্রতীকপূজা এই নিয়মেই সংসাধিত হইয়া আসিয়াছে। প্রতীক পূজার এই যে রহস্য, ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার Kali the Mother নামক পুস্তিকায় তাহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয়, অনেক হিন্দুর সন্তান এখন যে-তথ্য বুঝিতে পারেন না,—সম্পূর্ণ ভিন্নদেশে জন্মিয়া, প্রতিকূল প্রতিবেশ অবস্থার মধ্যে লালিতা হইয়া মনস্বিনী নিবেদিতা জন্মান্তরের সুকৃতিবলে তাহা বুঝিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় পাশ্চাত্ত্য চিন্তার, পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি প্রাচ্য প্রতীক-পূজার রহস্যে অনেকটা প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মূর্তিপূজা

ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার গ্রন্থের প্রথমেই প্রতীকের আলোচনা করিয়াছেন। মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার হইতেই ভগবানের মূর্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। দুইটি স্বতন্ত্র মূর্তি একই ধারনা বা একই ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করে না। ভাষা, ভাবের প্রতিমা বা প্রতীকমাত্র। ধরাবাসী সমগ্র মানবের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য-আবশ্যক বস্তু একই। সেই জন্য বিদেশের ভাষা শিক্ষাকালে আমরা বৈদেশিক শব্দ সন্ধানে ব্যস্ত হই। "তৃষ্ণা" বলিলে আমার যে বেদনা বা অনুভূতি বুঝায়, "thirst" বলিলে ইংরাজের সেই বেদনা বা অনুভূতিই বুঝাইয়া থাকে। তৃষ্ণা শব্দ বাঙ্গালীর রচিত যে বেদনা বা অনুভূতির শাব্দিকা মূর্তি thirst শব্দ ইংরাজের রচিত সেই অনুভূতিরই শাব্দিকা মূর্তি। মূর্তিকে চিনিলেই আমরা ভাবকে চিনিতে ও চিনাইতে পারি। ভাবের অর্চিঃ ভাবেরই প্রতিমা শব্দে বর্তে, তাই শব্দ দেখিয়া ভাবের পরিচয় মিলে। সেইজন্য যেখানে ভাবসাম্য, সেখানে কেবল প্রতিমার পরিচয় পাইলেই ভাবের পরিচয়লাভ সম্ভব। কিন্তু অনুভূত বস্তু ও অনুভাবকের বিপর্যয় বশে অনুভূতিরও বিপর্যয় হইয়া থাকে। অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য-ফলে অনুভূতির মূর্তি-শব্দেরও অর্থস্বাতন্ত্র্য ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভাষার শব্দ স্থূলতঃ একই ভাবের প্রতিমা বা মূর্তি হইলেও, উহাদের মধ্যে অর্চিঃ বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজীতে "twilight" বলিলে যাহা বুঝায় বাংলায় সন্ধ্যা বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। মেরুসান্নিহিত দেশসমূহে দিনের আলোক নিশার অন্ধকারে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইবার পূর্বে আলোকে ও আঁধারে একটা বহুক্ষণব্যাপী মেশামিশি হইয়া থাকে। পলে পলে আলোকের পরিবর্তন যে গম্ভীরতা আনিয়া দেয়, না দেখিলে তাহার অনুভূতি অসম্ভব। আর সেই সময়ের সহিত দৈনন্দিন ব্যাপারের কত স্মৃতি, কত ভাব, কত অভিজ্ঞতা জড়াইয়া একটি ভাবের সৃষ্টি করে। সে ভাব twilight শব্দেই ব্যক্ত হয়। twilight শব্দ সেইভাবেরই পূর্ণ প্রতিমা। আমাদের সন্ধ্যা শব্দ সে ভাবের পূর্ণপ্রতিমা নহে। এদেশে সন্ধ্যা বলিলে twilight এর প্রতিমা পূর্ণমাত্রায় মনোমধ্যে জাগিয়া ওঠে না। এদেশে দিনের আলোক নিশার আঁধারে ত্বরিতে মিশিয়া যায়। সুতরাং ইংরেজী twilight শব্দ আর বাংলা "সন্ধ্যা" শব্দ ঠিক একই ভাবের দ্যোতনা করে না। উভয় দেশের শাব্দিক প্রতিমা স্বতন্ত্র। প্রদোষ শব্দও ঠিক ঐ ভাব প্রকাশ করে না। রজনী

প্রভাত হইলেও উভয় অঞ্চলে twilight হয়। আলোক ও অন্ধকারে ঐরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে থাকে। এদেশের ঊষায় ঠিক সেরূপ হয় না। এদেশে দেখিতে দেখিতে ঊষার আলোক বালভানুকিরণে পরিণত হয়। এদেশে twilight নাই, সুতরাং বাঙালী সে ভাবের প্রতিমা গড়ে নাই। সেইজন্য বাংলায় twilight শব্দের প্রতিশব্দও নাই।

ইংরেজী gloaming শব্দ বাঙ্গালীর গোধূলি শব্দেরই অনুরূপ। প্রদোষের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, উৎসুকা নাগরী দিবাশ্রমশ্রান্ত নাগরের গৃহাগমন প্রতীক্ষায় গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথপানে চাহিতেছে—"ঐ এলো, ঐ এলো" ভাব শব্দটির সহিত যেন জড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে;—প্রত্যাশিতের আগমনে পরিবারের মধ্যে যেন কেমন একটা কোমলভাবের প্রবাহ ছুটিতেছে, নিদ্রিত শিশুর অধরে কোমল হাস্য ফুটিতেছে। এই সমস্ত ভাব gloaming শব্দ-প্রতিমায় অনুস্যূত রহিয়াছে। বাংলা "গোধূলি" শব্দ ঠিক ঐ সময়কে বুঝায় সত্য, কিন্তু ঐ শব্দের সহিত বঙ্গীয় পল্লীজীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠে। তপন প্রতীচ্য দিক্‌চক্রবালপ্রান্ত আশ্রয় করিয়াছেন। নিশাসমাগম-শঙ্কিত রাখাল গো-পাল লইয়া পল্লীর অভিমুখে ফিরিতেছে; প্রত্যাবর্তনশীল গো-পালের ক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে; দূরে গ্রামপ্রান্তস্থ শ্যামল শষ্পসমাচ্ছন্ন প্রান্তর-প্রান্তে রাখাল ও গো-পালের এই চিত্র গোধূলিশব্দের সহিত বিজড়িত। আর দেখিতে দেখিতে গাভীগণের ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিকে আশ্রয় করিয়াই নৈশ অন্ধকার যেন সমস্ত দৃশ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বাঙালীর পল্লীজীবন এই ধারণার সৃষ্টি করে,— 'গোধূলি' শব্দ এই ধারণারই শব্দময় চিত্র। 'গোধূলি' বলিলে এই সমস্ত দৃশ্যপট যেন মানস চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। ইংরাজী gloaming ও বাংলা গোধূলি একই কালের দ্যোতনা করে সত্য—কিন্তু উভয়ের প্রতিমা বা মূর্তি স্বতন্ত্র। এক কথায় দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, জাতির প্রকৃতি ও ব্যক্তির বিশেষত্ব অনুসারে শব্দের ব্যঞ্জনা ও ভাষার বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

ধর্মসম্পর্কিত ভাব ও তাহার প্রতীক ঠিক এইরূপভাবেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। অনন্তঃজ্যোতিঃ আমাদের ধারণার মধ্যে আইসে না, উহা আমাদের চিন্তাশক্তির ভিতর দিয়াই মানস মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ব্যক্তিভেদে ও জাতিভেদে চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র হয়; সুতরাং ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণা ও তাহার মূর্তি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। দুই জাতির বা দুই ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ও ধারণা সম্পূর্ণ একরূপ হয় না;—ফলে, তাহাদের মানস-প্রতিমা স্বতন্ত্রই হইয়া থাকে। আরব জাতির সমাজে পিতাই শ্রেষ্ঠ। আরবের মরুপ্রান্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ষীয়ান্ পুরুষই সমাজের গোপ্তা ও পরিচালক। তাঁহারই ইঙ্গিতে শত শত যুবক সমরক্ষেত্রে প্রাণদানে প্রস্তুত। সকলে তাঁহারই আজ্ঞাধীন। সমাজে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপ ও অপ্রতিহত প্রভাব। পিতৃশাসিত সেমেটিক জাতির মনে সেইজন্য শক্তিমানের কল্পনায় পিতৃপ্রতিমাই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহারা সর্বশক্তিমানকে পিতা বলিয়াই ডাকিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, আর্যজাতির সমাজে রমণীই প্রধানা। প্রতীচ্যখণ্ডে ভার্যাই সর্বেসর্বা, ভার্যাই স্বামীর সম্রাজ্ঞী। প্রাচ্যখণ্ডে জননীই সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবীমূর্তি,— সংসারের পবিত্রতা বিধায়িনী ও শান্তিপ্রদায়িনী। মা মা বলিয়া ডাকিলে এই অঞ্চলের

লোক যত তৃপ্তি, যত শান্তি পায়, বুঝি আর কিছুতেই তেমন তৃপ্তি পায় না। মা মা বলিয়া ডাকিলে হৃদয়ের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া যে ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। তাই বোধ হয় ক্যাথলিক খৃস্টান, শিশু খৃস্ট কোলে কুমারী মেরীর পূজা করিয়া থাকেন। মা শব্দের মত সর্বসন্তাপহারক শব্দ জগতে আর নাই। সাধকের আত্মা ইষ্টদেবের নিকট ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় হইয়া পড়ে। ভারতীয় বর্ণাশ্রমিগণ মাতৃত্বের পূর্ণভাবের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই ভারতে মাতৃমূর্তির পূর্ণ প্রতিমা গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেইজন্যই কালীমূর্তি স্ত্রীমূর্তি—মাতৃমূর্তি। ভক্ত হিন্দু কালীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মাতৃপ্রতিমা অতি অদ্ভুত। প্রতীচ্যখণ্ডে রমণী-প্রতিমার সহিত কাব্যকলার সমস্ত কোমল ও কান্তভাব বিজড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতেও যে ঐরূপ মাতৃমূর্তি নাই, তাহা নহে। নিবেদিতা সে মূর্তির উল্লেখ করেন নাই—সম্ভবতঃ তিনি উহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কালিকা মূর্তিই তাঁহার আলোচ্য বিষয়। এই মূর্তি দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা শিহরিয়া উঠেন। এই মূর্তি বিবসনা, লোলরসনা, বিকট দশনা,—এলোকেশী ও চতুর্ভূজা; মূর্তির এক হস্তে কৃপাণ, অন্য হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরশির। আবার অন্য দুই হস্তে বর ও অভয়। মূর্তির গলে দোদুল্যমান নরশিরের মালা, মূর্তি বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ, পদতলে লুণ্ঠিত শিবের উপর নৃত্যশীলা। মূর্তি বিভীষণা ও অসাধারণী। যাহারা মায়ের কেবল মূর্তির ঐটুকুমাত্র লক্ষ্য করে,—তাহারা মূর্তির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। মায়ের স্নেহমাখা স্বর তাহাদের কর্ণে পশে না। হিন্দু এই মূর্তিরই পূজা করিয়া প্রীতি অনুভব করে।

শিব

প্রকৃতি অনন্তসৌন্দর্যশালিনী। সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনী, সুহাসিনী প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে শান্ত, শুভ্র নির্বিকার ও নির্মল সত্তা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেন প্রকৃতির অন্তরালে নির্বিকার, নিরঞ্জন, মূক ও অনন্ত শূন্যতার মধ্যে কে অবস্থিত করিতেছে বলিয়া বোধহয়। পার্থিব সৌন্দর্যের মধ্যে যেন কেমন এক দ্বৈতভাব লুকাইয়া রহিয়াছে। হিন্দু যে-দিকেই দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই এই দ্বৈতভাব দেখিতে পায়। আলোকের সহিত অন্ধকার, আকর্ষণের সহিত বিপ্রয়োগ, সৃষ্টির সহিত লয়, কারণের সহিত কার্য ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। মানবজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও স্ত্রী ও পুরুষ, দেহ ও আত্মা—এই দ্বৈতভাব পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্টিরহস্য-উদ্ভেদের ইঙ্গিত এইখানেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ লইয়াই যেমন মানবতা, প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়াই তেমনি বিশ্ব। প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিরোধ বা বিবাদ নাই। স্ত্রী ও পুরুষের সমবায়ে যেমন মানবতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সেইরূপ বিশ্বও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত পরমাত্মার বিরোধ নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু বলিয়া আসিতেছে,—পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও শক্তি অভিন্ন। মানবের কল্পিত মূর্তি মানবত্ব-জড়িতই হইবে। লোককোলাহলশূন্য নির্জন দেশে বিশাল পর্বতের বিপুল ছায়া মানবের

মনে ভূমার গুণবিশেষ উদ্রিক্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বেশ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে পারে না। বাহ্য আকৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা সম্ভব নহে। নিবেদিতা বলিয়াছেন,—

Hinduism has avoided this danger of fixedness in a curious way. Of all the peoples of the earth it night be claimed that Hindus are apparently the most, and at heart, the least idolatrous"

ইহার মর্মার্থ এই, "হিন্দু অতি চমৎকার উপায়ে বন্ধভাব পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছে। জগতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে হিন্দুরাই আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অধিক পৌত্তলিক,—কিন্তু অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, অন্য কোনও জাতি তাহাদের ন্যায় পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিতে সমর্থ হয় নাই।" মনস্বিনী ভগিনী নিবেদিতা বাস্তবিকই হিন্দুর মর্মকথা বুঝিতে সমর্থা হইয়াছেন,—হিন্দুধর্মের প্রকৃত রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারিয়াছেন। বাহ্য আকৃতি লইয়াই হিন্দু ব্যস্ত নহে,—ভাবের পথ ধরিয়া হিন্দু বিশ্বপ্রহেলিকার সমাধানে ব্যগ্র। বাহ্য আকৃতি বা প্রতিমা সেই ভাবেরই প্রকাশকমাত্র। বাহ্যবস্তু অবলম্বন করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, হিন্দু তাহা বুঝে; সেইজন্যই হিন্দু প্রতীকোপাসক। বিশাল হিমালয়ের বক্ষে নিত্য শুভ্র হিমানীর উপর কৌমুদীরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—চন্দ্রিকাসমুদ্ভাসিত হিমানী দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অনন্তকাল নিঃস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিয়াছে,—আর তাহারই উপরে শশিকলাকে ভালে লইয়া নিবিড় নীলিমাময় অনন্ত আকাশ প্রকৃতির নগ্নামূর্তিরূপে নৃত্য করিতেছে,—এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হিন্দুর মনে যদি প্রকৃতিপুরুষের লীলা-কথা উদিত হয়,—যদি সে মনে করে, এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির মূলে নিত্য, শুদ্ধ, নিরঞ্জন ও নির্বিকার আত্মা অবস্থিতি করিতেছে; হিমাদ্রিশিখরশায়ী হিমরাশির ন্যায় উহা দুরধিগম্য, কিন্তু উহারই বক্ষের উপর নৃত্যশীলা নগ্না প্রকৃতির প্রত্যেক লীলারই প্রতিবিম্ব পতিত হইতেছে,—তাহা হইলে সে ভাব হৃদয়ে পুনর্বার জাগাইবার জন্য সেই ভাবমূলক প্রতীক রচনা করিবার প্রবৃত্তি হিন্দুর মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। সে প্রতীকপূজা পুত্তলিকার পূজা নহে, ভাবেরই পূজা। হিন্দু যেখানে সেইভাব প্রতিফলিত দেখে, সেইখানেই প্রকৃতি পুরুষের মূর্তি দেখিতে পায়। হ্রদের জল নিথর নিঃস্পন্দ লহরীশূন্য। কৌমুদীরাশি তাহারই উপর ছড়াইয়া তাহাকে শুভ্র করিয়া তুলিয়াছে। আর সেই শুভ্র সলিলরাশির উপর তীরস্থ তরুলতা, পত্রপুষ্প প্রভৃতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আর সেই সকল প্রতিবিম্বমধ্যে চন্দ্রকলার প্রতিবিম্ব পূর্ণ ভাস্বরতায় সকলকেই পরাজিত করিয়াছে।—এ দৃশ্য হিন্দুর মনে প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়,—তাই হিন্দু ইহারও প্রতীকপূজক। তাই বুঝি বিসর্জনের সময় দর্পণে বা পাত্রস্থজলে মায়ের পাদপদ্মের প্রতিবিম্ব দেখিতে হয়। হিন্দুর এই প্রতীক উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলা বিষম ভ্রম।

প্রকৃতি ও পুরুষের, শিবের ও শক্তির সম্বন্ধ কি? য়ুরোপীয়দিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য য়ুরোপীয়ভাবে মনস্বিনী নিবেদিতা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা সত্য, কিন্তু তাহাকে ক্রিয়া করাইবার জন্য পুরুষের প্রয়োজন। আত্মার সহিত অভিজ্ঞতার যে সম্বন্ধ, ডায়নামোর (dynamo) সহিত বিদ্যুতিক শক্তির

যে সম্বন্ধ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সেই সম্বন্ধ। একের সহিত অন্যের সংযোগের ফলে শক্তি ও কার্যকারিতা উদ্ভূত হয়, বিশ্বব্যাপারে ইহা নিত্য পরিদৃশ্যমান। শিষ্য শ্মশানে নিশীথে শবের উপর আসীন। অকস্মাৎ গুরুর মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ শিষ্যের কর্ণে পশিল। শিষ্য নির্ভয়ে শবসাধনায় ব্রতী হইল। সাধনবলে শবে জীবনীশক্তির সঞ্চার হইল। সেইরূপ পুরুষের অশরীরিণী শক্তির সঞ্চারে প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। শিব ও শক্তি পৃথক নহে। নিবেদিতা এই তথ্যই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জীবমাত্রেই শিব। মানবাত্মা শিবরূপে প্রকৃতির লীলা দেখিতেছে।

ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিতে হইলে পার্থিব সকল সম্পদই পরিত্যাগ করিতে হয়। এমন কি, সুখ, দুঃখ উভয় ভাবেরই পরিহার আবশ্যক হইয়া উঠে। সেইজন্য শঙ্কর ভিখারী,—আপনার যজ্ঞকুণ্ডের ভস্মে আপনি আবৃত। মহাযোগে নিমগ্ন। তাঁহার নয়নদ্বয় অর্ধনিমীলিত। পার্থিব কোন ব্যাপারই তিনি লক্ষ্য করেন না। জগৎ তাঁহার দৃষ্টিতে মায়াকল্পিত স্বপ্নরাজ্য। তাঁহার প্রজ্ঞাই কেবল ক্রিয়াশীল। সেইজন্য আদর্শ মানবরূপী শিবের ললাটে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত। তাই শিব বিরূপাক্ষ। তিনি সর্বজীবের আশ্রয়। বিষধর ভুজঙ্গও তাঁহার গলদেশে উপবীত-রূপে আশ্রয় লইয়া রহিয়াছে। তিনি বিশ্বপ্রেমে বিভোর। ভূত, প্রেত, পিশাচও তাঁহার প্রেমের পাত্র। সংসারের সকল দুঃখ-জ্বালা তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বিষপানে নীলকণ্ঠ। তাঁহার কিছুই নাই। বৃদ্ধ বৃষই তাঁহার বাহন, যোগের ব্যাঘ্রচর্মই তাঁহার আসন। তিনি আশুতোষ; বিল্বদল ও গঙ্গাজলেই তিনি তুষ্ট। তিনি সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, বীরেশ্বর ও বিরূপাক্ষ। ভগ্নী নিবেদিতা এই ভাবেই জীবরূপী শিবের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জীবাত্মা বা পুরুষ মায়া বা প্রকৃতির অর্ধাঙ্গ। মায়া নশ্বর ইন্দ্রিয়-বৈচিত্র্যজ্ঞান। জীবাত্মা শবরূপে পতিত। নিষ্ক্রিয় ও বাহ্য ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। কালী বা প্রকৃতি ভীষণামূর্তিতে সংহারকার্যে নিযুক্তা। চারিদিকেই সংহারের ভীষণ দৃশ্য। তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা, হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরশির ও উদ্যত কৃপাণ, অকস্মাৎ তাঁহার পদ তাঁহার ভর্তার বক্ষ স্পর্শ করিল। শিব ঊর্ধ্বে চাহিলেন; জীবাত্মার প্রজ্ঞাচক্ষু, মায়ার চক্ষুর সহিত সম্মিলিত হইল। মায়া লজ্জায় দশনে রসনা কাটিলেন। শিব সেই মহা মেঘপ্রভা সাক্ষাৎ সংহারিণী মূর্তিধারিণী মায়াকে পরমা সুন্দরী দেখিলেন। তখন সেই নগ্না, ভীষণা, সংহারিণী প্রকৃতি সংহার-জন্য বেদনায় ব্যথিতা নহেন, বরং প্রফুল্লা। পিশাচগণ তাঁহারই প্রদত্ত পিশিতে পরিপুষ্ট। এ হেন প্রকৃতির উপর যোগী জীবাত্মার প্রজ্ঞাদৃষ্টি পতিত হইল। তখন প্রকৃতি তাহাকে বরাভয় কর উদ্যত করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষুশালী জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ মহাশক্তিকে চিনিলেন। তিনি শক্তিকেই মাতৃসম্বোধন করিলেন। প্রকৃতির রহস্য উদ্ভিন্ন হইল। মায়াবদ্ধ শিব 'জীবাত্মার' সহিত পরমাত্মা পরমা-প্রকৃতির মিলন হইল। যোগীর যোগ সাফল্য লাভ করিল।

কিরূপে সাধকের এই আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে? কিরূপে সাধক 'মা'-কে চিনিতে ও জানিতে পারে? প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্যশালিনী ও বৈচিত্র্যময়ী। কিন্তু তাঁহার সেই সৌন্দর্যময়ী যবনিকার অন্তরালে বিভীষিকাময় মশানের দৃশ্য লুকাইয়া

রহিয়াছে। সে দৃশ্য সর্বজ্ঞের সর্বতোবিসারিণী দৃষ্টি অতিক্রান্ত করিতে পারে না। প্রকৃতির অঙ্কে জীব জীবের প্রাণসংহার করিতেছে। স্রোতস্বতী ভূধরকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছে, ধূমকেতু পৃথিবীকে চূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই যেন মধ্যগগনে খর করপালতুল্য পুচ্ছ উদ্যত করিয়া উদিত হইতেছে। জীবের হাহাকার, ব্যথিতের আর্তনাদ, পিপাসিতের মর্মোচ্ছ্বাস, ভয়চকিতের আতঙ্কধ্বনি প্রভৃতিতেই প্রকৃতির ক্রোড় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সেই ব্যথিতের বেদনার প্রতি তাঁহার একেবারেই দৃক্‌পাত নাই,—উপেক্ষার অট্টহাস্যে তিনি সেই বেদনাধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতেছেন। হিন্দু প্রকৃতির এই দৃশ্যে অন্ধ নহে। হিন্দু হৃদয়ের মর্মতল ভেদ করিয়া বলিতে পারে—"মাগো, তুমি বিশ্ব-সংহারিণী সত্য কিন্তু তথাপি আমি তোমারই শরণাগত।" "শ্মশানের মধ্যেই মায়ের করুণার কমল প্রফুল্ল রহিয়াছে।" নিবেদিতা দার্শনিকদিগের দৃষ্টিতে মায়ের মূর্তিকে চিনিয়াছেন। সাংখ্য মতে পুরুষ অনেক; প্রকৃতিই এক। নিবেদিতা বলেন পুরুষ সাধক, প্রকৃতি বিশ্বাত্মার মূর্ত প্রতিমা—মায়া। পরমাত্মা, মায়া কর্তৃক উপহত হইয়া, পদতলে মথিত হইয়া জীবাত্মারূপে শবের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন। ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত। সাধনায় জীবাত্মার প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়। তান্ত্রিকগণ সকলে কালী-মূর্তির এই ব্যাখ্যা করেন না। তাঁহারা বলেন, শিবই পরমাত্মা, কালী পরমাপ্রকৃতি। ঐশী শক্তি মায়ারূপে সৃষ্টিস্থিতি সংহার করিতেছেন, ঈশ, শুভ্র, শান্ত, নির্বিকল্প ও নিরঞ্জন অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন। নিবেদিতা এ ব্যাখ্যাও গ্রহণ করিয়াছেন। মূলে সকল ব্যাখ্যাই এক। নিবেদিতা য়ুরোপীয়দিগকে বুঝাইবার জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে সাধক রামপ্রসাদ ও পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এই দুইজন মায়ের ভক্ত সাধকের সাধনপদ্ধতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষানবীশদিগের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

'কালী দি মাদার' গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ

['কালী দি মাদারে'র নির্বাচিত অংশের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হয়েছে। 'নির্বাচিত' কথাটি ব্যবহার করা বোধহয় ঠিক হবে না, কারণ এই ক্ষুদ্র বইটির প্রায় সবটুকুই অনূদিত হয়েছে। এই বইয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের অনুবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে, পাঠক দেখেছেন। পরে অন্যপ্রসঙ্গে The Voice of the Mother এর অনুবাদ দেওয়া হবে। এখানে দেওয়া হল 'প্রতীকোপাসনা', 'শিবানুধ্যান', 'মায়ের গল্প' ও 'রামপ্রসাদ'।

'প্রতীকোপাসনা', 'শিবানুধ্যান' ও 'মায়ের গল্প' অনুবাদ করেছেন শ্রীনারায়ণী দেবী।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনা বাংলা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এপর্যন্ত যে-সব আলোচনা হয়েছে, তাদের মধ্যে নিবেদিতার এই লেখার স্থান উচ্চে। নিবেদিতা জন্মে এবং প্রথম জীবনের শিক্ষায় ভারতীয় নন, সুতরাং তাঁর পক্ষে স্বচ্ছন্দে রামপ্রসাদকে বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে স্থাপন করে বিচার করা সম্ভব হয়েছে, যে-ধরনের বিচার করতে আমাদের পক্ষে সাহসের অভাব বা হীনমন্যতার প্রভাব বাধা ঘটায়। নিবেদিতার আলোচনার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে সুনীলচন্দ্র সরকার নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি :

"আমাদের শ্যামা সঙ্গীতগুলির একটা উদার মানবিক ব্যাখ্যানের জন্য বাংলা সাহিত্যের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নিবেদিতার কাছে। সেই কাব্যরসবেদিত্ব তো তাঁর আগে কেউ প্রকাশ করেননি, কাজেই ঐ সুন্দর কবিতাগুলিকে আমাদের সাহিত্যের রসবিপণিগুলি থেকে পৃথক হয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ উমার সৌন্দর্য নানা গানে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, তাঁর বাপের বাড়ি আসার কাহিনীটিও গল্পে-প্রবন্ধে নানা জায়গায় কাব্যমণ্ডিত করেছেন। রামপ্রসাদের গানে তিনি যে মুগ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার কাব্যিক বিশ্লেষণ তিনি করেননি, যেমনটা করেছিলেন আমাদের গ্রাম্য ছড়ার, মধ্যযুগের কবীর প্রভৃতির কবিতার, বাউলের গানের। সেই কাজ কী চমৎকার করেছেন নিবেদিতা!...... রামপ্রসাদের গানের যে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন নিবেদিতা, তার থেকেই তাঁর রসজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যখন বিদেশীদের জন্য আমাদের সাহিত্য-সম্ভার ইংরাজীতে মেলে ধরতে চেষ্টা করি, তখন এইগুলি নিশ্চয় কাজে লাগাতে পারি।"*

---

* রামপ্রসাদের গানের ইংরাজী অনুবাদ যতখানি নিবেদিতার, অন্ততঃ ততখানিই স্বামীজীর, একথা আমরা সহজেই বলতে পারি।

'কালী দি মাদার' বইটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকারের আরও কিছু সাধারণ মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায় :

"(কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি) ভজনার মধ্যে সমস্ত মানবাত্মার যে সার্বিক প্রেরণা, দ্যোতনা, আকৃতিগুলি কাজ করে, যা নানাভাবে সর্বদেশের সংস্কৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে, শুধু তাদের ধর্মচেতনায় নয়, তাদের কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পেও—তা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। শিক্ষিত জীবনের সঙ্গে বরং তার একটা বিরোধ-আশঙ্কা স্থায়ী আসন পেতেছিল আমাদের মনে। নিবেদিতা এই সত্য দেখতে পেলেন অত সুন্দর করে তাঁর অনন্য কাব্যদৃষ্টির সহায়তায়। 'মূর্তি হল কুসংস্কারমাত্র, তা বর্জন করা উচিত'—এমন কথা তিনি বললে দোষের হত না। কিংবা তিনি বলতে পারতেন, ও ভারতীয়দের একটা বিশেষ সাধনার উপায়। কিন্তু তিনি তার মধ্যে দেখলেন সমস্ত মানবচিত্তের স্বাভাবিক প্রতীক-প্রবণতার উন্মেষ। ক্রীশ্চানদের পরম আনন্দ-দর্শন (Beatific Vision) ভগবানকে মায়ের কোলে শিশুরূপে দেখা, ম্যাডোনাকে নিয়ে তাদের নানা ভাবোচ্ছ্বাস—আর তার সঙ্গে তুলনায় আমাদের ঐ ভয়াল কালী-মূর্তি—এই সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলেন নিবেদিতা। তিনি ডি জি রসেটীর সনেট থেকে লাইন তুলে দেখিয়েছেন সেখানে ভার্জিন মেরীর শ্রদ্ধানম্রতা, বুদ্ধির প্রাঞ্জল গভীর সরলতা, অক্লান্ত ধৈর্য কী সুন্দর।......আবার পাশ্চাত্ত্য কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান কার কাছ থেকে কালী ধ্যানের ইঙ্গিত পেয়ে অনুভব করেছেন, 'সে যে আসে, ঐ আসে,'......তাও স্মরণ করেছেন নিবেদিতা। মিলিয়ে দেখেছেন সমস্ত বিশ্ব-সাহিত্যের সাক্ষ্য, তার মধ্যে যোগ্য স্থান দিতে চেয়েছেন ভারতীয় আত্মার স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার আবিষ্কারকে।

এই হচ্ছে এমন এক সাধনার ফল, যাকে আমরা বলতে পারি দ্রষ্টা কবির সাধনা। 'কবির্মনীষী'র যে সিদ্ধান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথে পাই, তারই সূচনা দেখি নিবেদিতাতে।"]

প্রতীকোপাসনা

(Concerning Symbols)

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা হতেই ঈশ্বরের প্রতীক সৃষ্টি করে নিই আমরা। ও নিয়ে দুটি মানুষের ধারণা কখনও ঠিক একরকম হয়না।

আমরা ভাষা বলি যাকে, সেও এক ধরনের প্রতীক। তার সম্বন্ধেও ওই কথাটা খাটে।

প্রতিদিনের সাদাসিধা প্রয়োজনগুলি সারা পৃথিবীতে সব মানুষের বোধহয় একই। এজন্য যেসব কথায় প্রত্যেক দেশে পরস্পরে একটা মিল আছে, সেগুলি আমরা খুঁজে বার করতে চাই। সেইসঙ্গে এও জানি যে, প্রত্যেকের মুখের ভাষাতেই

কোনও একটা ভাব কিরকম যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর অন্য সব বাতিল হয়ে যায়। দুটি মানুষের ভাষায় ঠিক একই ধরনের জোর বা খুঁত কখনও চোখে পড়েনা আমাদের। আরও তলিয়ে দেখি যদি তো একটা দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অভ্যাসের মধ্যেই সবসময় সে-দেশের ভাবনা কিংবা ভাবাভিব্যক্তির স্ব-তন্ত্র বৈশিষ্ট্যের হেতুটি আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তী খানিকটা সময়কে বোঝাতে উত্তরে আমরা বিশেষ একটি কালকে বলি আলো-আঁধারি (Twilight)। ভারতবর্ষে ঠিক ওই সময়-টারই নাম দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যাকাল। তার কারণ ওরকম 'আধ-আলো আধ-ছায়া' কোন পর্ব নাই এখানে। দিবালোক ও নিশান্ধকার এদেশে যেন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে পরস্পরকে।

দৃষ্টান্ত আরও ফলিয়ে তোলা চলে। সায়ংকাল (gloaming) কথাটার সঙ্গে একরাশ ভাবানুষঙ্গ জড়ানো রয়েছে আমাদের মনে—আসন্ন সন্ধ্যার কম্প্র ছায়া, ঘরে ফিরে আসার মাধুরী, খোকা-খুকুদের ঘুমজড়ানো হাসির শেষ রেশটুকু। গোধূলি বেলা বললে ভারতীয় ভাষাতেও অমনি এক আবেগের সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠে।

কিন্তু দুয়ের মধ্যে কী সুস্পষ্ট পার্থক্য। ওই যে, মাঠের ধার দিয়ে গোয়ালিনী তার গরুগুলিকে রাতের মত গ্রামে নিয়ে চলেছে। ওদের খুরের ঘায়ে রোদে-পোড়া মেঠো পথ থেকে মেঘের মত ধুলা উড়ছে ওদের পিছনে। সব কিছু হঠাৎ কেমন আবছা হয়ে গেল, ধুলো উড়ে আকাশ ছেয়ে গেছে যেন। গোচরের মাঝখানে গয়লা মেয়েটিকে দেখতে অনেক বড় লাগছে।

গোধূলি কথাটিতে ভাবের যে-উৎস খুলে যায়, তা সত্যই এই পূবদেশের নিজস্ব। গরু-বাছুরের সব কিছু সাদরে খুঁটিয়ে দেখে ভাষায় তা ধরে রাখা হয়েছে। ওর খুরের গর্তে যেটুকু জল ধরে আর্যজাতির মধ্যে সে একটি অতি পরিচিত মান।

ভাষার ক্রমবিকাশে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী মুখ্য নিমিত্ত হলেও ব্যক্তিগত ও জাতি-গত বৈশিষ্ট্যবশতঃই যে প্রতিটি ভাষা এবং ভাষাগোষ্ঠী পরস্পর হতে পৃথক হয়—এরপর তা নিয়ে আর যুক্তিতর্ক নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মসংক্রান্ত প্রতীকের ব্যাপারটাও অনেকটা এই ধরনের। সম্যক উপলব্ধির ন্যূনতা থাকায় সেই ধ্রুবজ্যোতিকে আমরা যে যার নিজস্ব ধারণার পরকলার মধ্য দিয়েই দেখতে বাধ্য। কারও একজনের সঙ্গেই বোধহয় অন্য কারও পরকলাটার মিল নাই। আবার, ব্যক্তিগত আত্মোন্নতির ফলে কেউ কেউ সার্বলৌকিক ভাবনার কেন্দ্র হতে বহুদূরে এমন এক-একটি ভূমিতে গিয়ে পৌঁছান যে, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ বা এমনি সব বিভিন্ন অধ্যাত্ম চেতনার বিশাল ক্ষেত্রে অদ্যাবধি যে-প্রগতি ঘটেছে, মনে হয় তাঁরা যেন তার চরম সীমাই নির্দেশ করছেন।

এইটি করা, কিংবা সুপ্রাচীন ধ্যান-ধারণার মানদণ্ডটিকে কেন্দ্র করে একটা জাতিকে নতুন এক সংঘচেতনায় প্রচোদিত করাই ধর্মজগতের মহাশক্তিধর পুরুষদের বিশেষ দায়।

এমনি করে ঈশা আত্মশক্তিতে প্রাচীন ইহুদী ধর্মের ন্যায়নিষ্ঠার খুঁটি যে

সত্যপরায়ণতা—তা-ও ছাড়িয়ে গিয়াছিলেন দুর্বার বেগে। ধর্মের কেতন তিনি নিজহাতে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রেম ও করুণার রাজ্যে। সংগ্রামী সাধকরা তাঁর আগেই সে-রাজ্যে পা দিয়েছিলেন, তা ঠিক। কিন্তু ওই প্রেম ও করুণাকে জীবধর্মের মর্মস্থান এবং শক্তি কেন্দ্র করে তোলার ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারও ছো ছিলনা।

আর তাই আমরা প্রত্যেকে শুধু তাঁর নিজস্ব ভাব-ধারায় ভাবিত হয়ে, তাঁর জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অনুসরণ করেই বিশ্ববাসীর স্বপ্নেরও অগোচর উপায়ে ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতায় তাঁর দোসর হতে পারি। ম্যানিঙের জীবন দিয়েই কি ক্যাথলিকদের বিভব সমৃদ্ধতর হয়নি? ফ্রান্সিস রিড্‌লি হ্যাভারসালের জন্য প্রটেস্টান্টদের?

এ যদি সত্য হয় তাহলে প্রত্যেকের নিজস্ব কল্পনারই একটা তাৎপর্য আছে আমাদের জীবনে। প্রত্যক্ষতঃ আমাদের নিজ নিজ ভাবনা-চিন্তা দিয়েই আমাদের সংস্কারের খোলসটা তৈরি হলেও মনের উপর চিরাচরিত প্রথার যে-প্রতিক্রিয়া হয় তার পরোক্ষ প্রভাবও থাকে। ফলে, সব অবগুণ্ঠনের মত এতে একদিকে যেমন দেখার সুবিধা হয়, অন্যদিকে তেমনি সে-দেখা আবার সীমিতও হয়। প্রতিটি প্রতীকের অর্থ যদি সম্যক উপলব্ধি করতে পারি কেবল তাহলে-ই ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের যা-ধারণা তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু দূর হয়ে যাক মনের এ খোলসগুলো।

প্রতীক-আবরণ, বাধা-বন্ধ সব কিছু বাদ দিয়েই যে সেই স্বয়ম্ভূ বৈশ্বানরকে বরণ করতে উৎসুক আমরা। ভগবানকে না দেখেও যদি জীবন কেটে যায়, তবে সেই ভাবেই মরি না কেন? ভয়ের কি আছে তাতে? অনাদি-নিধন প্রলয়াগ্নিতে ভস্মসাৎ করো—আমাদের ভাসিয়ে দাও মহা প্রাণসমুদ্রে। তবুও বলব, যে-অমৃত-ধারার পিপাসায় তৃষ্ণার্ত এ-প্রাণ, তার মাঝখানে আর কিছু যেন ঢুকিও না। না, ছায়ামাত্র নয় অন্য কিছুর।

সত্য একথা। তবু আমাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট একটা পথ আছে। আমরা নিজেরা হয়তো এখনও তা খুঁজে ফিরছি। কোথায় কখন যে তার হদিশ মিলবে তা-ও আমাদের অজানা। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে নিরূঢ় রয়েছে এ আশ্বাস যে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসবেই একদিন। বাঁশি বাজবে গোপন সংকেতে, ইষ্টনাম সেদিন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশবে' আমাদের। যেমন করেই হোক কোথাও কোন এক দিন সেই শান্তিধামের দুয়ারে পা দেব আমরা। পরমা সংদৃক্ যে-পথের শেষ, সে-পথ একদিন আমরা ধ্রুব-ই।

আর যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন, প্রাচীন হিন্দু কবি তাঁর দোঁহায় নিজেকে উদ্দেশ করে বেশ বলেছেন,—

> তুলসী জগৎমে আইয়ে সব্‌সে মিলিয়া ধায়।
> ন জানে কৌন ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্ যায়॥

[Tulsi, coming into this world,
Seek thou to live with all—

for who knows where or in what guise,
The Lord Himself may come to thee?"]

আমাদের দৈনন্দিন জীবনই ঈশ্বরের প্রতীকটি আমাদের যুগিয়ে দেয়।

মরুভূমির আরবদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারের পিতা যিনি, তিনি ধীরভাবে ন্যায়ান্যায় বিচার করেন, আত্মীয়-কুটুম্বদের রক্ষক তিনিই—শিশুর মত যারা তাঁর কোলের কাছে খেলে বেড়ায় তাদের সম্বন্ধে স্নেহবৎসল। যা কিছু হতে নিরাপত্তার আশ্বাস পায় মানুষ, তিনি স্বচ্ছন্দে তার জাতিরূপ (type) হতে পারেন।

তাই স্বভাবের নিয়মেই—নিত্যসত্ত্বের সঙ্গে আত্মার অনতিপরিস্ফুট সংবেদন সেমিটিক মনে 'পিতা'—এই মহান সংস্কার প্রভাস্বরতাই পরমোল্লাসে ঝলসে ওঠে।

পরমেশ্বর আমাদের পিতা। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্ত যে,—তার সঙ্গেও এমনই এক আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধা তিনি যে, কোনো অকাজ-কুকাজেই তা ছিন্ন হওয়ার নয়। মানবিক সম্পর্ক যদি অচ্ছেদ্য হয়, দিব্য সম্পর্ক কি তার চেয়ে খাটো হতে পারে? 'পিতা'—এ-সম্বন্ধের বাঁধনে এতই আপন তিনি যে, আজও দশাসই এক আফগান মসজিদে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে ত্রিদশাধিপতিকে বলবে, 'তুমি —'তোমার',—ছোট ছেলে তাদের কোলে বসে যেমন বলে তাঁকে।

আর্যদের ঘরে নারীর আসন সর্বোচ্চে। পাশ্চাত্ত্যে সে যেমন তার স্বামীর ঘরে সর্বময়ী কর্ত্রী এবং তাঁর হৃদয়েশ্বরী, প্রাচ্যে সে তেমনি তার সন্তানের হৃদয়-সিংহাসনে আরাধ্যা দেবী—শুভদা ও শান্তিদায়িনী।

মায়ের কোলে কচি খোকা তিনি—ঈশ্বর সম্বন্ধে খ্রীস্টানের এই ঐকান্তিক প্রত্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হৃদয়ের গভীরে কি যেন এক আলোড়ন জাগে আমাদের। দোলনার পাশে স্নেহাতুরা মা, ক্রুশের নীচে ভক্তিমতী উপাসিকা আর পরম দীনতায় মহীয়সী—শোকে জর্জরিতা, ভালবাসার আগুনে অগ্নিদগ্ধা নারী-হৃদয়ের এ-আদর্শ মানবজাতিকে ক্যাথলিক চার্চের এক মহার্ঘ উপহার।

রসেটির সনেটে নারীত্বের আদর্শ তার নিজস্ব ধরনে অতুলন হয়ে ফুটে উঠেছে :

এই সে সুভগা মেরী
'যামেবৈব বৃণুতে'—কন্যাকুমারী।
কতকাল গেল তার পরে,
গালিলির নাজারেথে কাটল কৈশোর তার,
দেবতার সংকল্পে সে বয়ে আনল নিষ্ঠার অর্ঘ্য,
আনল মেধার গভীর ঋজুতা,
আর ক্ষান্তি—পারমিতা।
কৈশোর এমনই ছিল তার
যেন দেবদূতের অমৃত-সিঞ্চিতা লিলি,
দেবতার একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে চলেছে—নিথরে।

ভাটিকানে কোন ম্যাডোনার সামনে কখনও নতজানু হয়নি যারা, তাদের জন্য ঈশা নিজেই চিরন্তন নারীত্বের এ-সুরে আলাপ করে গেছেন—

"বোঝার ভারে অবসন্ন শ্রমক্লান্ত যারা, তারা আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের সঞ্জীবিত করব। আমার দায় মাথায় তুলে নাও তোমরা। আমিও যে দীনহীন নম্রস্বভাব—আমায় চিনতে শেখো, তাহলেই প্রাণে তোমরা শান্তি পাবে।"

এ কি একটি মেয়েরই বুকফাটা ডাক নয়?

না, নিজের স্বভাবের এ-দিকটা সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। একবার অন্ততঃ তাঁর মুখে এই ভাবের কথা ফুটেছিল।

ভাবীকালের মুক্তিসেনাদের তরুণ অধিনায়ক হিসাবে সূর্যকরোজ্জ্বল পর্বত-শীর্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। নীচে, স্বজাতির মহানগরীটির দিকে চেয়ে দেখছেন—ঘোর নিয়তির ছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন তার অদৃষ্ট। সেই পরম মুহূর্তে সহজ মানুষের ব্যাকুল বেদনায় স্বদেশবৎসল ঈশা ভুলে গেলেন তিনি ঈশান, জীবের মুক্তিদাতা পরিত্রাতা তিনি। সেই মুহূর্তে তিনি হয়ে গেলেন শুধু মাতৃমূর্তি।

"জেরুজালেম, হায় জেরুজালেম! প্রবক্তাদের হত্যা করেছ তুমি, যারা ঈশ্বরপ্রেরিত, পাথর ছুঁড়েছ তাদের লক্ষ্য করে। মুরগী যেমন তার ছানাগুলিকে ডানার তলায় জড়ো করে ঢেকে রাখে, কতবার তেমনি করে তোমার সন্তানদের বুক দিয়ে আড়াল করেছি আমি—কিন্তু তুমি তো তা করলে না!"

সাধকের প্রাণ সবসময়ই ছোট্ট একটি শিশুর মত হয়ে যায়। এই শিশুসত্তা যখন দেবতার দেখা পায়, তখন সাধারণতঃ তাঁকে মায়ের মতনই দেখে। পূত অমৃতান্নের (Blessed Sacrament) সামনে ধ্যান করতে গিয়ে কোন একজনের কলমে এসেছিল এই অপরূপ আশ্বাসবাণী—

"ওরে বাছা, আমায় খুসী করার জন্য বেশি কিছু জানতে হবে না তোকে। কেবল প্রাণ ভরে ভালবেসো আমায়। মা তোমায় কোলে তুলে নিলে যেমন করে কথা বলতে মায়ের সঙ্গে, তেমনি করে কথা কও আমার কাছে।"

কিন্তু এই মাতৃ-উপাসনার ভাবটি পূর্ণতা লাভ করেছে ভারতবর্ষে। দেবতার যেসব প্রতীক এদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়, কালীমূর্তি তার অন্যতম। ভগবানকে নারীরূপে উল্লেখ করাটা এখানে একেবারে প্রথাগত হয়ে গেছে। আর কাজে কাজেই সরাসরি সম্বোধনের বেলায় তাঁকে কেবল 'মা' বলে ডাকলেই চলে।

কিন্তু কি অদ্ভুতভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে তাঁকে! শিল্প ও কাব্যে যা কিছু মধুর, যা কিছু অনর্ঘ, পশ্চিমে তার সবটুকু উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে ওই মাতৃ-উপাসনার ভাবটিতে। মা তাঁর খোকার সঙ্গে খেলা করছেন, কি আদর করছেন তাকে, বা সেবা করছেন। কখনও-বা মায়ের বাহু-দুটিই হয়েছে তার রাজাসন। জগৎবাসীকে আশীর্বাদ করতে শিশু ঈশ্বর সেই আসনেই আসীন।

কিন্তু প্রাচ্যে মাতৃমূর্তির সর্বজনস্বীকৃত প্রতীক হল, এক আলুলায়িতকুন্তলা নগ্নিকা। এমনই ঘননীল তাঁর গায়ের রঙ্ যে, অসিতবরণী বলে মনে হয় তাঁকে। তিনি চতুর্ভুজা—দুই হাতে বরাভয়, আর অন্য দুটিতে খড়্গ ও রক্তক্ষরিত নরমুণ্ড। নৃমুণ্ডমালিনী হয়ে লোলরসনায়, শবাসনে শয়ান, ভস্ম-শুভ্র কলেবর এক পুরুষের বুকে নৃত্যপরা তিনি।

এ এক ভয়ঙ্করীর অলোকসামান্যা মূর্তি। এ-মূর্তিকে বীভৎস বলে যারা, তাদের স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করা চলে। তারা দেবায়তনের বহিরঙ্গনটি পার হয়েছে শুধু। মায়ের কণ্ঠ কানে আসে যেখানে গেলে, সেখানে তারা যায়নি। এ একরকম ভালই তাদের পক্ষে।

কিন্তু প্রতীচ্যের কাছে যা এত ভয়াবহ, মায়ের সেই প্রতিরূপটি বোধহয় ভারত-বাসীর কাছে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। শক্তি-উপাসকের কাছে মা অবশ্য শুধু ওই একরূপেই আবির্ভূতা হননি। শিখের কাছে তিনি অনিঃশেষে রূপ ধরেছেন তার কৃপাণে। সব মেয়েই, বিশেষ করে খুকুরা তাঁর মূর্ত বিগ্রহ। যশস্বিনী সীতা দেবীও ওই পরমা প্রকৃতিকে প্রকট করেছেন অনেকের কাছে।

কিন্তু সকলের চেয়ে কালী আমাদের বেশী আপন। অন্য সকলকে আমরা ভক্তি করি, ভালবাসি। মনে-প্রাণে কিন্তু আমরা তাঁরই। জানি বা না জানি, মায়ের সন্তান আমরা—তাঁর কোলের কাছটিতে খেলে বেড়াচ্ছি। এ-জীবন শুধু তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা একটা। সে-খেলায় একবার যদি কোনমতে তাঁর পা দুখানি ছুঁতে পারি—শক্তির কি বিপুল স্পন্দন সঞ্চারিত হবে আমাদের সত্তায়—কে তার পরিমাপ করে? কে বুঝবে কি উল্লাসে 'মা' 'মা' বলে ডাকি আমরা?

শিবানুধ্যান

(The Vision of Siva)

Dark Mother! Always gliding near with soft feet,
Have none chanted for Thee a chant of fullest Welcome?

Walt Whitman

হতে পারে আমাদের পিতৃপুরুষরা পাহাড়েই শিবের প্রতিরূপ দর্শন করেছিলেন। কিংবা হয়তো অন্যত্র। যেভাবেই হোক, হিন্দুর মনে এটা জেগেছিল যে, তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গ, জ্যোৎস্নাকিরণ আর নিস্তরঙ্গ সলিলের যে-সৌন্দর্য, বর্ণ-রতি-প্রমোদ রূপে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যবহুল দৃশ্যরাজি হতে তার জাত আলাদা।

জগদীশ্বরী বা প্রকৃতি যেন পাখী আর ফুলফলের বুটি-তোলা সবুজ শাড়ি পরে নানা-রত্ন-খচিত নীল ওড়না তুলে দিয়েছেন মাথায়। কিন্তু তাঁর বৈভবের নিরবচ্ছিন্ন আড়ম্বর ও কলরবের মধ্য হতে যেন অন্য একটা কিছুর ইশারা চমক হানে থেকে-থেকে। শুচি-শুভ্র, তপঃশুদ্ধ এমন একটা কিছু, চিত্তকে যা উপপান্ত হতে প্রচোদিত করে—যাকে মনে হয় মৌন নির্বিকার এবং চির অসঙ্গ। এ-বিশ্বের সৌন্দর্যের পিছনেও তাহলে দুটি সত্তার ব্যঞ্জনা রয়েছে। যেদিকে চেয়েছে সেই দিকেই এই দ্বৈতভাবের পুনরাবৃত্তি চোখে পড়েছে হিন্দুর—আলো আর ছায়া, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, 'অণরোণীয়ান' আবার 'মহতো মহীয়ান,' কার্য এবং কারণ। শুধু তাই নয়, খোদ মানুষের জীবনের দিকে চেয়ে সে আবিষ্কার করেছে, মানুষ বলতেও তো নারী এবং পুরুষ, দেহ আর আত্মাই বোঝায়।

এইখানে একটা সূত্র পাওয়া যায়। প্রতীক-কল্পনার ক্ষেত্রে কেমন করে যেন বস্তুর প্রাণসত্তা এই পৌরুষ-রূপের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, আর তার একটা শক্তিরূপ (যাকে প্রকৃতি বলি আমরা)—তা ওই নারী বা মাতৃত্বের সঙ্গে। নারী ও পুরুষ যেমন পরস্পরের পূরক, ঈশ্বর ও প্রকৃতিও যে তেমনি পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য—ওই ধারণার মধ্যে স্বতঃ প্রণোদিত এই স্বীকারোক্তিটাই লক্ষ্য করবার মত। প্রকৃতির প্রাণসত্ত্ব রূপে ঈশ্বরই প্রকৃতি স্বয়ং। ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি অন্যোন্য-বিরোধী তত্ত্ব? এ-কান্না কেবল এক মহাকবির নয়, প্রতীচ্যের বুক জুড়েই আজ এই আর্তনাদ। আর শত শতাব্দীর ধূসর অতীত হতে ভেসে আসছে হিন্দু ঋষিদের মৃদু গুঞ্জরণ—"ভাল করে চেয়ে দেখ ভাই, ওরা দুই নয় মোটেই, দুয়ে মিলে এক।" এই দৃষ্টিতে এক সম্মাত্রই পুরুষ ও প্রকৃতি, চৈতন্য ও শক্তিরূপে বিরাজিত।

দিব্যসত্ত্বের রূপকল্পনার চরমোৎকর্ষ যেখানে, সেখানেই মানবীয় ভাবের আরোপ। রৌদ্রক্লান্ত প্রতিবেশে বিরাট পাহাড়ের ছায়া ঈশ্বরের কাল্পনিক কয়েকটা গুণের চমৎকার আভাস এনে দেয় কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তা মনকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করে না যে, আসল বস্তুটিও ওইখানে মিলে যাবে। জ্যোতিঃপ্রভা-উন্মুক্ত-দ্বার তুঙ্গ গিরি বা বর্ম সম্বন্ধেও ওই কথা। এগুলি এমন কোন প্রতিরূপ নয় যে হৃদয় ও বুদ্ধিকে যুগপৎ বিমোহিত করে ওদের জন্য প্রাণ দেওয়ার মত উদ্দীপনা জাগাবে কারও প্রাণে। কল্যাণকৃৎ মেষপালক কিংবা বিশ্বপিতা—এ-জাতীয় ছবির বেলায় ব্যাপার কিন্তু একেবারে আলাদা। এসব ক্ষেত্রে মনে অচিরাৎ অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সমস্ত রূপের পিছনে যে-রহস্য লুকিয়ে আছে, শেষ পর্যন্ত কোনও একটা সূত্রে (formula) বাঁধা পড়ে তা এত আস্থাভাজন, এমন চিত্তাকর্ষক আর এত মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে যে, রূপ এবং প্রতিরূপের ভেদরেখা তখন মুছে যায়। আমরা ভুলে যাই যে, এই শেষ নয়—সেই 'ঋতং বৃহৎ' এই কল্প-মূর্তিকেও ছাপিয়ে স্ব-মহিমায় বিরাজিত। মন সংস্কারবদ্ধ হয়ে যাবার এই বিপদটা হিন্দুধর্ম ভারি আশ্চর্য উপায়ে এড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে হিন্দুদের সবচেয়ে বেশী পৌত্তলিক মনে হলেও অন্তরে অন্তরে তারা যে সবচেয়ে কম পৌত্তলিক, এ বোধহয় জোর করেই বলা যেতে পারে। তার কারণ তাদের প্রতীকগুলির প্রয়োগ নানামুখী—ঠিক 'ওপালে'র বর্ণ-বিচ্ছুরণের মত।

এই পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহাতত্ত্ব। প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয়, এ-তত্ত্ব উপস্থাপনের একটা দিক। জীবাত্মা ও তার স্বানুভব—এর আরেকটা দিক তুলে ধরে আমাদের সামনে। আর ডায়নামো এবং যে-শক্তিতে তা বিদ্যুদ্‌গর্ভ হয়—সেটি ওই তত্ত্বের তৃতীয় একটা দিক হতে পারে।

এই শেষ দৃষ্টান্তটি একটুখানি মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। শক্তি ও ক্রিয়া-পরিণাম প্রকটনের জন্য একটা বস্তু অন্য একটা কিছুর অপেক্ষায় থাকে, এ-ব্যাপার আমরা সর্বত্রই দেখেছি। ভারতবর্ষে এই যুগলসত্তা শিব ও শক্তি নামে পরিচিত। 'নাইট' তার দয়িতার দেখা পাবার প্রতীক্ষায় থাকে, তার স্পর্শে উদ্দীপিত না হওয়া পর্যন্ত শক্তিহীন সে। শিষ্য থাকে গুরুর পথ চেয়ে, তাঁকে পেয়েই নিজের অতীত জীবনের অর্থ শেষপর্যন্ত সে খুঁজে পায়। তেমনি শুভ লগ্ন না আসা পর্যন্ত চৈত্যসত্তাও থাকে স্থাণু, নিষ্ক্রিয়, মাত্রাস্পর্শে অবিচল। তারপর যেন কোন দিব্য

সন্নিপাতে—বিদ্যুচ্চকিত হয়ে চোখ মেলে চেয়ে এক চমকে সে দেখে নেয়—তার অন্তঃরাজ্যের মত বাইরের এই যা কিছু—সমগ্র জীবন, কাল, প্রকৃতি আর বিষয়োপ-ভোগ, এ-সবও দেবতা স্বয়ং।

এই হল 'পরমা সংদৃক' (Beatific vision) প্রতীচ্যের মতে। প্রাচ্যবাসী ঘোষণা করছে—একেই বলে জীবন্মুক্তি—এই দেহে এইখানেই আত্মোপলব্ধি।

তত্ত্ব-দর্শনের ওই শুভক্ষণটিরই প্রতীক কালী মূর্তি। চৈত্যসত্ত্ব চোখ মেলে জগৎকে দেখতে গিয়ে দেখছেন জগন্ময়ীকে।

দেবতায় নরত্বারোপ যে মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, এ আমরা দেখতেই পাই। কিন্তু এই 'রূপকল্পনা'র রীতি-নীতি ও পদ্ধতি বুঝতে হলে একটা জাতির হৃদয়ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া চাই।

আমাদের কাছে পৌরুষের আদর্শ হলেন রাজা, আচার্য এবং পিতা। পুরুষের শক্তির চরম। অধিনায়ক ও রাজ্যাধিপ হিসাবে তাঁর সেনাপরিকরের পুরোধা তিনি। সন্তান সন্ততির মাথার প্রতিটি চুলও তাঁর আঙুলে গোণা। কেউ তাদের সম্পর্কে অন্যায় করলে তার শোধ নেবেন তিনি, রক্ষা করবেন মারী-ভয় হতে। এ-বিশ্বের দ্রাক্ষাকুঞ্জ তাঁরই অধিকারে। তাঁর বাছাই-করা আঙুরলতাগুলির রক্ষণাবেক্ষণও করেন তিনি নিজে। স্নেহ প্রেমে অতুলন, শাসক হিসাবে অনিন্দ্যকর্মা, প্রতাপে অদ্বিতীয়—আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক এবং আদর্শ নরপতি তিনি। পশ্চিমে এই হল নরত্বারোপের ধারা।

ভারতবর্ষের ধারাটা কি আশ্চর্যরকম আলাদা! সেখানে জীবনের কষ্টিপাথর একটাই—মানদণ্ড শুধু একটি। মানুষটা ভগবানকে জেনেছে কি না—এটাই আসল কথা। ফলাফলের প্রশ্নই নাই, কর্মকুশলতার কথা ওঠেই না, সুখ-সমৃদ্ধি নিয়েও কোন প্রশ্ন নয়। এক মাত্র প্রশ্ন—প্রাণ কি দেওয়ানা হয়েছে সত্যলাভের পিপাসায়?

মনের ঝোঁকটা যে এই একদিকেই, জনপ্রিয় যাত্রা-নাটকে তা আমরা স্পষ্টাক্ষরে ফুটে উঠতে দেখি। রোমাণ্টিক মনোবৃত্তির কোন স্থান নাই সেখানে। জ্যাক তার জোয়ানকে পাবে কি পাবে না, সেটা নিতান্তই গৌণ। বাগাড়ম্বর না করে গোড়াতেই ও-পালা শেষ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ওরা ভগবানকে পাবে কখন, কি নিদেন পক্ষে কখন ওরা বুঝবে যে, ভগবান ছাড়া চাইবার আর কিছু নাই—সেইটি জানবার জন্যই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিষ্টচিত্তে ওই নাটকে মজে থাকি আমরা।

বিষয়-বৈরাগ্যই চিত্তের ওই পরিণতির বাহ্য লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কারণ ঈশ্বরানুরাগের রক্ত কমলটি হৃদয়ে দল মেলে ফুটে ওঠে যখন তখন উর্ধ্বস্বরে সাধক বলে ওঠেন—"তৃষার্ত হরিণ যেমন ছোটে ঝরণার সন্ধানে, প্রাণ আমার তেমনি স্বরে তোমায় চাইছে ঠাকুর।" এশিয়াবাসী ভাল করেই জানে তখন অন্য সব কিছুই খসে যায় তাঁর মন থেকে। হাজারো রকম ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়ে ওঠে একটা বোঝা। গৃহ-পরিবার এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেন বন্ধন একটা। আহার-নিদ্রা এবং প্রাণ-রক্ষার নানা প্রয়োজনে আর মন থাকে না তাঁর। দুঃসহ বোধ হয় ওসব। আর, তাই থেকে হিন্দুর কল্পনায় দেবাদিদেব মহাদেব হয়েছেন ভিখারী। যজ্ঞভস্ম বিলেপনে তুষার-শুভ্র তাঁর দেহ, অযত্নে জটা বেঁধেছে মাথার রাশি রাশি চুল, শীতোষ্ণে দৃক্‌পাত নাই তাঁর। তিনি যতবাক্‌ বিবিক্ত সেবী, নিত্য কালে ধ্যানমগ্ন।

প্রাকৃত নয়ন দুটি অর্ধ-নিমীলিত তাঁর। প্রতি নিশ্বাসে যদিও উৎপত্তি ও বিলয় ঘটছে জগতের, তবু তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। এই গতায়াতি সবই তাঁর কাছে স্বপ্নবৎ। দৃশ্যজগতের অবাস্তবতার এই-ই অর্থ। কিন্তু তাঁর একটি শক্তিই সমস্ত কর্মশক্তির মূল। সর্বেন্দ্রিয়ের শক্তি প্রত্যাহারে সংহত হয়েছে তাতেই। সে তাঁর ভ্রূমধ্যে উন্মীলিত উজ্জ্বল তৃতীয় নেত্র, প্রত্যক্ দৃষ্টি। স্বভাবতঃ তাই 'মহতী দেবতা' শিবকেই আদর্শ পুরুষরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য নামের মধ্যে একটি নাম বিরূপাক্ষ।

তিনি পশুপতি। কেউ যাদের ছোঁবে না সেই সাপেরা জড়িয়ে রয়েছে তাঁর গলায়।

কাউকে তিনি ফেরান না কখনও। উন্মাদ, খামখেয়ালী অপ্রকৃতিস্থ সৃষ্টিছাড়া কি জড়বুদ্ধি—শিবের কাছে এদের সবারই স্থান আছে। রক্ষঃ পিশাচদেরও প্রেমালিঙ্গন দেন তিনি।

সকলের যা ত্যাজ্য তা-ই তিনি গ্রহণ করেন। বিশ্বের যত ব্যথা-বেদনা যত অমঙ্গল—তাঁর প্রাপ্য ভাগ বলে সেসবই তিনি স্বীকার করে নেন। জগৎকে রক্ষা করতে বিষয়-সমুত্থিত হলাহল পানে নীলকণ্ঠ তিনি।

নিজের বলতে কি আছে তাঁর? বাহন হিসাবে বুড়ো বলদ একটি, বাঘছালের আসন একখানা, দু এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা—আর কিছু নয়।

আর সর্বোপরি—তিনি আশুতোষ। এর চেয়ে অপরূপ বৈশিষ্ট্য আর কি হতে পারে? প্রতিদিন তাঁকে শুধু নির্মল জল, কয়েক দানা চাল আর একটি কি দুটি বিল্বপত্র দিলেই চলে। কারণ জাগতিক ব্যাপারে মহাদেব নিতান্তই অনাড়ম্বর। যেসব জিনিসের জন্য আমরা যুঝে মরি, মিথ্যাকথা বলি এবং আমাদেরই ভাইকে হত্যা করি—তেমন কোন কিছুই সঞ্চয় করতে চান না তিনি। বিশ্বাত্মা, করুণা-নিদান, অজ্ঞান-তিমিরান্তক শিব-মহাদেবের এই ছবিই ফুটেছে ভারতীয় মনে। আর শেষকালে এই ছবিতে লেগেছে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে ছড়িয়ে-পড়া অস্পষ্ট আলোর প্রথম আভাস এবং স্থির জলে প্রতিবিম্বিত প্রতিপদের একফালি চাঁদের ছোঁয়া। পূর্ণ বৈরাগ্য, সম্যক নিবৃত্তি, আর অনন্ত সমাপত্তি—এ কেবল তাঁতেই সম্ভব যিনি 'সৌম্যাদ্ সৌম্যতর ঘোরাদপি ঘোর ত্রিলোচন বীরেশ্বর।'

কান পেতে শোনো আসমুদ্রহিমাচল ভারতে তাঁর উদ্দেশে অগণিত সাধকের কণ্ঠে অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে কি প্রার্থনা—

> অসতো মা সদ্গময়
> তমসো মা জ্যোতির্গময়
> মৃত্যোর্মামৃতং গময়
> আবিরাবির্ম এধি
> রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
> তেন মাং পাহি নিত্যম্॥*

---

* 'Wanderings' গ্রন্থে নিবেদিতা এই রুদ্রস্তুতি প্রথম কোন সময়ে ও কোন পরিবেশে শোনেন তা বর্ণনা করেছেন। ১৩ জুন, ১৮৯৮-এর ডায়েরী :

"(আলমোড়া থেকে কাঠগুদামে নামার পথে) রবিবার অপরাহ্ণে সমতলের কাছাকাছি,

এই আমাদের শিব—পৌরুষের আদর্শ, 'ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'।

পুরুষ বা পরমাত্মারূপে তিনি প্রকৃতি অথবা মায়ার—এই ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচিত্র জগতের ভর্তা এবং পতি। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই তাঁকে কালীর পদতলে দেখি আমরা। তাঁর ওই শববৎ শয়ানের ভঙ্গি সূচিত করছে তাঁর নিষ্ক্রিয়তা—জগদ্ব্যাপারে চিৎপুরুষ নির্লিপ্ত, উদাসীন। সংহারের উন্মত্ত তাণ্ডবে মেতেছেন কালিকা। চারিদিকে ছড়ানো তাঁর ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য। মায়ের বুকে নৃমুণ্ডমালা, আবার হাতে খড়্গ আর সদ্য-ছিন্ন নরমুণ্ড। আচম্বিতে নিজের অজ্ঞাতে তাঁর স্বামীর অঙ্গে পদক্ষেপ করেছেন তিনি। শিবের বুকে তাঁর পা। সেই স্পর্শে যেন চোখ মেলে চেয়েছেন শিব। দুজনে চেয়ে আছেন দুজনের দিকে। দেবীর দক্ষিণপাণি যেন স্বতঃই উত্তোলিত হয়েছে বরাভয় মুদ্রায়, দংশিত রসনায় ফুটেছে অতিমগ্ন লজ্জা ও বিস্ময়ের ভঙ্গি—গ্রামের মেয়েদের মধ্যে যেটি সুপরিচিত।

আর শিব? তিনি কি দেখছেন? মহাশঙ্খ ও জপমালাধারিণী হয়ে, খর্পরগলিত রুধিরস্রোতে যিনি প্রেত পিশাচবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করছেন, নিধনে যাঁর অনুশোচনা নাই, আছে উল্লাস আর কেবল পদদলিত মহেশ্বরের প্রতিই প্রসাদসুমুখী যিনি—সেই নগ্নিকা কালী করালিনী শিবের চোখে সাক্ষাৎ সৌন্দর্যলহরী।

মায়ের দীর্ঘ আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পিছনে—ধাবমান বায়ু, কাল বা ঘটনাস্রোতের মত। কিন্তু ত্রিনয়নের দৃষ্টিতে কাল-ই মহাকাল, সেই মহাকালই

একটি হ্রদ ও জলপ্রপাতের উপরিভাগের এক জায়গায়—যেটিকে লোকালয়-বহির্ভূত পান্থশালা মনে হয়েছিল—বিশ্রাম করেছিলাম। সেখানেই তিনি (স্বামীজী) আমাদের রুদ্রস্তুতি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন।

From the Unreal lead us to the Real.
From Darkness lead us unto Light,
From Death lead us unto Immortality.
Reach us through and through ourself,
And evermore protect us—Oh Thou Terrible!
From ignorance, by Thy Sweet compassionate face.

চতুর্থ ছত্রটির ('আবিরাবির্ম এধি') অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন; 'Embrace us in the heart of our heart'—এইভাবে ছত্রটির অনুবাদ করবেন কিনা ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর সঙ্কোচের কারণ কুণ্ঠিতভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করে বললেন, আসল অর্থ হল, 'Reach us through and through ourself' তিনি স্পষ্টই ভয় পেয়েছিলেন, এই অতীব সঘন গূঢ়ার্থপূর্ণ ছত্রটি ইংরাজী অনুবাদে অর্থবহ হবে না। কিন্তু সেই অপরাহ্নে নিঃসঙ্কোচে আমরা তাকে মেনে নিয়েছিলাম, এবং পরে বুঝেছিলাম, আরও আক্ষরিক অনুবাদে দাঁড়াবে—"O Thou who art manifest only unto Thyself, manifest Thyself also unto us!" তাঁর অনুবাদকে এখন আমার মনে হয়—সমাধিপ্রাপ্ত উপলব্ধির দ্রুত প্রত্যক্ষ রূপায়ণ। এর মধ্যে সংস্কৃতের জীবন্ত হৃদয়টিকে আকর্ষণ করে যেন ইংরাজী ভাষার আধারে স্থাপন করা হয়েছে।"

'এই রুদ্রস্তুতি নিবেদিতার প্রিয়তম স্তোত্র হয়ে দাঁড়াবে। শেষক্ষণে যখন পৃথিবীর আলো চোখে নিভে আসছে, তখন তিনি এই স্তোত্রটি শুনতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে আছে—'From darkness lead us unto Light,' এবং যার মধ্যে আছে স্বামিজীর সমাধিপ্রাপ্ত সত্য-ঘোষণা—'Reach us through and through ourself'.

—লেখককৃত টীকা

ঈশ্বর। এক বিপুল ছায়ার মত কৃষ্ণায়িত তাঁর অঙ্গের নীলিমা। জীবন-মৃত্যুর নগ্ন সত্যের প্রতীক তিনি, তাই মা আমার নগ্না দিগ্‌বসনা। কিন্তু এ আঁধার তো আঁধার নয়, শিবের কাছে। এই ভীষণাদপি ভীষণার হৃদ্যসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অপলকে চেয়ে আছেন তিনি। ধ্যানে তাঁর তত্ত্ব জেনে তাঁকে ডাকেন 'মা' বলে। এই তো শক্তি আর শূন্যের সাযুজ্য।

কোন্ ভাবনার পটভূমিতে এ-কল্পনার উদ্ভব হতে পারে, তা কি ধরতে পারলাম আমরা? কালী-মূর্তিকে দেবতার প্রতিরূপ বলার চেয়ে আমাদের জীবনরহস্যের সোচ্চার প্রকাশ বলাই হয়তো সঙ্গত হবে।

আত্মসাক্ষাৎকারকালে মাকে কেমন দেখে সাধকের সিদ্ধসত্তা? সবুজ ক্ষেত, প্রসন্ন আকাশ আর সূর্যের আলোয় মাখামাখি ফুলের ছবি তো সেই সর্বজ্ঞকে ভোলাতে পারে না। আপাতদৃষ্ট রমণীয়তার পিছনে তিনি দেখেন, প্রাণ পুষ্ট হচ্ছে প্রাণকে গ্রাস করে, নদী ভেঙে পড়ছে, পাহাড়ের উপর অন্তরীক্ষে রয়েছে সংহারোদ্যত ধূমকেতু। তাঁর দশদিকে নিখিল জীব-কুলের বিলাপরোল, যন্ত্রণার অস্ফুট রোদন, লোভের গুমরিয়ে কাঁদা আর ক্ষুদ্র প্রাণীদের ভয়ার্ত করুণ চিৎকার। মহাকাল অকরুণ দৃক্‌পাতহীন। মানুষের শোক-দুঃখে বধির তিনি, অথবা অট্টহাস্যই তাঁর একমাত্র প্রত্যুত্তর।

হিন্দুর মন জগতের এই চিত্র দেখতেই যেন তৈরি হয়ে আছে। তার ক্লান্ত হৃদয় বলে, 'জীবনের চেয়ে মরণের শক্তি সত্যই বেশি, আর হ্যাঁ, মরণই আমাদের ভাল।'

মহাপ্রাণের উপলব্ধি কিন্তু এ নয়। কাপুরুষের অবসন্ন দীর্ঘশ্বাস নাই তার মধ্যে, নাই করুণাকর্ষণের স্বার্থসন্ধ প্রার্থনা। অলসের মত হাল ছেড়ে দেওয়াও নয়। বিনম্র হোক চিত্ত, তখন শুনতে পাবে যুগযুগান্তে উৎপীড়ন আর আশাভঙ্গ সয়েও ভারতবর্ষ কি বলে চলেছে জগজ্জননীকে। মন দিয়ে শোন—ধ্বংসকাণ্ডের প্রচণ্ড ঘোরারাবে ক্ষীণ তার কণ্ঠস্বর,

নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে পরাণী।
কৃপা করে দিও রাঙা চরণ দুখানি॥

এই শৈব-দৃষ্টি ছাড়া, যাই বলনা কেন, আমাদের কেউ কি কখনও ঈশ্বরকে আর অন্য কোন রূপে দেখতে পায়? দুঃখের ভরা যখন পোরে, ঠিক সেই সব মুহূর্তেই না জীবনের পরম অনুভবগুলি পাই আমরা? সর্বহারা শূন্যতায় ঝাঁপিয়ে উঠেই কি আমরা সবসময় উপলব্ধি করি না যে, প্রেমেই সর্বজয়ী সেই পরম পুরুষ?

মাগো আমরাও যে তোমার সন্তান! প্রাণে মারো যদি, তবু তুমিই আমাদের ভরসা মা!

মাহেন্দ্রক্ষণ অবসান, মিলিয়ে তোল অতীন্দ্রিয় দর্শনের আবেশ! মানুষ এ-পর্যন্ত নিজের জন্য যা-কিছু প্রতীক কল্পনা করেছে, তার মধ্যে ওই কল্পনাটি বোধহয়

সর্বশ্রেষ্ঠ। অতিক্রান্ত হল ধ্যানের লগ্ন, আমরা প্রাচীন যুগের পাহাড়-পর্বতে ফিরে এলাম আবার।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য সমবেত হয়েছে আর্যগোষ্ঠী। ওই যজ্ঞের সমিধ্‌ভার বহন করে রাজোচিত মহিমায় আমাদের দিকে মন্দগতিতে এগিয়ে আসছেন বৃষরাজ।

আগুন জ্বলে উঠল যজ্ঞবেদিতে। যজ্ঞানলের মাঝখান হতে উঠছে আনীল বহ্নিদ্যুতি। আর চারিদিকের সমিধসম্ভারকে লেহন করে দগ্ধ অঙ্গারের বুকে লক্‌লকিয়ে ফিরছে হুতাশনের লোলুপ রক্তরসনা। ওর প্রত্যেকটি শিখার আলাদা আলাদা নাম দিয়েছেন ঋষি—

কালী করালী মনোজবা চ
সুলোহিতা বা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥ মুঃ ১।২।৪

ঋত্বিকরা বেদপাঠ করছেন, যজ্ঞ দর্শন করছে সমবেত জনতা। আমরা দেখছি ওই যজ্ঞাগ্নির শিখাতেই ফুটে উঠছেন ভাবীযুগের পঞ্চানন রুদ্র। দেখছি যজ্ঞ-ব্যাপারে বৈদিক কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে যেদিন, সেদিন ও-থেকেই তিনি গড়ে তুলবেন পুরুষ ও প্রকৃতি, চিৎসত্ত্ব ও মহাপ্রাণের বিরাট অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব।

পণ্ডিতেরা বলেন শিব ওই বৈদিক যজ্ঞবহ্নির প্রতিরূপ ছাড়া আর কিছু নন। তিনিই বৃষবাহিত সমিধ্‌-ভার, শুভ্রদ্যুতি নীলকণ্ঠ হুতাশন।

আর তাঁর শক্তিস্বরূপিণী কালিকা ওই লেলিহান পাবকশিখা—অর্ধদগ্ধ সমিধ্‌ লেহন করে ফিরছে যারা। আজও দেবীর লোলরসনায় সেই সুলোহিতা অগ্নিজিহ্বারই সঙ্কেত পাই আমরা।

মায়ের গল্প

[The Story of Kali]

আচ্ছা খুকুসোনা, ছোটবেলায় সবার আগে কি দেখেছিলে মনে পড়ে? তুমি মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে হাসছ—এই না?

মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছ কখনও? মা চোখ বুজলেন,—ওমা! খুকী কোথায় গেল? চোখ মেলে দেখেন—এই যে খুকী! তারপর খুকী চোখ বুজল...মা নাই! নাই! আবার চোখ মেলতেই...এই যে!

আচ্ছা মা যখন চোখ বোজেন কোথায় যান তিনি? সেই সেখানেই তো ছিলেন সারাক্ষণ? তাঁর চোখ দুটি বোজা ছিল বটে। তবু তিনি সেখানেই ছিলেন কিন্তু।

জান খুকু, অনেকে বলেন ভগবানও একেবারে ঠিক এই রকম। তিনি আমাদের মা—কিন্তু অ—নে—ক বড়। এত বড় যে এই বিরাট বিশ্বসংসার তাঁর খেলাঘর! তাঁর জগৎ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে মা চোখ বুজে রয়েছেন। আর আমরা সারাজীবন

ধরে কেবল মা কখন চোখ চাইবেন সেইটি ধরতে চাইছি, বুঝলে খুকুসোনা? আমাদের কেউ যদি কখনও তা পারল, একবার একটি মুহূর্তের জন্যও যদি তাঁর চোখে চোখ মিলল কারও, তাহলে কি হয় জানো? সে-মানুষটি স—ব বুঝে ফেলে। বুকে বল হয় তার, সে হয় জ্ঞানী প্রেমিক, আর সেই মুহূর্তটি সে কোনদিন ভুলতে পারে না।

খেলায় যখন এইরকম জিতে যাও তুমি, মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়, তখন আরেকটা ব্যাপার হয়। একটা মজার ব্যাপার। মায়ের অন্য সব খোকাখুকু তোমার সঙ্গে খেলা করতে আসে তখন। ছোট পাখীরা আসবে, এইটুকু-টুকু ভেড়ার ছানাগুলি তোমায় ভালবাসবে; বনের খরগোসরা ঘুরঘুর করবে পায়ের কাছে। আর ওই যে পথে-পথে-ঘুরে-বেড়ানো দীনদুঃখী ছেলেপুলেরা—শীতে যারা জমে যাচ্ছে, খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে—মা ওদের সবচেয়ে ভালবাসেন, জান! ওদের বাপ-মা, ঘরবাড়ি নাই কি না—তাই। ওই ওরাও বিশ্বাস করে তোমার কাছে আসবে, তোমায় ওদের একজন করে নেবে। আমরা সকলেই মায়ের কোলে আছি। কিন্তু ওরা বসেছে একেবারে মায়ের বুকের কাছটিতে।

মা যখন চোখ বুজে থাকেন তখন তাঁকে কি বলে ডাকি আমরা? ডাকি কালী বলে।

খানিকক্ষণ মনটা বড় ভার হয়ে আছে, এমন তো তোমার হয়েছে কখনও? তখন মা, কি ধাই-মা কিংবা পিসী বা আর কেউ এসে কোলে নিয়ে আদর করলেন, চুমো খেলেন। যতক্ষণ তোমার ঠোঁটে হাসি না ফুটল, ততক্ষণ কোলে কোলেই রাখলেন তোমায়।

ভগবান এরকমও করেন কখনও কখনও। তাঁর চোখ দুটি বোজা দেখি বলেই আমরা ভয় পাই। এই লুকোচুরির খেলা শেষ করতে চাই। এ আর আমাদের ভাল লাগে না। মনে হয়, বড় একা, কত দূরে পড়ে আছি, হারিয়ে গেছি যেন। তখনই কেঁদে উঠি আমরা। একেবারে আঁধার হয়ে এল, তবু যে চোখ দুটি বোজা মায়ের। আর খেলব না আমরা। একেক সময় এমনি মনে হয়।

তাঁর চোখ দুটি সত্যি সত্যি বোজা নয় কিন্তু। চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে কিনা, তাই অমন ভাবি আমরা। যেমনি তুমি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠ—অমনি তাঁর অপরূপ চোখ দুটি মেলে তাকান মা—চেয়ে থাকেন তাঁর সন্তানের মুখের দিকে। অগাধ স্নেহে যেন টলমল করে সে-দৃষ্টি। আর তুমি, একবার যদি দেখ সে-চাহনি, অমনি সব খেলা ফেলে 'মা' 'মা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকাবে মায়ের বুকে—কান পেতে শুনবে মায়ের বুকের ধুকধুকানি।

তাহলে খুকুমণি—মা যেসব জায়গায় আছেন, এবার তোমার তা মনে থাকবে তো? যখন মনে হবে মা যেন অ-নে-ক দূরে আছেন, জানবে সে কেবল তাঁর সঙ্গে তোমার চোখাচোখি হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। এই মা যখন কোথাও চলে যান, তুমি তাঁকে দেখতে পাও না। কিন্তু মা কালী সবসময় আছেন তোমার কাছে, সবসময় তোমায় ভালবাসছেন। তাঁর খোকাখুকুর সঙ্গে খেলতে মা সবসময়ই তৈরি।

তোমার কি কখনও মনে হবে, একটুক্ষণের জন্য খেলাটা ছেড়ে ছোট্ট হাত দু'খানি জুড়ে বলি, 'মাগো একবার চোখ মেলে চাও না মা!'

মা আরেক ধরনের লুকোচুরি খেলেন। এ যেন অনেকটা রূপকথার মত। কখনও কখনও অন্য মানুষের মধ্যে লুকিয়ে পড়েন মা, কি অন্য যে-কোনও কিছুতে। কখন যে তাঁর দেখা পেয়ে যাবে তার কিছু ঠিক নাই। হয়তো মায়ের চোখে চোখ পড়তে দেখলে তাঁর স্নেহদৃষ্টি...হয়তো বিড়ালছানাটির সঙ্গে খেলতে গিয়ে, কি ভুঁয়ে-পড়া পাখির ছানাটিকে তুলতে গিয়ে তাদের চোখে দেখলে তাঁকে। এদের সবার মধ্যে দিয়েই হয়তো মাকে লুকোচুরি খেলতে দেখবে।

যখনই কারও জন্য আমাদের কিছু করতে হয়—জানবে মা আমাদের খেলতে ডাকছেন। আমাদেরও তখন সে-খেলা খেলতে ভাল লাগে। মা একবার নিজে বলে-ছিলেন (অর্থাৎ কারও মধ্যে লুকিয়ে পড়ে তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন)—'দীন-হীন কারও জন্য যখন যেটুকু করবে, তোমরা জেন তা আমার জন্যই করেছ।'

ঠিক যেন রূপকথার মত লাগে না শুনতে? আর মা কি মজার মজার জায়গাতেই না লুকাতে পারেন! আরেকবার মা বলেছিলেন 'ওই পাথরটা তোল আমায় দেখতে পাবে। কাঠটা দু'টুকরো কর—ওখানেও আমি!' তুমি কখনও একটা পাথর তুলে, কি একটুকরা কাঠ কেটে দেখেছ—ওর ভিতরে কি আছে? কখনও ভেবেছ যে সব কিছুর ভিতরেই ঠাকুর আছেন? কি সুন্দর মায়ের খেলা! তাঁকে যেখানে চাও সেখানেই দেখবে,—তিনি সর্বত্র আছেন!

মা যখন লুকিয়ে থাকেন, তখনও কি তাঁর খুকিকে মা ভালবাসেন? নিশ্চয়, তা নইলে মা লুকোবেন কেন? মার চোখ দুটি বোজা থাকলেও কি তাঁর খুকুকে ভালবাসছেন মা? হ্যাঁগো—দেখ না, সারাক্ষণ মা কেমন হাসছেন!

কালীও তাই। অনেককাল তাঁর দেখা না পেলেও আমাদের ভয়ের কিছু নাই। মা যে হাসছেন সারাক্ষণ। যখন ভাল বুঝবেন তখনই খেলা ভেঙে দেবেন মা, তাঁর চোখে চোখে তাকাব আমরা, আর এক চমকে বিশ্বসংসার পিছনে ফেলে সোজা চলে যাব কোন সুদূরে—সেই 'মহাশূন্যের ওপারে।'

কাজেই ডাক পড়লেই এস খেলতে ছুটে। খুকু মনে রেখ, কাউকে দেওয়ার মত কিছু যদি থেকে থাকে তোমার, জানবে, মা তোমায় ডাকছেন তাঁকে খুঁজে বার করতে। কেউ যদি তোমায় দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে চায়—জেনো আসলে মা-ই তোমায় বলছেন 'খুকু চোখ চাও!' কিংবা নতুন কেউ ভালবাসার জন এলে বুঝবে, মা-ই বলছেন 'এই যে আমি খুকু!'

এছাড়া আরেকটা কথা আছে। তোমার বাবা, মা, মাসী পিসী ধাই-মা আর আর সকলকে তুমি তো ভালবাসো? নিশ্চয়ই বাসো। তাঁরাও ভালবাসেন তোমায়। তাঁরা সবাই কত ভাল, কত মায়া-মমতা তাঁদের।

কিন্তু অনেক দূরে মনে কর মায়ের এক ভাই আছেন, বড়ভাই—ওই অমুকের

মত। তুমি কি তাঁকেও ভালবাসো? কেন? কখনও তো দেখনি তাঁকে। তিনি কোনদিন খেলা করেননি তোমার সঙ্গে।

না, কিন্তু মা যে তাঁকে ভালবাসেন। আর মা যাদের ভালবাসেন তুমিও তাদের সকলকে ভালবাসো—তাই না খুকু সোনা? তেমনি কালী ভালবাসেন বলে আমরাও সব মানুষকে ভালবাসব। মায়ের মত খোকাখুকু—ওই ভেড়ার ছানাগুলি, কতরকম ফুল, বড় বড় গাছপালা, ছোট্ট ছোট্ট মাছ—সবার সঙ্গেই মায়ের খেলা। মা ওদের সবাইকে ভালবাসেন, ভালবাসেন আকাশের ওই তারার মেলাকেও। আমরাও তাই বাসব। আমরা যে তাঁর ছেলে-মেয়ে। তিনি যা-কিছু ভালবাসেন, আমরাও তা ভালবাসি। তিনি যে মা আমাদের—না-ভালবেসে কি পারি?

রামপ্রসাদ

'মহিমা' যেন কোনো কিছুর 'ভাষ্য'। কতকগুলি জীবনের সম্মুখীন হলে মনে হয়, সেগুলি যেন আমাদের অপরিচিত ভাষার কোনো কবিতার অনুবাদ। প্রত্যেক সুগভীর সত্য জীবনাধার প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করে থাকে—যে জীবন হবে ঐ সত্যের শঙ্খ। যখন সেই জীবনশঙ্খ মেলে তখন দুর্জ্ঞেয় সত্য লক্ষ লক্ষ মানুষের গোচর হয়, যা এতাবৎ সাধারণের অনায়ত্ত ছিল।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা আলোকিত না হলে কিন্তু শব্দে সত্য দর্শন করি না। যে ব্যক্তব্যটি আমরা জীবনে পেয়েছি, কিন্তু উচ্চারণ করিনি, স্বগতোক্তিও নয়—তাকেই যদি অন্যের কণ্ঠে শুনি, আবাহন করে বলি, ধন্য প্রকাশ। অপরপক্ষে যা আমরা নিজেরাই বলে ফেলেছি, তা সাদা-মাঠা ঠেকে নিজেদের কাছে, আর যা আমাদের অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে তাকে দুর্বোধ্য বলে মনোযোগীই হই না।

তাই দেখা যায়, কবি বা ভাষ্যকার যাঁরা, তাঁরা পৃথিবীর কাছে সেই জিনিস-গুলিই বলে যাচ্ছেন, যার বিষয়ে তাঁর হৃদয় আলোকিত। বাণীদূতদের কাছে এই লক্ষণ-চিহ্নই আমরা সন্ধান করে থাকি—তাঁরা সমষ্টি-স্মৃতিকে উন্মোচন করেছেন কি না। যিনি করেছেন, সানন্দে তাঁর কথা আমরা শুনি, কেননা বিশ্বাস করি, তাঁর যে-কথাগুলি এখনো স্পষ্ট হয়নি আমাদের কাছে, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা তার তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করে দেবে অচিরে।

কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি—ঋষি। প্রেম, বেদনা অথবা বীরত্বের কতকগুলি দীপ্তোজ্জ্বল খণ্ডাংশকে নির্বাচন করে বহুজনের করবাদ্যের প্রলোভনে সেগুলিকে মণিখণ্ডবৎ রত্নমাল্যে গ্রথিত করা ঋষি-কবির কাজ নয়,—তিনি জীবনকে সর্বাংশে গ্রহণ করবেন, যে-জীবন মূলত ধূসর, পাংশু-মলিন উপাদানে গঠিত; সেই সঙ্গে কৃষ্ণতম এবং উজ্জ্বলতমকেও তিনি নেবেন, এবং সমস্তের উপরে নূতন আলোক-সম্পাত করবেন, যার ফলে দেখা যাবে জীবন যাদের যাতনা দিয়েছে, তারাও সুন্দর দেখছে তাকে। যিনি শুধুই নাট্যকার তিনি নাটকীয় ভাবটিকেই মাত্র বেছে নেন,

কিন্তু ঋষিকবির কাছে সব কিছুই নাটকীয়। একটি শিশুর সামান্য চাওয়া আর ওথেলোর দারুণ বাসনা, যা হনন করেছে ডেসডিমোনাকে—বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে যোগের ক্ষেত্রে একটি অপরের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ঋষিকবির কাছে।

জীবনের পুরাতন সঙ্গীদের ভিতর থেকে যে নূতন তান ইনি পেয়েছেন, তাকে ধরতে হয়েছে পলকে ঝলকে, নানা স্বরে, সুরে সাধারণের মধ্য থেকে। মা গুন্‌গুনিয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন শিশুকে, কিংবা তার শেষ নিদ্রার শয্যাপার্শ্বে বুক-ফাটা কান্নায় লুটিয়ে পড়ছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে ফুঁসছে মানুষ কিংবা গুমরে উঠছে ভালবাসার পাত্রদের সামান্য একটু ভাল রাখতে না পারার দুঃখে, ধীর শান্তিতে লাঙল ঠেলছে কৃষক, দিনের আলোয় খেলছে শিশু,— সবকিছুই কানাকানি করে গেছে এ'র কাছে, দিয়ে গেছে জীবনরহস্যের সবটুকু।

তাহলে এই কথাই বলা যায়, প্রেরণা-পুরুষের কণ্ঠে নয়, গণমানুষের অমার্জিত বিশাল হৃদয়েই নবধর্মের অরুণোদয়। যে-সব অঙ্গভঙ্গি ও উগ্র বলের চেহারা আমাদের মনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে, তা আসলে এখনো আত্মসচেতন হয়নি, এমনি একটা আবেগ-তাড়নার অস্পষ্ট পরীক্ষামূলক উচ্চারণ ছাড়া কিছু নয়।

এইভাবে অগণিত জনের কল্পনায় ও চেতনায় ভাবটি যখন ব্যাপ্ত ও প্রকাশিত হয়েছে, তখনি আবির্ভূত হন একজন মানুষ যিনি ঐ ভাবের মূর্তিমান বিগ্রহ হয়ে দাঁড়ান। সকলে তাঁকে বন্দনা করে বলে—'আচার্য', 'শিক্ষক'—কারণ তিনি তাদের জীবনভাষ্য দিয়েছেন—ভাষা দিয়েছেন তাদের ব্যাকুল প্রকাশবাসনাকে। তিনি তরঙ্গচূড়া—তরঙ্গ ঐ 'অগণিত নগণ্য'।

এইভাবেই জাতি-জীবন থেকে আবির্ভূত হয়েছেন ঈশ্বরের মাতৃভাবের বাঙালী মহাকবি রামপ্রসাদ—তাঁর বাণী সাক্ষাৎ প্রবেশ করেছে জাতির অন্তর্লোকে। দলে দলে মানুষ গঙ্গাতীরে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল—তাঁর সব সেরা গানগুলি শুনেছিল তাঁরই কণ্ঠে—শেষ কথাটি উচ্চারণ করেই সেই বৃদ্ধ মানুষটি বলে উঠলেন—'দক্ষিণা হয়েছে'—সেই মুহূর্তে মৃত্যু ঘটল।* কিন্তু তা মৃত্যু নয়—রূপান্তর। এই ঘটনার পরে এক শতাব্দীও পেরোয়নি। সকলে মনে করে, এ-তো গতকালকার ঘটনা।

---

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই রামপ্রসাদের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে প্রথম তথ্য পরিবেশন করেন। রামপ্রসাদের দেহত্যাগের বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

"প্রাচীন লোকেরা কহেন, তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জন সময়ে পরিজন, স্বজন, বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে জাহ্নবী-তটে গান করিতে করিতে আইলেন; ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে যতক্ষণ জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ অতি আশ্চর্য আশ্চর্য ভক্তিরসের বিদায়ী পদ অনেকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গা-যাত্রার সময়ে পথিমধ্যে কয়েকটি গান করেন।"

ঈশ্বর গুপ্ত মোট চারটি গান উদ্ধৃত করেছেন। প্রথমটির শুরু—

কালী-গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।

দ্বিতীয়টির শুরু—

বলো দেখি ভাই কি হয় ম'লে—
এই বাদানুবাদ করে সকলে।

(পর পৃষ্ঠায়)

সেরেস্তার মুহুরীরূপে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। চাকরির কথা মনে রেখে নিষ্ঠার সংগে কাজ করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। সপ্তাহ শেষে কিন্তু মালিক যখন খাতা চেয়ে পাঠালেন পরীক্ষা করতে, দেখলেন যে, প্রথম পাতাতেই লেখা একটি গান :

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
[Mother! make me Thy accountant.
I shall never prove defaulter]

হিসাবের খাতায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গান লেখা—ছত্রে ছত্রে একই হাহাকার—মা! মা! ধর্মের পাগলামির মর্ম বোঝে না, এমন হিন্দু যেহেতু বিরল, তাই তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত হল তৎক্ষণাৎ। কিছু বৃত্তি বরাদ্দ হল (মাসিক ত্রিশ টাকা), এবং তিনি অন্নের জন্য চাকরির দায় থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি পেলেন।

এই গানটিরই শেষকালে আছে—

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদান কালে, যেমন, জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।

তারপরে, ঈশ্বর গুপ্ত অনুযায়ী—'তীরে নীরে শরীর স্থাপন করত' রামপ্রসাদ যে গানটি গেয়েছিলেন, সেটি অভিমানে, বিষণ্ণতায় অথচ গোপন আশা-বিশ্বাসে অপূর্ব।—

নিতান্ত যাবে দিন—এদিন যাবে—কেবল ঘোষণা রবে গো!
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা, শ্রীসূর্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ওমা, তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে, পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে—ভবার্ণবে গো॥

ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, "প্রবাদ আছে নিম্নলিখিত গান করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল"—সে গানটির আরম্ভের দুই ছত্র—

তারা, তোমার আর কি মনে আছে।
মাগো ওমা, এখন যেমন রাখছো সুখে, তেমনি সুখ কি পাচ্ছে॥

শেষ দুই ছত্র—

প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড় মাগো,
মাগো ওমা, আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে।

"'দক্ষিণা হয়েছে' এই উক্তি করিবামাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ প্রপঞ্চ শরীর পরিহার করিলেন। প্রাচীন লোকের মধ্যে অনেকেই কহেন, তাঁহার মরণ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।"

উপস্থাপিত তথ্যগুলি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি কেরী সাহেবের গ্রন্থে (১৮৫৮ খৃ.) লিখিত সংবাদ উদ্ধৃত করে অগ্রাহ্য করেছেন। কেরীর বইয়ে পাওয়া যায়—রামপ্রসাদ কালীমূর্তি বিসর্জনের সংগে সংগে 'উদ্দাম ভক্তিতে' গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। শেষযাত্রার শুরুতে রামপ্রসাদ যে গানটি গেয়েছিলেন, তার কয়েকছত্র যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন, যার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা অবশ্য সুনিশ্চিত নই—

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো,
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।

ফল : এক গুচ্ছ লোকসংগীত, কালী-উপাসনার ভাবে পূর্ণ—রয়ে গেল জনগণের স্মৃতিলোকে। তার অনেকগুলি এখনো সংগৃহীতই হয়নি হয়ত, ছড়িয়ে আছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। কিন্তু সেগুলি এমনভাবে গ্রাম-জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, ভরসা করা যায়, হয়ত হারিয়ে যাবে না কোনোদিন।

পরবর্তী কালে রামপ্রসাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্রীষ্ম-দিনে গঙ্গার উপরে নিজের ছোট ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলার বজরার কাছে গিয়ে পড়লেন। বাংলার সেই প্রতিভাবান তরুণ শাসক* আদেশ জানালেন, বজরায় উঠে গান গাইতে হবে। কবি বীণা হাতে নিয়ে স্থান-কালের উপযোগী প্রাচীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মুসলমান মানুষটি সে সঙ্গে খুশী নন—'তোমার নিজের গান গাও—মায়ের গান গাও!'—মধুরভাবে নির্দেশ দিলেন। তাঁর প্রভুর আদেশ পালন করলেন পরম আনন্দে।

এত সহজ, এত সরল তিনি—কোনো স্তুতি দিয়েই তাঁকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে আমরা সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসে এমন এক বিরাট কবির সাক্ষাৎ পাই—যাঁর প্রতিভা ব্যয়িত হয়েছিল শিশুর অনুভূতির উপলব্ধিতে। আমাদের নিজেদের কাব্যে† উইলিয়ম ব্লেক যে সুর তুলেছেন, তা অনেকটা তাঁর কাছাকাছি—কিন্তু ব্লেক কোনোমতে তাঁর উপরে নন।

সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে অপূর্ব ঔদাসীন্যের ক্ষেত্রে রবার্ট বার্নস্, সাধারণ বস্তুর মহিমা ঘোষণার ক্ষেত্রে হুইটম্যান রামপ্রসাদের আত্মীয়, কিন্তু তাঁর সেই শুভ্র জ্যোতিপূর্ণ শিশু-সত্তা—তার কোনো তুলনা নেই—তুলনা পাওয়া অসম্ভব। বয়স তাঁর এই স্বভাব নষ্ট করতে পারেনি, বরং দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস—আত্মস্থতা। শিশুর মতই কখনো নিরাশ, কখনো সহাস, কখনো গম্ভীর, কখনো প্রগল্‌ভ। শিশুর কাছে এ সবই উদ্দেশ্যহীন, রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সুগভীর উদ্দেশ্য—তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি ছত্রে জগজ্জননীর মহিমাধ্বনি।

তাঁর এত সরলতা, তাই বলে একথা যেন মনে না করি বিনা আয়াসে তাঁকে বোঝা যাবে। এতে বিস্ময়ের কারণ নেই। রোমের এবং ফ্লোরেন্সের সমগ্র ইতিহাসের দ্বারাই মাত্র (দান্তের) 'ডিভাইন কমেডি' বোধগম্য হয়েছে। যথার্থ বলতে গেলে, যে সংস্কৃতি থেকে কবির উদ্ভব, তার বিষয়ে কিছু না জানা থাকলে কোনো কবিকেই বুঝতে পারা যায় না। দান্তে সম্বন্ধে যদি একথা সত্য হয়, তাহলে যে-কবি বহু সমুদ্র এবং মহাদেশের ব্যবধানে অবস্থিত, জটিল বহু শতাব্দী-প্রাচীন সভ্যতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন—তাঁর বিষয়ে আরও কত সত্য হবে।*

বাস্তবিক, এই প্রশ্ন মনে ওঠে, প্রাচ্যের অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি কিছু পরিমাণে বিভ্রান্তিকর কি না! আমরা শুনি, চীনা-জাপানী শিল্পীরা চার লাইনের এক

* সিরাজদ্দৌলা সম্বন্ধে নিবেদিতার এই উক্তি, বলা বাহুল্য, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

† নিবেদিতা কখনো ইউরোপীয়, কখনো ভারতীয়—লেখার সময়ে এই দ্বন্দ্ব তাঁর সমস্ত রচনাতেই পাওয়া যায়।

* এখানে পুনশ্চ বোঝা গেল, নিবেদিতা ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য করেই এই বই লিখেছেন।

নিসর্গ-চিত্রে জাতীয় সভ্যতার সমগ্র তত্ত্ব প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন—অথচ কোনো ইউরোপীয় সন্দেহই করতে পারবেন না, ঐ নিসর্গ-চিত্রের মধ্যে ভিন্নতর কোনো উদ্দেশ্য নিহিত আছে। হিন্দুর বিষয়েও একই কথা বহুলাংশে সত্য। যেমন ধরা যাক, তুষার-পটে পার্বত্য অরণ্যের রূপ বর্ণিত হয়েছে অসাধারণ এই যে ছত্রটিতে—"মহাদেবের দেহে নিত্য সতীদাহ"—এর গুণাস্বাদের জন্য গভীর ঐতিহ্যজ্ঞান প্রয়োজন।

জাপানী শিল্পী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে নিতান্ত সত্য, উপাদানে শুধু পার্থক্য। রামপ্রসাদ ভাঙা খেলনা, চৈত্র সন্ধ্যার বৃষ্টিপাত, এবং *শিশুর নানা ভাবের নানা কিরণের মধ্যে বিশ্বরহস্য আবৃত রাখেন।*

জগন্মাতার প্রতি ভক্তির প্রবল আকৃতি ছাড়াও রামপ্রসাদের মনে জীবনের এমন এক পূর্ণাঙ্গিক বোধ রয়েছে, যা আমাদের অজানা। "হৃদয়ে যে পবিত্র, ঈশ্বরের দর্শন সে পাবেই"—এই ধরনের কথাকে একেবারে আক্ষরিকভাবে প্রাচ্যে গ্রহণ করা হয়। আদর্শ অবস্থা কেবল পরিত্রাণে (Salvation) নয়, কিংবা পাপ থেকে উদ্ধারের শর্তে নয়—তা আছে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বোধের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই পবিত্রতার শক্তিতেই।

প্রাচ্য মতে চরম জ্ঞানের পথে শরীর বাধাস্বরূপ। অর্থ ভাষার দ্বারা বাহিত হয়, একথা সত্য নয়, ভাষা মনকে এনে দেয় অন্য মনের কাছে। অপরিণত ভাষায় শব্দ হয়ত *চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে না,* কিন্তু অতীব পরিণত ভাষাতেও তা চিন্তার আভাস-ইঙ্গিতের বেশী কিছু দিতে পারে না। স্নায়ু যন্ত্রণা সৃষ্টি করে, একথা ঠিক নয়, যেহেতু কল্পনায় যে সুখ-দুঃখ অনুভব করি, তা নিজস্ব সুখ-দুঃখের চেয়ে অনেক প্রখর। সুতরাং রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের দ্বারা সাধারণতঃ আমরা যে আমি-উত্তর বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হই, তা পরমকে আবৃত রাখে আমাদের কাছে—যে পর্যন্ত না আমরা সেই পরমকে সহ্য করার সামর্থ্য লাভ করি। এবং যে-পর্যন্ত না ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য ঘটেছে এমন অবস্থায় আমরা পৌঁছাই—সে অবধি শরীরেই আমাদের অবস্থান করতে হবে, কিংবা তাতে ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু যখন সীমার বন্ধন ভেঙেছে, যখন আমাদের অস্তিত্বের গহন স্তর পর্যন্ত চেতনাস্পন্দিত হয়েছে, আমাদের সমগ্র চৈতন্য জ্ঞানলাভের একমুখী প্রচণ্ড প্রয়াসে সংহত হয়েছে—সে জ্ঞান এই পরিচিত নির্ধারিত ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষ পরমানুভূতি—তখন *কী দর্শন করি আমরা?*—তখন *দর্শন-স্পর্শন* প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা যা 'বহু' বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তা হয়ে দাঁড়াবে 'এক'—অদ্বৈত—ঈশ্বর।

এই কারণেই প্রাচ্য ধর্মের পরম লক্ষ্য মুক্তি বা নির্বাণ। অর্থাৎ স্বাধীনতা। যাঁর মধ্যে এই চেতনা পূর্ণতা পেয়েছে, তিনি পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্ত ; যথেচ্ছতার মধ্যে বিহার করলেও তার দ্বারা আবদ্ধ নন। অজ্ঞানের ঘুম ঘোর ছেড়ে এসেছেন তিনি, তিনি চিরজাগ্রত। রামপ্রসাদ বলেন :

"যে দেশে রজনী নাই......"

[নিবেদিতার অনুবাদ—"from the land where there is no night"—পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে]

রামপ্রসাদের গানের মুখ্য বিষয় কিন্তু জগন্মাতা। মাকে ডেকে তাঁর আদর্শ শিশু হয়ে ওঠেন তিনি। ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়, দেড়শো বছর আগে—ইউরোপীয় শিল্পে 'শিশু-ভাব' আবির্ভূত হওয়ার প্রায় এক শতাব্দী আগে—একজন মহান ভারতীয় ঋষি-কবি ক্ষুদ্র শিশু-প্রাণের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন—লক্ষ্য করেছিলেন তাদের ভাবের পর্যায়, নিজেকে সঞ্চারিত করেছিলেন তাদের অনুভূতির প্রতিটি অংশে—তা করেছিলেন যেন সে বিষয়ে সচেতন না হয়েই।

একবার তিনি বাস্তবিকই সাফাই গেয়েছেন :

"আমি তেমন মায়ের ছেলে নই যে..." [পূর্বে উদ্ধৃত]

কিন্তু আহত গর্বের স্থানে এসে যায় গোপন নৈরাশ্য, তাতে মিশ্রিত সুরের অধীরতা। ঈশ্বর কি আছেন—তিনি নেই—মরেছেন—নইলে কোনো মা কি ছেলের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে? মায়ের মূর্তি বিসর্জন দিয়ে বেরিয়ে পড়বেন সংসার ত্যাগ করে :

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই,
থাকলে আসি দেখা দিত, সর্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই।
বিমাতার* তীরে গিয়ে কুশপুত্তল দাহাইয়ে,
অশৌচান্ত পিন্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই।

[Mind, stop calling 'Mother, Mother!'
Don't you know she is dead?—
Else why should she not come?
I am going to the banks of Ganges,
To burn the grass image of my Mother,
And then I will go and live in Beneras]

কিন্তু যখন তীর্থযাত্রার কথা সত্যই উঠল, তখন তিনি এক অপূর্ব সুন্দর, সুগভীর উত্তর দিলেন। বড় দুরন্ত ছেলে তিনি, তাই যেতে চান না, কিন্তু না-যাওয়ার কারণ নির্দেশেও তৎপর। সন্দেহ নিয়ে যায় সন্দেহের মধ্যে, ভ্রূকুটি পরিণত হয় পরম অবাধ্যতায় :

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।...
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন, তাঁর দাসী।
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

* গঙ্গার।

[Why should I go to Benares?
My Mother's lotus-feet
Are millions and millions
Of holy places.
The books say, man dying in Benares
Attains Nirvana.
I believe it. Siva has said it.
But the root of all is devotion
And freedom is her slave.
What good is there even in Nirvana?
Mixing water with water—!
See I do not care to *become* sugar,
I want to *eat* sugar!]

শেষ দুই ছত্রে কী আলোকোম্ভাস! কৃষকের গ্রাম্য সহজ-চতুর বুদ্ধি মিলেছে মহাকবির অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে। নিম্নাবস্থানে থাকার উল্লাসের মত অতি সুন্দর—সুন্দরতম—অনুভূতির প্রকাশেই তা নিয়োজিত নয়, একই সঙ্গে সৃষ্টিরহস্যকেও বাঙ্ময় করেছে।*

অপরূপের চেয়ে অপরূপ ঘুড়ির গানটি। মা তার খেলনা নিয়ে খেলবেন, এটা শিশুর কাছে খুবই স্বাভাবিক চিন্তা। সব মা-ই তো তাই করে থাকেন। কালী কিভাবে খেলার সাথী হন? মায়ের খেলার জিনিস ঘুড়ি। সুতোর মাঞ্জা দেওয়া আছে, যাতে অন্যের ঘুড়ি কেটে বেরুতে পারেন। কিন্তু মা এমন মোহিত করে রাখেন যে, ছেলে তার খেলা ভুলে যায়। সে ছুটে পালিয়ে যায়, আনন্দ-গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখে—আর তার মুখে অজান্তে গান বাঁধা হয়ে যায়। জীবনের সঙ্গীত তা—যে জীবনের খেলা সে দেখছে সামনে। যে-ঘুড়ি কাটল—তা হচ্ছে আত্মা—মুক্তি পেয়েছে। তবু মা হাসছেন, খেলছেন, যেন জানেন না যে, এ সবই ছায়ার খেলা!

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি,
ভবসংসার বাজার মাঝে।...
ঘুড়ি লক্ষে দু'একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।

[In the market place of this world,
The Mother sits flying Her kite.
In a hundred thousand,
She cuts the string of one or two.
And when the kite soars up into the Infinite
Oh how She laughs and claps her hands!]

* অদ্বৈতবাদীর কাছে 'চিনি হতে না চাওয়া' নিম্নাবস্থানের অবস্থা, কিন্তু লীলার আনন্দে থাকা। লীলাবাদীর 'চিনি খেতে ভালবাসি'র মধ্যেই সৃষ্টিরহস্য রয়েছে, কারণ অভেদে প্রলয় এবং রূপভেদের লীলাকামনায় সৃষ্টি।

আবার কবি কিছু নেই তবু তারি মধ্য থেকে রহস্য সৃষ্টি করে শিশুর মত আনন্দের লুকোচুরি খেলছেন।

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে,
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।...
ষড়্দর্শনে না পায় দরশন,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।...
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে
আমি তত্ত্ব করি যাঁরে
সেটা, চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি,
বোঝ না রে মন ঠারে ঠারে।

[The name of Her whom I call my Mother
Shall I tell that secret to the world?
(Lit. 'Shall I break the pot before the market?')
Even then who knows Her?
Lo, the six philosophies were not able to
find out Kali!]

মাত্র একটি অলংকারে দেখা যায়, কবি আর শিশু নেই, যেখানে ব্যাকুল হয়ে তিনি নিজেকে শুধিয়েছেন—'ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি-রত্নাকরের অতল জলে',—সেই সৌন্দর্যসাগরে ডুবতে বলেছেন মনকে যেখানে 'রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।'

সুকোমল শিশুহৃদয়ের ব্যাকুল অর্চনার শিল্পরীতির বিষয় এই পর্যন্ত। মায়ের সঙ্গে কবির এই ঘনিষ্ঠতার জন্য এই কবি হিন্দুর কাছে কেবল প্রিয় ও মহান হয়ে ওঠেন নি, পরম ভক্তরূপেও গৃহীত হয়েছেন। সেন্ট টেরেসার তিরস্কারের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে এক্ষেত্রে: 'প্রতিদিন যেসব মানুষ বা বস্তু আশেপাশে দেখি তার থেকে ঈশ্বর অনেক সত্য আমার কাছে।' ঈশ্বরের এত নিকট এই যে আত্মা, এ কি সেই শিশু নয়, যাকে খ্রীস্টের জানুর উপরে স্থাপন করা হলে তিনি বলেছিলেন—'স্বর্গরাজ্য এদেরই নিয়ে!'

মৃতের জন্য প্রার্থনা*

আত্মগতভাবে :

কি নির্জন হয়ে গেছে শহর, কি ভীষণ জনশূন্য ঘর-বাড়ি,
যেখানে এক সময় লোক গমগম করত!...
কি ক'রে উৎস শুকিয়ে গেল, বাতি গেল নিভে!
কি ক'রে আগুন নিভে গেল, চুল্লির উপর ছাই পড়ল ছড়িয়ে!
কারণ এখন কুমোরের পরম হাত নিজের তৈরি পাত্র ভেঙে ফেলেছে।
এবং জগম্মাতা আমাদের পরম প্রিয়ের মুখ রেখেছেন ঘোমটার আড়ালে।
রাত্রি অন্ধকার, শ্মশানে ঝড় ভয়ংকর।
খরস্রোতা গভীর নদী ভস্মরাশি বহনের পক্ষে।
কাল অনন্ত, যে-কালে বিদেহী আত্মারা ধাবমান।
এবং প্রেম মৃত্যুর হাতকে আটকাবার ব্যর্থতায় কাঁদছে।
হে প্রিয়, আমাদের পুষ্পবনে শুকিয়ে গেছে ফুল, শূন্যপদ্ম পদ্মদীঘি।
আমাদের কাছে গানের পাখির গান থেমে গেছে, আমাদের চোখের তারার উপর দিয়ে কালো মেঘ চলে গেছে।
কারণ তোমার পায়ের চিহ্ন আমাদের দরোজায় আর পড়ে না, তোমার চোখে আর আলো দেখি না।

মৃতার প্রতি প্রণতি :

তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ, যাবার আগে আবার শোনো আমাদের প্রণতি এবং বিদায়!
সমস্ত আঘাত এবং নিঃসঙ্গতার জন্য,
সমস্ত ক্ষুব্ধ এবং অধীর ভাবনা-চিন্তার জন্য,
সমস্ত ভালোবাসায় আমাদের ব্যর্থতার জন্য,
অথবা ভালোবাসা, তোমাকে যে-কথা বলতে পারিনি
আমরা ভালোবাসতাম, ক্ষমো হে ক্ষমো।
জীবনে তোমার সমস্ত প্রয়োজনের জন্য,
মৃত্যুর পরে সমস্ত প্রয়োজনের জন্য,
যে-পরিশ্রম তোমাকে ক্লান্ত করেছিল,
এবং যে-ভালোবাসা তোমাকে শান্তি দিতে পারেনি,
ক্ষমো হে ক্ষমো।
তোমার মৃত চরণে এইখানে নম্রভাবে আমরা তোমার অতীতের স্মৃতিপত্র অর্পণ করছি।

---

* নিবেদিতাকৃত *An Indian Study of Love and Death* কাব্যগ্রন্থের *An Office of the Dead* -এর অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত।

তোমার শিশু-দিনের অনুস্মরণে অসীম ভালোবাসায় আবার আমরা বেঁচে উঠি।

একে একে তোমার সমস্ত সাহায্যের মাধুর্যের নম্র আত্মনিয়মের কথা আমাদের মনে আসছে।

আমাদের একত্র চলার স্মৃতি অপরূপ! আশ্চর্য! মৃত্যুর সামনে তুমি এখন পবিত্রতা!

কিন্তু জেনে রাখো, তুমি আমাদের গভীর ভালোবাসায় ফুল, জেনো, যতদিন না আমরাও মৃত্যুর দ্বারা আবৃত হয়ে তোমার পাশে যাচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত আমরা তোমাকে নিয়ত প্রেমের ও সাহায্যের প্রার্থনা পাঠাতে ভুলব না।

জেনে রাখো ভালোবাসা মৃত্যুর মতোই শক্তিমতী, অনেক জলেও ভালোবাসার তৃষ্ণা মেটে না, অনেক প্লাবনেও ভালোবাসা ভেসে যায় না।

তোমার হাত আমাদের হাত থেকে বিচ্যুত হয়নি। আমাদের হৃদয়ের জীবন থেকে তোমার নাম চলে যায়নি।

এবং আমরা এটা ভালোই জানি যে আমাদের তীব্র ইচ্ছা এবং ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা তোমার কাছে না পৌঁছে পারে না, তোমাকে শক্তি না দিয়ে পারে না। ইহলোকে অথবা পরলোকে—ঈশ্বরের যা ইচ্ছা।

কিন্তু তুমি—প্রিয় আমাদের—এখন বিশ্রাম নাও, শান্তিতে থাকো। তারপর জেগে উঠে আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা কোরো; এখন এবং মৃত্যুর লগ্নে চিরদিন প্রার্থনা কোরো।

পুজা :

তুমি রাত্রি ভয়ঙ্করী!
তুমি রাত্রি ছলনাময়ী!
তুমি রাত্রি অয়ি মৃত্যুময়ী!
তোমাকে প্রণাম করি আমরা।
তোমাকে প্রণাম করি। তোমাকে প্রণাম করি।
তোমাকে প্রণাম।
জীর্ণ বাস ছেড়ে মানুষ নতুন বস্ত্র পরিধান করে,
জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে আত্মা নতুন দেহে আশ্রয় নেয়...
যা জন্মেছে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত,
যা মৃত তার জন্ম সুনিশ্চিত...
দেহী আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না...

এই সমস্ত দেহ যা আত্মাকে ধারণ ক'রে আছে বিনাশ আছে তাদের, শুধু আত্মা অনন্ত, অবিনশ্বর, অজ্ঞেয়...

সেই আত্মাকে অবিনাশী ব'লে জানো, যে-আত্মা জগৎ চরাচর পরিব্যাপ্ত ক'রে আছে। কোন কিছুই সেই অনিঃশেষ আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না...

দেহ আসে আর যায়। মৃত্যু থেকে আমাদের অমৃতত্বে নিয়ে যাও!...

শান্তি! শান্তিতে থাকো শ্মশানতীর্থে হারিয়ে-যাওয়া হে মানুষ, তোমরা চলে গেছ আগে, আমরা তোমাদেরই পিছনে আসছি।

হে মহান শক্তিমান মৃত্যু! হে সুখী মৃত্যু! অনন্তকাল ধ'রে পৃথিবী মৃতদের জন্য রোরুদ্যমানা। মৃতের জন্য কেঁদো না! জীবিতদের জন্য বরং কাঁদো, কারণ তাদের মৃত্যু এখনো বাকি।

মৃতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য :

ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমাকে রক্ষা করুন।
ঈশ্বর তাঁর মুখের আলো তোমার উপর প্রক্ষেপ করুন,
এবং তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন,
তোমাকে শান্তি দান করুন।
স্বর্গ থেকে করুন তোমাকে সাহায্য।
স্বর্গীয় আসন থেকে তোমাকে শক্তিমতী ক'রে তুলুন।
পূরণ করুন তোমার অন্তরের ইচ্ছা;
ভরে তুলুন তোমার সমস্ত প্রাণ-মন।

প্রার্থনা :

হে কৃষ্ণ, জনগণের প্রিয় গোপাল প্রিয় রাখাল,
হে বুদ্ধ, অনন্ত করুণার অবতার,
যীশু, আত্মার প্রেমিক, আত্মার ত্রাণকর্তা,
রামকৃষ্ণ, মহামাতার মুখচ্ছবি, আর বিবেকানন্দ বীরপ্রাণ,
তোমরা এবং আত্মার আর-সব নামহীন প্রভু
দিব্য করুণার মূর্তি
তোমরা এই আত্মাকে গ্রহণ এবং রক্ষা করো।
হে ঈশ্বর এই মেয়েটিকে তোমার সামনে তোমার সমীপে রাখো,
এবং আলো অন্তহীন তার মুখের উপর বিভাসিত হোক।

'শান্তিতে বিশ্রাম' (স্বামী বিবেকানন্দ রচিত) :

দ্রুত যাও দ্রুত আত্মা তোমার
তারকাকীর্ণ পথে!
ধন্য আত্মা যাও দ্রুত সেইখানে
যেখানে চিন্তা-ভাবনা পেয়েছে মুক্তি!
যেখানে করে না ইন্দ্রিয় কাল দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন
অসীম শান্তি আশীর্বচন বর্ষিত হোক তোমার উপরে, হোক
তোমার সত্য কর্ম তোমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন!
মধুময় স্মৃতি যা অতিক্রম ক'রে সমস্ত দেশ আর কাল,
বেদীর গোলাপের মতো পূর্ণ করুক তোমার পিছনের আসন।

তোমার বন্ধন ছিন্ন, আশীর্বাদে তোমার অন্বেষা সমাপ্ত,
এবং তা-ই যা জীবন-মৃত্যুর মতো আসে,—
তুমি সহায়! পৃথিবীতে সর্বসময়েই ঈর্ষাহীন,
এই দ্বন্দ্ব-কলহের জগতকে তুমি এখনো প্রেম দিয়ে সাহায্য করতে অগ্রসরমান।

রুদ্রের প্রতি প্রার্থনা :

হে রুদ্র, অসৎ থেকে মেয়েটিকে সতে নিয়ে যাও!
অন্ধকার থেকে মেয়েটিকে আলোতে নিয়ে যাও!
মৃত্যু থেকে মেয়েটিকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও!
প্রবেশ করো মেয়েটিতে মেয়েটির আত্মার ভিতর দিয়েই হে রুদ্র।
এবং রক্ষা করো তাকে রক্ষা করো অজ্ঞান থেকে, হে রুদ্র!
অবারিত করো তোমার দক্ষিণ মুখ তার কাছে!

জগন্মাতার প্রতি প্রার্থনা :

হে মাতঃ, তুমি সর্ব আশীর্বাদ-দাত্রী,
সর্ব প্রার্থনা-পূরয়িত্রী,
সর্ব সৎ কর্মের কারয়িত্রী,
তোমাকে আমাদের প্রণাম।
তোমাকে প্রণাম করি। তোমাকে প্রণাম করি।
তোমাকে প্রণাম।
তুমি রাত্রি ভয়ংকরী!
তুমি রাত্রি ছলনাময়ী!
তুমি রাত্রি অয়ি মৃত্যুময়ী!
তোমাকে প্রণাম করি আমরা।
তোমাকে প্রণাম করি! তোমাকে প্রণাম করি!
তোমাকে প্রণাম!

নিবেদিতা-নির্দেশিকা

সাধারণ নির্দেশিকা